(কোচবিহার দর্পণ) (প্রথম খণ্ড, ১৩৫২)

সম্পাদক—অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত এম-এ

সূচীপত্র

(বৈশাখ—আশ্বিন)

বিষয়-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

বিষয়		পৃষ্ঠাঙ্ক
ঊর্দ্ধপথের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৯০
অবিনাশ বাবুর বার্দ্ধক্য (গল্প)	শ্রীজগদীশ গুপ্ত	৯৭
অঞ্জলি (শোক-গাথা)	শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ	১২৪
আমার মা (কবিতা)	শ্রীজগদীশ গুপ্ত	২০১
আয়নার টুক্‌রো (গল্প)	শ্রীঅমলেন্দু রায় বি-এ	১১৮
উদ্বোধন (কবিতা)	ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট, সি-আই-ই	৪৫
উপনদী (উপন্যাস)	শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য	২৩১
এক দেহে একাধিক মানুষ (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন এম-এ	৪৯
ওরে যাযাবর মন (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	২৫৮
ঔপন্যাসিক অন্নদাশঙ্কর রায় (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি	১৭
কবিগুরু স্মরণে (প্রবন্ধ)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ	১৩৯
কবিধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি	১৪৬
কা-না-চৌ (গল্প)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	১৬৭
কুচবিহারী কাণ্ড (গল্প)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	৩১

CENTRAL LIBRARY

P 29410

বিষয়		পৃ:
গরিলারে গেরিলারা করিছে নকল (কবিতা)	শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত	৭৬
চিঠি (কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রলাল রায়	১১৪
চিলারায় সৈন্যাবাস (কবিতা)	শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ	৩২
জন্মাষ্টমী (প্রবন্ধ)	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন	১৯২
জয়দেব (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর এম-এ	১৩৩
আলো আওন জ্বালো (কবিতা)	ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট, সি-আই-ই	২০৬
তারাশঙ্করের মন্বন্তর (আলোচনা)	ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি	১৮
তোমার বিরহ মোর এল কাছে (কবিতা)	শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	১৫৪
দেশবিদেশের কথা	৩৭, ৮৩, ১২৭, ১৬৮, ২১১,	২৬০
ধূলিকণা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম-এস-সি	৭৭
নতুন বছর (কবিতা)	শামসুদ্দীন	১৮
নরনারায়ণ সেনানিবাস (কবিতা)	শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ	৭৫
পদার্থের রূপান্তর (প্রবন্ধ)	শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম-এস-সি	২৪৭
পরিচয় (গল্প)	শ্রীদাসবিহারী মণ্ডল	২৬৯
পাঁঠা ও কমলাকান্ত (কবিতা)	শ্রীজগদীশ গুপ্ত	৫১
বঙ্কিমচন্দ্র ও কোমত দর্শন (প্রবন্ধ)	অধ্যাপিকা শ্রীমরুকতী সেন এম-এ	
বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি	১৫
বনফুল (কবিতা)	শ্রীসাধনা গুহ বি-এ	১৯৯
বর্ত্তমান শিক্ষাধারার দৃষ্টিভঙ্গী (প্রবন্ধ)	শ্রীগীতা গুপ্ত বি-এ, বি-টি	১৪৩
বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীমন্মথরতন গুপ্ত এম-এ	২১৯
বাহন (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীশুকদেব সেনগুপ্ত এম-এ	১৫৩
বিজ্ঞানবাদ (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীশুকদেব সেনগুপ্ত এম-এ	৫৭
ব্যঙ্গরসে কবিশেখর কালিদাস রায় (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ	৪৯
ভক্ত (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৪৫
ভাব ও ভাষা (কবিতা)	ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি,	৪৫

সূচীপত্র ।

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	ভাব ও ভাষা (কবিতা)	ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ, পি-এইচ্-ডি, ডি-লিট	১
২।	শ্যামাসঙ্গীত (প্রবন্ধ)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় বি-এ	৩
৩।	ভক্ত (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৭
৪।	বিজ্ঞানবাদ (প্রবন্ধ)	শ্রীশুকদেব সেনগুপ্ত এম্-এ	৮
৫।	শ্রীশ্রীবাসুদেব (কবিতা)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ	১৩
৬।	শান্তিনিকেতন দর্শনে (প্রবন্ধ)	শ্রীগীতা গুপ্ত বি-এ, বি-টি	১৪
৭।	নতুন বছর (কবিতা)	শামসুদ্দীন	১৮
৮।	শেষের কবিতা (প্রবন্ধ)	শ্রীদুর্গাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম্-এ	১৯
৯।	বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন (প্রবন্ধ)	শ্রীকমলারঞ্জন গুপ্ত এম্-এ	২২
১০।	মধু-চন্দ্রিমা (গল্প)	শ্রীঅখিল নিয়োগী	২৪
১১।	চিলারার সৈন্যাবাস (কবিতা)	শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ	৩১
১২।	রাজপরিবারের সংবাদ		৩৩
১৩।	স্থানীয় সংবাদ	... ...	৩৪
১৪।	দেশবিদেশের কথা ...	...	৩৭
১৫।	সাময়িক প্রসঙ্গ	... ...	৪০
১৬।	খেলা-ধূলা	... ...	৪৩

বিজ্ঞাপন।

কুচবেহার রাজ্যস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষক, সম্পাদক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের অবগতির জন্য জানান যাইতেছে যে, বর্ত্তমান বৎসর হইতে পূর্ব্বের ন্যায় কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় গৃহীত হইবে; সুতরাং বর্ত্তমান বৎসর হইতে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের তৃতীয় শ্রেণীর শেষ পরীক্ষা স্কুলে গৃহীত না হইয়া স্কুলের নিকটবর্ত্তী কেন্দ্রে গৃহীত হইবে এবং ছাত্রদিগের পরীক্ষার ফলানুসারে বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইবে।

স্কুল ইন্‌স্পেক্টর অফিস,
কুচবিহার। ১৩ই মে ১৯৫৫ ইং।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত,
কুচবেহার রাজ্যস্থ স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টর।

কে, এম, সরকারের

'ক্ষতবিনাশন'

সর্বপ্রকার ক্ষতের অব্যর্থ মহৌষধ।

শুষ্ক ক্ষত, ব্রণের ঘা, অস্ত্র ঘত, স্তনের ঘা, নাসা ক্ষত, মাথার ঘা, পোড়ার ঘা, আঙ্গুলঘা, কাটা ঘা, নালী ঘা, কাঁড়ার ঘা, পুঁচাঘাত, বিষাউজ (বিচুটি) ঘা, পাচড়া, পাপড়ি ঘা, মাথীর ঘা, ছবিত ঘা ইত্যাদি যত দিনের যে কোন ঘা ঠিক না কেন বিনা যন্ত্রণায় অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হইবে। এই ঔষধ নির্দ্দোষ উপাদানে প্র

এজেন্ট—মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স, কোচবিহার

প্রোঃ—কে, এম, সরকার এণ্ড সন্স, হেড অফিস :—বাধাডাঙ্গা, কোচবিহার।

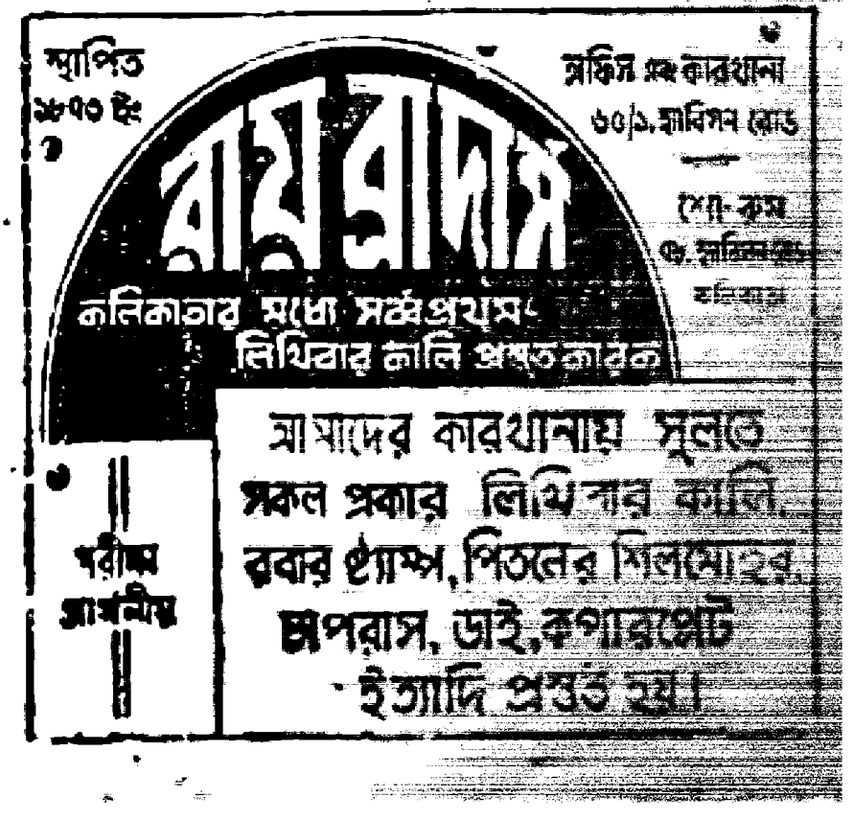

বিষয়		পত্রাঙ্ক
মধু চন্দ্রিমা (গল্প)	শ্রীঅখিল নিয়োগী	২৪
মাটী ও আকাশ (কবিতা)	শামসুদ্দীন	১০৪
মাপাধরা (নাটিকা)	শ্রীযামিনীমোহন কর	২০৪
মৌচাক (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৫৭
রবীন্দ্র প্রতিভার এক দিক (প্রবন্ধ)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	২১১
রাজপরিবারের সংবাদ	৩৩, ৮৯, ১২২, ১৬৫, ২১১,	২৫৯
লতার ব্যথা (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২০৮
শান্তিনিকেতন দর্শনে (প্রবন্ধ)	শ্রীগীতা গুপ্ত বি-এ, বি-টি	১৪
শারদীয় (কবিতা)	শামসুদ্দীন	২৫৬
শিক্ষার পথ-সঙ্কট (প্রবন্ধ)	শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	১৩৬
শেষের কবিতা (আলোচনা)	অধ্যাপক শ্রীদুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম-এ	১৯
শোক-সংবাদ		১২৩
শ্যামদেশে ভারতীয় সভ্যতা (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী এম-এ, ডি-লিট.	২২৩
শ্যামসুন্দর (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৫৭
শ্যামাসঙ্গীত (প্রবন্ধ)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	৩
শ্রাবণ ঘন বরিষণ মেঘ (কবিতা)	শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত	১৬৪
শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক (আলোচনা)	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন	৬৮, ১০৮
শ্রীমথুরা (কবিতা)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ	২৭
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা (প্রবন্ধ)	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ	২৩২
শ্রীশ্রীবাসুদেব (কবিতা)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ	১৩
ষ্টালিং পাওনার কথা (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ	১৫৫
সাময়িক প্রসঙ্গ	৪০, ৮৫, ১২৯, ১৭১	২৬২
সাহস (গল্প)	শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র	১৮৫
সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব (প্রবন্ধ)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	১৮১
স্থানীয় সংবাদ	৩৪, ৮০, ১২৫, ১৬৬, ২১৫,	২৫৯
স্বভাবোক্তি (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত এম-এ	২১৪
স্বর্গবাস (গল্প)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	২১৬
স্রষ্টা (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৮৯
হে মরণজয়ী তোমাকে প্রণাম করি (কবিতা)	শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায় বি-এ	২১০

লেখক সূচী—বর্ণানুক্রমিক

লেখক		পত্রাঙ্ক
শ্রীঅনিল নিয়োগী—মধুচন্দ্রিমা	(গল্প)	২৪
শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্য—উপনদী	(উপন্যাস)	২৩১
শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—ওরে যাযাবর মন	(কবিতা)	২৪৮
—তোমার বিরহ মোর এনো কাছে	(কবিতা)	১৫৪
শ্রীঅমলেন্দু রায় বি-এ—আপনার টুকরো	(গল্প)	১১৮
অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত এম-এ—বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন	(প্রবন্ধ)	২২
অধ্যাপিকা শ্রীঅরুন্ধতী সেন এম-এ—বঙ্কিমচন্দ্র ও কোমত দর্শন	(প্রবন্ধ)	৯৪
শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—কা-না-চৌ	(গল্প)	১৪৭
—কুচবিহারী কাণ্ড	(গল্প)	৬১
—স্বর্গবাস	(গল্প)	২২৬
কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়—অনন্তপথের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ	(প্রবন্ধ)	৯০
—রবীন্দ্র প্রতিভার একদিক	(প্রবন্ধ)	২১৯
—শ্যামসঙ্গীত	(প্রবন্ধ)	৩
—সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব	(প্রবন্ধ)	১০১
শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত—গরিলাকে গেরিলারা করিছে নকল	(কবিতা)	৭৪
—শ্রাবণ ঘন বরিষণ মেঘ	(কবিতা)	১৬৪
শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক—ভক্ত	(কবিতা)	৭
—মৌচাক	(কবিতা)	১৫৩
—লতার ব্যথা	(কবিতা)	২০৮
—শ্যামসুক	(কবিতা)	২৫৭
—স্রষ্টা	(কবিতা)	৮৯
অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর এম-এ—জয়দেব	(প্রবন্ধ)	১৩৩
শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র—সাহস	(গল্প)	১৮৭
শ্রীগীতা গুপ্ত বি-এ, বি-টি—বর্তমান শিক্ষাধারার দৃষ্টিভঙ্গী	(প্রবন্ধ)	১০৫
—শান্তিনিকেতন দর্শনে	(প্রবন্ধ)	১৪
শ্রীজগদীশ গুপ্ত—অবিনাশ বাবুর বার্দ্ধক্য	(গল্প)	৯৭
—আমার মা	(কবিতা)	২০২
—পাঠা ও কমলাকান্ত	(কবিতা)	৫৬
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ—শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	(প্রবন্ধ)	২০২
শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ—অশ্রুকণা	(শোক গাথা)	১২৪
—চিগারায় সৈন্যাবাস	(কবিতা)	৩১
—নরনারায়ণ সেনানিবাস		৭৫

লেখক		পত্রাঙ্ক
অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম-এস-সি	—ধূলিকণা (প্রবন্ধ)	৭৭
	—পদার্থের রূপান্তর (প্রবন্ধ)	২৪২
অধ্যাপক শ্রীদুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য এম-এ	—শেষের কবিতা (আলোচনা)	১৯
অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন এম-এ	—এক দেহে একাধিক মানুষ (প্রবন্ধ)	৪৯
ডক্টর শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র বাগচী এম-এ, ডি-লিট	—শ্যামদেশে ভারতীয় সভ্যতা (প্রবন্ধ)	২২৩
অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম-এ	—বাঙ্গলার কবিশেখর কালিদাস রায় (প্রবন্ধ)	১৬০
শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত	—শিক্ষার পথ-সঙ্কট—(প্রবন্ধ)	১৩৬
শ্রীযামিনীমোহন কর	—মণ্ডাধরা (নাটিকা)	২০৪
শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল	—পরিচয় (গল্প)	২৪৯
ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর এস, পি-এইচ-ডি	কবি ও যুগ ধর্ম্ম (প্রবন্ধ)	১৯৬
	—বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব (প্রবন্ধ)	৪৭
শামসুদ্দিনন	—নতুন বছর (কবিতা)	১৮
	—মাটি ও আকাশ (কবিতা)	১০৪
	—শারদীয় (কবিতা)	২১৬
অধ্যাপক শ্রীশুকদেব সেন গুপ্ত এম-এ	—বাচন (প্রবন্ধ)	১৯১
	—বিজ্ঞানবাদ (প্রবন্ধ)	৮
শ্রীশৈলেন্দ্রলাল রায়	—চিঠি (কবিতা)	১১৩
শ্রীশ্যাম চন্দ্র রায়	—হে নবজন্মী তোমাকে প্রণাম করি (কবিতা)	২১০
শ্রীমতী শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ	—ষ্টার্লিং পাওনার কথা (প্রবন্ধ)	১৫৫
ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল, পি-এইচ-ডি	—ঔপন্যাসিক অন্নদাশঙ্কর রায় (প্রবন্ধ)	১৭৫
	—তারাশঙ্করের মন্বন্তর (প্রবন্ধ)	৫৮
শ্রীসাধনা গুহ বি-এ	—বনফুল (কবিতা)—	১৬৯
অধ্যাপক শ্রীসুধীর কুমার দাশ গুপ্ত এম-এ	—স্বভাবোক্তি (প্রবন্ধ)	২৫৪
ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ ডি-ডি-লিট-সি-আই-ই	—উদ্বোধন (কবিতা)	৪৫
	—আলো আগুন আলো (কবিতা)	২০৭
	—ভাব ও ভাষা	১
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ	—কবিগুরু স্মরণে (প্রবন্ধ)	১৩৯
	—শ্রীমথুরা (কবিতা)	৯৭
	—শ্রীশ্রীবাসুদেব (কবিতা)	১৩
শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন	—জন্মাষ্টমী (প্রবন্ধ)	১২২
	—শ্রীশ্রীঅরবিন্দের প্রথম শ্লোক (আলোচনা)	৬৬, ১১৮

বিজ্ঞাপন।

অত্র রাজ্যে খনিজ তৈল (কেরোসিন, পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি) আবিষ্কার মানসে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে ঘোষণা করা যাইতেছে যে :—

নিম্নলিখিত সংবাদগুলি রাজদরবারে যে কোন ব্যক্তি পেশ করিবেন, যদি উহা গ্রহণযোগ্য অথবা কার্য্যকরী বিবেচিত হয়, রাজদরবার হইতে তিনি যথোপযুক্ত পুরস্কৃত হইবেন।

(১) যদি কোন নদী বা ছড়ার জলের উপরিভাগে তৈলাক্ত পদার্থ জমিতে দেখা যায়;

(২) যে কোন স্থানের নদী বা জলা ভূমির অন্তস্থল হইতে জলবুদ্বুদ নির্গত হইতে দেখা যায়;

(৩) যে কোন স্থানে কোনরূপ লবণাক্ত জলের ফোয়ারা বা দুর্গন্ধযুক্ত জলধারা বা এরূপ জল প্রস্রবণ যাহা জলের উপরিভাগে আসিবামাত্র তাম্রবর্ণ পদার্থ (Brown Stuff) পৃথক করিয়া দেয়।

মন্তব্য :—উপরে লিখিত নির্দ্দেশগুলি ভূগর্ভস্থ খনিজ তৈলের পরিচায়ক। উক্ত লক্ষণগুলি সচরাচর বর্ষাকালে অথবা বর্ষার অব্যবহিত পরেই দৃষ্ট হয়।

কুচবিহার।
১১ই অক্টোবর, ১৯৪৫।

শ্রীহেমেন্দ্রকিশোর সেনগুপ্ত,
সেক্রেটারী ষ্টেট কাউন্সিল, কুচবিহার।

CENTRAL LIBRARY

কোচবিহার দর্পণ।

'শুন হে মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

—চণ্ডীদাস।

অষ্টম বর্ষ, | বৈশাখ ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ | ১ম সংখ্যা

ভাব ও ভাষা।

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ; পি-এইচ্-ডি; ডি-লিট্; সি-আই-ই।

একটি বাক্যের মাঝে
আমারে নিঃশেষ করে দেব
হেন শক্তি নাই;
তাই শুধু বাক্য হোতে
বাক্যে ছুটে যাই।
অনন্তের রথ
অনন্তে রয়েছে তার পথ,
তাই যত ছুটে যাই
তত পথ আরো থাকে বাকী;
বাক্য দিয়ে বোঝাব আমারে
চিত্ত জুড়ে ঘোরে এই
আকাঙ্ক্ষার ফাঁকী

নিদাঘের প্রখর সূর্য্যালোকে
লোকে লোকে আলোক বিস্তারে :
জানাতে মহিমা আপনার, মহাকাশ
আলোকের ভাষা দিয়ে
মহাশূন্যে করেছে প্রকাশ।

সে প্রকাশ ঢেকে দিল তারে
আপন আলোর অহঙ্কারে
সিত পীত নীল মরকত
বিচিত্রিত বর্ণের গৌরবে :

সে ফিরিছে নানা কলরবে
অঙ্কুরিল বৃক্ষ ওঠে
কুঞ্জে কুঞ্জে পুষ্পদল ফোটে
গন্ধের সম্ভারে
তবু সে গম্ভীর রহে
সবাকার অগোচর
প্রকাশের সর্ব্ব অবসর
রবি তার রশ্মিদলে হানে।

আকাশের মহিমারে
ক্ষুণ্ণ করি রশ্মিভারে
আপন সুনীল বর্ণে
দেয় তার মিথ্যা পরিচয়

সত্যের প্রকাশচ্ছলে
মিথ্যাজালে লইয়া প্রশ্রয়;
তাই মেঘ মহাকাশ
আপনারে অন্ধকারে ঢাকে;
আপন মহিমা তার
শুধু চাহনির ছলছলে
আপনা প্রকাশ করে
রসের উচ্ছল টলমলে।

তাই বলি বাক্য থাক্
সে পূরাক্ শুধু তার
মিথ্যার বঞ্চনাময় ফাক্;
হে চিত্ত নিস্তব্ধ তুমি রহ
আপন নির্বাকে তুমি
অনুভবে পরিপূর্ণ হয়ে
আপন অনন্ত বাণী কহ।

শ্যামাসঙ্গীত।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়।

রামপ্রসাদের আগে শ্যামা সঙ্গীত দুই চারিটি রচিত হইয়াছিল কিন্তু সেগুলি দেশে সমাদৃত হয় নাই। রামপ্রসাদকেই শাক্তপদাবলীর চণ্ডীদাস বলা যাইতে পারে। রামপ্রসাদের পূর্ব্বে অসংখ্য বৈষ্ণব পদাবলী রচিত হইলেও শক্তিপূজক বাংলা দেশে শ্যামা সঙ্গীত কেন রচিত হয় নাই তাহা ভাবিবার বিষয়। প্রাচীন বাংলার পূজার অনুষ্ঠান ধারা অনুসরণ করিলে মনে হয় বঙ্গদেশে সঙ্গীত-সংযোগে শ্যামা মার প্রভাব তেমন সঞ্চারিত হয় নাই। বঙ্গদেশ

বহুলোক বৈষ্ণব ছিলেন, পূর্বে যাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন তাঁহাদের কেহ বৈষ্ণব, কেহ শৈব, কেহ সহজিয়া, কেহ বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বর্ণাশ্রমী সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোক ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা শক্তি পূজা করিত। নারীজাতির মধ্যেই শক্তিপূজার প্রচার ছিল বেশী। রামপ্রসাদের পূর্বে বাংলা দেশে যে ধর্ম্ম-দ্বন্দ্বের ইতিহাস পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায়—শক্তির ভক্তদের সহিত বিষ্ণু, শিব, ধর্ম্ম ইত্যাদি দেবতাদের দ্বন্দ্ব ঘটিতেছে। বাঙ্গালী যে শক্তির পূজা করিত—সে শক্তি ঠিক মহাকালী বা মহামায়া নহেন—তিনি বেদান্তের ব্রহ্মময়ী তারা নহেন—তিনি আত্মপূজা প্রচারের জন্য ব্যাকুল, তিনি নিজের বিলীয়মান ও বিলুপ্যমান দেবীত্বকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ছলবল কৌশলের আশ্রয় লইতেছেন—ভক্তকে প্রলুব্ধ করিতেছেন—তাঁহার ঐহিক কামনার পূরণ করিতেছেন—বিদ্রোহী ও বিদ্বেষীকে দণ্ডিত করিতেছেন—তিনি ছলনাময়ী, তিনি নিজের প্রভাব সঞ্চারিত করিবার জন্য দেবপুত্রগণকে অভিশাপের দ্বারা মর্ত্ত্যে অবতারিত করিতেছেন। বাঙ্গালী ইঁহাকে মনসা, চণ্ডী শীতলা ইত্যাদি রূপে উপাসনা করিয়াছে। ইনি ব্রহ্মময়ী তারা নহেন। অনার্য্যদের উপাস্যা দেবী, ব্যাধগণের উপাস্যা দেবী এবং বৌদ্ধদের আদ্যা, বজ্রতারা ইত্যাদি দেবীরাই শিবসীমন্তিনী জগদম্বার অঙ্গ ধরিয়া বাঙ্গালীর পূজা আদায় করিয়াছেন। এই দেবীদের উচ্চশ্রেণীর বাঙ্গালীরা বিশেষতঃ পুরুষ সমাজ সহজে স্বীকার করিয়া লয় নাই। নারীদেবতা বলিয়া বা নারীদের দেবতা বলিয়া পুরুষ-সমাজ মস্তক অবনত করিতে যায় নাই। আবার বৌদ্ধ ও অনার্য্যদের দেবতা বলিয়াও তাহাদের পূজায় আপত্তি ছিল। চণ্ডী যদি শিবজায়া মহামায়া বলিয়া স্বীকৃত হইতেন তাহা হইলে শৈব ধনপতি কখনো চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করিতে পারিত না অর্থাৎ কবিরা একথা লিখিতেই পারিতেন না, তাঁহাদের লেখনী স্তম্ভিত হইয়া যাইত।

এই দেবীদের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ ছিল ভয়ের—ভালবাসার নয়, বাৎসল্যের নয়। পুত্রের সঙ্গে জননীর যে আবদার অভিমানের সম্বন্ধ এই দেবীদের সঙ্গে উপাসকদের সে সম্বন্ধ ছিল না। সম্বন্ধটা ছিল যেন আদানপ্রদানের, Barter and Exchange এর। এরূপ স্থলে কাব্য রচিত হইতে পারে, রসঘন গীতি বা পদাবলী রচিত হইতে পারে না। তাই রামপ্রসাদের আগে শাক্ত পদাবলীর জন্ম হয় নাই।

রামপ্রসাদের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে লৌকিক দেবতাদের প্রভাব প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। সম্ভবতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবের আতিশয্যেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু শক্তিপূজক বাঙ্গালীর শক্তিতত্ত্ব বিলুপ্ত হইতে পারেনা। বাঙ্গালীর শক্তিপূজা আর্য্যহিন্দুর বেদান্ত পুরাণ ও তন্ত্রের মহাশক্তিকে আশ্রয় করিল। আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী সহসা চৈতন্য লাভ করিয়া চৈতন্যময়ীর সন্ধান পাইল—তাহার মোহনিদ্রা বিদূরিত হইল—সে মা মা বলিয়া মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিয়া জগদম্বার চরণে আশ্রয় লইল। তখন হইতেই শাক্তপদাবলীর সৃষ্টি। রামপ্রসাদ শুধু শাক্তপদাবলীর প্রবর্ত্তক নহেন—তিনি এদেশে মহাশক্তির পূজারও প্রবর্ত্তক। যে বেদান্ত ভারতের শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি ধর্ম্মের ভিত্তি সেই বেদান্তই রামপ্রসাদ-প্রবর্ত্তিত শাক্তধর্ম্মেরও ভিত্তি। কাজেই শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত রামপ্রসাদের শাক্ত ধর্ম্মের কোন দ্বন্দ্ব নাই। রামপ্রসাদের শ্যামা মা ব্রহ্মেরই মাতৃরূপ—ব্রহ্মময়ী। তাই রামপ্রসাদের পদাবলীতে সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। শতশত বৎসর ব্যাপী ধর্ম্মদ্বন্দ্বের অবসান হইয়াছে রামপ্রসাদের পদাবলীতে।

বঙ্গদেশে শ্যামের আহ্বানে যদি শ্যামা আসিয়া না থাকেন—বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ায় শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব হইয়াছে একথা বলিলে খুব অসঙ্গত হয় না।

রামপ্রসাদের পরে এদেশে অসংখ্য শ্যামা সঙ্গীত রচিত হইয়াছে—শত শত কবি রামপ্রসাদের অনুকরণে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদই তাঁহাদের গুরু। রামপ্রসাদের মত সাধকতা ও কবিত্বের শক্তি তাঁহাদের কাহারো ছিল না। এক কমলাকান্ত রামপ্রসাদের শক্তি কতকটা পাইয়াছিলেন। রামপ্রসাদের পরবর্তী শাক্ত-গীতিগুলিতে কবিত্বের অভাব আছে বটে কিন্তু ভক্তির অভাব নাই। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণের আকিঞ্চন বহু পদেই দেখা যায়। সাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলির স্থান আছে—কিন্তু সেগুলি পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনার বস্তু নয়।

যে আবদার অভিমানের সুর রামপ্রসাদের পদগুলিতে কাব্যরসের সঞ্চার করিয়াছে—তাঁহাদের গীতগুলিতে তাহা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে—সর্ব্বনাশীর সঙ্গে কলহ করিবার সাহস তাঁহাদের হয় নাই। রামপ্রসাদ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসমন্বয়ের ধারা তাঁহারাও অনুসরণ করিয়াছেন—শ্যাম শ্যামার অভেদ সম্বন্ধে তাঁহাদের রচনায় কোন সংশয় দেখা যায় না। রামপ্রসাদের নিষ্কাম ভক্তির আদর্শও তাঁহারা অনুসরণ করিয়াছেন। রামপ্রসাদ প্রবর্ত্তিত আগমনী বিজয়ার গানের ধারাটীকে কমলাকান্ত অধিকতর পরিপুষ্ট করিয়াছেন এবং ক্রমে তাহা আয়তনে হইয়াছে। শাক্তসঙ্গীতের সুরধুনী এদেশে কবিগানের মধ্য দিয়া যাত্রা গানের সমতল ক্ষেত্রে নামিয়া আসিয়াছে।

যে সকল গীতি জনবল্লভতা লাভ করিয়াছে সেগুলির সবই যে রসের দিক হইতে উৎকৃষ্ট তাহা নয়—সুরের জন্যই সেগুলির প্রচার বেশী হইয়াছে। এই সকল গীতির অনেকগুলি কেবল শ্যামা মায়ের রণরঙ্গিণী রূপেরই বর্ণনা—কতকগুলি কেবল সম্বোধন পদের এবং বিশেষণের তালিকা, * কতকগুলিতে প্রেম বমকের ছড়াছড়ি, কতকগুলি ক্লিষ্ট রূপকে (Strained metaphor) রচিত, কতকগুলিতে শুধু তত্ত্বকথা, কতকগুলি রামপ্রসাদের কথারই পুনরাবৃত্তি। যেমন কালীনাম সম্বল করিলে সন্ধ্যা বন্দনার প্রয়োজন নাই, গয়া গঙ্গা কাশীরও প্রয়োজন নাই, ঘটা করিয়া পূজাবলিও অনাবশ্যক—একথা অনেকেই বলিয়াছেন। সাধনার পথে পঞ্চভূত, ষড়রিপু, দারাসুত পরিবার, বিষয়াসক্তির বাধার কথা অল্প বিস্তর বহু পদেই আছে। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—

"যেমন চিত্রের পুতলে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো।"

"মায়ের মূর্ত্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।"

এই কথাগুলির প্রতিধ্বনি বহু পদেই পাওয়া যায়। সাহিত্যের দিক হইতে এই গীতগুলির মূল্য যাহাই হউক—এইগুলি শত শত কণ্ঠে গ্রামে গ্রামে গীত হইয়া এদেশে যে ভক্তির ধারাটীকে সঞ্জীবিত করিয়াছে সে বিষয় সন্দেহ নাই।

চর্য্যাপদ রচয়িতারা যেমন সকলেই সিদ্ধ পুরুষ—বৈষ্ণব পদ রচয়িতাদের প্রায় সকলেই যেমন সাধক—শাক্ত পদ রচয়িতাদের দুই চার জন ছাড়া কেহই সাধক নহেন—গৃহী ভক্ত মাত্র।

---

* এ বিষয়ে কবিরা ভক্তির আতিশয্যে ব্যাকরণের মর্য্যাদাও অনেক স্থলে রক্ষা করেন নাই। যথা বিশ্বরূপী, বিশ্বসনী, হৃদয়েশী, নাগিনী-জড়িত-জটা-বিভূষণী, ত্রিনয়নী, নিশানাথনিভাননী, মদমত্ত-মাতঙ্গিনী, শশিভালী, শশি খণ্ডশিরোমণী, মহেশউরসী ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। দেশের লোক এ সকলকে ভক্তের সম্বোধন হিসাবে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে।

শাক্তধর্ম্ম গৃহীরই ধর্ম্ম। আশ্রম, কুঞ্জ, আখড়া, মঠ, সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম নয়।

বাংলা দেশের অধিকাংশ জমিদার শাক্ত। এই সকল জমিদার বংশের অনেক রাজা, মহারাজা, কুমার শাক্ত সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন।

মহারাজ নবকুমার, মহারাজ রামকৃষ্ণ, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রামপ্রসাদের সাময়িক ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে মহারাজ মহাতাপচাঁদ, মহারাজ শিবচন্দ্র রায়, মহারাজ শ্রীশচন্দ্র রায়, মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ, মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা মহেন্দ্রনাথ খাঁ, কুমার নরেন্দ্র রায়, কুমার শম্ভুচন্দ্র রায় ইত্যাদি ভূস্বামিগণ পদ রচনা করিয়াছেন। রাজা মহারাজার দেওয়ানরাও পদরচনা করিতেন—দেওয়ান রঘুনাথের পদ ত সর্ব্বজন পরিচিত। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের রচিত পদও পাওয়া যায়। এইগুলি ছাড়া দেওয়ান নবকুমার রায়, দেওয়ান রামদুলাল নন্দী, দেওয়ান ব্রজকিশোর রায় ইত্যাদি দেওয়ানদের পদও পাওয়া যায়। বিখ্যাত কবিদিগের মধ্যে দাশরথি রায়, রাম বসু, নিধু বাবু, নীলকণ্ঠ, গিরিশ চন্দ্র, ফিকির চাঁদ শ্যামা সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। এন্টনি সাহেবকেও ভোলাময়রার সঙ্গে লড়াই করিতে গিয়া শ্যামা মার মহিমা কীর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

সকলেই যে শ্যামা ভক্ত এবং ভক্তি বশেই পদ রচনা করিয়াছেন তাহা নয়। সঙ্গীতের ধারা রক্ষার জন্যও শ্যামা মার শরণ লইতে হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ কবিশক্তি হয় কীর্ত্তন না হয় পাঁচালী সঙ্গীতে নিয়োজিত হইয়াছিল—বাকি যারা ছিল তাহা সঙ্গীতের অস্তিত্ব যারা রক্ষার জন্য প্রয়োগ করিতে হইয়াছে। শ্যামা সঙ্গীতই এ দেশে সঙ্গীতের উচ্চাঙ্গের ধারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

শাক্ত কবিগণ মনসা শীতলাকে শ্যামা মার সহিত একাত্মিকা বলিয়া মনে করেন নাই বটে; কিন্তু অনেকেই চণ্ডীদেবীকেই শ্যামা মায়েরই প্রাক্তনী অভিব্যক্তি বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। কমলে কামিনীকেও শ্যামা মারই ছলনাময়ী মূর্ত্তি বলিয়া ধরিয়াছিলেন—তাই দেখি—রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—"বামা রণে ক্রতগতি চলে, দলে দানবদলে, ধরি করতলে গজ গরাসে।" আর এক জন কবি লিখিয়াছেন—

এক বার মুখে দুর্গা বলে কালকেতু তোর চরণ পেলে,
কেউ বা যোগ সমাধি করে পায়না দেখা যুগান্তরে।
শ্রীমন্তে কমল বনে দেখা দিয়া দাও শ্মশানে।
আবার দয়া করে পরক্ষণে চরণে রেখেছ তারে॥

এ জগৎ যে মায়াময় জলবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায় অলীক, ব্রহ্ম ছাড়া সত্য কিছুই নাই—বেদান্তের এই তত্ত্ব শাক্ত কবিগণের একটী প্রধান উপজীব্য। রামপ্রসাদ বঙ্গ গীতিকাব্যে এই তত্ত্বের প্রবর্ত্তক। শ্যামাকে কবিগণ, ব্রহ্মিকরের মেয়ে বলিয়াছেন। যে মায়াময়ী বিশ্ব প্রকৃতি জীবকে ঐহিক সুখসম্ভোগে ভুলাইয়া রাখেন তিনিই কর্ত্তার পরীক্ষার পর জীবকে রক্ষা করেন। এই তত্ত্বটি শাক্ত কবিগণ সম্ভবতঃ নাথ সাহিত্য হইতেই পাইয়াছেন। তপস্যার দ্বারা মীননাথ শিবের কৃপায় মহাজ্ঞান লাভ করিলেন। মহামায়া মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া মীননাথকে মোহিত করিয়া সেই জ্ঞান হরণ করিলেন। মীননাথ রম্ভাপত্তনে ভোগে মত্ত হইয়া থাকিলেন। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষ, নাথ গুরুকে উদ্ধার করিবার জন্য সাধনা করিতে লাগিলেন। মহামায়া গোরক্ষনাথকেও মোহিত করিবার চেষ্টা করিলেন—কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না। গোরক্ষনাথ যখন দেখিলেন মহামায়ার আকর্ষণ ছুরির তত্ত্ব

মা মা বলিয়া মহামায়ার শরণ গ্রহণ করিলেন। ইহাই মহামায়ার সহিত মহাজ্ঞানের সন্ধি। মায়াকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই—মায়াকে জননী বলিয়া তাঁহার শরণগ্রহণই একমাত্র সর্ব্বদ্বন্দ্বের সমাধান। বেদান্তের মায়ার জননীত্ব এই ভাবে বঙ্গসাহিত্যে গোরক্ষনাথ প্রচার করেন। গোরক্ষনাথ মহামায়ার সহিত সন্ধি করিয়া কেবল মীননাথকে উদ্ধার করিলেন না, বঙ্গের শুষ্ক জ্ঞানমার্গী সকল সাধককেই উদ্ধারের পন্থা দেখাইয়া দিলেন। রামপ্রসাদ এই ধর্ম্মসমন্বয় অনুসরণ করিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী শাক্ত কবিগণ ছলনাময়ী মহামায়াকে জননী বলিয়া তাঁহাদের পদাবলীতে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন।

ভক্ত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

ভগবানে আমি পেয়েছি—অনেকে
আদর করিয়া বলে,
এই অপবাদ গুরু গৌরবে
আঁখি ভরে উঠে জলে।
পেয়েছি—যেমন মলয় গিরিরে
পায় চন্দন টিপ,
জ্যোতির্ম্ময়কে পেয়েছে যেমন
তুলসী তলের দীপ।
পেয়েছি যেমন রসজ্ঞানিন
লাগে কোরকের গায়,
পেয়েছি তাঁহারে চাতক যেমন
নব জলধরে পায়।
আনন্দ মোর প্রকাশ করিতে
পারিনে যে আমি মুখে,
ক্ষুদ্র সরসী জোয়ার জলের
পরশ লেগেছে বুকে।

হয় তো হয়েছে ইহাতেই মোর
নীলাম্বুধিকে পাওয়া।
এ গায়ে লেগেছে গরুড়পাখীর
পাখার একটু হাওয়া।

বিজ্ঞানবাদ [Idealism]

অধ্যাপক শ্রীশুকদেব সেনগুপ্ত এম্-এ.

দর্শনশাস্ত্রের মতবাদগুলির মধ্যে বিজ্ঞানবাদ বা Idealism একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে; বহুকাল ধরিয়া বিভিন্ন দেশের দার্শনিকগণ বিজ্ঞানবাদের বিভিন্ন দিক নিয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছেন। ইহার প্রশ্নগুলি ব্যাপক ও গভীর; একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিজ্ঞানবাদের সকল প্রশ্ন নিয়া আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমরা বর্ত্তমানে শুধু বিজ্ঞানবাদের মূল বক্তব্যটি কি তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিব।

পাশ্চাত্যে এবং প্রাচ্যে বিজ্ঞানবাদ নামে বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। পাশ্চাত্যে প্লেটো হইতে সুরু করিয়া ক্রোচে পর্য্যন্ত অনেকেই বিজ্ঞানবাদী নামে পরিচিত। আমাদের দেশেও হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকদের ভিতরে অনেক বিজ্ঞানবাদীর পরিচয় পাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই সকল বিজ্ঞানবাদীদের সম্মিলিত মতবাদ কি তাহা বলা শক্ত। শুধু এইটুকু বলা যায় যে কোন বিজ্ঞানবাদীই জড় বা দৃশ্য জগতের পৃথক অস্তিত্বে বা মূল্যে বিশ্বাস করেন না। জড় জগতের যদি পৃথক সত্তা না থাকে, তবে ইহা কিরূপ বস্তু? এই যে আমরা জড়কে দেখি শুনি জানি, ইহা কি সবই ভুল? জড় জগৎ কি নিতান্তই মিথ্যা, ভ্রমাত্মক কল্পনা? অথবা জড়কে কি চেতনের আত্মবিকাশের সহায়করূপে মানিয়া নিতে পারি? জড়ের প্রকৃত স্বরূপটি কি, চেতনের সঙ্গে ইহার ঠিক সম্বন্ধটি কি—এ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানবাদীদের ভিতরে মতভেদ আছে। তবে জড়ের স্বরূপ যাহাই হউক, চেতনের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ যেরূপই হউক,—এ বিষয়ে সকলে একমত যে চেতন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে জড়ের পৃথক কোন সত্তা নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে—জড় জগৎকে ত আমাদের সত্য বলিয়াই মনে হয়। যখনই আমরা জাগ্রত থাকি তখনই ত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া জড়ের নিজস্ব সত্তা আমরা অনুভব করি। চোখ খুলিলেই দেখি টেবিল, চেয়ার, বাড়ী, ঘর, সবুজ গাছ, রঙীণ ফুল, বিরাট নীল আকাশ; এই দৃশ্যমান জগতের নিজস্ব সত্তা নাই—এ কথা অতি অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়। বিজ্ঞানবাদী হয়ত বলিবেন—জগত একেবারেই অলীক তাহা ত বলা হয় নাই, তবে চেতনের বাহিরে, জ্ঞাতা বা তার জ্ঞানের বাহিরে জগতের কোন পৃথক সত্তা নাই। কিন্তু এ কথাও সমভাবেই

আশ্চর্য্যজনক। রূপরসগন্ধেরা এই বিচিত্র প্রকৃতি—আমাদের জানা না জানার উপরেই ইহার অস্তিত্ব নির্ভর করে, ইহা কিভাবে স্বীকার করা যায়? চেতনের বাহিরে জড়ের পৃথক সত্তা নাই—এ কথা সত্যই আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ নাই, কিন্তু বিজ্ঞানবাদীরা বহু সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কবলে তাহাদের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। সে সব সূক্ষ্ম তর্কের জালে প্রবেশ করা এখানে সম্ভব নহে। তবে শুধু এইটুকু বলা যাইতে পারে যে—একটু ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় বিজ্ঞানবাদিদের কথা যতটা অদ্ভুত বলিয়া প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় ইহা ততটা অদ্ভুত বা অসম্ভব নয়। আধুনিক Science বা বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়া দেখিলে রূপ বা শব্দের কি পরিচয় পাওয়া যায়? আমরা ত চোখ খুলিলেই নীল, লাল, সবুজ, কত রূপ দেখিতে পাই। কিন্তু ঐ নীল বা লাল রূপের ঐ নীল লাল ভাবেই কোন সত্তা আছে কি? কত রকমের শব্দ, কত রকমের সুমধুর গান আমরা শুনিতে পাই, কিন্তু ঐ সব শব্দ বা মধুর গানের শব্দ বা গান হিসাবে কোন অস্তিত্ব আছে কি? বৈজ্ঞানিকদের কাছে জানিতে পারি—যাহাকে আমরা শব্দ বা রং বলিয়া মনে করি উহা প্রকৃত পক্ষে বাতাস বা ইথর বা এই জাতীয় কোন কিছুর ঢেউ বা তরঙ্গ মাত্র; ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের ঢেউ আসিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের দরজায় আঘাত করে। যাদুকর মন তাহার সোনার কাঠির স্পর্শে এই ঢেউগুলিকে রূপে, গানে, গন্ধে, পরিবর্ত্তিত করিয়া তোলে। যে রামধনুর বিচিত্র রং দেখিয়া কবি আত্মহারা হইলেন, যে গানের মধুর ঝঙ্কার আমাদের মোহিত করিল—এই সবের বাস্তব রূপ যদি কতগুলি ঢেউ মাত্রই হয় তবে এ কথা কি বলা চলে না যে—রূপরস গন্ধময় এই বিচিত্র প্রকৃতি আমাদের মায়াবী মনেরই সৃষ্টি? কেহ বা বলিতে পারেন—রূপ শব্দ গন্ধের জগৎ না হয় মনেরই সৃষ্টি, কিন্তু এই যে অসীমপ্রসার দেশ ও চিরপ্রবাহিত কাল—ইহারা ত মনের কল্পনা নয়! রূপাদির পৃথক সত্তা না থাকুক, দেশকালের স্বতন্ত্র সত্তা ত স্বীকার করিতেই হইবে। দেশকালে অবস্থিত জড় জগতের সত্তাও তাহা হইলে স্বীকার করিতে বাধা নাই। কিন্তু দেশ ও কাল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সত্য সত্যই সেইরূপ দেশ ও কাল বলিয়া কিছু আছে কিনা তাহারই বা প্রমাণ কি? বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া যাহা বলিতেছেন সে সকলের খুব স্পষ্ট ধারণা করিতে পারি না। তবে এইটুকু বুঝি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের কথা যদি সত্য হয় তবে আমাদের দেশ ও কাল সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা সবই মিথ্যা। কে দেখিতেছে, কোথা হইতে কি ভাবে দেখিতেছে ইত্যাদি সব প্রশ্ন বাদ দিলে দেশ ও কালের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দ্রষ্টা ও তার দৃষ্টি-ভঙ্গীর সহিত দেশ ও কালের নিবিড় যোগ রহিয়াছে। কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে জার্মাণ দার্শনিক কাণ্টও বলিয়া গিয়াছেন যে দেশ ও কাল দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গীর আকার (Forms of Perception) মাত্র। দ্রষ্টার বাহিরে দেশ ও কালের কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। দেশ ও কালই যদি দ্রষ্টা সাপেক্ষ হয় তবে দেশ কালাবচ্ছিন্ন এই জগতের স্বতন্ত্র সত্তা মানিবার পক্ষেও কোন ভাল যুক্তি পাওয়া যায় না।

আমরা এই সব তর্কের জালে এখন আর প্রবেশ করিব না। এইটুকু মাত্র বক্তব্য যে বিভিন্ন বিজ্ঞানবাদী দার্শনিকগণ নিজ নিজ মতে জড় জগতের পৃথক সত্তা অপ্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে বিজ্ঞানবাদীরা সকলেই জড় জগতের পৃথক অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেন কেন? সকল বিজ্ঞানবাদীরই জড়কে অস্বীকার করিবার মূল কারণটী কি? প্রাকৃত মানবের

মনে ত দৃশ্য জগৎকে অসত্য বা অস্তিত্বহীন বলিয়া মোটেই মনে হয় না। বরং প্রাকৃত লোকের কাছে দ্রষ্টার সত্তাই থাকে আড়ালে; দ্রষ্টাকে, তাহার স্বরূপ কি—ইহা নিয়া আমাদের ভাবিবার অবসর নাই। দৃশ্য জগতই আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান ও সত্য। ইহার রূপরসগন্ধস্পর্শাদি ভোগ করিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া ছুটি। যাহা আমাদের প্রিয়, যাহা আমাদের কামনার বস্তু -তাহা মিথ্যা, তাহা অস্তিত্বহীন—ইহা শুনিতে আমরা ভালবাসি না।

কিন্তু আমরা ভালবাসি বা নাই বাসি ঠিক এই কথাই ত বলিয়া গিয়াছেন পৃথিবীর ধর্মপ্রচারকগণ। দেশে দেশে যুগে যুগে মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া এই বাণীই দিয়া গিয়াছেন—পার্থিব সুখে ভুলিয়া থাকিও না উহা অলীক—ঈশ্বরই পরম সত্য—তাহার ভজনা কর। তাহারা বলিয়া গিয়াছেন সকল দৃশ্য পদার্থের ভিতরে সেই এক পরম সত্যকে উপলব্ধি করিতে। 'যো দেবোঽগ্নৌ যো অপ্সু, যো বিশ্বং ভুবনম্ আবিবেশ'—অগ্নি, জল, বায়ু, ওষধি, বনস্পতি, জগতের যাহা কিছু সবই এক পরম সত্যের প্রকাশ—তিনি আমাদের বল, আমাদের জ্ঞান, আমাদের বুদ্ধির উৎস—"শ্রোত্রস্য শ্রোত্রম্ মনসো মনঃ"—আমাদের ভিতরে বাহিরে একই পরমাত্মা, একটি আধ্যাত্মিক সত্য (Spiritual Reality) প্রকাশিত হইতেছেন। সর্বত্র সেই আত্মাকেই জানিতে হইবে—তাই বাহিরের বস্তুকেই সত্য বলিয়া আকড়াইয়া ধরিলে ভুল করা হইবে। তাঁহারা বলিয়াছেন—"মা গৃধ"—দৃশ্যবস্তু দ্বারা লুব্ধ হইও না; শুধু দৃশ্যকে নিয়াই বসিয়া থাকিলে আর দৃশ্যাতীত সেই পরম সত্যকে পাওয়া যাইবে না।

আমাদের মনে হয় বিজ্ঞানবাদের মূল উৎস মানবের ধর্মবুদ্ধির ভিতরই নিহিত। ধর্ম ও দর্শন—উভয়ের ভিতর দিয়া মানুষ এক সত্যেরই সন্ধান করে। সাধকগণ যে সত্য তাহাদের সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন ও জগতে প্রচার করিয়াছেন—দার্শনিকগণ তাহাই মনন দ্বারা বুদ্ধিতে ও বিচারের দ্বারা স্থাপিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া একই মানব মনের সত্য লাভের চেষ্টা। সত্য এক; ধর্মের সত্য, দর্শনের সত্য ও বিজ্ঞানের সত্য পৃথক হইতে পারে না। যখন দেখিতে পাই ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিতরে মতভেদ রহিয়াছে তখন বুঝিতে হইবে উহা আমাদেরই অক্ষমতার পরিচায়ক। মানবমন এখনও অপরিণত অবস্থায় আছে বলিয়াই সত্যের পূর্ণ রূপটী আমরা ধরিতে পারি নাই। শ্রেষ্ঠ মনীষিদের চিন্তাধারার প্রতি লক্ষ্য করিলে মনে হয় ক্রমেই ধর্ম দর্শন ও বিজ্ঞান কাছাকাছি আসিয়া আসিতেছে। আমরা যেন বুঝিতে পারিতেছি একই সত্যের বিভিন্ন দিক ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া আলোচিত হইতেছে—ইহাদের ভিতর কোন বিরোধ নাই।

ধর্ম বলিলেন—জগতে এক পারমার্থিক বস্তু—এক পরমাত্মা বা পরমেশ্বর সত্য। দৃশ্য জগতের ভিতর দিয়া সেই পরমাত্মারই বিকাশ বা লীলা। জগত সেই আত্মার লীলা হিসাবে সত্য। ইহাছাড়া ইহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা বা মূল্য নাই। বিজ্ঞানবাদও ঐ একই সুরে বলিতেছে—জগতের মূল সত্তা (Ultimate Reality) হইতেছে একটী আধ্যাত্মিক শক্তি। বিজ্ঞানবাদের মতে জগৎ একেবারেই অলীক বা অসৎ হইবে এমন কোন কথা নাই। মূলগত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রকাশক হিসাবে জড় জগতেরও মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যেমন কায়া ছাড়া ছায়া থাকে না, ভাব ছাড়া রূপ থাকে না, তেমনি চেতন আধ্যাত্মিক শক্তি ছাড়িয়া জড় জগত থাকে না। গন্ধকে প্রকাশ করে বলিয়াই ধূপকে আমরা মূল্য দেই,

সুন্দরকে প্রকাশ করে বলিয়াই ফুলকে আমরা আদর করি, তেমনি আনন্দময় চেতন শক্তির বিকাশ হিসাবেই আমরা জড় জগতকে মূল্য দিব। ভাব ছাড়া রূপের মত চেতন ছাড়া জড়ের নিজস্ব কোন মূল্য নাই।

কথা আছে, ভগবান নাকি মানুষকে বহির্মুখীন প্রবৃত্তি-সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির গতি স্বভাবতঃই বাহিরের দিকে; তাই জড়ের রূপরসের দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলি সহজেই আকৃষ্ট হয়, এবং জড়কেই একমাত্র সত্য বলিয়া ধরিতে চায়। কিন্তু মানুষ শুধু বহির্মুখীন নয়, মানুষ অন্তর্মুখীনও বটে। মানুষের অন্তর্মুখীনতা যদি না থাকিত তবে তাহার ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি কিছুই গড়িয়া উঠিত না। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর ভিতরে প্রভেদ এই যে—পশুপাখীর ইন্দ্রিয়ের গতিও বাহিরের দিকে—ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া উহারা বাহিরের জিনিষকে গ্রহণ করে; কিন্তু পশুর নিকট বাহিরের বস্তু বাহিরের বস্তুই থাকে, উহার মধ্যে অন্য কোন তাৎপর্য্যের সন্ধান সে পায় না। মানুষের ইন্দ্রিয়ের গতিও বাহিরের দিকে—কিন্তু মানুষ ইন্দ্রিয়ের পথে বাহিরে গিয়া বাহিরের বস্তুর অন্তরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে ও উহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য খুঁজিয়া পাইতে চায়। অন্তরের যে স্রোতটি ইন্দ্রিয়ের পথে বাহিরে চলিয়া গেল, সেই বাহিরে গিয়া বাহিরের বস্তুর ভিতরে আবার অন্তরের আত্মীয়কেই খোঁজ করিল। বাহিরের বস্তুর ভিতরে আত্মাকে পাই বলিয়াই বাহিরের বস্তু আমাদের কাছে প্রিয়। রামায়ণে গল্প আছে শ্রীরামচন্দ্র একদিন পর্ব্বতশিখরে সূর্য্যোদয়ের শোভা দেখিতেছিলেন; সীতাদেবী কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও তাহাকে স্পর্শ করিলেন। সীতাদেবীর স্নিগ্ধ স্পর্শে শ্রীরামচন্দ্র চোখ বুজিলেন সীতাদেবী কিছু পরে চলিয়া গেলেন; কিন্তু রামচন্দ্র একইভাবে আনন্দে সমাহিত অবস্থায় বসিয়া রহিলেন। অনেক সময় পরে সীতাদেবী আসিয়া আবার আহ্বান করিলেন—রামচন্দ্রের সমাধি ভাঙ্গিল—তিনি একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"সীতা, তুমি কি আমার কাছ হইতে চলিয়া গিয়াছিলে? আমার ত ধারণা ছিল তোমাকে নিয়াই এতক্ষণ আনন্দে মগ্ন ছিলাম। আজ আমার একটা ভুল ভাঙ্গিল। এতদিন ভাবিতাম তুমিই বুঝি আমার আনন্দের কারণ। তুমিই আনন্দের কারণ হইলে তোমার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও লোপ পাইত। আজ বুঝিলাম—তোমার ভিতর দিয়া সেই পরমাত্মাকে পাই বলিয়াই তুমি আমার প্রিয়।" স্ত্রীপুত্রপরিজন, বাহিরের যাহা কিছু আমাদের প্রিয় তাহা সেই পরমাত্মার জন্যই প্রিয়। দৃশ্য জগৎ যদি শুধু জড়ই হইত, যদি আত্মার বিরুদ্ধ ধর্ম্মাত্মক পদার্থ হইত, তবে উহা কখনই আমাদের প্রিয় হইতে পারিত না। জড়ের ভিতরে চেতনকে, দৃশ্যের ভিতরে অদৃশ্যকে, অনাত্মার ভিতরে আত্মাকে পাই বলিয়াই সবাই আমাদের প্রিয়। রূপরসগন্ধ সেই 'বিশ্বং ভূবনম আবিবেশ' আত্মার দূত; পরমাত্মীয়ের সংবাদ বহন করিয়া আনে বলিয়া দূতও আমাদের প্রিয়।

মানুষ কোন দিনই জড়কে শুধু জড় হিসাবে দেখিয়া সুখী হয় নাই। মানুষ বরাবরই জড়ের ভিতরে চেতনকে খুঁজিয়াছে। সভ্যতার আদিযুগে—যখন দর্শনশাস্ত্রের কোন মতবাদ গড়িয়া ওঠে নাই, তখনও দেখি ঐ জাতীয় চেষ্টা। প্রাচীন গ্রীসের গল্পগুলিতে দেখিতে পাই সে দেশের লোক তখন আকাশে-বাতাসে, চন্দ্রসূর্য্যে, নদীর সাগরে—প্রকৃতির যাহা কিছু সুন্দর ও শক্তিমান সব কিছুর মধ্যে দেবতাকে দেখিতে পাইত। এই সব দেবদেবীর সঙ্গে তাহারা আত্মীয়তা স্থাপন করিত—ইহাদের ভয় করিত, পূজা করিত, আবার তখনও বা ইহাদের সঙ্গে ঝগড়াও করিত।

হইত। পাহাড় বন কর্ণা সাগর—ইহাদের কাছে শুধু জড় নয়—ইহারা সব যেন চেতন। চাক দিলেই সাগরের ঢেউয়ের উপর দেবী ভাসিয়া উঠিবেন—কথা বলিবেন। আমাদের দেশেও একসময় এইরূপ দেবদেবীর কল্পনা ছিল। মনে হয় সভ্যতার আদিযুগে সব দেশেই এইরূপ দেবদেবী কল্পনার এক যুগ গিয়াছে। আজ এই সব শিশু-সুলভ কল্পনায় নিশ্চই আমরা হাসিব—কিন্তু মাঝে মাঝে মনে হয়, জড়কে জড় মাত্রই-নে করিয়া যে অবস্থায় আমরা পৌঁছিয়াছি—ইহার চেয়ে যদি আবার সেই শৈশবে ফিরিয়া যাওয়া যাইত, তবে অন্ততঃ আর কিছু না হউক প্রাণের সহজ সরল আনন্দটুকু পাওয়া যাইত।

মানুষের চিন্তাধারা শৈশব ছাড়াইয়া অগ্রসর হইল। মানুষ বুঝিল—জড়পদার্থগুলির ভিতরে একটা করিয়া দেব দেবী নাই। বুঝিল—জড়ের পিছনে জড় হইতে ভিন্ন একটা চেতন জগৎ আছে। একটা জড় জগৎ, একটা চেতন জগৎ; একটি মর্ত্য, একটি স্বর্গ; স্বর্গের ছায়া নিয়াই মর্ত্যের সৌন্দর্য্য। এইরূপ কল্পনা পাই গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর কবিত্বময় লেখার ভিতর। তাহার মতে একটি আছে World of Ideas, আর একটি World of Particulars; আমরা বলিতে পারি—একটি ভাবের রাজ্য, আর একটি রূপের রাজ্য। Ideas বা ভাবময় জগতই সত্য, দেশ কালে অবচ্ছিন্ন নামরূপের জগত ঐ ভাব জগতের ছায়ামাত্র; এইরূপে প্লেটো ভাবের জগতকে রূপের জগত হইতে পৃথক করিয়া ফেলিলেন; এক জগতের ছায়া অন্য জগতে আসে বটে, কিন্তু দুএর ভিতরে আর তেমন নিবিড় যোগ রহিল না।

দুইটী জগতের মধ্যে ভেদের ইঙ্গিত করিয়া প্লেটো যে Dualism বা দ্বৈতভাবের সৃষ্টি করিলেন—পাশ্চাত্য চিন্তাধারার তাহার প্রভাব চলিতে লাগিল। পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারা শৈশব ছাড়াইয়া যৌবনে আসিয়া পৌঁছিল। শৈশবের দেবদেবীর কল্পনা দূরে চলিয়া গেল। মানুষ যুক্তিতর্ক শিখিল—শাণিত তর্কের বলে জড় ও চেতনকে দ্বিধা খণ্ডিত করিল। যুক্তিতর্কের নব জাগরণের প্রথম যুগে ডেকার্ট বলিলেন—জড় ও চেতন দুইটী সম্পূর্ণ ভিন্ন পদার্থ; জড়ের শুধু আয়তন বা পরিমাণ আছে—ইহার চেতনা নাই, চেতনের শুধু বিজ্ঞানময় সত্তাই আছে—ইহার কোন আয়তন বা পরিমাণ নাই। জড়-জগত ও চেতন-জগত সম্পূর্ণ ভিন্নসত্তাবিশিষ্ট; এই দুএর উপরে এক ঈশ্বর আছেন বটে কিন্তু তিনিও এই দুইকে এক করিতে পারেন না।

মানুষের চিন্তাধারা আরও জাগ্রত হইলে মানুষ বুঝিল জড় ও চেতনের ভিতরে এই দ্বৈতভাবই চরম সত্য হইতে পারে না। ইহাদের ভিতরে নিশ্চয়ই নিবিড় যোগসূত্র রহিয়াছে। পরবর্ত্তী যুগে জার্মাণ দার্শনিক কাণ্ট ও হেগেল এই যোগসূত্রটী দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাণ্ট যোগ সূত্রটী দেখাইবার পথে কিছুটা অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু পূর্ণ সফলতা লাভ করেন নাই। জড় ও চেতন, ভাব ও রূপের পূর্ণ মিলনের কথা আমরা পাই হেগেলের ভিতরে। কাণ্টের মতে জড়জগৎ নিতান্তই জড় নয়; চেতন মনের "আকার" (forms) নিয়াই জড় জগতের সৃষ্টি; কিন্তু এই জড় ও চেতনে মিলিত এই দৃশ্যজগৎ পরম সত্য নয়। যেটী পারমার্থিক সত্য (Noumenal Reality) তাহা আমাদের জ্ঞানের বাহিরে। কাণ্টের মতে পারমার্থিক জগতই প্রকৃত সত্য কিন্তু উহা জ্ঞানের সীমার বাহিরে, ব্যবহারিকজগৎ নিতান্ত অলীক না হইলেও বাস্তবসত্তাহীন। পরবর্ত্তী যুগে হেগেল দেখাইলেন—Noumenal and Phenomenal—পারমার্থিক ও ব্যবহারিক জগতের মধ্যে এইরূপ ভেদ কল্পনা করা

CENTRAL LIBRARY

সমীচীন। পারমার্থিককে ছাড়িয়া ব্যাবহারিক অর্থহীন, আবার ব্যবহারিককে ছাড়িয়া পারমার্থিক প্রায় শূন্যবৎ। Noumena and Phenomena—পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের মিলনই পূর্ণ সত্য। একই আধ্যাত্মিক সত্য এই দুএর ভিতর দিয়া বিকাশিত হইতেছে। ভাব ও রূপ, চেতন ও জড়, পারমার্থিক ও ব্যবহারিক—এই দুইয়ে মিলিয়া সত্য। পারমার্থিক ব্যবহারিকের মধ্য দিয়া আত্ম বিকাশ না করিলে অপূর্ণ থাকিয়া যায়। এককে ছাড়িয়া অপর থাকিতে পারে না। "ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ, রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে হারা।"

পরিশেষের প্রশ্ন—বিজ্ঞানবাদের এই সিদ্ধান্তকেই চরম সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় কি? অথবা ইহাও অপূর্ণ সত্য? ইহার উত্তর দিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত—আমরা শুধু প্রার্থনা করিতে পারি—"আবিঃ আবির্ম্এধি।"

শ্রীশ্রীবাসুদেব।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

কারাগার দিল তাঁরে জনমিতে ভূমি;
ধরণী হইল ধন্য পাদপদ্ম চুমি।
নীলাকাশ নিঙাড়িয়া দিল নিজ কান্তি;
প্রশান্ত বারিধি দিল শ্রীমুখে প্রশান্তি।
বনদেবী আপনি শ্রীকণ্ঠে দিল মালা;
যমুনা তিলক দিল ত্রিভুবন আলা।
জগতের যত সতী দিল তাঁরে প্রেম;
শ্রীঅঙ্গে বসন দিল নিকষিত হেম।
শিখী তার পুচ্ছ দিল সাজাইতে চূড়া;
ভালে রাঙটীকা দিল দ্বারকা মথুরা।
মুনিবর ধ্যানে লভি দিল কৃষ্ণ নাম;
মহালীর কণ্ঠ দিল ত্রিভঙ্গ সুঠাম।
অলি দিল বেণু মাঝে নিজ গুঞ্জরণ;
কদম্ব দিবে কি মোরে ভক্তি শিহরণ?

শান্তিনিকেতন দর্শনে।

শ্রীগীতা গুপ্ত বি-এ, বি-টি।

কলকাতা, ফাল্গুন মাস চলছে, শীতের আমেজ তখন বেশ কমে এসেছে। একদিন কলেজে গিয়ে শুনলেম, প্রিন্সিপ্যাল মিস্ দাস আমাদের বোলপুর বেড়াতে নিয়ে যাবেন। তিনি জানতে চান, আমাদের কার কার যাবার ইচ্ছে আছে; তাহলে এক সপ্তাহের ভেতরেই ব্যবস্থা ক'রে নেবেন। আনন্দে মনটা নেচে উঠল, কারণ বিশ্বকবির আশ্রমটি দেখবার সাধ মনের গোপন কোণে অনেক ছেলেবেলা হতেই ছিল। সময় এবং সুযোগের অভাব সে ইচ্ছেটাকে সাময়িক চাপা দিয়ে রেখেছিল মাত্র। বলা বাহুল্য, সেই মুহূর্তেই মত জানিয়ে এলাম। সত্যিই কবিগুরুর আপন হাতে গড়া এত সাধের স্থানটি দেখতে পাব তা যেন বিশ্বাস হতে চাইছিল না। তখন একে একে কত কথাই না মনে আসতে লাগল।

মনে হ'ল, যেদিন শুনলেম রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই অতিপ্রিয় আলোবাতাসভরা ধরণীর বুক হতে চিরদিনের জন্য বিদায় নিয়েছেন, সেদিন কী ব্যথাই না বেজেছিল প্রাণে। তাঁর যুগে জন্মেও তাঁকে চাক্ষুষ দেখিনি, তাঁর অমৃতময়ী বাণী শুনিনি, এ আমার জীবনের পরম দুর্ভাগ্য। সত্যি বটে, তিনি তাঁর রচনার ভিতর দিয়েই চির অমরত্ব লাভ করেছেন। তাঁর অনবদ্য লেখনী দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যকে যে সম্পদ দান করে গেছেন কোন জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে এর তুলনা মেলে না। আমি বাঙালী, তাই তাঁর অমর সাহিত্য পড়বার অধিকারটুকু অন্তে তো কেউ আমায় বঞ্চিত করতে পারবে না, সেই তো আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য। তাঁকে সামনাসামনি দু'চোখ ভরে দেখতে পেলে আর এর চেয়ে বেশী কি পেতাম? আমরা অতি ক্ষুদ্র, তাই বাইরের আদানপ্রদানটুকুই বড় বলে মনে করি। তাঁর কাব্যের ভিতর দিয়ে যদি তাঁকে চিনবার চেষ্টা করি, তাঁর চিন্তাধারাকে যদি বুঝতে শিখি, তা হ'লেই তো তাঁর সঙ্গে আমার শ্রেষ্ঠ পরিচয় লাভ হয়। বিশ্বভারতী কবিগুরুর আজীবনের সাধনার মূর্ত প্রতীক। তিনি যদিও আজ আর আশ্রমটিকে তাঁর সুমধুর বাণী দিয়ে আনন্দে ভরে তোলেন না, তবুও সে স্থান তাঁরই স্মৃতিতে ভরপুর হয়ে আছে; সেটুকু উপলব্ধি করতে পারাটাই পরম সৌভাগ্য বলে মনে হ'ল।

মন তো আমার সে' ক'দিন হাওয়ায় ভেসে বেড়াতে লাগল। দেখিনি তো শান্তিনিকেতন, তবু কল্পনাতেও সে স্থান পরম মধুর, পরম রমণীয় বলে প্রতিভাত হতে লাগল। সেখানে গিয়ে কী দেখব, কী করব, এই চিন্তায় মন আচ্ছন্ন হয়ে রইল। এক বর্ষণমুখর প্রাতে আমাদের যাত্রার দিন স্থির হ'ল। ভোরের আলো না ফুটতেই পরম উৎসাহের সঙ্গে কলেজ হোষ্টেলে গিয়ে পৌঁছালাম। কারণ এখান হতেই আমাদের সবাইকে নিয়ে যাওয়া হবে। গিয়ে দেখি, আমার মতন অনেক প্রার্থীতেই হোষ্টেলপ্রাঙ্গণ ভরে গেছে। আমাদের মালগুলো আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। স্থির হ'ল যে আমরা সবাই দল বেঁধে ট্রামে চড়ে রওনা দেব হাওড়া ষ্টেশনের উদ্দেশে। তখনও আবছা অন্ধকার; সুরু হয়েছে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি; এই অবস্থায় গিয়ে ট্রামে উঠ্‌লুম। কিন্তু বহিঃপ্রকৃতির এই নিরানন্দ থম্‌থমে ভাব আমাদের মনের আনন্দকে কেন জানি ছাপিয়ে উঠতে পারেনি; কারণ হয়ত যে সহপাঠিনীদের সঙ্গে মিলে এভাবে বেড়াবার আনন্দ উপভোগ করার সৌভাগ্য আর কখনও

হয়নি। পথে ট্রামের গণ্ডগোলের জন্য আমরা ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছেছিলেম, ঠিক ট্রেণ ছাড়বার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে। ছুটো কামরাতে ভাগাভাগি করে উঠলুম আমরা কুড়িজন যাত্রী। সঙ্গে ছিলেন মিস্ দাস ও তাঁর দুই বন্ধু। ট্রেণ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুদের মনের উচ্ছ্বাসও যেন বাঁধ ভেঙ্গে উছলে পড়তে লাগল। গান, গল্প, হাসিহল্লোড় দিয়ে কামরাখানি যেন সবাই সচকিত করে দিতে লাগলাম। চা, চীনেবাদাম, পান হতে আরম্ভ করে প্রতি ষ্টেশনের সামান্যতম জিনিষটুকুর কিছুই আমরা বাদ দেই নাই; সবাই মিলে এরকম উপভোগ করে খাওয়ার স্বাদ তো রোজ পাবার উপায় নেই। আমাদের প্রিন্সিপ্যালের কলেজে দেখি এক রূপ; কিন্তু সেদিন তিনিও বুঝি তাঁর হারাণো ছাত্রীজীবন ফিরে পেতে চেয়েছিলেন। আমাদের প্রতিটি খুঁটিনাটি কথা, আমোদ আহ্লাদকে তিনিও বেশ আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করছেন, বুঝলাম। এতে আমাদেরও উৎসাহ গেল বেড়ে। সেদিন তাঁর মতন বয়োজ্যেষ্ঠার উপস্থিতি যে আমাদের আলাপ আলোচনার বিন্দুমাত্র ব্যাঘাত ঘটায় নি, তা বোধ করি বলাই বাহুল্য। এই রকম হৈ চৈর ভিতর দিয়ে বেলা ১১টার সময় আমরা বোলপুর ষ্টেশনে পৌঁছলাম। প্রতি ষ্টেশনেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠছিলাম আমি, ভাবছিলুম আরও কতক্ষণ, আরও কতদূর? ষ্টেশনে নেমে দেখি—দূরে রাস্তাতে অপেক্ষা করছে 'শান্তিনিকেতন' নাম আঁটা একটি বাস। এতে করেই আমাদের যেতে হবে, জিনিষপত্র উঠিয়ে আমরাও বাসে উঠে পড়লেম। ইচ্ছে ছিল, পায় হেঁটে দুধারের শোভা দেখতে দেখতে যাই। কিন্তু আমার একার ইচ্ছেতে আর কি হবে? ক্রমে বাজারের সীমানা ছাড়িয়ে বাস খোলা রাস্তা দিয়ে চলতে লাগল। বড় বড় রাঙা চলে গেছে চারিদিকে—সব লাল কাঁকড়ের। মাটি হচ্ছে গেরুয়া রঙের। বাংলার রাঢ় অঞ্চলে পা দিলেই এই গৈরিকভূমি চোখে পড়ে। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য একটু অন্য ধরণের। বাংলা দেশের শ্যামল শ্রীতে ভরা স্নিগ্ধতা এখানে নেই বটে, তবে এর রুক্ষতাও চোখকে পীড়া দেয় না। প্রকৃতি দেবী যেন গেরুয়া বসন পরিহিতা তপস্যারতা যোগিনীর রূপ ধারণ করেছেন।

আর একটু পরেই দূর হতে কবিগুরুর প্রধান আবাসগৃহ উত্তরায়ণ দেখা যেতে লাগল। বুঝতে পারলেম এসে গেছি আশ্রমের সীমানাতে। মনে মনে সেই মহাপুরুষের উদ্দেশে সহস্র নতি জানালেম; এখন যে আমরা তাঁরই বিদ্যামন্দিরের প্রাঙ্গণে এসেছি। বাস আমাদের অতিথি সদনের দরজাতে নামিয়ে দিল; শুনলেম এর উপরতলাটা আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাড়াতাড়ি উপরে উঠে গেলুম, উপরে তিনখানি বড় ঘর ও সঙ্গে লাগান দুদিকে বড় বারান্দা। মাঝের বড় ঘরখানি আমরা দখল করলেম; পাশের ঘর দুটোয় মিস্ দাস ও তাঁর বন্ধুরা থাকবেন স্থির হ'ল। বন্ধুদের ত্যাগিয়ের জন্য তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসতে হ'ল; জলাভাবের জন্য স্নানের ইচ্ছেটা দমন করতে বাধ্য হ'লেম। কলকাতা হতেই সকলের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়া হয়েছিল; কারণ বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সেবেলার মত আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে না। খাওয়া সেরে ঘরের বারান্দাতে এসে দাঁড়ালুম; একটু আশ্রমের শোভা দেখব, এই ছিল উদ্দেশ্য।

আধ ঘণ্টা পরে আশ্রমটি ভালভাবে দেখবার জন্য আমরা মিস দাসের সঙ্গে অতিথি সদন ছেড়ে বেরিয়ে এলেম। একেবারে সামনেই দেখি রয়েছে উপাসনাগৃহ; একটি আসাপোড়া কাঁচের তৈরী। চারধারের খোলার

অপরূপ চিত্রনৈপুণ্যে ভরা। ভিতরে আর ঢুকিনি; মনে করলেম উপাসনার সময় ছাড়া বুঝি প্রবেশের অধিকার নেই। প্রথমে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আবাসগৃহগুলোর দিকে গেলুম। উত্তরায়ণের সামনে এসে দেখি বারান্দাতে বসে রয়েছেন রথীঠাকুর। মিস্ দাস তাঁর সঙ্গে সামান্য একটু কথা বলে আমাদের নিয়ে 'পুনশ্চ'র দিকে গেলেন; এখানে তখন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবী বাস করছিলেন। তিনিই আমাদের সঙ্গে নিয়ে কবিগুরুর বাসগৃহগুলো দেখাতে চল্লেন। উদীচী হচ্ছে কাঠের একটি ছোট্ট দোতলা বাড়ী। আমরা যথাই জুতো খুলে ভিতরে ঢুকলেম। ঘরে গিয়ে দেখি রবীন্দ্রনাথের চেয়ার টেবিল লিখবার ও ছবি আঁকবার সাজসরঞ্জাম, তাঁর খাট সবই এমনভাবে সাজান রয়েছে যে মনে হতে লাগল একটু আগেই বুঝি গুরুদেব কাজ থামিয়ে ঘরের বাইরে গেলেন, এক্ষুণি ফিরে এসেই নিজের স্থান অধিকার করবেন। তাঁর ভক্তরা জন্মদিন এবং নানা উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে তাঁকে যেসব উপহার পাঠিয়েছিলেন, সবই সযত্নে সাজান রয়েছে। ইন্দিরা দেবী বলতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথের নাকি ইদানীং আর এক বাড়ীতে মন টিঁকত না কেবল 'উত্তরায়ণ' 'পুনশ্চ' 'উদীচী' আর 'শ্যামলী'তে ঘুরে বেড়াতেন। 'শ্যামলী' মাটির তৈরী কিন্তু ভিতর দেখে বুঝবার উপায় নেই। কিন্তু যাঁর ঘর এত আগ্রহে দেখে বেড়াচ্ছি তিনি তো আর এর মধ্যে নেই। বুদ্ধি দিয়ে বুঝি যে তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাইরে বিরাজিত আছেন; তবু তাঁর ঘর, তাঁর জিনিষপত্র দেখে তিনি হারিয়ে গেছেন এই চিন্তাটাই মনকে হাহাকারে ভরে দিতে চাইল। সেখান হতে এলাম 'উত্তরায়ণে'; এর নীচতলাটাই শুধু দেখতে পেলাম। দেখলুম যে ভারতের নানা দেশের সুন্দরতম যা কিছু পেয়েছেন তা তিনি ঘরে সাজিয়ে রাখতে ভোলেননি। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের চর্চা যে কতখানি স্থানলাভ করেছে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতভবন ও কলাভবন। তিনি বুঝেছিলেন যে সুন্দরের উপাসনা না করতে শিখলে পূর্ণাঙ্গ শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়। কলাভবনের ছাদে, ঘরের দেওয়ালে—সর্বত্র শিক্ষক নন্দলাল বসু এবং তাঁর কৃতী ছাত্রদের চিত্রনৈপুণ্যের পরিচয় মেলে। শিশুসদনে গিয়ে দেখি সেখানে শিশুদের উপযোগী ছোট ছোট ছবিতে ঘরের দেওয়াল ভরে আছে। কলাভবনের একটি ছাত্র আমাদের সঙ্গে নিয়ে সব দেখালে এবং একে একে পরিচয় করিয়ে দিলে। লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি রয়েছে সেখানে কাতারে কাতারে বই। আরও তো কত লাইব্রেরী দেখেছি, কিন্তু বই সাজিয়ে ঘরকে সুন্দর করে তোলার এমন অভিনব পন্থা আর কোথাও চোখে পড়েনি; দেখে যেন চক্ষু সার্থক হল। ইচ্ছে হল দু'চারটে বই নেড়ে চেড়ে দেখি, কিন্তু আমাদের যে সময় বাঁধা, আর দেরী করবার উপায় নেই। চীনাভবনের ঘর আর বারান্দা ঘুরেই চলে এলাম; আলাপ আলোচনার কোন সুবিধা হয়নি।

ক্রমে বেলা পড়ে এল; চা খাবার ডাক আসাতে আমরা সবাই খাবার ঘরের দিকে চল্লাম। দেখি সবাই সার বেঁধে খেতে চলেছে; মেয়ে ছেলে দুধারে বসে গেল; কোন অনাবশ্যক হৈ চৈ নেই; কারুর কোন অহেতুক লজ্জাও নেই। এই সময় শুনলেম সন্ধ্যার পর 'বাল্মীকি প্রতিভা' অভিনয় হবে। বম্বেতে শান্তিনিকেতনের ছাত্র ছাত্রীরা অভিনয় করতে যাবেন, সেদিন সন্ধ্যায় হবে তাই রিহার্সাল। ভাবলুম আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; তাই শান্তিনিকেতনের অভিনয় দেখবার সাধটুকুও আর অপূর্ণ রইলনা। চা খাবার পর একটু বেড়াবার উদ্দেশ্যে আশ্রম ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেম; পথে দেখা কতিনের বোম

নামে এক কবির সঙ্গে। মিস দাসের সঙ্গে তাঁর পূর্ব্ব পরিচয় ছিল। তিনি আমাদের তাঁর আবাসে না নিয়ে ছাড়লেন না। তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন একজন হাঙ্গেরীয়ান মহিলা। কিন্তু দেখে বোঝবার উপায় নেই, ঠিক আমাদের বাঙ্গালী ঘরের আদর্শ বধূর মত ব্যবহার। ভারতের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাসম্পন্না। তাঁদের আদর অভ্যর্থনাতে পরম আপ্যায়িত হ'লাম।

এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে, সবাই অভিনয়ের স্থানে এসে জড় হলেম। কান্তিদেব ঘোষের স্ত্রীও আমাদের সঙ্গে এলেন, খোলা মাঠের মধ্যেই আমাদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা এই নাটকের ভূমিকাতে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। বাল্মীকির ভূমিকায় শান্তিদেব ঘোষের অভিনয় অতি চমৎকার হয়েছিল। শান্তিনিকেতনের মেয়েদের নাচ আমি এই প্রথম দেখতে পেলাম। ১০টার পর অভিনয় শেষ হওয়াতে খাবার ডাক এলো। অভিনয় শেষ হলেও তার দু'একটি টুক্‌রো কথা, গানের সুরের রেশ ঘুরে ফিরে কেবলই এসে কাণে বাজতে লাগল। এতক্ষণ যেন মোহাচ্ছন্নের মত ছিলেম। যন্ত্রচালিতের মত খাওয়া সেরে অতিথিসদনে এসে উপস্থিত হ'লেম। এখন বিছানা করে শোবার পালা। কলকাতার তুলনাতে শীতও বেশী বলে বোধ হ'ল; ক্লান্ত হয়েছিলাম খুব, কাজেই শোবামাত্র গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'লেম।

পরদিন ভোরে উঠে হাত মুখ ধুয়েই নীচে নেমে এলুম। সেদিনই চলে যেতে হবে, তাই বাকী প্রতিটি মুহূর্ত্ত দিয়ে আশ্রমটিকে প্রাণ ভরে দেখে নেবার ইচ্ছে জাগল। সকালে চা খাওয়ার পর শ্রীনিকেতনের উদ্দেশে যাত্রা করলেম। সেখানে মৃৎশিল্প, চামড়ার কাজ, বয়নশিল্প সবই বেশ প্রসার লাভ করেছে। কবিগুরু তাঁর দরদী অন্তর দিয়ে বুঝেছিলেন যে কুটীরশিল্পের উন্নতি না হ'লে এ জাতির উন্নতি অসম্ভব। ফিরে এসে স্নান সেরে নিলেম। দুপুরের খাওয়া সেরে কলাভবন ও সঙ্গীতভবনের ছাত্রীদের হোষ্টেল দেখতে গেলুম। হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদের সব ঘুরিয়ে দেখালেন। ছাত্র ছাত্রীদের পড়বার নিয়ম হচ্ছে সকাল এবং দুপুরের পর খানিকক্ষণ। মধ্যাহ্নের আহারের পর তারা ঘণ্টা দুই ছুটি উপভোগ করে। ক্লাস বসবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নেই। খোলা মাঠে, গাছের তলায় বা ঘরের বারান্দাতে দেখি গুরু ছাত্রের আলোচনা চলছে। হোষ্টেলেও কোন অনাবশ্যক নিয়ম কানুন নেই, ছাত্র ছাত্রীরা বেড়াবার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে।

উত্তরায়ণের সামনের বাগানখানি ঠিক যেন কোন নিপুণ শিল্পীর হাতের তৈরী ছবির মত শোভা পাচ্ছে। তার খানিক দূরে রয়েছে একটি কৃত্রিম হ্রদ। এ সব যুগ যুগ ধরে দেখলেও বুঝি আশ মেটে না, কিন্তু আমাদের কত অল্প সময়ের মধ্যেই না চোখ বুলিয়ে নিতে হয়েছে। আর কতক্ষণ বা থাকতে পাব—বিকেলের ট্রেণেই তো ছেড়ে চলে যেতে হবে। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিশ্বকবির উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নতি জানিয়ে ফিরে এলাম। ছাতিমতলায় মহর্ষির উপাসনার স্থানটি একবার দেখে অতিথিসদনের দিকে চল্লাম। জিনিষপত্র গোছগাছ করতে হ'ল। অল্পক্ষণের মধ্যে বাসও এসে উপস্থিত। ফিরে যেতে মন চাইছিল না। কিছুই তো সেখানে দিয়ে আসিনি, কিন্তু কী অপূর্ব্ব স্মৃতি যে নিয়ে এসেছি, তা জীবনে কোনদিন হারাবার নয়। ষ্টেশনে এসে পৌঁছুলাম। ট্রেণ বেশ দেরী করেই সন্ধ্যে নাগাদ এল। গাড়ীতে সবাই উঠে পড়লেম। রাত দশটায় এসে পৌঁছুলাম আবার সেই ধূলি-ধূসর ধোঁয়া-সমাচ্ছন্ন চির পুরাতন কলকাতা মহানগরের বুকে।

নতুন বছর।

শামসুদ্দীন।

দিন তবু ফিরে ফিরে আসে
হতাশার শ্বাসে।

নিরালা নিকুঞ্জ বনে পুষ্পঘেরা
ছিল যে স্বপন
নিঝুম চাঁদিনী রাতে আলোভরা
ছিল যে তপন
মেঘের উতল হাওয়া
ঢাকে সেই আলোকের দিন
আকাশের বুকে শুধু জেগে রয়
সেই আলো বিবর্ণ মসৃণ।

সেই বাণী জাগে যেন
ধূলিকার মিনারে মিনারে,
জরাজীর্ণ জীবনের
কিনারে কিনারে।
মর্মরিত ঝরা পাতা
ডাকে দিন শেষে
নিস্পৃহ মাটীর মত
নতুনের বেশে।

সে দিনের আলো নেই
নেই হাসি গান,
তবু কেন আসে ফিরে—
স্মৃতির বিতান।

শেষের কবিতা।

অধ্যাপক শ্রীদুর্গাকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য, এম্ এ।

সমালোচকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে "শেষের কবিতার" বিচার করেছেন। বেশীর ভাগ সমালোচকের মতে শেষের কবিতায় একটা বাঙ্গ আত্মগোপন ক'রে আছে আর এই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গাত্মকতাই এর সর্ব্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। একটা কাল এসেছিলো যখন ছোটখাটো কবিদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ ঘটানোই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলো তাঁদের গৌরব বাড়ানোর প্রথম সোপান। কবি তাই এঁদেরই প্রতিনিধিস্বরূপ নিবারণ চক্রবর্ত্তীকে খাড়া করেছেন আর দেখাতে চেয়েছেন যারা তাঁর কাব্য বিদ্বেষী—তাদের উপরই তাঁর প্রভাব সব চাইতে বেশী। তাদের এই মস্তাবিকাশ কবির প্রভাবকে গোপন রাখবার একটা বাহ্যিক আড়ম্বর মাত্র—কিন্তু এই সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ ক'রে সে নির্লজ্জভাবে আত্মপ্রকাশ ক'রে ফেলে। কিন্তু তবু উঠে এইটেই কী কবির মুখ্য বক্তব্য? অবশ্য শেষের কবিতার প্রায় প্রতি পৃষ্ঠাতেই কবির কিছু-না-কিছু বক্রোক্তি বা কটাক্ষ রয়েছে। কলেজের অধ্যাপক, প্রখ্যাতনামা রাজনীতিজ্ঞ, ব্যবসাদার বক্তা, রিপোর্টার, সমালোচক—প্রত্যেকেরই প্রতি কবির সহানুভূতিহীন সমালোচনা ও কষাঘাত বিরূপতার অন্ত নেই। "ক্যাসাদের পসরায় আপাদমস্তক ছদ্ম মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট বিশেষ", "সে ছিলো ইংরাজী সাহিত্যে রোমহর্ষক এম, এ", "মুখের স্বাভাবিক গরিমা বর্ণ প্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা"—এই ধরণের ছোটখাটো বিদ্রূপাত্মক বহু মন্তব্যই ছড়ানো রয়েছে। তবু মোটা দাগটাকে আমরা স্যাটায়ারের পর্য্যায়ে ফেলতে দ্বিধা বোধ করি। অমিত ও লাবণ্যের মতো দুটো নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি হ'য়েছে কবির

বিশেষ একটা সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রোশকে ফুটিয়ে তুলতে—এটা ভাবতেও কষ্ট হয়। মিতা ও বন্যা কবির ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাধনের ছুটো অস্ত্রমাত্র নয়—তারা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে জীবন্ত—নিজেদের জীবনেরই একটা সমস্যাবহুল ইতিবৃত্তকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে উঠেছে, আর এই ইতিবৃত্তের সাহায্য নিয়ে কবি তার আশৈশবপুষ্ট প্রেমের পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন। এতোদিন কবিতায় ও গানে কবি যে প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন—শেষের কবিতায় একটা আখ্যানভাগের ভিতর দিয়ে নতুনভাবে সেই পুরাতন জিনিসটাকেই বোঝাতে চেয়েছেন, আর এইটেই হ'ল শেষের কবিতার সর্ব্বপ্রধান উপজীব্য।

অমিত ও লাবণ্য পরস্পরকে ভালোবাস্‌লো—অথচ বিবাহের সকল আয়োজন যখন সম্পূর্ণ, স্বেচ্ছায় তারা সামীপ্যের বন্ধনকে ছিন্ন কর্‌লো। এর অন্তর্নিহিত রহস্যটাই আমাদের আলোচ্য। অমিতের সম্বন্ধে তাঁর আত্মীয় স্বজন মনে ক'রে রেখেছেন—"বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধ'রে আন্‌বার জো নেই।" লাবণ্যও তার বিরুদ্ধে অনুযোগ তুলেছে—"তুমি তো সংসার ফাঁদ্‌বার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্য ফের।" অনেকের মতে তাই অমিত এড়িয়ে যেতে চাইলো বিবাহের দায়িত্বকে, আর লাবণ্যও অমিতের মতো লোককে নিয়ে সংসার ফাঁদ্‌বার বিপদ্ সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লো। ফলে বিবাহের অনুষ্ঠান চিরদিনের মতো রইল বন্ধ!.....এমন কি অনেকে এ পর্য্যন্ত দেখাতে চেয়েছেন যে কেতকীর ব্যর্থ নারীত্বের প্রতি লাবণ্যের সহানুভূতি ও তার সঙ্গে অপমানিত প্রত্যাখ্যাত শোভনলালের কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্ত্তি চকিতে মনে-পড়ে-যাওয়া: এই ছুটোর মিলিত ষড়যন্ত্র বিবাহ ভাঙ্গার কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আসল কারণটার সঙ্গে সংযোগ থাকলেও—এইগুলোই সত্যিকারের কারণ ব'লে স্বীকার্য্য নয়।

আসলে অমিত ও লাবণ্যকে কেন্দ্র ক'রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমসম্পর্কিত আদর্শবাদকে ব্যাখ্যা করেছেন। যাকে আমরা সব সময়েই ব'লে থাকি "Platonic love", শেলির ভাষায় যা' "Desire of the moth for the Star", Browing এর "Infinite Passion"—রবীন্দ্রনাথ কল্পিত এই "মৃত্যুহীন প্রেম" সেই গোত্রীয়। দেহাতীত এই প্রেম—রক্তমাংসের আকাঙ্ক্ষা হ'তে অনেক উঁচু স্তরের। এ প্রেমে প্রতিদানের সকল প্রশ্নই নিরর্থক ও অবান্তর। "এ সুখের দাবী করে না, এ নিজে মুক্ত ব'লেই মুক্তি দেয়।" তাই অমিত ব'লে,—আমি মনে-মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি, সে গর্ ঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্য্যন্ত এসে পৌঁছে না। লাবণ্য বলে—"তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য শেষে রাখি।" রবীন্দ্রনাথের এই প্রেমের পরিকল্পনার সঙ্গে বিজড়িত রয়েছে তাঁর আদর্শ নারীত্বের কল্পনা! নারীর কামনা-উদ্দীপক মূর্ত্তি—

অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অঞ্চল
বন্দী হ'য়ে আছে!"

তার সত্যিকারের পরিচয় নয়। এর চেয়ে অনেক বেশী সত্যি তার বিজয়িনী মূর্ত্তি—অর্দ্ধেক মানবী ও অর্দ্ধেক কল্পনার রূপ:

"পুষ্পধনু পুষ্পশরভার
সমর্পিল পদপ্রান্তে পূজা-উপচার
তূণ শূন্য করি।"

এই অমিতের কল্পিত প্রিয়ার রূপ। অমিতের কাছে বিবাহ অনেকটা Vulgar গোছের, কারণ 'নিয়ে করলে

মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।" Bernard Shawও তাঁর "Getting Married" নাটকে দাম্পত্যসম্বন্ধ সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন এবং বিবাহ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন—"It combines the maximum of temptation with the maximum of opportunity." মানুষ হ'ল আসলে Sadist, তাই বিবাহ যখন দৈহিক সম্ভোগের অবাধ সুযোগ এনে দেবে, "তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের" হবে অপমৃত্যু : প্রেমে লাগবে মর্ত্যের ম্লানতা—বাস্তবতার সহস্র আঘাতে সে হবে বিদীর্ণ বিকৃত! অমিত ও লাবণ্য কারও অভিপ্রেত নয় যে তাদের 'বাণীহীন প্রতীক্ষা' ও 'নিদ্রাহীন বেদনার' একটা রূঢ় অবসান হয়। 'যে প্রেম সম্মুখপানে চলিতে চালাতে নাহি জানে'—শেষের কবিতার নায়ক-নায়িকার কাছে সে প্রেম অতি তুচ্ছ : এই প্রেম দৈহিক লালসারই ছদ্মবেশ মাত্র। এর পরিধি অতি সঙ্কীর্ণ—বিপর্য্যয় ও আবর্ত্তনের শত ঝাপটার সামনে এ অতি দুর্ব্বল ও অসহায়। অমিত-লাবণ্যের প্রেমে পরিবর্ত্তন নাই—অবসাদ নাই—এ প্রেমে রয়েছে মহাকালের স্বাক্ষর। অমিত ও লাবণ্যের প্রেম তাই বিবাহের পরিণতিকে এড়িয়ে গেলো। অমিতের নববধূ চিরদিন নববধূই রইল—আর লাবণ্য যখন বিদায় নিলো—রেখে গেলো তার প্রিয়ের উদ্দেশে অপরিবর্ত্তন অর্ঘ্য। রবীন্দ্রনাথের এই Philosophy of love অনেকটা Shelleyর ধরণেরই কিন্তু Shelleyর প্রেম কতগুলো অশরীরী ছায়ার স্বপ্নময় কামনা মাত্র। রবীন্দ্রনাথ Shelleyর মতই প্রেমের 'অমৃত মূরতি' সৃষ্টি করেছেন বটে—কিন্তু ছায়ার সাহায্য নিয়ে নয়—প্রাণচঞ্চল দুটী রক্তমাংসের জীবকেই ভিত্তি ক'রে। 'মহুয়া'য় এই প্রেমকেই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন ;—

'যা' পেয়েছি, সেই মোর অক্ষয় ধন,
যা' পাইনে বড়ো সেই নয়।
চিত্ত ভরিয়া রবে ক্ষণিক মিলন
চির বিচ্ছেদ করি' জয়।'

এর পরে গল্পের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিণতি অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু কবি কেতকী ও অমিতের বিয়ে দিয়েছেন—লাবণ্য ও শোভনলালের নিদ্রিত অতীত সচেতন হ'য়ে উঠলো : তারাও পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হ'লো। কবির এই ঘটকালি আমাদের পীড়া দেয়—মনে হয় Shaw এর 'Arms and the Man' নাটকে সার্জিয়াস-লুকা এবং ব্লাণ্টশলি-রেইনার বিবাহের মতো এটাও একটা মস্ত বড়ো এণ্টি-ক্লাইম্যাক্স।

P 29410

বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন।

মহারাজ নরনারায়ণের একখানি চিঠি।)

শ্রীঅমূল্যরতন গুপ্ত এম্-এ।

ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষা পৃথক ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাগধী প্রাকৃত হইতে মাগধী অপভ্রংশের মধ্য দিয়া ইহার উদ্ভব। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম রূপ আমরা পাই হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত "বৌদ্ধ গান ও দোহা" নামক বৌদ্ধ পদগ্রন্থে। শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই ভাষা 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষা"। এই বৌদ্ধ পদগুলিকে চর্য্যাপদ বলা হয় এবং ইহাদের রচনাকাল খৃষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী বলিয়া ধরা হয়। ইহার পরে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ বিজয় প্রভৃতি রচিত হয়। এইগুলির রচনা কাল মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে। মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাংলাদেশে এক প্রবল ভাবের বন্যা প্রবাহিত হয় এবং বহু বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিতাবলী রচিত হয়। ইহা ছাড়া পঞ্চদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল।

উপরোক্ত সমস্ত রচনাই ছন্দোবদ্ধ পদ্য। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যেই আমরা দেখিতে পাই যে প্রথমে হয় পদ্য সাহিত্যের উদ্ভব এবং তাহার বহু পরে আসে গদ্য সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে খৃষ্টান মিশনরীগণের চেষ্টায় এবং রাজা রামমোহন রায়ের সাধনায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের জন্ম হয়। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা সাহিত্য সমস্তই পদ্য সাহিত্য। কিন্তু বাংলাভাষায় গদ্য কি ইহার পূর্ব্বে ছিল না? কথাবার্ত্তায়, চিঠিপত্রে, দলিলদস্তাবেজে বাঙ্গালী বাংলা গদ্যেরই ব্যবহার করিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত বহু চিঠিপত্র দলিলদস্তাবেজ পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু এইগুলি সমস্তই প্রয়োজনের তাগিদে লেখা বলিয়া রসোত্তীর্ণ হইয়া সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই।

এই সকল চিঠিপত্র এবং দলিলদস্তাবেজের মধ্যেই আমরা বাংলা গদ্যের প্রাচীন রূপ দেখিতে পাই। কুচবিহারের পক্ষে আনন্দের কথা এই যে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কুচবিহার রাজ্যেই রচিত হইয়াছিল। ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে (১৪৭৭ শকাব্দে) কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ তৎকালীন আহোমরাজ স্বর্গদেব বা স্বর্গ নারায়ণকে একখানি পত্র লেখেন। কুচবিহাররাজ ও আহোমরাজের মধ্যে কিছুকাল হইতে অসদ্ভাব চলিতেছিল এবং এই অসদ্ভাব ক্রমশঃ প্রকাশ্য বিবাদের আকার ধারণ করিতেছিল। আহোমরাজের সহিত শত্রুতা করা মহারাজ নরনারায়ণের অভিপ্রেত ছিল না। তাই তিনি কয়েকজন দূতের মারফত কিছু উপঢৌকন এবং একখানি চিঠি আহোমরাজের নিকট পাঠাইলেন। উভয় রাজার মধ্যে সদ্ভাব ও প্রীতি বর্দ্ধিত হউক ইহাই মহারাজ কামনা

করিলেন। কিন্তু আহোমরাজ মহারাজ নরনারায়ণের প্রীতির প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন না; বরং প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে এক তথ্যসমাপূর্ণ পত্র লিখিলেন। ইহার ফলে মহারাজ নরনারায়ণ সসৈন্যে আহোমরাজের রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং আহোমরাজ পরাজিত হইয়া নরনারায়ণের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ত্তমানে আমাদের আলোচনার বিষয় নহে। কৌতূহলী পাঠক ইতিহাস পাঠ করিলে ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন। মহারাজ নরনারায়ণ আহোমরাজকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তাহা অমূল্য সম্পদস্বরূপ। নিম্নে চিঠিখানি উদ্ধৃত করা গেল।

"স্বস্তি সকল-দিগ্‌দন্তি-কর্ণতালাস্ফাল-সমীরণপ্রচলিত-হিমকর-হার-হাস-কাশ-কৈলাশ-প্রান্তর-যশোরাশি-বিরাজিত ত্রিপিষ্টপ ত্রিদশতরঙ্গিণী-সলিল-নির্ম্মল-পবিত্র-কলেবর ভীষণ-প্রচণ্ড-বীর-ধৈর্য্য-মর্য্যাদা-পারাবার সকল-দিক্-কামিনী-সীমন্ত-সিন্দূর-গুণসন্তান শ্রীশ্রীস্বর্গ নারায়ণ মহারাজ-প্রতাপেষু।

লেখনং কার্য্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অথন তোমার আমার সন্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্ত্তব্যে সে বর্দ্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগত আছি। তোমারো এ গোট কর্ত্তব্য উচিত হয় না করা তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সত্যানন্দ কর্ম্মী রামেশ্বর শর্ম্মা কালকেতু ও ধুমা সর্দার উভএ চাউলিয়া শ্যামরাই ইসারাক পাঠাইতেছি। তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিত্তাপ বিদায় দিবা।

অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গা মৎস্য ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গইছে। আর সমাচার বুঝি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।"*

এই চিঠির ভাষার আমরা কয়েকটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারি। প্রথমতঃ, চিঠির পাঠে সমাস-বহুল সংস্কৃত পদের ছড়াছড়ি দেখিতে পাই। তখনকার দিনে—শুধু তখনকার দিনে কেন আজকালও—রাজরাজড়াকে সম্বোধন কালে এইরূপ সমাস-বহুল পদেরই ব্যবহার ছিল। আজকাল আমরা সাধারণ চিঠিপত্রেও "শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু" "সেবকস্য নিবেদনমিদং" প্রভৃতি বাঁধা-ধরা পাঠের ব্যবহার করিয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ, নিজ চিঠির ভাষা বড় সরল এবং প্রাঞ্জল। কঠিন সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগে ভাষা আড়ষ্ট হইয়া পড়ে নাই। মনে হয় যেন ঐ ষোড়শ শতাব্দীতেই বাংলা গদ্য তাহার নিজস্ব রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী কালের চিঠিপত্র ও দলিলদস্তাবেজে আমরা বহু আরবী পারসী শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই। কিন্তু এই চিঠিখানিতে আরবী পারসী শব্দ মোটেই নাই। ইহার কারণ বোধ হয় তখনও কুচবিহার রাজ্যে পাঠানমোগল দরবারের ভাব। প্রবেশ

*এই পত্রখানি দীনেশ সেনের "বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ে" ও ডঃ চৌধুরী আমানতউল্লা সাহেবের "কুচবিহারের ইতিহাসে" সম্পূর্ণভাবে এবং ডক্টর মনোমোহন ঘোষের "বাংলা গদ্যের চারযুগে" আংশিক ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে।

লাভ করে নাই। চতুর্থতঃ, এই চিঠিখানির ভাষায় কিছু কিছু প্রাদেশিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। "বর্দ্ধিতাক," "উদ্যোগত," "তাক," "লেখিম" "ইমরাক," "তামরার" প্রভৃতি শব্দ বাংলা ভাষার কুচবিহারী প্রাদেশিক রূপ।

মোটের উপর এই পত্রখানি বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে একখানি মূল্যবান দলিল। ষোড়শ শতাব্দীতেও যে এইরূপ বাংলা গদ্য লিখিত হইতে পারিত ইহা একটি বিস্ময়ের বিষয়।

মধু-চন্দ্রিমা।

শ্রীঅখিল নিয়োগী।

এক ভদ্রলোক নতুন চাকরী পেয়ে মফঃস্বলের এক সহরে এসেছে। সঙ্গে শুধু তার স্ত্রী। লোকে তাদের দুটিকে দেখে আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে ভাবে, আহা! আমাদের সংসারে যদি এমন মনের মিল হত! লোকে মাণিকজোড়ের সঙ্গেই এদের দুটির তুলনা করে। যে পাড়ায় এদের বাস সেখানে এই কপোত কপোতীর নিভৃত কূজন আর মধু-যামিনী যাপনের মনোহারিত্ব দেখে—আশে-পাশের বাড়ীর কর্ত্তারা গিন্নিদের এবং গিন্নিরা কর্ত্তাদের অনুযোগে আর অভিযোগে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

সব সময় সেই বাড়ী থেকে গুণ গুণ গান শোনা যাচ্ছে। হয় ভদ্রলোক—না হয় ভদ্রমহিলা—গানের ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছেন। অন্যান্য গৃহে তখন চলেছে হয়ত ছেলেদের তারস্বরে চীৎকার কিম্বা গৃহিণীর সঙ্গে ঝির দারুণ বচসা। ওদের দুটিকে অত বেশী খুসী দেখে গৃহিণীদের কাণকথা গেল বেড়ে...ডালের বড়ি দেয়া হল বন্ধ...আর জরদা দিয়ে পান তাদের মুখে বিস্বাদ হয়ে উঠল। পাড়ার কর্ত্তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। দাবা আর পাশায় মন বসে না...কপোত-কপোতীর সুখ-নীড়ের দিকে মন ভেসে যায়। মাঝে মাঝে দু'একটা গানের কলি আলবোলার তামাকটানা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেয়।

এমনি যখন পাড়ার ঘনঘটাচ্ছন্ন অবস্থা সেই নতুন ভদ্রলোক অফিস্ ফেরৎ লক্ষ্য করলে কে একজন লোক আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে তার পেছু নিয়েছে। প্রথমটা ভদ্রলোক ভারী ভয় পেয়ে গেল। অচেনা বায়গা...নতুন এসেছি... গুণ্ডা শ্রেণীর লোক হলেই বা কে রক্ষা করছে। এখনো পাড়া থেকে অনেক দূর। নতুন ভদ্রলোকটির নাম—মধুময় বাবু। মধুময় বাবু তখন বেগতিক দেখে পা—এক

সিনেমা হাউসে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। শো তখন সুরু হয়ে গেছে। একটু বাদেই দেখা গেল—ব্যাপার বুঝি দিয়ে সেই লোকটাও টিকিট কেটে মধুবাবুর পাশে এসে বসল। সিনেমাতে তখন প্রেমের গান চলছে। কিন্তু মধুবাবুর মনের অবস্থা এমন নয় যে সে গান শোনে। তার বুক তখন টিপ্ টিপ্ করছে এবং এই ভয় শুধু মনে জাগছে কখন গুণ্ডাটা তার কোমর থেকে ছোরা বের করে। আজকে নতুন মাইনে পেয়েছে। ত্রাস জেগেছে মনে সেই জন্যে আরো বেশী। গুণ্ডাটাই প্রথমে গলা খাঁকারি দিয়ে কথা বল্লে। বল্লে, এই ইয়ে—আপনার সঙ্গেই আলাপ করতে এলাম—হাতে কোন কাজ ছিল না কিনা তাই! দেখ্‌লাম আপনিও সিনেমায় ঢুকছেন—!

মধুময় বাবু এইবার মুখ ফিরিয়ে তাকাবার সাহস পেলো। লোকটা তা হলে সত্যি গুণ্ডা নয়। মধুময় বাবু যাকে গুণ্ডা বলে ভুল করেছিল সে বল্লে—আজ্ঞে আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি। চাক্ষুষ আলাপ নেই কিনা! আমার নাম বশম্বদ বাবু। আপনার নাম ত মধুবাবু?—নমস্কার।

মধুময় বাবু মুখখানা তবু গম্ভীর করে বল্লে, আজ্ঞে নমস্কার! এখন আসল ব্যাপারটা খুলে বলা দরকার। বশম্বদ বাবু নিজে লাইফ ইন্সিওরের এজেন্ট। পাড়ার পাঁচজন হিতৈষীর মধুময় বাবুকে অতি সুখী-দম্পতি দেখে বশম্বদ বাবুর শরণাপন্ন হয়েছে। যে করেই হোক—এই মাণিকজোড়কে "ইউনিয়ন উমান" চ্যুত করতেই হবে। সলাইকার সংসারে আছে—দুঃখ, কষ্ট, কান্নাকাটি আর এই মাণিকজোড়ই কি মলয় হাওয়ায় ভেসে বেড়াবে পাড়ার দশজনের পরামর্শে বশম্বদ বাবু মধুময় বাবুর পেছু নিয়েছে।

সিনেমাগৃহেই বশম্বদ বাবু—লাইফ ইন্সিওর করবার জন্যে মধুময় বাবুকে ধরে পড়ল মধুময় বাবু কিছুতেই তার কথায় কান পাততে চায় না। বশম্বদ বাবুর পেড়াপিড়িতে আশেপাশের দর্শকদল অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। তখন রাগ করে মধুময় বাবু সিনেমা না দেখেই ঘর থেকে বেরিয়ে চলে এলো।

পাশের বাড়ীর গিন্নি কিন্তু যথাসময়ে মধুময় বাবুর স্ত্রীকে কাণকথা শুনিয়ে দিলে যে, মধুময় বাবু তাকে না নিয়েই সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। মধুময় বাবুর স্ত্রী মাধুরী প্রথমটা সেকথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না—এবং গিন্নির কথা হেসেই উড়িয়ে দিল।

মধুময় বাবু বাসায় ফিরতেই—মাধুরী তাকে ধরল চেপে। মধুময় বাবুর তখন উভয় সঙ্কট: সত্যি কথাও বলতে পারে না—মিথ্যে কথাও বলতে মন চায় না!

সেদিন সারাটা সন্ধ্যা থেকে চল্‌ল মাণিকজোড়ের মান অভিমানের পালা। আশেপাশের বাসার গিন্নিরা—উঁকি ঝুঁকি মারতে সুরু করল...তাদের কাণকথা...ফিস্ ফিস্ আলোচনা ক্রমশঃ ভয়ে উঠল। কপোত-দম্পতি সন্ধ্যাবেলা যে গানের আসর জমায় সেদিন তা একেবারে স্তব্ধ! ব্যাপার দেখে চাকর-বামুন-ঝি...মুখ চাওয়া-চাউয়ি করতে লাগল। উড়ে ঠাকুরটা ত প্রাণের আবেগে একটা গানই গেয়ে ফেল্লে।

মজলিশ জমল সেদিন পাড়ার মাতব্বরদের আড্ডাখানায়। কর্ত্তাদের উল্লাস সেদিন সপ্তমে উঠল। বশম্বদ বাবুকে পেছনে লেলিয়ে দেয়া হয়েছে...আজ তার প্রথম তুরুপ! একজন কর্ত্তা তাকে টান্‌তে টান্‌তে বল্লে—বাপ...ইন্সিওরেন্সের দালাল...কচ্ছপের কামড় ধরেও চলে। ওর হাত এড়ানো বড় চাট্টিখানি কথা নয়।

সেদিন অনেক রাত্তির পর্য্যন্ত চল্‌ল সিদ্ধি খাওয়া, গান বাজনা প্রভৃতি।

কিন্তু মজার কথা এই যে, সে রাত্তিরে বাড়ীর কর্ত্তারা বেহুস অবস্থায় অনেক রাত্তিরে ঘরে ফিরলেও গিন্নিরা চটল না আদপেই। আজ তাদের মন খুসীতে ভরে উঠেছে! মাণিকজোড়ের মধ্যে যখন ঝগড়া বেঁধে গেছে তখন তার চাইতে মুখরোচক কথা আর কি হতে পারে? গিন্নিরা নথ নেড়ে নেড়ে—কর্ত্তাদের কত সব রকমারি মানঅভিমানের কথা জানিয়ে দিলে।

এর পরদিন কিন্তু পাড়ার লোকেরা ভারী দমে গেল। কপোত-দম্পতির মান-অভিমান পালা সাঙ্গ হয়েছে··· সকাল থেকে চলেছে আবার গুণ গুণ গান!

সন্ধ্যের সময় যখন দেখা গেল—তারা ছুটিতে সেজে গুজে মুনিজনেরও মনোহরণ করে সিনেমার দিকে চলেছে তখন—পাড়ার অতি বড় কেশবতীরও মাথার চুল ছিঁড়ে ফেল্‌তে ইচ্ছে হল! কর্ত্তাদের কাণে যখন এই কথা উঠল তখন একযোগে সবাইকার গড়গড়ার নলের ডাক বন্ধ হয়ে গেল। যে জীবনে কখনো তাসে হারে না··· সে ব্ল্যাক্ সেট খেয়ে মুখ কালো করে বাসায় ফিরে এলো। কিন্তু বাসায় গৃহিণীদের বদনে আরো অন্ধকার জমা হয়ে রয়েছে। অনেক রাত্তিরে সেই কপোতদম্পতির গান আর কলহাস্য শুনে—পাড়ার গিন্নিরা রাগ করে জান্‌লা বন্ধ করে দিলে। আকাশে চাঁদ উঠেছিল দেখে কেউ কেউ প্রতিজ্ঞা করলে জীবনে আর তারা চাঁদের দিকে তাকাবে না। চাঁদের সঙ্গে তাদের আড়ি!

আবার পাড়ার আড্ডায় ডাক পড়ল বশম্বদ বাবুর। বশম্বদ বাবু বিনয়ের অবতার। বল্লে, আজ্ঞে একটা কলে আমি দু'দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছিলাম। মধুময় বাবুর জীবন যদি বিষময়ই না করতে পারি তবে নিজেই আমি লাইফ্‌ইন্সিওরের এজেণ্ট হয়েছি।

এর পর থেকে বশম্বদ বাবু ছায়ার মতো মধুময় বাবুর পেছনে লেগে রইল। মধুময় বাবু প্রাতর্ভ্রমণে বেরুচ্ছেন সস্ত্রীক—বশম্বদ বাবু দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। বত্রিশ পাটি দাঁত বিকসিত করে বল্লেন—চলুন—আমিও নদীর ধারের দিকে যাচ্ছি। সুতরাং মাধুরীকে রাগ করে ফিরতে হল। মধুময় বাবু খেলার মাঠে খেলা দেখতে গিয়েছেন—বশম্বদ বাবু এক গাল হেসে তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে একেবারে কৃতার্থ করে দিলেন। মধুময় বাবুর প্রায়ই বাসায় ফিরতে রাত হতে লাগলো।

রোববার দুপুরবেলা মধুময় বাবুর একটা নেশা ছিল পুকুরে মাছ ধরা। মাধুরী চার তৈরী করে দিত—পাশে বসে গুণ গুণ করে গান শোনাতো—আর মধুময় বাবু ছিপ নিয়ে চুপচাপ থাকতো বসে। কিন্তু কি করে খোঁজ পেয়ে বশম্বদ বাবুও ছিপ হাতে রবিবারের দুপুরটা পুকুর ধারে এসে বসতে লাগলো। ফলে মাধুরীকে যেতে হল উঠে।

মধুময় বাবু নেশা ছেড়ে উঠতেও পারে না—অথচ বশম্বদ বাবুর মতো নিরস লোককে সর্ব্বক্ষণ পাশে রেখে বক্-বক্ করাও তার পক্ষে কষ্টকর।

ওদিকে মাধুরী অস্থির হয়ে উঠল। বল্লে, ওই লোকটার সঙ্গে তোমার এত ভাব কেন? ওকে তুমি আমাদের পুকুরের মাছ ধরতে অনুমতি দিলে কেন? কিন্তু মধুময় যে তাকে অনুমতি দেয় নি—বশম্বদ বাবু অনুমতির অপেক্ষা না রেখে আগে থেকেই এসে ছিপ নিয়ে বসে গেছে সে কথা সে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলে, কিন্তু মাধুরী সে কথা কোনমতেই স্বীকার করতে চায় না,

বলে আজ কাল আর আমাকে তোমার ভালো লাগে না—তাই আমাকে তোমার পাশ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যেই ওই বিদ্‌ঘুটে বদ্‌ লোকটাকে এনে হাজির করো! যাও—থাকতে চাইনে আমি আর তোমার কাছে। এমনি ভাবে আবার একটু একটু করে মেঘ ঘনিয়ে আসে।

সে দিন মাধুরীর জন্মদিন। ভাগ্যক্রমে আবার দিনটা পড়েছে রবিবার। মাধুরী বলেছে, এবার আর কাউকে নেমন্তন্ন করা নয়। ওরা ছুটিতে সারাদিন থাকবে কাছাকাছি...পাশাপাশি। জন্মদিনে জীবন-দেবতাকে আপনার ঘরে পেতে মাধুরীর নতুন করে সাধ জেগেছে। মাধুরী যেন আজ হাসি খুসীর ঝর্ণাধারা। গানে গানে তাদের ছোট ঘরখানি মুখরিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু মুস্কিল বাঁধলো দুপুর বেলা। আফিসের বড়বাবু একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন—তাঁর সঙ্গে তক্ষুণি দেখা করতে। মধুময় মহা মুস্কিলে পড়ে গেল। এখন যদি সে চলে যায় তবে মাধুরীর মুখে নেমে আসবে অকাল-বাদল। যত কিছু হাসি-গান সব এক মুহূর্ত্তে নিভে যাবে। কিন্তু বড়বাবুর আহ্বানও সে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না—কারণ এ আর কারো আহ্বান নয়। ডাক এসেছে স্বয়ং আফিসের হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতার কাছ থেকে। নিশ্চয়ই আফিসের কোন জরুরী কাজ। কোন ফাইলে ভুল-চুক করে এসেছে কিনা তাই বা কে জানে।

মধুময় ভাবলে মাধুরীকে না জানিয়ে সে শুধু যাবে আর আসবে। তাই মাধুরী যখন রান্নাঘরে গুণ গুণ গান গেয়ে রান্না চাপিয়েছে—সেই অবসরে চাকরটাকে ডেকে মধুময় বলে সে একটু বেরুচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে সে কথা যেন মাধুরীকে জানানো না হয়। হয়ত রান্না শেষ হবার আগেই সে চলে আসবে।

মধুময় বড় বাবুর বাসায় এসে দেখলে পরিস্থিতি জটিল। তাকে তক্ষুণি বড়বাবুর সঙ্গে পাশের জমিদারদের দীঘিতে মাছ ধরতে যেতে হবে। মাছ ধরার নেশা বড়বাবুর যে আরো বেশী—সে খবর মধুময়ের অজানা ছিল না। সে কোন রকমে নিজের অপত্তিও জানাতে পারে না। সুতরাং যেতেই হল সঙ্গে।

মাধুরী রান্না শেষ করে তাড়াতাড়ি বাইরে এলো মধুময় বাবুকে খুঁজতে। আজ তারা ছুটিতে এক সঙ্গে বসে খাবে এই ছিল পরিকল্পনা। মাধুরী প্রথমে মনে করলে মধুময় তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। এ ঘর ও ঘর খোঁজে···তার পর ছুটে বেরোয় প্রাঙ্গণে...পুকুরের ঝোপে ঝোপে সে খুঁজে বেড়ায় মধুময়কে! কিন্তু কোথায়ও সে নেই।

মাধুরীর চোখ ফেটে জল এলো। তাকে যদি ভালই না লাগে তবে সে কথা স্পষ্ট জানালেই হত! এমন করে মধুময়ের পালিয়ে বেড়াবার কি প্রয়োজন ছিল? চাকরটাও ভয়ে কিছু বলতে সাহস করল না! মাধুরী সারাদিন কেঁদে কাটালো...বিকেলের দিকে সে সাজানো খাবারগুলো ফেলে দিতে যাচ্ছিল এমন সময় ঘরে এসে ঢুকলো বশম্বদ বাবু। প্রকৃতপক্ষে বড়বাবুকে বলে মধুময়কে ডেকে পাঠানোর মূলেও রয়েছে সেই। বশম্বদ বল্লে, আহা-হা—লক্ষ্মীর হাতের তৈরী খাবারগুলো ফেলবেন না। দ্বারে ভিকিরী প্রার্থী। মাধুরী এক রকম মরিয়া হয়েই খাবারগুলো বশম্বদর হাতে তুলে দিলে। খাবার শেষ করে প্রকাণ্ড একটা ঢেকুর তুলে বশম্বদ বাবু পকেট থেকে একটা লকেট বের করে বল্লে, আমার স্ত্রী আপনাকে জন্মদিনের উপহার পাঠিয়ে দিয়েছেন। আপনি গ্রহণ না করলে আমার দুঃখ রাখবার ঠাঁই থাকবে না। হঠাৎ এই সময় মধুময় এসে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল অপরাধীর মতো।

কিন্তু বশম্বদ বাবুর মুখে শেষ কথাটা শুনে সে আর ঘরে না ঢুকে—অন্যত্র চলে গেল। তার মনে বিঁধলো একটা কাঁটা। সে রাত্রে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অভুক্ত রইল। কেউ কারো সঙ্গে বাক্য বিনিময় পর্য্যন্ত করলে না।

এর পর থেকে মাণিকজোড়ের নীড়ে কেমন যেন একটা খাপছাড়া ভাব দেখা দিল। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে চায় না। একজন অপরকে করে সন্দেহ। একই বঙ্কে তারা নিদ্রা যায় বটে কিন্তু পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে চলে যায় বহুদূরে···বুঝি বা স্বপ্নেও মধুময় মাধুরীর নাগাল পায় না।

এমনি যখন অন্তঃপুরের অবস্থা তখন বশম্বদ মধুময়ের নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গী রূপে এসে আবির্ভূত হল। সন্ধ্যে বেলাটা আজকাল মধুময়ের বশম্বদ বাবুর সঙ্গেই কাটে। দাবা খেলায় দুজনেই বেশ মশগুল হয়ে পড়ে। অন্তঃপুর থেকে না চাইতেই চা খাবার আসে, বশম্বদ বাবুও তার সদ্ব্যবহার করতে ভোলেনা ...কিন্তু মধুময়ের কাছে তা বিস্বাদ হয়ে ওঠে।

এমনি সময় এদের জীবনে এলো এক লেডি ক্যানভাসার। লেডি ক্যানভাসার সোজাসুজি এসে মধুময়ের সঙ্গে আলাপ জমালো এবং বলে তাকে লাইফ্ইন্সিওর করতে হবে।

বশম্বদ বাবু এতদিন নিজের আসল কাজটা বোধ করি ভুলেই গিয়েছিল। কারণ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করেই সে মনের আনন্দে ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিনীর দেখা পেয়ে তার প্রকৃত স্বার্থের কাজটার কথা মনে পড়ে গেল।

হ্যাঁ, মধুময়কে দিয়ে একটা লাইফ্ইন্সিওরের পলিসি নেয়াতেই হবে। সুতরাং বশম্বদ বাবু তার পুরোনো আর্জিটা পেশ করলে লেডি ক্যানভাসারের সামনেই। এই নিয়ে বশম্বদ বাবুর সঙ্গে লেডি ক্যানভাসারের বেশ কিছু বচসাও হয়ে গেল। বর্ত্তমানে মধুময় বাবুর মনটা স্বভাবতই বশম্বদ বাবুর প্রতি একটু অনুকূল—কারণ সে সন্ধ্যা বেলার নিত্য সঙ্গী, তাকে না হলে আজ কাল মধুময় বাবুর চা খাওয়াই হয় না।

লেডি ক্যানভাসার দুএকদিন যাতায়াত করেই ব্যাপারটা অনুমান করে নিলে। মনবাসিনী চালাক মেয়ে; সে বুঝলে এপথে কোন কাজ হবে না। তখন সে একদিন অন্দর মহলে গিয়ে মাধুরীর সঙ্গে ভাব করে বসল এবং তাকে কথায় কথায় বুঝিয়ে দিলে যে স্বামীর যখন তার দিকে নজরই নেই তখন দুঃসময়ের পাথেয় হিসেবে তার লাইফ ইন্সিওর করানো প্রয়োজন। এণ্ডাউমেণ্ট হলেই ভাল হয়। তাহলে পলিসির সুখ সুবিধেটে সে নিজেই ভোগ করতে পারবে।

মাধুরী প্রথম দিন কথাটায় বিশেষ আমল দিলে না, তারপর ভেবে দেখলে লেডি ক্যানভাসার মনবাসিনীর কথাই সত্যি। স্বামী আর ফিরে তাকায় না বলেই সব রকমে সে নিজেকে রিক্ত করে রাখতে পারে না। তারও নিজেরও ভবিষ্যৎএর কথা ভাবতে হবে। মাধুরী তাই মনবাসিনীকে জানিয়ে দিলে যে লাইফইন্সিওর সে করবে।

একদিন মনবাসিনী বেরিয়ে যাচ্ছে আর বশম্বদ বাবু সেই বাড়ীতে ঢুকছে···এই রকম অবস্থায় উভয়ের সাক্ষাৎ হল।

মনবাসিনী গর্ব্বের হাসি হেসে জানিয়ে দিলে যে, বাড়ীর গিন্নি লাইফ ইন্সিওর করতে রাজী হয়েছে। দুই এক দিনের মধ্যেই মেডিক্যাল একজামিন হয়ে যাবে।

এই কথা শুনে বশম্বদ বাবু নিজেকে ভারী ছোট মনে করতে লাগলো। সে এতদিন ঘরে হাঁটাহাঁটি করছে তবু মধুময় বাবুকে রাজী করাতে পারলে না—আর মনবাসিনী

এসেই কাজ গুছিয়ে নিলে। রাগে সে ফুলতে লাগলো। ইন্সুরেন্স কোম্পানীতেও তার সবুর সইল না। এক কথায় দশ কথা বানিয়ে সে সবিস্তারে গিয়ে মধুময় বাবুকে সব কথা জানিয়ে দিলে।

এতে মধুময় বাবুর চটবার প্রকৃতই কারণ ছিল। স্ত্রী যে তাকে লুকিয়ে লাইফ ইন্সিওর করবার কথা ভাবতে পারে এটা তার একেবারে ধারণার অতীত। স্থির মাথায় সে অন্দর মহলে তখুনি আদেশ জারি করে দিলে যে, তার গৃহে থেকে মাধুরী কিছুতেই লাইফ ইন্সিওর করতে পারবে না। ঠিক সেই সময় মনবাসিনী এসেছিল লেডি ডাক্তার দিয়ে মাধুরীকে পরীক্ষা করতে। কাজেই গৃহকর্ত্তার আদেশ শুনে তাদের উভয়কেই পাততাড়ি গোটাতে হল।

মনবাসিনী যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়—শুনতে পেলো বৈঠকখানা ঘরে বসে বশম্বদ বাবু মধুময় বাবুর কাছ থেকে লাইফ ইন্সিওরের পলিসি লিখিয়ে নিচ্ছে।

মনবাসিনীর মনে তখন দুষ্ট বুদ্ধি চাপল। সে লেডি ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে ফিরে গেল—মাধুরীর কাছে। বলে, বোন, তোমার ভালর জন্যেই আমি তোমার জীবন বীমা করতে বলেছিলাম। কর্ত্তা তোমায় করতে দিলেন না—কিন্তু গিয়ে দেখ, সেই বাইরের ঘরের বণ্ডামার্ক লোকটার কাছে তিনি বীমা কচ্ছেন। তোমারও ত ভবিষ্যতের জন্যে কিছু করা দরকার—

এই কথা শুনে মাধুরীরও আজ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। ঐতদিন সেই ছিল এ গৃহের সর্ব্বেসর্ব্বা। আজ সে কেউ নয়—বোধ করি দাসী বাঁদীরও অধম। তাই মরিয়া হয়ে মনবাসিনীকে বল্লে, বাড়ীর কর্ত্তা যদি বীমা করে থাকেন তবে আমিও করবো। মায়ের দেওয়া আমার আলাদা টাকা আছে। আমি তাই থেকেই ইন্সিওর করবো।

যথা সময়ে মনবাসিনী তার এই বিজয় বার্ত্তা—বণ্ডামার্ক বশম্বদ বাবুকে জানিয়ে দিল এবং সেই সন্দেশ মধুময় বাবুও জানতে বিলম্ব হল না।

এর পর সুরু হল—স্বামী স্ত্রীর প্রতিযোগিতা। স্ত্রী যদি করে এক হাজার টাকার বীমা, স্বামী অমনি পাঁচ হাজার টাকার পলিসি নিয়ে বসে! এই প্রতিযোগিতার ফলে বশম্বদ বাবু আর মনবাসিনী দেবীর বেশ কিছু আয় হতে লাগল।

স্বামী স্ত্রীর ভেতর প্রতিযোগিতা যত জোরালো হয়ে ওঠে—বশম্বদ বাবু তত বেশী মনবাসিনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার সুযোগ পায়।

শেষে একদিন বশম্বদ বাবু মনবাসিনীর কাছে প্রস্তাব করে বসে—আর কেন? অর্থ ত অনেক পাওয়া গেল। আমার আগে থেকে জমানোও আছে বিস্তর—চল এইবার আমরা ঘর বাঁধি—

মনবাসিনী ফোঁস করে ওঠে। বলে তোমায় আমি কিছুতেই বিয়ে করবো না। উঁহু প্রাণ থাকতে নয়।

বশম্বদ বাবুর যখন মনবাসিনীর মনভরের তপস্যা চলে তখন গোটা পাড়া উল্লাসে মেতে উঠেছে। কারণ তারা যা চায়নি—তার চাইতেও বেশী মনান্তর ঘটেছে মাণিক-জোড়ের ভেতর। সেই জন্যে সবাই বশম্বদ বাবুর কাছে কৃতজ্ঞ। প্রত্যেক বাড়ী থেকে আসে তার নিমন্ত্রণ। কিন্তু বশম্বদ বাবুর চিত্তে সুখ নেই।

আর একদিন সুযোগ বুঝে বশম্বদ বাবু মনবাসিনীর কাছে আবার প্রস্তাব করে বস্‌ল, আর কতদিন পরের জীবনবীমা করবে, এসো আমরা পরস্পরের Life Insure করে নি। মনবাসিনী বল্লে কিন্তু আমি মাধুরীর কাছে শুনেছি আপনার স্ত্রী আছে—

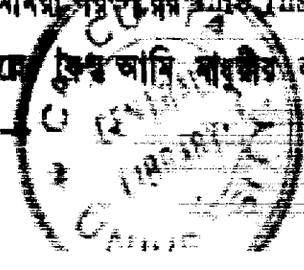

বশম্বদ বাবু এতদিনে ওর আপত্তির কারণটা বুঝ্‌তে পার্‌লে। তখন সে সকাতরে নিবেদন কর্‌লে · চলুন আপনি আমার ডেরায়—যাকে বলে Bachelor's Den Out of Policy আমি ঐ সব কথা রটিয়েছিলাম।

মনবাসিনী বশম্বদ বাবুর Bachelor's den দেখে খুসী হল এবং পুলকিত মনে একদিনেই তার লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়ে আন্‌লে। এরপর থেকে মধুময় আর মাধুরীর কাছে যথাক্রমে তারা দুটি গরহাজির হতে লাগলো।

এর ফলে বিপদ হল মধুময় আর মাধুরীর।

তাদের দিন যেন আর কিছুতেই কাট্‌তে চায় না সন্ধ্যে বেলা মধুময়—সঙ্গীর জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে...তার পর বিছানায় নিজের দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে কড়িকাঠ গোণে।

মাধুরীর অবস্থা আরও সঙ্কটজনক। রান্নাঘরে যায় বটে, তবে মন দিয়ে কিছুই করতে পারে না। তরকারীতে হয় নুন দেয় না—না হয়, অতিরিক্ত নুন দিয়ে রাখে পুড়িয়ে।

মধুময় সেই ব্যঞ্জন আস্বাদ করে মুখ বিকৃতি করে। কিন্তু মুখে কিছু বল্‌বার যো নেই—। কারণ পরস্পরের বাক্যালাপ বন্ধ।

একদিন হঠাৎ মধুময় উঁকিয়ে দেখলে তাদের অর্গানটাতে ভয়ানক ধুলো জমেছে। আন্‌মনে অর্গানের ডালা খুলে একটা অতি পরিচিত গান সুরু করলে। পাশের ঘরে মাধুরীও ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিল। সে উঠে অবাক হয়ে উঁকি দিয়ে দেখ্‌লে। মধুময় বিস্মিত হয়ে তাকালে... তাইত! মাধুরী অনেক শুকিয়ে গিয়েছে! গানে সে মাধুরীকে পাশে ডাক্‌লে। মাধুরীও হয়ত এরই জন্য অপেক্ষা করে ছিল দীর্ঘ দিন ধরে।. সে-ও গানের ভেতর দিয়ে এসে ধরা দিল।

এর পরের দিনই মধুময়ের জন্মদিন। মাধুরী আজ কারো কথা শুনলে না, সে গোটা পাড়ার লোককে নিজে গিয়ে নেমন্তন্ন করে এলো। সবাই মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে তার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

নিমন্ত্রণ বাড়ী হাসি গান উল্লাসে জমে উঠ্‌ল। নিমন্ত্রিত অতিথিরা অন্য কোন দিকে দৃকপাত না করে দু'হাতে খাবার ওড়াতে লাগ্‌ল। কেউ কেউ ছাঁদা বেঁধে নিলে। কিন্তু মধুময় আর মাধুরী সবাইকে লুকিয়ে... হাজির হল সেই পুকুরের ধারে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। পুকুরের জলে পড়েছে তার ছায়া।

মধুময় ঠাট্টা করে বল্লে, আজ আমার ছিপে সত্যি তা-হলে মাছ ঠোকর দিলে? মাধুরী মুচ্‌কে হেসে জবাব দিলে আজ কিন্তু চারের দরকার হয় নি···এ মাছ ধরা দিতেই ভালোবাসে। ধরা দিয়ে সে মরতে চায়।

কিন্তু এ মরণেও আছে মধুচন্দ্রিমার স্বপ্নবিহ্বলতা। মধুময়ের জন্মতিথির নিমন্ত্রণে কিন্তু বশম্বদ বাবু এবং মনবাসিনীকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। তারা দুটিতে তখন—মধু-যামিনী যাপন কচ্ছে···পুরীর সাগর সৈকতে।

দেখা গেল···সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত জল-কল্লোল তাদের দুটিকে আড়াল করে... মধুরতর কিছু আস্বাদনের সুযোগ প্রদান কর্‌লে!

চিলারায় সৈন্যাবাস।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ।

শাস্ত্র বিধানে কয়—
যে দেবতা প্রীত যেই উপচারে তা' দিয়া পূজিতে হয়।

পৌনে চারিশত বর্ষ বিগত—উদিল সফল দিন,
বেদিকা-প্রান্তে বাজিল ঘণ্টা—সাধক সম্মুখীন।

* * * *

কোথা মহারাজ নরনারায়ণ নরনারায়ণ প্রায়,
কোথা আজ তব স্নেহের সোদর শুক্লধ্বজ 'চিলারায়'?
হিমাচল হ'তে বঙ্গসাগর—যেথায় মিলিত গঙ্গা,
প্রাগ্-জ্যোতিষের সীমাচল হ'তে সুদূর কনকজঙ্ঘা,
বঙ্গ-আসামে একাধিপত্য—দিগ্বিজয়ী বীর—
চিলের মতন ছোঁ মারিয়া নিত সমরে শত্রু-শির।
বিস্ময়কর অশ্ব-চালনা—বাতাসে মিশিয়া ধায়।
অশ্বপৃষ্ঠে লঙ্ঘিয়া নদী নাম পেলে চিলারায়।
অকুতোভয়তা সমর ক্ষেত্রে কালান্তক অবতার।
'সংগ্রামসিংহ' পদবী প্রাপ্তি ঘটেছিল তাই যার।

* * * *

কোথা আজ সেই ভবানীর বরে বলীয়ান্ মহাবীর?
বংশ-দুলাল স্মরিছে তোমায় শ্রদ্ধা-আনত শির।

---

* মহারাজ নরনারায়ণের ভ্রাতা ও সেনাপতি শুক্লধ্বজ বা চিলারায়ের নামে স্থাপিত সৈন্যাবাসের উদ্দেশে রচিত।

বিরচিয়া তব পূজা-মণ্ডল শক্তি কেন্দ্রীভূত,
বীরের যোগ্য, বীরের ভোগ্য, বীরের প্রীতিপূত!
শিরায় শিরায় চপলা চমকে গুরু-গম্ভীর বাদ্য,
তালে-তালে-তালে অঙ্গ-চালনা নর্ত্তন অনবদ্য,
কুসুমাঞ্জলি অনল-অস্ত্র সজ্জিত করে করে,
কামান পাত্র উভয় পার্শ্বে ধূপ-আরতির তরে,
অঙ্কিত রাজ-শক্তি-চিহ্ন সাধন-বেদিকা মূলে,
ত্রিবর্ণ পতাকা আহ্বানে আহা! বায়ুভরে হেলে-দু'লে!

* * * *

যেমতি কুরু-ক্ষেত্র সমরে পার্থ ধনুর্দ্ধর,
দ্রোণগুরু পদে জানাইলা নতি সন্ধানি' খর-শর!
অথবা ভীষ্ম পিতামহ পড়ি' সম্মুখ রণাবর্ত্তে,
যাচিলা তীক্ষ্ণ শরের শয্যা কোমলতা পরিবর্ত্তে!
এ বীর-পূজাও তাই—
উপচার এর বজ্র-কঠোর কমনীয় কিছু নাই!
শক্তি তন্ত্র, মিলন মন্ত্র, পদ্ধতি বীরাচারে,
বীর দেবতার এ পূজা করিতে বীর সাধকেই পারে।

* * * *

অশরীরি! তব শক্তিপুঞ্জ অলক্ষ্য ভরে এসে—
আকাশে বাতাসে রহুক্ তোমার সৈন্য-আগারে ভেসে।
ভরিয়া উঠুক সাধনা কুঞ্জ রঙ্গীণ ফুলে ফলে,
আমরা আবার উল্লাসে মাতি জয় চিলারায়! বলে।

রাজপরিবারের সংবাদ।

২০শে মার্চ্চ জয়পুর রাজ্যের মহারাণী শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবী কোচবিহারে আগমন করেন। নব-জাত রাজকুমারের সহিত শ্রীঈশ্বরাণী সাহেবাও ঐ দিন কোচবিহারে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জয়পুরের শ্রীশ্রীমহারাজ বাহাদুর ২৯শে মার্চ্চ তারিখে কোচবিহার আগমন করেন। জয়পুর মহারাণী ১লা এপ্রিল এবং জয়পুর মহারাজ ২রা এপ্রিল কুচবিহার ত্যাগ করেন। যাত্রার প্রাক্কালে জয়পুর অধিপতি এবং কোচবিহারের মহারাজ ভূপবাহাদুর রাজমাতা বাড়ীর নিকট একটী "বাইসন্" শিকার করেন। রাত্রিতে সকলের অগোচরে "বাইসনটি" সহরে প্রবেশ করে—কিন্তু কোন কিছু ক্ষতি করিবার আগেই মহারাজ ভূপ বাহাদুর উহার উপস্থিতির কথা জানিতে পারেন। তৎক্ষণাৎ তিনি জয়পুরাধিপতি ও কর্ণেল হার্ভের সহিত ঘটনাস্থলে গমন করেন এবং মাত্র দুই তিন গজ দূর হইতে তাঁহারা "বাইসনটিকে" গুলি করিয়া নিহত করেন।

মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা ১৪ই এপ্রিল তারিখে বোম্বাই হইতে কলিকাতা হইয়া কোচবিহার প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তিনি তাঁহার দানে স্থাপিত এবং পরিচালিত অনাথ আশ্রমটি কয়েকবার পরিদর্শন করিয়াছেন। আশ্রমের নিঃসহায় বালক-বালিকাগণের অধিকাংশকেই মহারাণী সাহেবা বাংলার গত দুর্ভিক্ষের সময় কলিকাতা নগরী হইতে এখানে লইয়া আসেন এবং তখন হইতেই তাহাদিগকে মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থাও করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর ১৬ই ও ১৭ই মার্চ্চ কুচবিহার আইন সভার সভাপতিত্ব করেন এবং সভার কার্য্য পরিচালনা করেন। ২৩শে মার্চ্চ তিনি উন্নয়ন বোর্ডের প্রথম সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং ২রা এপ্রিল কোচবিহার ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট সার্ভিসের উদ্বোধন করেন। রাজ্যের সকল মঙ্গল কর্ম্মে মহারাজ ভূপ বাহাদুরের নিবিড় যোগ রাজ্যের অভ্যুদয় সূচনা করে। ১৩ই এপ্রিল তারিখে মহারাজ ভূপ বাহাদুর হাউসহোল্ড মন্ত্রী সহ বিমানযোগে কলিকাতা গমন করিয়াছেন।

রাজপরিবারের সকলে কুশলে আছেন।

স্থানীয় সংবাদ।

কোচবিহার আইন সভার শীতকালীন অধিবেশন :—

বিগত ১৬ই এবং ১৭ই মার্চ্চ কোচবিহার আইন সভার (Legislative Council) শীতকালীন অধিবেশন শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ই মার্চ্চ বেলা ১১টার সময় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভা উদ্বোধন করিয়া মহারাজ এক সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ইউরোপীয় এবং ব্রহ্ম রণাঙ্গনে যুদ্ধের গতি ক্রমশঃই সম্মিলিত জাতিসমূহের অনুকূলে চলিতেছে; ব্রহ্মদেশ শীঘ্রই পুনরধিকৃত হইবে এবং বাংলাদেশ যে বিপদের সম্মুখীন হইয়াছিল তাহা একেবারে দূরীভূত হইবে। যুদ্ধোত্তর ভারতের অর্থ নৈতিক ও শিল্পবিষয়ক উন্নতির জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকেও এই বিষয়ে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে; কোচবিহারেও নানাবিধ উন্নতিমূলক পরিকল্পনা রাজসরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে; কিন্তু জনসাধারণের সহযোগিতা ও সাহায্য না পাইলে কোন পরিকল্পনাই পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না। রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি জনসাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের সহযোগিতার উপর নির্ভর করে; রাজ্যের গভর্ণমেণ্টকে তাঁহারা সর্ব্ববিধ সাহায্য করিলেই রাজ্যে শান্তি স্থাপিত ও রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে। তাই মহারাজ ভূপ বাহাদুর আইন সভার নির্ব্বাচিত সদস্যগণকে বিশেষভাবে সম্বোধন করিয়া বলেন যে শুধুমাত্র নূতন আইন প্রণয়ন বা পুরাতন আইনের দোষত্রুটি সংশোধন করিলেই তাঁহাদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত হইবে না; তাঁহাদের নির্ব্বাচকমণ্ডলী, অর্থাৎ রাজ্যের জনসাধারণের যাহাতে প্রকৃত মঙ্গল হয় তৎপ্রতি তাঁহাদিগকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাঁহারা জনসাধারণের মতামত, আশা আকাঙ্ক্ষা গভর্ণমেণ্টের গোচরে আনিবেন এবং সর্ব্বতোভাবে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবেন—ইহাই ভূপ বাহাদুর প্রত্যেক নির্ব্বাচিত সদস্যের নিকট আশা করেন; অপরপক্ষে গভর্ণমেণ্টও সর্ব্বদা নির্ব্বাচিত সদস্যগণের পরামর্শ ও প্রস্তাব সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিতে প্রস্তুত থাকিবেন। গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের উন্নতির জন্য সর্ব্ববিধ সাহায্য করিবেন; কিন্তু জনসাধারণের নেতৃগণ সাধারণের স্বার্থের খাতিরে আত্মত্যাগ করিতে প্রস্তুত না থাকিলে উন্নয়নমূলক কোন পরিকল্পনাই পূর্ণরূপে সফলতা লাভ করিতে পারে না।

মহারাজা ভূপ বাহাদুরের বক্তৃতার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয় এবং পনরটি নূতন ও সংশোধিত পুরাতন আইন বিধিবদ্ধ হয়। তন্মধ্যে অনাথ আশ্রম আইন, সংশোধিত ফৌজদারী আইন, খেয়া পারাপার আইন, সংশোধিত ষ্ট্যাম্প আইন, বিশেষ আবকারী আইন, খাদ্যে ভেজাল নিবারণ আইন, সংশোধিত গ্রাম্য চৌকীদারী আইন, সংশোধিত আয়কর ও অতিরিক্ত মুনাফা-কর আইনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহারাজা বাহাদুর দেড় ঘটিকার সময় ঐ দিনের মত সভার কার্য্য স্থগিত রাখেন।

১৭ই মার্চ্চ বেলা ১১টার সময় মহারাজা ভূপ বাহাদুরের সভাপতিত্বে পুনরায় সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। মহারাজ ভূপ বাহাদুরের অনুমতি অনুসারে হোমরুলিং

বিভাগসমূহের (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) ১৯৪৪—৪৫ সালের সংশোধিত আয়ব্যয়ের হিসাব এবং ১৯৪৫—৪৬ সালের মূল আয় ব্যয়ের হিসাব বিবেচনার জন্য উপস্থিত করা হয় এবং সতেজ আলোচনার পর গৃহীত হয়।

তৎপরে বেসরকারী নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহ্‌মদ, রায় সাহেব সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র মুস্তফী কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; এই গুলির উত্তর পূর্ব্বেই ছাপাইয়া সদস্যগণের মধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। সদস্যগণ কয়েকটি অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন; সেইগুলির উত্তর প্রদানের পর সভার কার্য্য অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হয়।

উন্নয়ন বিভাগের কার্য্যকলাপ—

কোচবিহার রাজ্যের কৃষি, শিল্প, পল্লী অঞ্চলের রাস্তা ঘাট, যানবাহন, গ্রাম্য জীবনযাত্রা প্রভৃতির উন্নতিকল্পে কয়েক মাস পূর্ব্বে একটি নূতন উন্নয়ন বিভাগ (Development Department) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নলিতমোহন বকসী মহাশয় উন্নয়ন কমিশনার নিযুক্ত হইয়া এই বিভাগের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং প্রধান মন্ত্রী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে বিভাগীয় কার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর এই বিভাগের কার্য্যে ব্যক্তিগত মনোযোগ দিতেছেন এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মচারিগণকে উৎসাহিত করিতেছেন।

উন্নতিমূলক বিষয়ে পরামর্শ দিবার জন্য একটি প্রতিনিধিমূলক উন্নয়ন বোর্ডে (Development Board) গঠিত হইয়াছে এবং মহারাজা ভূপ বাহাদুর স্বয়ং ইহার সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়াছেন। মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয় এবং উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণ ইহার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন। গত ২৩শে মার্চ্চ ষ্টেট কাউন্সিল গৃহে মহারাজা ভূপ বাহাদুরের সভাপতিত্বে উন্নয়ন বোর্ডের প্রথম অধিবেশন হয়। সভার কার্য্য উদ্বোধন করিয়া মহারাজা ভূপ বাহাদুর এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, যুদ্ধজনিত অবস্থার জন্য রাজ্যের জাতিগঠন মূলক কার্য্যসমূহ সাময়িক ভাবে স্থগিত রাখা হইয়াছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে যুদ্ধ পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ায় এবং নিকট ভবিষ্যতে জগতে শান্তি স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা দেখা যাওয়ায় আর বিলম্ব না করিয়া প্রজাগণের মঙ্গলার্থে এখনই জাতিগঠন মূলক কার্য্য সমূহে হাত দেওয়া হইবে। এই জন্য ইতিপূর্ব্বেই উন্নয়ন বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে; এবং উন্নয়ন বিভাগের কমিশনারের হস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পরিচালনা ভার দেওয়া হইয়াছে—(১) কৃষি ও মৎস্য; (২) শিল্প; (৩) পুষ্প ও উদ্যান বিভাগ এবং পশু পালন ও শূকর পালন; (৪) গ্রামোন্নয়ন এবং গ্রাম্য রাস্তা ঘাট ও জল সরবরাহ; (৫) সভেন ডেয়ারী ফার্ম্ম সহ দুগ্ধ উৎপাদন ও পশু চিকিৎসা; (৬) রাস্তাঘাট ও নদীপথে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা; এবং (৭) বেসামরিক জনরক্ষা বিভাগ।

প্রজাসাধারণের মঙ্গলার্থে যে সকল পরিকল্পনা করা হইয়াছে সেইগুলি কার্য্যকরী করিবার নিমিত্ত সকলের সহযোগিতার উপর মহারাজ ভূপ বাহাদুর খুব জোর দেন এবং বলেন যে তাঁহার সরকারের গঠনমূলক সকল প্রচার প্রতিটি সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। বোর্ডের সদস্যগণকে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা সমূহের উপর তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিতে মহারাজ বাহাদুর সাদরে বলেন এবং পরিশেষে বলেন যে আমার সরকার পরিচালনা তাঁহার

গভর্ণমেণ্টের বিবেচনাধীন আছে ও রাজ্যের উন্নতি কল্পে অর্থব্যয় করিতে তাঁহার গভর্ণমেণ্ট কুণ্ঠিত হইবেন না।

মহারাজের বক্তৃতার পরে উন্নয়ন কমিশনার রাজ্যের কৃষি, শিল্প, যানবাহন প্রভৃতির উন্নতিমূলক নানাবিধ পরিকল্পনা সম্বলিত একটি বিবরণ পাঠ করেন। এই সকল পরিকল্পনা সম্বন্ধে সভায় নানাবিধ আলোচনা হয়। পরিশেষে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী মহোদয় এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে যাতায়াত ও যানবাহন সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে। রেলওয়ে, রাস্তাঘাট এবং যানবাহনের উন্নতিমূলক কয়েকটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে। রেলওয়ের উন্নতি সম্বন্ধীয় পরিকল্পনায় বর্ত্তমান মিটার গেজ রেলপথকে ব্রড্‌গেজে পরিণত করা এবং তুফানগঞ্জ হইতে মেখলীগঞ্জ হইয়া কালাকাটা পর্য্যন্ত একটি রেলপথ নির্ম্মাণের প্রস্তাব করা হইয়াছে; এই পরিকল্পনা বিবেচনার জন্য ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। রাস্তাঘাটের উন্নতি সম্বন্ধে প্রধান মন্ত্রীমহোদয় বলেন যে এই বিষয়ে অর্থই হইতেছে প্রধান সমস্যা। ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যের এমন অর্থসামর্থ্য নাই যে তাহারা বিরাটভাবে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে পারে। প্রধান মন্ত্রী মহোদয় বলেন যে তিনি এই বিষয়ে ভারত সরকারের অর্থসচিবের সহিত আলোচনা করিয়াছেন; এবং অর্থসচিব ছোট ছোট দেশীয় রাজ্যের প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিয়া দেখিতে সম্মত হইয়াছেন। অতঃপর প্রধান মন্ত্রীমহোদয়ের প্রস্তাবানুসারে উন্নয়নবিভাগের বিভিন্ন প্রস্তাবসমূহ বিবেচনা করিয়া মতামত প্রকাশের জন্য চারিটি সাবকমিটি গঠিত হয়।

আমরা আশা করি এই নূতন বিভাগের কার্য্যকলাপের ফলে নানাভাবে কোচবিহার রাজ্যের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে।

কোচবিহার ষ্টেট্‌ ট্রান্সপোর্ট—

রাজ্যমধ্যে যাতায়াতের সুবিধার জন্য এবং রাজধানীর সহিত পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য উন্নয়ন-বিভাগের অধীনে কোচবিহার ষ্টেট্‌ ট্রান্সপোর্ট নামক একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি কোচবিহার হইতে কালাকাটা যাতায়াতের জন্য একটি মটর সার্ভিস খোলা হইয়াছে। গত ২রা এপ্রিল তারিখে ষ্টেট্‌ কাউন্সিল প্রাঙ্গণে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সম্মুখে মহারাজা ভূপ বাহাদুর স্বয়ং কোচবিহার কালাকাটা মটর সার্ভিসের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন করেন।

বর্ত্তমান কালের নানাবিধ সঙ্কট, পেট্রোল ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্র সংগ্রহের প্রভূত অসুবিধা সত্ত্বেও ষ্টেট্‌ ট্রান্সপোর্ট চারিখানি মটর বাস এবং চারিখানি মটর লরী সংগ্রহ করিয়াছেন। ইঁহারা ক্রমশঃ অন্যান্য স্থানেও মটর সার্ভিস খুলিবার ব্যবস্থা করিতেছেন; শীঘ্রই দিনহাটা ভেটাগুড়ি এবং দিনহাটা—সাহেবগঞ্জ মটর সার্ভিস খোলা হইবে।

আবকারী—লাইসেন্স সমিতি গঠন।

বে-আইনী ভাবে মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য প্রস্তুত নিরাকরণ এবং মাদকদ্রব্যের ব্যবহার ও ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কোচবিহার দরবারের আবকারী বিভাগ একটি আবকারী লাইসেন্স সমিতি গঠন করিয়াছেন। রাজ্যের ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ এই সমিতির সভাপতি এবং মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট ও আইন সভার বেসরকারী সদস্যগণ ইহার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় যে এই সমিতির নিয়ন্ত্রণের

ফলে কোচবিহার রাজ্যে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে।

স্থানীয় দোকান সমূহ হইতে বস্ত্র উদ্ধার।

গত ৫ই এপ্রিল পুলিশ কোচবিহার সহরের কাপড়ের দোকান সমূহ খুঁজিয়া বহু মার্কাবিহীন কাপড়, সার্ট ও কোটের ছিট এবং অন্যান্য বস্ত্র উদ্ধার করে। এইগুলি রাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং দোকানের মালিকগণের বিরুদ্ধে ভারতরক্ষা আইন অনুসারে মামলা দায়ের করা হইয়াছে।

অবসরপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারিদিগের পেন্সন-বৃদ্ধি।

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ষ্টেটের অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের কষ্ট লাঘবের নিমিত্ত কোচবিহার দরবার সাময়িক ভাবে অনূর্দ্ধ ৮০৲ টাকা পর্য্যন্ত পেন্সন প্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণের পেন্সনের পরিমাণ সাময়িকভাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে ইতি পূর্ব্বেই রাজসরকার নন্ গেজেটেড কর্ম্মচারিদিগের জন্য বর্দ্ধিতহারে বেতন এবং গেজেটেড কর্ম্মচারিদিগের জন্য যুদ্ধভাতা মঞ্জুর করিয়াছেন। রাজ সরকারের এই সদাশয়তার রাজকর্ম্মচারী মাত্রেই কৃতজ্ঞ।

দেশ-বিদেশের কথা।

মহাযুদ্ধের গতি—

প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধে ক্রম-পরাজয় জাপানীদের সঙ্কটকে ক্রমশঃ ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে। ফিলিপাইনে মার্কিণ আধিপত্য স্থাপিত হওয়ায় তথাকার এবং তাহার দক্ষিণস্থ দ্বীপ সমূহের তৈল প্রভৃতি সমরোপকরণ স্বদেশে চালান দেওয়ার পক্ষে জাপানীদের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিতেছে। সুতরাং জাপান যে কেবল ফিলিপাইনের সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা নহে, ডচ ইষ্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি স্থানের সম্পদ আহরণের সুযোগও তাহার পক্ষে বিঘ্ন ঘটিবে। আকাশ-বিমানে জাপান বোমা বর্ষণ করিতেছে সত্য, কিন্তু যুদ্ধ জাহাজের অভাব [illegible]

গিয়াছে; আয়োজিমা হইতে জাপানের ব্যবধান মাত্র ৭৫০ মাইল।

রয়টারের সংবাদে প্রকাশ মার্কিণ সৈন্য রিউকিউ দ্বীপপুঞ্জের ওকিনাওয়া দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। তথা হইতে জাপানের দূরত্ব ৩৫০ মাইল মাত্র। এতদ্ব্যতীত মার্কিণ অতিকায় বিমানবাহিনী প্রায়ই জাপানের সহরগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে।

ব্রহ্মের যুদ্ধেও জাপানকে পুনঃ পুনঃ বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইতে হইতেছে।

ইউরোপীয় রণাঙ্গনের যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহা মিত্রপক্ষের একটানা বিজয়কাহিনী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্ব ও পশ্চিম উভয় রণাঙ্গনেই মিত্রবাহিনীর বিনা বাধায় অগ্রসর হওয়া এবং 'জার্ম্মাণদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের অবসান' প্রভৃতি সমরবিশেষজ্ঞগণের যে সকল অভিমত সংবাদের মারফত পরিবেশিত হইতেছে সেগুলি দৃষ্টে ইহা বুঝিতে বাকী থাকে না যে জার্ম্মাণীর অবস্থা ক্রমেই সঙ্কটাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। বর্ত্তমানে যুদ্ধ যে অবস্থায় চলিতেছে তাহাতে মনে হয় জার্ম্মাণী পূর্ব্ব রণাঙ্গনে যেরূপ প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতেছে, পশ্চিম রণাঙ্গনে তদ্রূপ পারিতেছে না। তাহারই ফলে অতি সামান্য প্রতিরোধেই বৃটিশ ও মার্কিণবাহিনী রাইন নদী অতিক্রম করিতে পারিয়াছে। পশ্চিম রণাঙ্গনে দৃঢ় প্রতিরোধ চালাইবার ক্ষমতা জার্ম্মাণীর আছে বলিয়া মনে হয় না; তাহা হইলেও শেষ পর্য্যন্ত তাহারা মরিয়া হইয়াই লড়িবে।

বাংলা মন্ত্রীসভার পরাজয় ও গভর্ণরের স্বহস্তে শাসন ভার গ্রহণ—

গত ২৮শে মার্চ্চ বাংলা ব্যবস্থা পরিষদে কৃষি বাজেটে ব্যয় বরাদ্দের দাবী সম্পর্কে ৯৭—১০৬ ভোটে বাংলা মন্ত্রীসভার পরাজয় ঘটে। ইহার ফলে ভারত শাসন আইনের ৯৩ ধারা অনুসারে বাংলার গভর্ণর স্বহস্তে প্রদেশের শাসন ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

ভারতে প্রধান খৃষ্টান ধর্ম্মাধ্যক্ষের অবসর গ্রহণ—

কলিকাতার লর্ড বিশপ এবং ভারতের প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ডক্টর ওয়েষ্টকট আগামী অক্টোবর মাসে বিরাশী বৎসর বয়স অতিক্রম করিবেন। তিনি সম্প্রতি তাঁহার উচ্চ পদ হইতে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৬ বৎসর কাল তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ভারতের সামাজিক এবং নৈতিক উন্নতির সর্ব্ববিধ প্রচেষ্টার সহিত তিনি বরাবর যুক্ত রহিয়াছেন। ভারতে সাম্প্রদায়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যুবার ন্যায় পরিশ্রম করিয়াছেন; বর্ত্তমানে তিনি সপ্ত মীমাংসা কমিটির একজন সদস্য। ভারতের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তিনি সতত সহানুভূতিশীল; তাঁহার অবসরগ্রহণে ভারত একজন প্রকৃত হিতৈষী বন্ধুর সেবা হইতে বঞ্চিত হইবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর পরলোক গমন—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ইতিহাসাধ্যাপক ও ভাইস চ্যান্সেলার স্যার এ, এফ রহমান গত ২৪শে মার্চ্চ জলপাইগুড়ি সহরে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রাদেশিক নেতা ছিলেন। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি।

বরোদা রাজ্যের দেওয়ান পদে স্যার বি, এল্, মিত্র—

স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র সম্প্রতি ভারতীয় [illegible] কোর্টের এডভোকেট জেনারেলের পদ হইতে অবসর গ্রহণ

করিয়া বরোদা রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। বাংলার বাহিরে বাঙালীর এই সম্মান লাভে আমরা আনন্দিত। বহু পূর্ব্বে আর একজন খ্যাতনামা বাঙালী বরোদা রাজ্যের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; তিনি হইতেছেন প্রথিতযশাঃ পণ্ডিত ও সাহিত্যিক সিভিলিয়ান রমেশচন্দ্র দত্ত।

যুদ্ধে ভারতের ক্ষতি—

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চ্চিল কমন্স সভায় এক ঘোষণায় বলেন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় হইতে গত ফেব্রুয়ারীর শেষ পর্য্যন্ত ১৬৩৪৮৬ জন ভারতীয় সৈন্য হতাহত, নিখোঁজ এবং বন্দী হইয়াছে। ইহার মধ্যে ১১৪২০ জন নিহত এবং ৫১০৮৮ জন আহত হইয়াছে।

লর্ড ওয়াভেলের নূতন সম্মান লাভ—

লণ্ডনের এক সংবাদে প্রকাশ লর্ড ওয়াভেল লণ্ডনের Poetry Societyর নূতন সভাপতি নির্ব্বাচিত হইবেন। লর্ড ওয়াভেল কেবল যোদ্ধা ও শাসক নহেন; ইহা তাঁহার বহিরঙ্গ পরিচয়; তাঁহার অন্তরে একটি কবি মানুষ লুক্কায়িত রহিয়াছে। তাঁহার নব প্রকাশিত কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থ Other Men's Flowers যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার রসজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

সোভিয়েট-জাপ নিরপেক্ষতা চুক্তি বাতিল—

১৯৪১ সালের ১৩ই এপ্রিল সোভিয়েট রুশিয়া ও জাপানের মধ্যে এক নিরপেক্ষতা চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছিল। গত ৫ই এপ্রিল সোভিয়েট সরকার এই চুক্তি বাতিলের অভিপ্রায় জাপ সরকারকে জ্ঞাপন করিয়াছেন।

জাপানে মন্ত্রিসভার রদবদল—

গত ৫ই এপ্রিল জাপানের কয়সো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছেন। জাপ সম্রাট এডমিরাল সুজুকিকে একটি নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। সুজুকির নেতৃত্বে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

পরলোকে লয়েড জর্জ্জ—

গত ২৬শে মার্চ্চ বিখ্যাত বৃটিশ রাজনীতিক লয়েড জর্জ্জ ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধের সময় লয়েড জর্জ্জ বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন বৃটেনের যুদ্ধ জয়ের মূলে তাঁহার অনেকখানি কৃতিত্ব ছিল। তিনি বিখ্যাত বক্তা ও কূটনীতিক ব্যক্তি ছিলেন।

মার্কিণ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের আকস্মিক মৃত্যু—

গত ১২ই এপ্রিল অপরাহ্ণে মার্কিণ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট ভার্জ্জিনিয়া প্রদেশের ওয়ার্ম-স্প্রিং নামক স্থানে অকস্মাৎ পরলোক গমন করেন। মৃত্যু কালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। "আমার জীবন মাধুর্য্যময়" ইহাই তাঁহার শেষ কথা। পরদিন মধ্যাহ্নে প্রবাহ মস্তিষ্কের অভ্যধিক রক্তসঞ্চার জনিত রোগ তাঁহার মৃত্যুর কারণ। মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রগণ কেহই নিকটে উপস্থিত ছিলেন না। মার্কিণ শাসনতান্ত্রিক নিয়মানুসারে ভাইস্ প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রুম্যান প্রেসিডেন্ট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

"কোচবিহার দর্পণের" মাসিকে রূপান্তর—

বাংলা ১৩৪৫ সালের বৈশাখ মাসে "কোচবিহার দর্পণ" প্রথম প্রকাশিত হয়। গত সাত বৎসর ইহা পাক্ষিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হইয়াছে। রাজসরকারের আদেশে বর্ত্তমান বৎসর হইতে ইহা মাসিকরূপে প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান বৈশাখ সংখ্যাই এই পত্রিকার প্রথম মাসিক সংখ্যা। বাংলার বহু খ্যাতনামা কবি ও সাহিত্যিক এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লিখিতে সম্মত হইয়াছেন। রাজসরকারের পৃষ্ঠপোষকতা এবং পাঠক ও লেখকগণের সহযোগিতায় পত্রিকাখানিকে প্রথম শ্রেণীর মাসিকে পরিণত করিবার সর্ব্ববিধ চেষ্টা হইতেছে। মফঃস্বল হইতে একখানি মাসিক সুষ্ঠুরূপে পরিচালনার পথে বহু বাধা বিঘ্ন রহিয়াছে, কিন্তু কোচবিহার রাজ্য ভারতের উন্নতিশীল দেশীয় রাজ্য সমূহের মধ্যে অন্যতম, এখানকার রাজপরিবার ও রাজসরকার চিরদিনই শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক কার্য্যে অগ্রণী; আমরা আশা করি রাজসরকারের সাহায্যে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পত্রিকাখানিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা কঠিন হইবে না।

কোচবিহার রাজ্য বাংলাদেশেরই অঙ্গীভূত, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার একটি নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাবধারা আছে। এই পত্রিকায় আমরা সেই ভাবধারা এবং কোচবিহারের আশাআকাঙ্ক্ষা ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিব; অপর পক্ষে বাংলা দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাধনার পরিচয়ও আমাদের পত্রিকায় থাকিবে; এক কথায় পত্রিকাখানি যাহাতে বাংলাদেশ ও কোচবিহার রাজ্যের মধ্যে যোগসূত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় আমরা তাহারই চেষ্টা করিব।

সাম্প্রতিক বিভিন্ন শিক্ষা-সম্মেলন—

বাংলা দেশে সম্প্রতি দুইটি শিক্ষা-সম্মেলন হইয়া গেল- একটি কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ শিক্ষা সম্মেলন, অপরটি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলন। শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন খ্যাতনামা অধ্যাপক ও সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর, এবং অধ্যাপক সম্মেলনের নির্ব্বাচিত সভাপতি ছিলেন দৌলতপুর কলেজের অধ্যক্ষ বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্য্য।

অধ্যাপক কবীর তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য; প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজে তাহার যথাযোগ্য স্থানের উপযুক্ত করিয়া তোলা এবং সমাজকে সমগ্রভাবে প্রগতিপন্থী করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই মানদণ্ড দ্বারা বিচার করিলে বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ব্যর্থতার প্রমাণই দিকে দিকে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দোষ এই যে ইহার সহিত আমাদের অতীত সংস্কৃতি বা ভাবধারার কোন যোগাযোগ নাই, দেশে একদল কেরাণী ও নিম্ন কর্ম্মচারী সৃষ্টি করিবার জন্যই এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এই শিক্ষাব্যবস্থা ছাত্রকে অনুসন্ধিৎসু বা তত্ত্বজিজ্ঞাসু করিয়া তোলে নাই; পরন্তু তাহার ঔৎসুক্য একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, এই শিক্ষাব্যবস্থা সমাজকে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত এই দুই দলে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে; ইহার ফলে শিক্ষিতগণ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছে এবং অশিক্ষিতগণ অচল, আত্মচেতনাহীন হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং আমাদের এমন শিক্ষার প্রয়োজন যাহা আমাদের মনকে অনিসন্ধিৎসু ও হস্তকে সুদক্ষ করিয়া তুলিবে: ইহার ফলে ব্যক্তিগত জীবন সাফল্যলাভ করিবে এবং সমাজ জীবন পুনরুজ্জীবিত হইবে।

অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতী; বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির দোষত্রুটি, শিক্ষক ও ছাত্রজীবনের বিভিন্ন সমস্যার সহিত দীর্ঘ দিন ধরিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয়। তিনি তাঁহার অভিভাষণে দুঃখের সহিত বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান শিক্ষা বড় বেশী পুঁথিগত ও বাস্তব জীবনের সহিত সম্পর্ক হীন; ইহা ছাত্রগণকে জীবিকার্জ্জনের পথ দেখাইয়া দেয় না; ফলে শিক্ষার প্রতি ছাত্রগণের কোনরূপ আকর্ষণ থাকে না; তাহারা বিদ্যালয়গৃহে শূন্যদৃষ্টি ও শূন্যমন লইয়া শিক্ষকের বক্তৃতা শোনে; ইহাতে শিক্ষকেরও উৎসাহ নিভিয়া যায়। পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার একটা সাংস্কৃতিক মূল্য আছে বটে, কিন্তু ব্যবহারিক শিক্ষারও প্রচলন দরকার। যুদ্ধোত্তর শিক্ষাব্যবস্থায় এই দুয়ের সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে, এই আশাই অধ্যক্ষ ভট্টাচার্য্য পোষণ করিতেছেন।

আমরাও আশা করি যুদ্ধোত্তর ভারতে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইবে যাহাতে পুঁথিগত ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয় সাধিত হইবে, প্রত্যেক ছাত্রের ব্যক্তিগত শক্তির বিকাশ হইয়া সে সমাজে যথাযোগ্য স্থান লাভ করিতে পারিবে এবং ভারতীয় সমাজ ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে। সার্জ্জেণ্ট পরিকল্পনা ও বনিয়াদী শিক্ষার ভিত্তিতে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরীক্ষা এখন হইতেই আরম্ভ করা যাইতে পারে।

যুদ্ধোত্তর ভারতে শিল্পবিস্তার ও শিল্প-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার—

ভারত বর্ত্তমানে কৃষিপ্রধান দেশ; কৃষিও প্রাচীন মামুলী পন্থায় অনুসৃত হইতেছে; কৃষকেরা অজ্ঞ, নিরক্ষর; বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য্যের উন্নতির কথা তাহারা কিছুই জানে না। সামান্য কয়েকটি বড় বড় শিল্প ছাড়া ভারতে বৃহৎ-শিল্পের বিস্তারও বিশেষ কিছু হয় নাই। বর্ত্তমান যুদ্ধের তাগিদে কিছু কিছু শিল্পের উন্নতি হইতেছে; জীবনযুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে ভারতের দিকে দিকে শিল্প বিস্তার আবশ্যক। মেঘনাদ সাহা প্রমুখ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরিয়া আসিয়াছেন; বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতায় তাঁহারা তাঁহাদের অভিজ্ঞতার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে তাঁহারা বিজ্ঞান ও শিল্পের যে বিস্ময়কর উন্নতি দেখিয়া আসিয়াছেন সরকার ও দেশবাসীর চেষ্টায় ভারতের সেইরূপ উন্নতি হয় ইহাই তাঁহারা কামনা করিয়াছেন।

ভারতের অগ্রগতির জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষির প্রতিষ্ঠা এবং নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন। ভারতে কাঁচা মালের অভাব নাই, ইহার কৃষি, বনজ ও খনিজ সম্পদ পূর্ণভাবে কাজে লাগাইতে পারিলে এক পুরুষের মধ্যেই ভারত শিল্পপ্রধান দেশ হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এইজন্য চাই একদল বৈজ্ঞানিক ও শিল্পকুশল কর্ম্মীর সৃষ্টি। আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে ভারত সরকার এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ও দেশীয় রাজ্য বহু বিজ্ঞানছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য বিদেশে পাঠাইতে [illegible] হইতেছেন এবং এইজন্য [illegible]

ব্যবস্থা করিতেছেন। ভারতবর্ষে একটি উচ্চ শ্রেণীর শিল্পবিদ্যালয় (Technological Institute) স্থাপনের জন্যও ভারতসরকার আগ্রাহান্বিত; এই জন্য নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে; আশাকরা যায় শীঘ্রই আমেরিকার Massachusetts Institute of Technology'র ন্যায় একটি উচ্চশ্রেণীর শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারতে স্থাপিত হইবে।

প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পরলোক গমন—

মার্কিণ রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের অকস্মাৎ পরলোকগমনে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে একজন শক্তিমান পুরুষের তিরোধান ঘটিল। তিনি যে কেবল মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রেরই প্রেসিডেন্ট ছিলেন তাহা নহে, বর্ত্তমান যুদ্ধ পরিচালনায় তিনি সম্মিলিত জাতিসমূহের অন্যতম কর্ণধার স্বরূপ ছিলেন, বর্ত্তমান যুদ্ধের ইতিহাস যখন লিখিত হইবে তখন চার্চ্চিল, ষ্টালিন ও রুজভেল্ট এই তিন জনের অবদান শ্রদ্ধার সহিত বর্ণিত হইবে।

রুজভেল্ট গত ৮ই নভেম্বর সকল রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া চতুর্থ বারের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত হন; ইহা এক অভূতপূর্ব্ব সম্মান; ইহা কোন দলগত সম্মান নহে; ইহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্মান। তাঁহার ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি সমগ্র বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যুদ্ধের ফলে তিনি যে চতুর্ব্বিধ স্বাধীনতার কথা বলিয়াছিলেন তাঁহার সেই আবেগময়ী বাণী আজও আমাদের কর্ণে ধ্বনিত হইতেছে। মৃত্যুর পূর্ব্বে রুজভেল্ট এক বক্তৃতা রচনা করিয়াছিলেন; সে বক্তৃতা প্রদান করিবার সুযোগ আর তাঁহার ঘটে নাই; কিন্তু ইহাতেও তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:—

"কেবলমাত্র আমাদের শত্রুদের উপর জয়লাভই যথেষ্ট নহে। ভয়, সন্দেহ, অজ্ঞতা ও লোভের ফলেই বর্ত্তমান ভয়াবহ যুদ্ধ সম্ভব হইয়াছে; আমাদিগকে যথাসাধ্য এইগুলি জয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আজ আমরা এই বড় সত্যের সম্মুখীন হইয়াছি যে, যদি মানব সভ্যতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হয় তাহা হইলে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মানবসমূহ কিভাবে পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া শান্তিতে বাস করিতে পারে আমাদিগকে সেই শক্তির অনুশীলন করিতে হইবে; পরস্পর হানাহানি করিয়া এই সমস্যার সমাধান হইবে না।"

খেলাধূলা।

ভারতীয় ক্রিকেটদলের সিংহল ভ্রমণ—

ভারতীয় ক্রিকেট দলের ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং, সকল বিষয়ে কৃতিত্বসম্পন্ন তরুণ খেলোয়াড়গণ মিলিয়া একটি শক্তিমান দল গঠন করিয়া সিংহল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সিংহলে তাঁহারা ৫টি খেলায় যোগদান করিয়াছেন। তাঁহারা কোন খেলায় পরাজিত না হইলেও বিভিন্ন খেলায় যেরূপ উচ্চাঙ্গের নৈপুণ্য প্রদর্শন করিবেন বলিয়া সকলে আশা করিয়াছিল তদনুরূপ পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। পাঁচটি খেলার মধ্যে মাত্র দুইটি খেলায় বিজয়ী এবং তিনটি খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় ভারতীয় ক্রীড়ামোদিগণকে যে হতাশ করিয়া ফেলিয়াছেন একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। বাস্তবিকই সিংহলের ক্রিকেট খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড অত্যন্ত উচ্চস্তরের নহে তথাপি এতাদৃশ একটি শক্তিমান খেলোয়াড়ের দল সে দেশে গিয়া প্রকৃত গৌরব অর্জ্জন করিতে পারিলেন না ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়।

কলিকাতা হকিলীগ প্রতিযোগিতা।

কলিকাতা হকিলীগের সকল খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে। হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ লইয়া মহমেডান, মোহনবাগান ও পোর্ট কমিশনার্স এই তিনটি দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়াছিল, ফলে মোট ২৭ পয়েন্ট পাইয়া মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ান শিপ লাভ করিয়াছে। হকি লীগ প্রতিযোগিতায় এইবার ইহাদের প্রথম চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ ঘটিল। দুঃখ হইতেছে মোহনবাগান দলের জন্য। মাত্র এক পয়েন্ট পশ্চাতে পড়িয়া মোহনবাগান রাণার্স আপ হইল।

স্থানীয় খেলাধূলা—

এ বৎসর কোচবিহার মহারাজার দল রংপুরে ক্রিকেট খেলিতে যান। রংপুর দলের সহিত তাঁহাদের খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়। উভয় দল মাত্র ৮৬ করিয়া রাণ করেন। ক্যাপ্টেন এস, রায় ছাড়া কোচবিহারের কাহারও খেলা তেমন সুবিধার হয় নাই।

কোচবিহারের এবৎসরের হকি খেলা ৪ঠা এপ্রিল শেষ হয়। ঐদিন রংপুর একাদশের সহিত বাজদাড়ীর প্রাঙ্গণে কোচবিহার একাদশের একটি ম্যাচ খেলা হয়। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই বিশেষ খেলায় কোচবিহার দল আশানুরূপ খেলিতে পারেন নাই। ইহার ফলে ৫—১ গোলে কোচবিহার দলকে রংপুরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে।

NOTICE.

Applications are invited for the following posts. Applications, stating age, residence academical qualifications and past experience, if any, with copies of testimonials will be received by the undersigned upto 15th May, 1945.

1. A trained graduate for the post of a Sub-Inspector of Schools, Cooch Behar in the grade of Rs. 70-5/2-125. Probationary period one year.

2. Probationary clerk for the Public Works Department on Rs. 30 P. M. with the usual dearness allowance. Preference will be given to one having office experience and knowledge of typewriting.

Serial No. 2.—None need apply who is not a registered candidate.

Canvassing of any nature will disqualify a candidate.

B. RAHAMAN,
Chairman,
Public Service Commission, Cooch Behar.

বিজ্ঞাপন।

প্রাথমিক কেন্দ্রীয় বৃত্তি পরীক্ষার পুনঃ প্রবর্ত্তন :—

বিগত ইং ১৯৪০ সন হইতে কুচবিহার রাজ্যস্থ কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার পরিবর্ত্তে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগের বার্ষিক পরীক্ষার ফলানুসারে বৃত্তি নির্দ্ধারণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসর হইতে মহামান্য রাজসরকার কর্ত্তৃক পূর্ব্বের ন্যায় কেন্দ্রীয় বৃত্তি পরীক্ষা গ্রহণের নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

স্কুল ইন্‌স্পেক্টার অফিস কুচবিহার,
৯লা মে ১৯৪৫।

শ্রীহেমচন্দ্র দাশ গুপ্ত,
কুচবিহার রাজ্যস্থ
স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টার।

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	উদ্বোধন (কবিতা)	ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ-ডি, ডি-লিট, সি-আই-ই	৪২
২।	বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি	৪৭
৩।	এক দেহে একাধিক মানুষ (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন এম-এ	৫৯
৪।	পাঠা ও কমলাকান্ত (কবিতা)	শ্রীজগদীশ গুপ্ত	৫৬
৫।	তারাশঙ্করের মন্বন্তর (আলোচনা)	ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল পি-এইচ-ডি	৫৮
৬।	কুচবিহারী কাণ্ড (গল্প)	শ্রীঅমলেন্দু মুখোপাধ্যায়	৬১
৭।	শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক (আলোচনা)	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন	৬৮
৮।	গরিলারে গেরিলারা করিছে নকল (কবিতা)	শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত	৭৬

নিবেদন :—

স্বাস্থ্যই সুখের মূল, শরীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হওয়ায় তবেই রোগ দেখা দিয়া থাকে, সেজন্য বুদ্ধিমান লোকে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন, নতুবা সামান্য ব্যাধি পরে কষ্টদায়ক—এমন কি প্রাণঘাতীও হইতে পারে।

যাহাতে দেশের সর্বসাধারণে সহজেই রোগমুক্ত হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সিটী মেডিক্যাল ষ্টোর, কলিকাতা সর্ব প্রকার দেশী বিদেশী ঔষধ, রোগীর পথ্য, শিশুর খাদ্য ও পেটেন্ট ঔষধ বাজার চলতি দরে আমদানী ও সরবরাহ করিতেছেন।

সিটী মেডিক্যাল ষ্টোরে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত থাকিয়া সমাগত রোগীগণের পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যাহাতে দেশবাসী অনায়াসে নিষ্ঠাযুক্ত মূল্যে ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসার সুবিধা পান ইহাও সিটী মেডিক্যাল ষ্টোর কর্তৃপক্ষের অন্যতম উদ্দেশ্য।

জন সাধারণ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদের শ্রম সার্থক করুন ইহাই আমার নিবেদন।

ডাঃ এ, লতিফ

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
৯।	নরনারায়ণ সেনানিবাস	(কবিতা) শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ	৭৫
১০।	ধূলি-কণা	(প্রবন্ধ) অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্-সি	৭৭
১১।	রাজপরিবারের সংবাদ		৭৯
১২।	স্থানীয় সংবাদ		৮০
১৩।	দেশবিদেশের কথা		৮৩
১৪।	সাময়িক প্রসঙ্গ	...	৮৫
১৫।	খেলা-ধূলা		৮৮

বিজ্ঞাপন।

"কোচবিহার রাজ্যস্থিত মাথাভাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ, দিনহাটা ও সদর সবডিভিজন ভুক্ত ব্রহ্মোত্তরের জোত আদি সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে, আবেদন করুন। ১১৫ নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।"

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
নায়েব, বড়কুঠি,
কুচবিহার।

বাসা বিক্রয়।

দি কমলা ব্যাঙ্ক লিমিটেডের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত অবনীমোহন মজুমদারের নিকট অনুসন্ধান করুন।

কোচবিহার বিখ্যাত শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহার
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটী শাস্ত্রীয় মহৌষধ।

রেজেষ্টরী করা

ধন্বন্তরী পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অমোঘ মহৌষধ মূল্য প্রতি বোতল ২৷৹ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

গরুড় মার্কা

শ্বাসশান্তি রস

হাঁপানী ও শ্বাস কাসের সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷৹ দেড় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

গোবিন্দসুধা— আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত পরম রসায়ন। সেবনে বলপুষ্টি বর্দ্ধিত এবং বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷৹ দেড় টাকা। ডাকে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

পিত্তশূল সুধা— ইহা পিত্তশূল, অম্লশূল ও অজীর্ণ রোগের মহামহৌষধি সেবনে বুকজ্বালা, চোঁয়া ঢেকুর উঠা অজীর্ণ, পেট ফাঁপা পিত্ত ঘটিত পেট ব্যাথা, অগ্নিমান্দ্য, আহারের পর বমি প্রভৃতি এবং অম্লশূল ও অম্ল পিত্তশূল আরোগ্য হয় মূল্য ২৷৹ টাকা। ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র।

কলেরা কিওর— কলেরা, উদারময়, পেট ফাঁপা অগ্নিমান্দ্য ও সূতিক' প্রভৃতি রোগে সদ্য ফল প্রদ অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

নেত্র সুধা— চক্ষু রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ব্যবহারে চক্ষুউঠা, চক্ষু দিয়া জল পড়া, বেদনা, ছানি দোষ, ঝাপসা দেখা প্রভৃতি চক্ষু রোগ সত্বর আরোগ্য হইয়া দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে। মূল্য ১৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহা,

কাঁইয়াপট্টি, কোচবিহার।

কে, এম, সরকারের

'ক্ষতবিনাশন'

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতের অব্যর্থ মহৌষধ।

শয্যাক্ষত, ব্রণের ঘা, অগ্ন ক্ষত, স্তনের ঘা, নাসা ক্ষত, মাথার ঘা, পোড়ার ঘা, আঙ্গুলহারা, কাটা ঘা, নালী পচা ঘা, ফোড়ার ঘা, পৃষ্ঠাঘাত, বিষাউজ (বিচ্‌কু) ঘা, পাচড়া, পাপড় ঘা, বাঘীর ঘা, দূষিত ঘা ইত্যাদি যত দিনের যে কোন প্রকার ঘা হউক না কেন: বিনা যন্ত্রণায় অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হইবে। এই ঔষধ নির্দ্দোষ উপাদানে প্রস্তুত।

এজেন্ট—মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স, কোচবিহার।

প্রোঃ—কে, এম সরকার এণ্ড সন্স, হেড্ অফিস :—মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার।

স্থাপিত ১৮৭৩ ইং

অফিস এবং কারখানা ৩৫/১, হ্যারিসন রোড

শো-রুম ৭৮, হ্যারিসন রোড কলিকাতা

রায় এণ্ড কোং

কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম লিথিবার কালি প্রস্তুতকারক

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

আমাদের কারখানায় সুলতে সকল প্রকার লিখিবার কালি, রবার ষ্ট্যাম্প, পিতলের সিলমোহর, সাপরাস, ডাই, রুপারপ্লেট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী।

১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক সডাক তিন টাকা; মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

৩। কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৪। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ,

পোষ্ট অফিস কোচবিহার।

কোচ্‌বিহারাধিপতি
ক্যাপ্টেন স্যার জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর, কে-সি-আই-ই

কোচবিহার দর্পণ।

সীমার মাঝে, অসীম, তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
—রবীন্দ্রনাথ।

CUTTA

অষ্টম বর্ষ, { জ্যৈষ্ঠ ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ } ২য় সংখ্যা

উদ্বোধন।

ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম্-এ; পি-এইচ্-ডি; ডি-লিট্; সি-আই-ই।

যদি ভুলে যাও, তবে ভুলে যাও পুঞ্জিত ব্যথাভার
মোচড়ি তোমার কঠিন আঘাতে ছিঁড়ে দাও এই তার।
গ্রন্থি-বাঁধনে মথনে মথনে যাহা কিছু জমে উঠে
নিষ্ফল তার সঞ্চয়-ভার সহজে যায় সে টুটে।
তবুও চিত্ত নিঃস্ব-বিত্ত তারই পানে ছুটে যায়
কিছু নাই, তবু কুড়ায়ে কুড়ায়ে পুঞ্জ বানাতে চায়।

হোক্ সে দুঃখ, হোক্ সে বেদনা, হোক্ সে হাসির ধারা
আপন রসেতে আপনি সে ফোটে, আপনাতে হয় হারা।
ফাগুন দিনের মন্ত্রণা জাগে পল্লব দল মাঝে
তারই আনন্দ গন্ধ জাগায় পুষ্পের নব সাজে।
ফুল ফোটে আর ফুল ঝরে যায়, কে রাখে তাহার ঠিকানা
পাতা ঝরে, নব পল্লব ওঠে, কে জানে তাহার সীমানা।
তারই অন্তরে মোহন মন্ত্র নাচিছে তরুর পুরে
অজানা রাগিণী ঝঙ্কৃত হয় অন্তবিহীন সুরে।
তারই উল্লাসে কল্লোলি ওঠে যে তরুর নব ফল
বৃক্ষের রস সঞ্চরি ফেরে উল্লাসে টলমল।
দিন আসে, দিন চলে যায় দূরে, গান নাহি যায় শোনা,
প্রাণের ধর্ম্ম চঞ্চরি উঠে ফলে করে আনাগোনা।
এমনি প্রাণের শক্তি আপনা আপনি সৃষ্টি করে,
আমি অভাগ্য সঞ্চয় করি আপন ক্ষুধার তরে।

বুদ্ধিরে মম নিদ্রিত কর বুলায়ে তোমার মায়া,
প্রাণেরে আমার জাগ্রত কর অঞ্চলে টানি ছায়া।
তিল তিল করি গুঞ্জন করা পুঞ্জিত মধু মিছে,
কালের হস্ত দক্ষিণে বামে ঘুরিছে তাহার পিছে।
যে বাণী তোমার প্রাণের ধর্ম্মে আপনি বাঁচিতে পারে,
তারে ছেড়ে দাও বিশ্বের মাঝে সৃষ্টির নব পাড়ে।
শক্তি যেথায় নিজ রচনায় রচিবে নতুন সৃষ্টি,
সেথায় জননী আমারে ফিরাও, খুলে দাও নব দৃষ্টি।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব।

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম্-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ-ডি।

জীবনের লক্ষণই আত্ম-চেতনা। স্তব্ধ অচল পাষাণ-পর্ব্বত—সেও আছে, কূলপ্লাবিনী নৃত্যচঞ্চলা নদী—সেও আছে, অনন্ত রসবৈচিত্র্যে শত ঘাতপ্রতিঘাতে জীবনের খরস্রোতে ভাসমান আমরাও আছি। কিন্তু চারিপাশের এই সকল থাকার ভিতরে আমরা যে এমন বিশেষ করিয়া আছি তাহার কারণ আমাদের অবিরাম গতি এবং সেই গতি-প্রবাহে জাগিয়া-ওঠা আত্ম-চেতনা। এই আত্ম-চেতনা জাগিয়া ওঠে নিরন্তর দ্বন্দ্বে—প্রবাহের ঘূর্ণিতে, অন্তরের সহিত বাহিরের নিরন্তর ঘাত-প্রতিঘাতে। যেখানে সেই ঘাত-প্রতিঘাতের তীব্র স্পন্দন নাই—সেখানে আত্ম-চেতনা নাই; যেখানে চেতনা নাই সেইখানেই বুঝিতে হইবে মানুষের প্রাণ-শক্তিও স্তিমিত হইয়া আসিতেছে।

একটা জাতীয় জীবন বা সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই একই কথা খাটে। যে জাতি আপনার অতি ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতরেই নিজেকে সঙ্কুচিত করিয়া বৃহৎ জগতের আলোড়ন বিলোড়নময় অখণ্ড জীবন-স্রোত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, সঙ্কীর্ণ লোকাচার ও অন্ধ-সংস্কারের রন্ধ্রহীন প্রাচীরের দ্বারা বাহিরের উন্মুক্ত নির্মল আলো-হাওয়া বন্ধ করিয়া দেয়, সে একদিন তাহার স্পন্দনহীন আত্ম-বিস্মৃতির ভিতরে আবিষ্কার করিয়া বসিবে তাহার শোচনীয় মৃত্যু।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাঙালী জাতির জীবন-ধারাটা চলিয়াছিল অনেকখানি এই ঘাতপ্রতিঘাতহীন স্পন্দনহীন আত্ম-বিস্মৃতির পথে, আর জাতীয় জীবনের সহিত জাতীয় সাহিত্যও চলিয়াছিল একটা তরঙ্গহীন নির্জীব স্রোতে। যে প্রেম-গীতিকার ঢেউ তুলিয়া দিয়াছিলেন বৈষ্ণব কবিগণ তাহাই শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়িয়া বাঙলা-সাহিত্যকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল একটানা বৈচিত্র্যহীন প্রেমবর্ণনার স্রোতে; তাহার জের চলিতেছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্য্যন্ত কবিওয়ালা-দের সঙ্গীতে। সেই রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদের পর অনুবাদ, সেই মঙ্গলকাব্যের চিরাচরিত দেবদেবীগণের অসংখ্য অহৈতুক উৎপাত।

ঝিমাইয়া-পড়া এই বাঙালী জীবন ও তাহার সাহিত্যের নব জাগরণের জন্য প্রয়োজন ছিল বাহিরের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের, আদানপ্রদানের; প্রাচীর-বেষ্টিত এই জীবনের আবদ্ধতা ও বদ্ধ হাওয়ার ভিতরে প্রয়োজন ছিল বাহিরের আলো-বাতাসের। এই সংঘাত প্রথম আসিয়াছিল বঙ্গে মুসলমানবিজয়ের পরে; কিন্তু সেটাও স্থাবরের সহিত স্থাবরের সংঘাতের ন্যায় কোন দিকেই তেমন কোন পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। বাঙালীর জীবনে, চিন্তায়, সাহিত্যে সত্যকার সংঘাত আসিয়াছিল ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে—সেই সংঘাতেই একটু একটু করিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল আমাদের জাতীয়-চেতনা; বঙ্কিমচন্দ্রের লোকোত্তর পুরুষীয় সত্তার ভিতর দিয়া সেই আত্মচেতনাই রূপগ্রহণ করিয়াছিল একটি বিশিষ্ট জাতীয়তাবোধের।

ইংরেজকে আমরা পাইয়াছিলাম শুধু মানুষ হিসাবে নয়, সমগ্র ইউরোপের চিত্ত-প্রতীক রূপে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "য়ুরোপের চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে; ভূমিতলের নিশ্চেষ্ট অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্চার করে দেয়, সেই চেষ্টা বিচিত্ররূপে অঙ্কুরিত বিকশিত হতে থাকে।" এখানে বাঙালীর বৈশিষ্ট্য এই, বাহির হইতে যে আঘাত আসিল তাহাতে সে একান্ত বিমূঢ় হইয়া নিজেকে একেবারে হারাইয়া ফেলিল না—ইউরোপের বিপুল কর্মোন্মাদনাময় জীবনাদর্শকে সে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল একটা নবজীবনের প্রেরণা হিসাবে,—একটা আত্মোপলব্ধির মন্ত্র হিসাবে। তাই পাশ্চাত্যের সহিত মিলনসংঘাত বাঙালীর জীবনে এবং সাহিত্যে অবিমিশ্র অমঙ্গলেরই সূচনা করে নাই,—তাহার মঙ্গলময় পরিণতিও শ্রদ্ধার্হ। ইউরোপের এই বিজাতীয় ভাববন্যাকে স্বীকরণের ভিতর দিয়াই বাঙালী সেদিন তাহার প্রাণপ্রাচুর্য্যের পরিচয় দিয়াছিল।

বাঙলা সাহিত্যে এই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ফল-পুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া প্রথম প্রকাশ পাইল পদ্যে মধুসূদনের ভিতর দিয়া এবং গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভিতর দিয়া। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের বহুপূর্ব হইতেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আমাদের সাহিত্যের ভিতরে নানাপ্রকারে কাজ করিতেছিল;—কিন্তু মধু-বঙ্কিমের পূর্বে ইহা কোথাও দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই;—মধু-বঙ্কিমের ভিতরেই ইহা লাভ করিয়াছিল একটি বিশিষ্ট রূপ।

বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র দীপ্তোজ্জ্বল রাজমুকুট মাথায় পরিয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন একহাতে তাঁহার সৃজনি-শক্তি—অন্য হাতে কঠোর শাসন-দণ্ড। তাঁহার ভাস্বর প্রতিভার ভিতরে এমন একটা সংস্কারবিহীন স্বাধীনতাবোধ, এমন একটা শান্ত ধীর দৃঢ় অনমনীয় ব্যক্তিত্বের জয়-গৌরব, এমন একটা সুশাসন ও সুনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ছিল যে, যুগযুগান্তরের স্তূপীকৃত লোকাচার, অন্ধ বিশ্বাস এবং সঙ্কীর্ণতার কলুষ আপনা হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল; এ যেন প্রভাতের নির্মল মুক্ত আলোক-সম্পাতে বিশ্ব-প্রকৃতির স্মিতহাস্যে নব জাগরণ। বঙ্কিম যেদিন তাঁহার প্রতিভার বাহন বঙ্গদর্শন লইয়া বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন সেদিন হইতেই প্রকৃত-পক্ষে বাঙলা সাহিত্যের অসীম আশাআকাঙ্ক্ষামণ্ডিত একটি নূতন যুগের সূচনা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"বঙ্গ-দর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত 'সমাগতো রাজবদ্বরত্তধ্বনির্', এবং মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গসাহিত্যের পূর্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী-নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস কত প্রবন্ধ কত সমালোচনা কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত-কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

বাঙলা-সাহিত্যে তখনও যিনি একরূপ একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তিনি গুপ্তকবি ঈশ্বরচন্দ্র। আদর্শে তিনি পাশ্চাত্ত্যের প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধান্বিত থাকিলেও রচনাশৈলীতে তিনি ছিলেন প্রাচীনপন্থী; পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন নবীন লেখকগণ তাঁহার উৎসাহ এবং পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি নিজে যমক-অনুপ্রাস-শ্লেষের মোহ কাটাইতে পারেন নাই। বাঙলা গদ্যরীতিতে তখন চলিতেছিল দ্বন্দ্ব; এই সকল দ্বন্দ্বকে মিটাইয়া দিয়া বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যকে একটি বিশিষ্টরূপ দান করিবার জন্য আবির্ভূত হন বঙ্কিম।

অনন্যসাধারণ প্রতিভার,—যে প্রতিভা আপনার শক্তি ও ঐশ্বর্যের ভিতরে সকল দ্বন্দ্বকে সংহরণ করিয়া সকলের সমবায়ে আবার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিল নূতন প্রকাশভঙ্গি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই নব প্রকাশভঙ্গির মর্যাদা এইখানে যে ইহার ভিতরে ছিল একটা স্বাতন্ত্র্যের আত্ম-গরিমা।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব বাঙ্গালী জীবনে ও সাহিত্যে এই যে আত্ম-শক্তির উদ্বোধন করিল ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। সেই যে আমরা একদিন আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলাম তাহাই আনিয়া দিয়াছে আমাদিগকে নব নব আত্ম-প্রত্যয়—তাই আজ আমরা আত্ম-শক্তি দ্বারাই আমাদের জীবন ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার সাধনায় ব্যাপৃত। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব আজিকার দিনে তাই আমাদের নিকটে এত উজ্জ্বলরূপে স্মরণীয়।

এক দেহে একাধিক মানুষ

বা

বহুব্যক্তিত্ব।

অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন এম-এ।

ভয় পাইবেন না। মনে করুন আপনার পরিবারভুক্ত কেহ যদি একদিন প্রত্যূষে ঘুম ভাঙ্গিলে আপনাকে বা বাড়ীর আর কাহাকেও চিনিতে না পারে, আপনার বাড়ী ঘর এবং পরিচিত বন্ধুবান্ধব সকলই তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়া যায়, এমন কি যদি সে নিজের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া নবজাত শিশুর মত নিতান্ত অজ্ঞান ও অসহায়বৎ ব্যবহার করিতে থাকে, তাহা হইলে আপনি যার-পর-নাই বিস্মিত হইবেন না কি? এই প্রবন্ধে এই ধরণের কয়েকটী কাহিনী বিবৃত করা হইবে। ইহার প্রত্যেকটী বাস্তব সত্য, অথচ ভৌতিক কাহিনীর মতই চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর।

মেরি রীনল্ডস্।

মেরি রীনল্ডসের পিতা আমেরিকার পেন্‌সিলভেনিয়া অঞ্চলে বসবাস করিতেছিলেন। শিশুকাল হইতেই মেরি খুব মেধাবী ও প্রখরস্মৃতিশক্তিসম্পন্না ছিল। আঠার বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে স্কুলে ও গৃহে নানাবিষয়ে জ্ঞানার্জ্জন করিবার সুযোগ লাভ করে। সে নিতান্ত শান্ত নিরীহ ও ঈষৎ বিষণ্ণ প্রকৃতির মেয়ে ছিল। গৃহের বাহিরে খেলাধূলা ও ছুটাছুটীর কাছে সময়ক্ষেপণ করা অপেক্ষা ঘরে বসিয়া

লেখাপড়া বা শিল্পকাজ অভ্যাস করাই সে বেশী পছন্দ করিত। আঠার বৎসর বয়সের সময় একবার মৃগী (Hysteria) রোগের আক্রমণে তাহার দর্শন ও শ্রবণশক্তি লোপ পায়। এই অবস্থায় প্রায় তিন মাস থাকিবার পর সে তাহার নষ্ট স্বাস্থ্য ও দর্শন এবং শ্রবণশক্তি ধীরে ধীরে ফিরিয়া পায়। এই সময়ে একদিন সে প্রায় বিশ ঘণ্টা ধরিয়া গভীরভাবে নিদ্রা যায়। নিদ্রাভঙ্গের পর দেখা গেল যে তাহার মানসপট হইতে এই দীর্ঘ অষ্টাদশ বৎসরের সমস্ত স্মৃতি নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। সে তাহার পিতামাতা ভাইভগ্নী বন্ধুবান্ধব বাড়ীঘর কিছুই চিনিতে পারিতেছে না। সমস্ত জগতটা তাহার নিকট একান্ত অপরিচিত ও নূতন বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। অষ্টাদশ বৎসরের পুরাতন দেহের মধ্যে সদ্যপ্রসূত শিশুর মনের ন্যায় একান্ত নূতন একটী মন লইয়া সে যেন জগতের সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয় ও সম্বন্ধ স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইল। আবার নূতন করিয়া তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু এবার তাহার শিক্ষা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। এই নূতন মানুষটীর স্বভাব চরিত্রেও বিলক্ষণ পার্থক্য দেখা যায়। কোথায় সেই বিষণ্ণস্বভাবা শান্তপ্রকৃতি সঙ্গবিরাগী পুরাতন মেরি রীনল্ডস্, আর কোথায় এই চঞ্চলপ্রকৃতি সদাপ্রফুল্ল আমোদপ্রিয় সঙ্গ-বিলাসী নবীনা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মেরির হাতের লেখার সহিতও এই নবীনার হস্তলিপির কিছুমাত্র মিল দেখা যায় নাই।

এই রূপে প্রায় ছয় সপ্তাহ কাটিবার পর একদিন সে পুনরায় দীর্ঘকালব্যাপী গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়। এই নিদ্রা হইতে যে জাগিল সে আমাদের সেই পুরাতন মেরি রীনল্ডস্, যে এই দেড়মাস যাবৎ ইংলণ্ড হইতে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে কোনও অজ্ঞাত রহস্যময় জগতে উধাও হইয়া গিয়াছিল। আর যে নূতন মানুষটী তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার পরিত্যক্ত দেহযন্ত্রটী অধিকার করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল তাহার কোনও চিহ্ন আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। জাগিয়া উঠিয়া মেরির মনে হইল যেন সে কেবল কালই ঘুমাইতে গিয়াছিল এবং ঘুমাইতে যাইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত কাজের সংকল্প করিয়া রাখিয়াছিল এখন তাহাই সম্পন্ন করিতে উদ্যোগী হইল। তবে এই স্বল্পকাল মধ্যে তাহাদের বাড়ীতে এত পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া হইল, আর তাহার আত্মীয়স্বজনেরাই বা তাহাকে দেখিয়া এরূপ বিস্ময়বোধ করিতেছে কেন, এই সব চিন্তা করিয়া সে নিজেই কেমন অবাক হইয়া গেল।

কিন্তু মেরি রীনল্ডসের এই পুরাতন ব্যক্তিত্ব পুনরায় আবির্ভূত হইবার পর বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার কয়েক সপ্তাহ পরেই আবার একদিন অস্বাভাবিক গভীর নিদ্রার ফলে প্রথম মেরির অন্তর্ধান হইয়া তাহার স্থলে দ্বিতীয় মেরি আবির্ভূত হইল। আবির্ভূত হইয়া ইহারও মনে হইল যেন সে কেবল কালই ঘুমাইতে গিয়াছিল এবং সেই ঘুম হইতে এই জাগিল। তাহার প্রথম আবির্ভাব এবং দ্বিতীয় আবির্ভাব লইয়া যেন একটী অখণ্ড ধারাবাহিক জীবন এবং এর মধ্যে কোনও স্থান বা কালের ব্যবধান ঘটে নাই। প্রথম মেরি সম্বন্ধে এর মনে কোনও প্রকার ধারণাই ছিল না।

এইরূপে ক্রমাগত ১৫।১৬ বৎসর ধরিয়া মেরি রীনল্ডসের দেহযন্ত্র অবলম্বনে একাধিক্রমে দুইটী ব্যক্তিত্ব উপর্য্যুপরি আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। অথচ এদের মধ্যে একে অন্যের অস্তিত্ব বা প্রকৃতি সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ কিছুমাত্র জানিত না। যেন সমান্তরাল দুইটী নদীস্রোত একই সমতলে প্রবাহিত; একটী যখন চলিতে চলিতে বিস্তৃত বালুচরের মধ্যে পথ হারাইয়া ফেলে, অপরটী তখন

জল-স্থল-নিনাদে আপনার প্রকাশবার্ত্তা ঘোষণা করে। শেষদিকে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের স্থায়িত্বকাল ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বাড়িতে থাকে। সেই সময়ে প্রথম মেরি রীনল্ডসের মনে কখনও কখনও অত্যন্ত অস্পষ্ট স্বপ্নস্মৃতির মত দ্বিতীয় মেরির জীবনের কোনও কোনও ঘটনার অস্পষ্টস্মৃতি জাগিয়া উঠিত। কিন্তু সে তাহা অলীক স্বপ্ন বলিয়াই মনে করিত।

ডাঃ অস্‌বোর্ণের বর্ণিত কাহিনী।

আমেরিকার মনোবিদ্যাবিশারদ ডাঃ অস্‌বোর্ণ এই জাতীয় আর একটী কাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। তবে এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব একবার মাত্র আবির্ভূত হইয়া প্রায় দুই বৎসর কাল থাকিবার পর চিরতরে অন্তর্হিত হয়। মেরি রীনল্ডসের দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বের মত ইহা পুনঃ পুনঃ আত্মপ্রকাশ করে নাই।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ফিলাডেলফিয়ার সন্নিকটে একটী ছোট সহরে জনৈক মধ্যম বয়সী যুবক বাস করিত। ঐ সহরেই টিনের আসবাবপত্র প্রস্তুত করিবার একটী কারখানা স্থাপন করিয়া সে বেশ সাফল্যের সহিত কারবার করিতেছিল। একদিন রবিবার। সকাল হইতে আকাশ ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন ছিল। যুবকটী সারা দিন গৃহে থাকিয়া শুইয়া বসিয়া কখনও বা একটু বই পড়িয়া, আবার কখনও বা নিজের শিশুদের সহিত একটু খেলাধুলা করিয়া সময় কাটায়। সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণের জন্য মুক্তবায়ু সেবন করিবার উদ্দেশ্যে সে বেড়াইতে বাহির হয়। কিন্তু সেই হইতেই সে একেবারে নিরুদ্দেশ। বহু অনুসন্ধানেও তাহার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। তিমির রজনীর অন্ধকার কি তাহাকে নিঃশেষে গ্রাস করিয়া ফেলিল!

এই ঘটনার প্রায় দুই বৎসর পরে একদিন দক্ষিণ আমেরিকার কোনও সহরে একটী টিনের কারখানায় একজন শ্রমিক কাজ করিতে করিতে সহসা কাজ ছাড়িয়া বিস্ময়বিমূঢ়ের ন্যায় চীৎকার করিয়া উঠিল—'এ কি! আমি এখানে কেন? কেমন করেই বা এলাম? এ কারখানা, এ লোকজন—এ কি সব! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না!' প্রথমতঃ তাহার সহকর্ম্মী অন্যান্য শ্রমিকেরা ঠাট্টা মনে করিয়া তাহার কথায় কোনও গুরুত্ব দিল না। কিন্তু তাহার বিস্মিত ও ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি এবং মুখভঙ্গী দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া গেল। যে লোকটী এতদিন নীরবে অসাধারণ নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে কারখানার কাজ করিয়া যাইতেছে তাহার এই আকস্মিক ভাবান্তর দেখিয়া তাহাদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ তাহার পাগল হইবার পূর্ব্বলক্ষণ মনে করিয়া তাহারা নানাপ্রকারে তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু করিলে কি হইবে। সে আর এখন তাহাদের এতদিনের সহকর্ম্মী শ্রমিকটি নহে। যে মানুষটির সহিত তাহারা এখন আলাপ করিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার সহিত ইহাদের বিন্দুমাত্র পরিচয়ও নাই। এমন কি যে অতিপরিচিত নামে তাহারা এই লোকটিকে সম্বোধন করিতেছে সে নামটীও এর নিকট অপরিচিত। বাহিরের খোলসটী এক আছে বটে, কিন্তু ভিতরের মানুষটী একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কাজেই তাহার সহিত পুরাতন পরিচিত সুরে আলাপ করিবার চেষ্টা বৃথা।

যাহা হউক, ধীরে ধীরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সে কারখানার মালিকের নিকট গিয়া সব কথা কহিল। উহার আমেরিকার কোনও সহরে তাহার বাড়ী। সে যে কেমন করিয়া এখানে আসিয়া পড়িল তাহা ভাবিয়া পাইতেছে না। সেও একটী টিনের কারখানার মালিক। কোনও রকমে তাহার নিজ গৃহে ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলে সে বিশেষ উপকৃত হয়। শ্রমিক হিসাবে এই কারখানায়

তাহার যে পরিশ্রমিক প্রাপ্য হইয়াছিল তাহাই তাহাকে দেওয়া হয়। এবং শীঘ্রই সে দেশে ফিরিয়া আপন পরিবারের সহিত মিলিত হয়। এর পর এই লোকটির আর কোনও প্রকার মনোবিকৃতির কথা শুনা যায় নাই।

বহু ব্যক্তিত্ব—মংকৃসের কথা।

অনেকের জীবনে চারি পাঁচটি করিয়া নূতন নূতন ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। লণ্ডন সহরে মংকৃস নামক একটী যুবকের মধ্যে একাদিক্রমে চারিটি বিভিন্ন এবং বিপরীত প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব প্রকট হইয়াছিল। মংকৃস প্রথমে ছিল নিরীহ স্বভাবের কেরানী, তারপর হয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির বেতনভোগী সাইকেল আরোহী; তৃতীয় বারে সে সৌখীন সমাজ-প্রিয় ভদ্রলোক এবং চতুর্থ বারে বেপরোয়া দুঃসাহসিক গুণ্ডারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই চারিবারে তাহার চারিদল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বন্ধু জুটিয়াছিল। সৌখীন ভদ্রলোক হিসাবে সে লণ্ডনসমাজের বহু মহিলার চিত্ত আকর্ষণ করে এবং তাহাদের মধ্যে চারিজন তাহাকে পতিত্বে বরণ করিতে উৎসুক হন। শেষবারে যখন সে গুণ্ডাজীবন যাপন করিতেছিল তখন বহুবৎসর নৈপুণ্যের সহিত রাহাজানি করিয়া অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এই অবস্থায় কারাগারে তাহার শেষ জীবন অতিবাহিত হয়।

ডরিসের কাহিনী।

আমেরিকার মনোবিৎ চিকিৎসক ডাঃ ডব লিউ, এফ্, প্রিন্স্ এইরূপ একটি রোগিণীর চিকিৎসা করেন। রোগিনীর নাম ছিল ডরিস্। ডরিসের কাহিনী নানাদিক দিয়া বেশ কৌতুকপ্রদ। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমরা তাহার মুহুর্মুহু ব্যক্তিত্ব বদ্‌লাইবার কথা বিশদভাবে উল্লেখ করিতে পারিলাম না। এই হতভাগ্য মেয়েটীর জীবনে কতকগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব মুহুর্মুহু যাতায়াত করিত। তার মধ্যে প্রকৃত ডরিস ছিল সজীব, ক্রীড়ামোদী এবং প্রফুল্লপ্রকৃতির মেয়ে। দেখিতে দেখিতে সহসা তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইত, তাহার দৃষ্টি নির্ব্বোধের ন্যায় ফ্যাল-ফেলে হইয়া যাইত এবং তাহার আড়ষ্ট ব্যবহার ও শুষ্ক প্রাণহীন হাসিতে একটী নির্জ্জীব ভীরু প্রকৃতির পরিচয় ফুটিয়া উঠিত। ডাঃ প্রিন্স্ এই দ্বিতীয় ব্যক্তিত্বটীর নাম দিয়াছিলেন রুগ্ন ডরিস। মুহূর্ত্তের মধ্যেই আবার রুগ্ন ডরিসকে অভিভূত করিয়া একটী নূতন ব্যক্তিত্ব জাগিয়া উঠিত। রুগ্ন ডরিসের মত তাহার ব্যবহারে কোনও জড়তা ছিল না। বরং সে রীতিমত চঞ্চল এবং দুষ্ট প্রকৃতির মেয়ে ছিল। রুগ্ন ডরিসের চেহারায় একটু বয়সের পক্কতা ও কাটখোট্টা ভাব প্রকাশ পাইত। কিন্তু এই বালিকাটীর শিশুসুলভ চপল ব্যবহারে এবং শিশুর ন্যায় অকপট কথাবার্ত্তায় সকলেই বিশেষ আমোদ উপভোগ করিত। এই তৃতীয় ব্যক্তিটি মার্গারেট নামে আপনার পরিচয় দিয়াছিল। এই তিনটি সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব ছাড়া আরও দুইটী গৌণ ব্যক্তিত্ব এই দেহে আসা যাওয়া করিত। চিকিৎসক তাহাদের নাম দিয়াছিলেন ঘুমন্ত ডরিস ও ঘুমন্ত মার্গারেট। হাবভাব ও প্রকৃতিতে এদেরও বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল। মাঝে মাঝে রুগ্ন ডরিসের অবস্থিতিকালেই সহসা মার্গারেট আত্মপ্রকাশ করিত। বুদ্ধিমতী মার্গারেট নির্ব্বোধ রুগ্ন ডরিসকে নানা-প্রকার শিক্ষা ও খেলাধূলার মধ্য দিয়া মানুষ করিতে চেষ্টা করিত; আবার সময়ে সময়ে তাহার উপর মুরুব্বিয়ানা করিয়া তাহাকে রীতিমত মারধর করিত। মার্গারেটের নির্য্যাতন সময়ে সময়ে রুগ্ন ডরিসের পক্ষে অসহনীয় বোধ হইত। অনেক সময় এমন হইত, যে হাত দুখানি যেন মার্গারেটের আর মুখখানি যেন রুগ্ন ডরিসের, এই সময়ে হাতের নখের আঁচড়ে মুখ ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইত।

ডাঃ প্রিন্সের চিকিৎসার ফলে ধীরে ধীরে এই সব গৌণ ব্যক্তিত্ব মিলাইয়া যায় এবং প্রকৃত ডরিস স্থায়ীভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

কারণ নির্ণয়।

মনোজগতের এই যে বিস্ময়কর বিপর্যয়, খণ্ড প্রলয়ের মত যাহাতে শরীর বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও একটী সম্পূর্ণ মনের অস্তিত্ব অন্ততঃ সাময়িকভাবে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়, এবং তাহার স্থলে অপর একটী অপরিচিত মন আত্ম-প্রকাশ করে, ইহা কোনও ভৌতিক ব্যাপার বা ঐন্দ্রজালিক প্রকাশের মত অপ্রকৃত ঘটনা নহে। প্রাচীন কাল হইতে বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত অনেক এই ধরণের ব্যাপারকে ভূত প্রেত অথবা কোনও দৈব শক্তির কার্য্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইত। মধ্য যুগে ইউরোপে উন্মাদ রোগ বা যে কোনও প্রকারের মনোবিকার ডাইনীদের প্রভাবেই ঘটে বলিয়া লোকের ধারণা ছিল, এবং এই প্রকার রোগে চিকিৎসার জন্য ডাইনী চিকিৎসকদের (witch-doctor) শরণাপন্ন হইত। সম্প্রতি মনোবিদ্‌গণ এই জাতীয় ঘটনার প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন যে ইহা একপ্রকার মানসিক ব্যাধি ছাড়া আর কিছুই নহে এবং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ভাবে মনের চিকিৎসার দ্বারা এই সব ব্যাধির প্রতিকার করা যায়। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহার কারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। আমরা সংক্ষেপে এসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রথমেই ব্যক্তিত্ব কি এবং ইহা কি উপাদানে গঠিত তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। কিন্তু ব্যক্তিত্বের কোনও পরিষ্কার সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় যে একটী লোকের মানসিক বৃত্তি ও শক্তিসমূহের সমবেত ফলই তাহার ব্যক্তিত্ব। অমুক একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক—ইহার অর্থ এই যে তাঁহার মানসিক বৃত্তিগুলি কোনও কোনও বিষয়ে অসাধারণ উৎকর্ষলাভ করিয়াছে এবং তিনি তাঁহার জ্ঞান ও শক্তির দ্বারা বহুলোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। মানুষ জন্ম হইতেই একটা ব্যক্তিত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে না। ইহা ধীরে ধীরে তাহার গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে গড়িয়া উঠে। ব্যক্তিত্ববোধের মূলে থাকে একটা কেন্দ্রীয় অনুভূতি। আমরা ইহার নাম দিতে পারি অস্মিতাবোধ (self feeling)—আমি যে আছি এই অনুভূতি। আমাদের দেহযন্ত্রের ভিতরে বাহিরে, শ্বাসে প্রশ্বাসে, রক্তসঞ্চালনে, হৃৎপিণ্ড ফুস্‌ফুস্ অন্ত্র প্রভৃতির সঙ্কোচন ও প্রসারণে অবিরত যে ক্রিয়া ও স্পন্দন অনুভূত হইতেছে তাহাই এই অস্মিতাবোধের ভিত্তিস্বরূপ। এই অস্মিতাবোধকে কেন্দ্র করিয়া আবার নানা ইচ্ছা, চিন্তা, ভাব প্রবৃত্তি প্রভৃতির উদয় ও বিলয় হইতেছে; ইচ্ছা ও চিন্তার মধ্যে আবার কতগুলি কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এই প্রকারে মানসিক বৃত্তিসমূহের উদয়, বিলয় ও পরিণতি-দ্বারা প্রত্যেক মানুষের মূলীভূত অস্মিতাবোধ এক একটী নির্দ্দিষ্ট ছাঁচে গড়িয়া উঠে। তাহার দ্বারা আবার পরবর্ত্তী ইচ্ছা চিন্তা ও কর্ম্মসমূহ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আত্মবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণই (self consciousness and self-determination) ব্যক্তিত্বের মৌলিক উপাদান। সহজাত প্রবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন লোকের ব্যক্তিত্বও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ব্যক্তিত্ববোধ একটা অখণ্ড প্রবাহের মত কাজ করিয়া থাকে। তাহাদের চিন্তা, ইচ্ছা, ভাব, কর্ম্ম প্রভৃতি সাধারণতঃ একমুখী; অন্ততঃ তাহাদের

মধ্যে বিরোধ ও অসামঞ্জস্য খুবই কম। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক মানুষের মনেই সময়ে সময়ে অন্তর্দ্বিরোধের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির বিরোধ ঘটিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ একজন কৃপণের কথা ধরা যাক্। কৃপণের হয়ত খুব ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার ইচ্ছা হইল, অথচ ইহাতে অনেক টাকা পয়সা খরচ হইয়া যাইতে পারে। অতএব কৃপণের মনে একদিকে ধর্ম্মলাভের ইচ্ছা এবং অন্যদিকে অর্থের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি—এই দুইটী বৃত্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। সে এখন কি করিবে তিনটী ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে এই বিরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যাইতে পারে। যথা :—

(১) উভয় প্রবৃত্তির লাভ ক্ষতি বা দোষগুণ যথাযথ বিচার করিয়া যেটী ন্যায়সঙ্গত মনে হয় সেইটী গ্রহণ করা। যেমন কৃপণ হয়ত বিচার করিয়া দেখিল যে সে সারাজীবন বহুকষ্টে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে এখন কোনও কারণে তাহা খরচ হইয়া গেলে সে মনে শান্তি পাইবে না। অতএব টাকা পয়সা খরচ করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করার তাহার প্রয়োজন নাই।

২। বিরোধী ইচ্ছা দুইটীর মধ্যে মন যেটীকে বর্জ্জন করিতে চাহিতেছে, বুদ্ধির দ্বারা তাহা বর্জ্জন করিবার পক্ষে কোনও যুক্তি আবিষ্কার করা এবং তাহার দ্বারা মনকে এবং অপরাপর সকলকে বুঝ দেওয়া, মনোবিদ্যার (Psychology) ভাষায় ইহার নাম যুক্ত্যাভাস (Rationalisation)। যেমন কৃপণ হয়ত স্থির করিল যে সে সাধ্যমত যে কয়েক লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়াছে ইহা তাহার বংশধরদের জন্য পর্য্যাপ্ত নহে। অতএব তাহাদের মুখ চাহিয়া সে ইহা হইতে ধর্ম্মকার্য্যে কিছু খরচ করিতে পারে না। বংশধরদের বঞ্চিত করিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম করিলে ভগবান তাহার উপর রুষ্ট হইবেন। ইত্যাদি।

এ স্থলে প্রকৃত কারণ হইল কৃপণ ব্যক্তির অর্থের প্রতি অহেতুক আসক্তি। কিন্তু সে বংশধরদের দোহাই দিয়া নিজের কাছে এবং অপরের কাছে এই প্রকৃত কারণ গোপন করিতে চেষ্টা করিতেছে। ইহা আত্ম-প্রবঞ্চনার নামান্তর মাত্র। দুর্নীতির সুনীতিকে তুষ্ট করিবার একটি কৌশল (the homage that vice pays to virtue.)।

৩। এই বিরোধ মীমাংসার আর একটী উপায় হইতেছে বিরোধী ইচ্ছা দুইটীর মধ্যে একটিকে অবদমিত (repress) করা। সহজ কথায় ইহাকে বলা যায় ধামাচাপা দেওয়া। অর্থাৎ কোনও প্রবৃত্তি বলবতী থাকা সত্ত্বেও তাহা যেন নাই এইরূপ বোধে আচরণ করা। যেমন কৃপণের অর্থের প্রতি যথেষ্ট আসক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি সে মনে করে 'আমার আর অর্থের উপর টান নাই, এবার আমি ধর্ম্মকর্ম্মে যথেচ্ছ ব্যয় করিব',—তাহা হইলে অর্থ রক্ষা করিবার প্রবৃত্তিকে অবদমন করা হইবে। কিন্তু জোর করিয়া অস্বীকার করিলেই কোনও প্রবৃত্তি চলিয়া যায় না। চেতন মনের স্তর হইতে সাময়িকভাবে অপসারিত হইয়া তাহা নির্জ্ঞান মনের স্তরে যাইয়া অবস্থিতি করিতে থাকে।

এই প্রকারের অবদমিত ইচ্ছা হইতে নানা প্রকার মানসিক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। অবদমিত প্রবৃত্তিটী যদি খুব শক্তিশালী হয় তাহা হইলে অবচেতন মনে লুপ্ত থাকিয়াও ইহা নানাপ্রকারে নিজেকে চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করে। এই জন্যই মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত লোকের মধ্যে নানাপ্রকার অসংলগ্ন, অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। অচিরাই এক ভদ্রলোক পকাশবার হাত ধুইয়াও মনে করে তাহার হাত দুটি

পরিষ্কার হইল না। তাহার সংশয় আর কিছুতেই কাটে না। তাহার এইরূপ ব্যবহার যে যুক্তিহীন ও অস্বাভাবিক তাহা সে বুঝিয়াও বোঝে না। কোনও অবদমিত প্রবৃত্তির তাড়নায় সে ঐরূপ করিতে বাধ্য হয়। এইরূপ কোনও কোনও লোকের আরশুলা টিকটিকি, কেঁচো প্রভৃতি প্রাণী হইতে ভীষণ ভয়; অথচ তাহারা নিজেরাই এরূপ অহেতুক ভয়ের কারণ খুঁজিয়া পায় না। এই জাতীয় ব্যবহার তাহাদের মূল ব্যক্তিত্বের সহিত সামঞ্জস্যহীন ও অসংলগ্ন। তাহাদের চেতন মন যে সকল ইচ্ছাকে জোর করিয়া অস্বীকার করিয়াছে সেই সকল ইচ্ছাই অবচেতন মন হইতে এই প্রকার অহেতুক ব্যবহারের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। পাছে চেতন মনের নিকট ধরা পড়িয়া যায়, এই জন্য ছদ্মবেশে আত্ম-প্রকাশ। প্রশ্ন হইতে পারে যে ধরা পড়িলেই বা ভয় কি? ইহার উত্তর এই যে ধরা পড়িলে ঐ প্রবৃত্তি নিজেকে চরিতার্থ করিবার সুযোগটি হারাইবে। কারণ তাহা হইলে যে কারণে ইহা অবদমিত হইয়াছিল সেই মূল বিরোধটি আবার দেখা দিবে, এবং যতক্ষণ মনের মধ্যে দুইটি ইচ্ছার বিরোধ চলিতে থাকে ততক্ষণ উহাদের কোনটিই কার্য্যকরী হইতে পারে না।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে প্রবল ইচ্ছার অবদমনের ফলে আমাদের কোনও কোনও ব্যবহার মূল ব্যক্তিত্বের সূত্র হইতে অসংলগ্ন বা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই প্রকার ব্যবহারের অসংলগ্নতা বা বিচ্ছেদকে মনোবিদ্যার ভাষায় 'বিযুক্ত' বা Dissociation বলে। বহুব্যক্তিত্ব এই প্রকার বিযুক্তের চরম পরিণতি। বিরোধের ফলে বিযুক্তের উৎপত্তি। একটী ইচ্ছার সহিত যেমন অপর একটী ইচ্ছার বিরোধ ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মূল ব্যক্তিত্বের সহিত আর একদল পরস্পর সাপেক্ষ ইচ্ছা, চিন্তা ও প্রবৃত্তির বিরোধ ঘটিতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যদি ঐ পরস্পর সম্বন্ধ চিন্তা, ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি সমূহকে অবদমিত করা হয় তাহা হইলে তাহারা অবচেতন মনে গূঢ় থাকিয়াও অনেক সময়ে একটী স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় এবং সুযোগ পাইলেই মূল ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে উপরিলিখিত প্রত্যেক কাহিনীতেই পরস্পর বিরোধী দুই বা ততোধিক ইচ্ছা, প্রবৃত্তি, চিন্তা-ধারা একই লোকের মনে গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিত। উপযুক্ত সুযোগ বুঝিয়া ইহাদের প্রত্যেকটী এক একটী স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। চতুর্থ কাহিনীর রোগী ডরিসের মনে যে গূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান ছিল তাহারই ফলে তাহার অতগুলি ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। ডাঃ প্রিন্স্ মনোবিশ্লেষণের দ্বারা এই দ্বন্দ্বের নিরসন করেন এবং তাহার ফলে ডরিসের গৌণ ব্যক্তিত্বগুলি মিলাইয়া যায়। ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইড্ নামক গল্পে ইংরাজ ঔপন্যাসিক ষ্টিভেন্সন্ একই লোকের এইরূপ পরস্পর বিরোধী দুইটী স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। উদার জনপ্রিয় যশস্বী ডাঃ জেকিল এবং ক্রূরকর্মা নিষ্ঠুর পশু তুল্য মিঃ হাইড্ একই লোকের সৎ ও অসৎ প্রবৃত্তির মূর্ত্ত স্বরূপ।

পরিশেষে আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে সাধারণ লোকের ব্যক্তিত্বের সহিত এই প্রকার একাধিক ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট লোকের কোনও প্রকারগত বৈষম্য নাই। এই হিসাবে মানুষ মাত্রই বহুব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট। অল্পবিস্তর অন্তর্বিরোধ ও অসামঞ্জস্য প্রায় প্রত্যেক লোকের চরিত্রেই দেখা যায়। আমরা অনেকেই ঘরে এক প্রকার ও বাহিরে বিপরীত আচরণ করিয়া থাকি এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন মানুষ সাজিয়া বসি। ফলে আমাদের মানুষের ব্যবহারে এই ধরণের অসামঞ্জস্য [illegible]

করে না। শুচিবাই কিংবা অহেতুক ভীতিগ্রস্ত লোকের ব্যবহারে এই অসামঞ্জস্য পরিস্ফুট। মৃগী রোগ (Hysteria) অথবা হিপ্‌নটিজম (Hypnotism) এর প্রভাবে কোনও কোনও লোকের ব্যবহারে সাময়িক-ভাবে এইরূপ অসংলগ্নতা আরও বেশী প্রকট হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বে যে বিযুক্ত বা dissociation এর কথা বলা হইয়াছে এই সমস্ত ঘটনা তাহারই এক একটী ক্রমিক স্তরের পরিচায়ক মাত্র। এইরূপ স্তরে স্তরে অগ্রসর হইলে বিযুক্তের সর্ব্বশেষ স্তরে আমরা পাই—এক দেহে একাধিক মানুষের অভিব্যক্তি।

পাঁঠা ও কমলাকান্ত।

শ্রীজগদীশ গুপ্ত।

কালী পূজা; বাজিতেছে কাঁসি আর ঢাক
তোলপাড় করি' সেই পাড়াটা বেবাক্।
ছেলেরা বুঁকেছে খুব দেখিতে প্রতিমা—
তাহাদের আনন্দেরি নাহি পরিসীমা।
শামিয়ানা লট্‌কানো; দূর্ব্বাগুলি চাঁচা;
মণ্ডপ উঠেছে ঠেলে' প্রচুর আগাছা।
পুরুত আছেন বসি'; শরীর বিশাল—
পরিহিত বস্ত্রখানা টকটকে' লাল।
পাঁঠা আছে বাঁধা দূরে বাঁশের খুঁটিতে—
মুখে দেয় আম্রপত্র বালক দু'টিতে···
খুব স্ফূর্ত্তি তাহাদের খাইয়ে পাঁঠায়,
বুলাইছে হাত সেই রোমশ গা-টায়।

সকলেই জানে, এই পাঁঠা হবে বলি—
কেহ কেহ স্বাদ তার ভাবিছে কেবলি;
কেবল জানে না সেই ছাগশিশু কিছে,
কেন ঐ ধুম্‌ধাম, আর, ভবিষ্যৎ কি যে।
খাইছে সে আমপাতা নির্ব্বিকার চিতে···
দেখে তা' নির্ব্বোধ বলি' হাসিতে হাসিতে
কেহ বা করিছে লম্ফ; কেহ ম্রিয়মান—
মিছামিছি জীবটির নে'য়া হবে প্রাণ।
সসীম এ পৃথিবীরে করিতে অসীম
কমলাকান্তের আছে শাশ্বত আকিম্;
দিব্যচক্ষু খুলে' যায় তারি প্রসাদাৎ—
সেই ফাঁকে খেলে ভালো প্রসন্ন'র হাত,
দুধে সে মেশায় জল ঘটি ভ'রে' ভ'রে',
গা'ল পাড়ে কটু কণ্ঠে 'বিটলে বামুনে।'

শুনিয়া কমলাকান্ত ঢাকের বাজনা—
দেখিয়া আলোক আর বহু আনাগোনা
আসিল সেখানে; চক্ষে পড়িল পাঁঠাটি,
অতীব নিরীহ জীব, ক্ষুদ্র, পরিপাটি;
চর্ব্বণ করিছে পত্র মনোযোগ দিয়া,
যেন সে ভালই আছে এখানে আসিয়া···

দাঁড়া'ল কমলাকান্ত তারি কাছে এসে—
খুলে' গেল দিব্যকর্ণ একটি নিমেষে ;
শুনিল, কহিছে পাঁঠা : "প্রণাম ঠাকুর ;
বদন বিষণ্ণ কেন ? দুঃখ করো দূর।
ফুরায়েছে আয়ু, আমি তবু নির্ব্বিকার—
ইহাই কি বর্ত্তমান বেদনা তোমার ?
তোমরা কি করো না তা' ? মরণ শিয়রে
জেনে' অন্ন তোলো নাকি মুখে অকাতরে !
সেই অন্ন আনো ঘরে কেড়ে' কি ঠকিয়ে,
তবু কি মৃত্যুরে কেউ রেখেছ ঠেকিয়ে !
মরিতেছ লাখ লাখ হাস্যকরভাবে,
অকারণে, অনর্থক ! তুমিও ত' যাবে—
সেদিন জন্মিয়া মনে তব ক্রোধ ক্ষোভ
ছাড়িতে পারিবে তুমি গোছগের লোভ ?
তোমরা মরিছ ভুগে', না খেয়ে, মড়কে—
মরিয়া সটান্ যাও অনন্ত নরকে···
আমি কাজে লাগিলাম ; মায়ের সম্মুখে
প্রাণ দেব ; রক্তপান করিবে মা সুখে।
পুলকে গোলোকে যাবো মাতৃ আশীর্ব্বাদে,
তৃপ্ত হবে মানবাত্মা এ-দেহের স্বাদে"···

একটু নীরব থাকি' হাসিয়া একটু
কহিল : "করিও ক্ষমা যদি লাগে কটু—
মাংস নয়, কথাগুলো। তোমাতে আমাতে
ইতর বিশেষ কতো দেখো হাতে হাতে
বাজারে লইয়া যাও তোমার ও দেহ,
এক কানা কড়ি দিয়া কিনিবে না কেহ,
কারণ, অখাদ্য তুমি, মাংস অতি হেয়,
বাজারে চাহিদা নাই, নহ তুমি ক্রেয়।
আমারে এনেছে কর্ত্তা ন'সিকায় কিনে'—
অন্নহীন হবে পূজা এই দেহ বিনে ;
কত দরকারী আমি ভেবে' দেখো মনে—
নিজের মূল্যও ভাবো ; কোনোই কারণে
তোমার ন'সিকে মূল্য হবে না কভুও ;
আমার অদৃষ্ট ভাবি' দুঃখ তব ভুও।
কোনো কাজে লাগিলে না, কোনো মূল্য নাই ;
প্রসন্ন'র মতো কেহ ভাবে না বালাই
আমারে কি স্বজাতিরে ! প্রণাম, ঠাকুর ;
নিজেরে ভাবিয়া দুঃখ করহ প্রচুর।"
শুনিয়া পাঁঠার কথা দাঁতে কাটি' জিব
প্রশান্ত কমলাকান্ত হ'ল অপ্রতিভ।

তারাশঙ্করের "মন্বন্তর"

আলোচনা।

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-এইচ-ডি।

"মন্বন্তর" (জানুয়ারী, ১৯৪৪) তারাশঙ্করের আধুনিকতম রচনা। ইহাতে লেখক বোমাবর্ষণের ভয়ে আতঙ্ক-বিমূঢ় কলিকাতার স্বল্পকালস্থায়ী বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতাকে উপন্যাসের মধ্যে চিরন্তন রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তা'ছাড়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট, কঙ্কালসার নরনারীর কলিকাতায় অভিযান, খাদ্যনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায় দরিদ্র ও মধ্যবিত্তশ্রেণীর দারুণ দুর্দশা, মহাত্মা গান্ধীর একবিংশতি দিবসব্যাপী অনশন উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশের অসহ উদ্বেগ ও রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা ইত্যাদি যে সমস্ত সমস্যা জনসাধারণের চিত্তকে ইদানীন্তনকালে আলোড়িত করিয়াছে সেইগুলি উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সংবাদপত্রের স্তম্ভ ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্র তাহাদিগকে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত করায় উপন্যাসের পরিধি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নূতন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে। উপন্যাসটি পড়িতে পড়িতে সন্দেহ জাগে যে ইহা কি সংবাদপত্রের ঢেঁকির সাহিত্যের পুষ্পকরথে স্বর্গারোহণ, না সাময়িক ঘটনা বিবৃতির ক্ষেত্রে সাহিত্যের অনধিকার প্রবেশ? কালের সূতিকাগার হইতে সদ্য নিষ্ক্রান্ত নবজাত শিশুকে কি সাহিত্যলোকের চিরন্তনতায় উন্নীত করা সম্ভব? যে আঘাত এখনও আমাদের শিরাস্নায়ুতে অনুরণিত হইতেছে, যে আতঙ্ক আমাদের রক্তপ্রবাহে এখনও সক্রিয়, যে হিমশীতল স্পর্শ এখনও আমাদের হৃৎস্পন্দনকে অবশ ও অসাড় করিয়া দিতেছে, তাহারা কি এত শীঘ্র এই অচির-উপলব্ধ ভয়ের মুখোস খুলিয়া আর্টিষ্টের নিকট নিজ সনাতন সত্যরূপটি উদ্‌ঘাটিত করিবে? ইহারা কি আমাদের ভীতিবিহ্বলতার ধূম্রলোক অতিক্রম করিয়া চিরন্তন সত্যের সূর্যালোকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার দূরত্ব ও রূপবৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে? অবশ্য এই ঘটনাগুলি আমাদিগকে গভীরভাবে আলোড়িত করিয়াছে লেখকও গভীর ভাবাবেগপূর্ণ অনুভূতি ও মননশীলতার সহিত ইহাদের আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি মনে হয় যে আমরা যাহা পাইতেছি তাহা উপন্যাসের কাঁচা মাল মাত্র, ইহার পরিণত শিল্প সৌন্দর্য্য নহে।

অবশ্য লেখকের উদ্দেশ্য যে আবেগময় তথ্যবিবৃতি তাহা নহে; এই সমস্ত তথ্যের সাহায্যে তিনি এক যুগান্তর সূচনাকারী ধ্বংসোন্মুখতার প্রতিবেশ রচনা করিতে চাহেন। এই চেষ্টার সাফল্যের উপরই উপন্যাসের সার্থকতা নির্ভর করে। এই সর্ব্বব্যাপী আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তা, ভয়তাড়িত পশুর ন্যায় সমাজসংহতি হইতে দূরোৎক্ষিপ্ত নরনারীর উন্মত্ত পলায়ন, পারিবারিক বন্ধনচ্ছেদ, সমাজব্যবস্থার চরম বৈষম্যের [illegible] প্রকাশ, দানবীয় ধ্বংসশক্তির অব্যাহত তাণ্ডবলীলা এই দিকে; অপরদিকে এই প্রলয়ঝঞ্ঝার মধ্যে মানবের কল্যাণকামনা ও সেবাপ্রবৃত্তির উদ্বোধন, মহত্তর কৃচ্ছ্রসাধনের ভিতর দিয়া অধ্যাত্মশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক সাম্যের উপর নূতন সমাজ [illegible] উপর নব রাষ্ট্রশক্তি [illegible]

উভয়ের সমাবেশ এক সুদূরপ্রসারী সাঙ্কেতিকতার অর্থ-গৌরব বহন করে। কিন্তু এই সাঙ্কেতিক অর্থটি কয়েকটি ব্যক্তি বা পরিবারের মানস-পরিস্থিতির মধ্যে ফুটাইয়া তোলাই ঔপন্যাসিকের বৈশিষ্ট্য; এইখানেই রাজনৈতিক আলোচনার সহিত উপন্যাসের প্রভেদ। তারাশঙ্কর এই লক্ষ্য আন্তরিকতার সহিত অনুবর্তন করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সাইরেণের ধ্বনি সর্ব্বসাধারণের মনে যে ভীতিশিহরণ জাগায় তিনি তাহাই ফুটাইয়াছেন; কিন্তু ইহা যখন ঘনায়মান অন্তর্দ্বন্দ্বের তীক্ষ্ণ ও সার্থক বহিঃপ্রকাশ রূপে প্রতিভাত হয় তখনই যে ইহা ঔপন্যাসিকের বিশেষভাবে আপনার বস্তু হয়, এই সত্য তিনি সর্ব্বদা স্বীকার করেন নাই। উপন্যাসের মধ্যে যে কয়েকবার সাইরেণ বাজিয়াছে তাহার মধ্যে ইহা একবার মাত্র থিয়েটারের রাত্রে কানাই ও লীলার পরস্পরের প্রতি ক্ষুব্ধ অনুযোগ-ভরা, উত্তেজিত হৃদয়বৃত্তির ও কানাইএর প্রতি হীরেণের অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত হিংস্র মনোভাবের সহিত এক সুরে বাঁধা হইয়া উপন্যাসোচিত অসাধারণ অর্থব্যঞ্জনায় অনুরণিত হইয়াছে। শেষবার ইহা শিশুর শ্বাসরোধে মৃত্যু ঘটাইয়া ভারাক্রান্তার আতিথ্য দ্বারা আমাদের অপ্রসিক্ত জীবনপথকে আরও কর্দমপিচ্ছিল করিয়াছে। অন্য সময় ইহা কেবলমাত্র বিপদের যান্ত্রিক সঙ্কেতের অংশ অভিনয় করিয়াছে।

"মন্বন্তর" গ্রন্থে ঔপন্যাসিক আদর্শচ্যুতির রেখাটি স্পষ্টভাবে অনুসরণ করা যায়। গ্রন্থারম্ভে সুখময় চক্রবর্ত্তীর পরিবারে ব্যাধিবিকৃত, দারিদ্র্য-পিষ্ট, অন্তর্জীর্ণ আভিজাত্য মোহের চিত্রে একটি চমৎকার উপন্যাসের বীজ উপ্ত হইয়াছে বলিয়া আমরা অনুভব করি। এই ধ্বংসোন্মুখ পরিবারের যে বংশানুক্রমিক পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদিগকে Galsworthy Forsyte Saga'র কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বংশশাখার ধাপে ধাপে এই বিকৃতির লক্ষণ কেমন স্ফুটতর, ক্ষয়জীর্ণতা কেমন প্রকটতর হইয়া আসিতেছে তাহা সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। মেজকর্ত্তার যে আভিজাত্য গৌরব একটা স্পর্দ্ধিত, বেপরোয়া উদাসীনতার স্তিমিত শিখায় বাঁচিয়া আছে, কানাইএর পিতার মধ্যে তাহা স্বার্থপর অক্ষম ভোগেলোলুপতায় নির্ব্বাপিত হইয়াছে; আবার কানাইএর ছোট খুড়িমার মধ্যে তাহা শ্লেষব্যঙ্গ বক্রোক্তি প্রবণতায় নিষ্ঠুর আঘাত হানিয়া পৃথিবীর উপর প্রতিশোধ তুলিবার প্রবৃত্তিতে এক বিকৃত রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে। এই বংশের গৃহিণীদের অন্ধ পাতিব্রত্য ও মূঢ় ভক্তি-বিহ্বলতা ইহার শোচনীয় ক্ষয়ীলতাকে করুণ অসহায়তার ম্লান গোধূলিচ্ছটায় অভিষিক্ত করিয়াছে। কানাইএর উপর মেজকর্ত্তার তীব্র রোষের অগ্ন্যুৎক্ষেপ ও ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনের পর ক্ষমামিগ্ধ আত্মনির্ব্বাসনবরণ তাঁহার মধ্যে যে সত্যিকার মহিমান্বিত বংশপ্রেরণা ছিল তাহার শেষ রশ্মি বিকীরণ। গীতাদের বাড়ীর আভ্যন্তরীণ অবস্থাও উপন্যাসের প্যাটার্নের মধ্যে পড়ে; কিন্তু দেবপ্রসাদের গার্হস্থ্য জীবনে রাজনৈতিক প্রভাবেরই প্রাধান্য। লেখক চক্রবর্ত্তীবংশের কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী উপেক্ষা করিয়া বোমাবিভ্রাটে পর্য্যুদস্ত সাধারণ নাগরিক জীবনের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন। অবশ্য চক্রবর্ত্তী বাড়ীর উপর বোমা ফেলিয়া তিনি কতকটা তাঁহার প্রথম পরিকল্পনার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন—সেখানেও চেষ্টা করিয়াছেন যে জীবনের সুস্থ অগ্রগতির সহিত নিঃসম্পর্ক, মাকড়সার জালের মত নিছক অসুস্থ মনো-বিকারের জটিল পাকে বন্দী, অতৃপ্ত ভোগকামনার অবরুদ্ধ উত্তাপে দেহে ও মনে জীর্ণ, বংশের উপর

বিধির অমোঘ ব্যবস্থায় প্রণয়ের বজ্র নামিয়া আইসে। কিন্তু এই প্রমাণে অনিবার্য্যতা অপেক্ষা আকস্মিকতার উপাদানই বেশী। লেখক দৈনিক সংবাদপত্র হইতে সংবাদ-কল্পনে অতিমাত্রায় ব্যগ্র হইয়া এই চমৎকার ঔপন্যাসিক সম্ভাবনাটির অকালমৃত্যু ঘটাইয়াছেন। তিনি সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে আত্মসমর্পণ করিয়া ঔপন্যাসিকের উচ্চ চূড়া হইতে সাংবাদিকতা'র (Journalism) সমতলভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন।

উপন্যাসের চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত জীবন, সাধারণ বিপৎপাত যে অভিন্ন যৌথ অবস্থার সৃষ্টি করে, তাহার দ্বারা অনুভূত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কানাই ও গীতার ব্যক্তিগত জীবন সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট। কানাই ব্যক্তিগত প্রেরণায় নিজ পরিবারের সহিত সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছে; লীলার প্রতি আকর্ষণে হৃদয়াবেগ অপেক্ষা আদর্শ-সাম্যই অধিকতর কার্য্যকরী হইয়াছে। গীতার করুণ জীবনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার সৃষ্টি তাহার সমস্ত পরবর্ত্তী জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। লীন ও নেপীর ব্যক্তিত্ব রাজনীতি সমাজসেবার রথচক্ররজ্জুর সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বাঁধা পড়িয়াছে। লীলাকে আমরা ঠিক প্রেমিকারূপে উপলব্ধি করিতে পারি না—পিতার সন্দেহপরায়ণতার প্রতিবাদস্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সে নিজ স্বাধীন জীবন খুঁজিয়া পায় নাই, বোমা বিস্ফোরণের ঘূর্ণাবর্ত্তে অন্ধবেগে ঘূর্ণিত হইয়াছে। বরং হীরেণের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের কিছু পরিচয় মিলে—কানাইএর উপর তাহার ছুরিকাঘাত এই প্রাণশক্তিরই মুহূর্ত্তের জন্য স্ফুরণ। বিজয়দার পারিবারিক জীবনের বালাই নাই—তাহার জীবনের সমস্ত শক্তিই তিনি সমাজসেবায় উৎসর্গ করিয়াছেন; কাজেই এই নিরন্তর স্তরে তিনি বেশ সজীব। এই অর্দ্ধজীবিত, প্রতিবেশের সর্ব্বগ্রাসী ও ভাবে রাহুগ্রস্ত, প্রাণীগুলির মধ্যে মেরুকর্ত্তা অন্নদাশঙ্কর সিংহের ন্যায় দৃপ্ত কেশর ফুলাইয়া দণ্ডায়মান। তাঁহার থিয়েটারী অভিনয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে সত্যকার বীরত্বের সুর লাগে। ইঁহারই প্রাণস্পন্দন লেখক মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছেন। বাকী সমস্ত চরিত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য স্তর অতিক্রম করে নাই।

তারাশঙ্করের ছোট গল্প ও বড় উপন্যাস একই সুরে গাঁথা—একই দোষগুণের আকর। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গীর অকৃত্রিম সরলতা চরিত্রসৃষ্টি ও জীবন সমালোচনায় তুল্যভাবে প্রকটিত। তাঁহার মধ্যে জটিল বিশ্লেষণের আতিশয্য নাই; তাঁহার চরিত্রগুলি সুস্থ, স্বাভাবিক, প্রাণশক্তি সমৃদ্ধ জীবন যাত্রার প্রতীক। তাঁহার উপন্যাসের কোন দৃশ্য অবিস্মরণীয় ভাবে মর্ম্মমূলে মুদ্রিত হয় না—সর্ব্বত্রই একটা পরিমিত, সুসমঞ্জস ভাব-গভীরতার উচ্ছ্বাস অনুভূত হয়। রাঢ় দেশের সাধারণ জীবন যাত্রার কয়েকটী অধ্যায়, বিশেষতঃ জমিদারের সামন্ত-তান্ত্রিক মনোভাব, তাঁহার উপন্যাসের পৃষ্ঠায় আর্টের চিরন্তন সৌন্দর্য্যে ধৃত হইয়াছে। তাঁহার উপন্যাসে স্ত্রীচরিত্র অপ্রধান ও প্রেম গৌণ। স্বাভাবিকভাবে সীমা লঙ্ঘন না করিয়া, অতিরঞ্জনের রং না ফলাইয়া, বিশ্লেষণের অতিশয্যে চরিত্রসঙ্গতি বিসর্জ্জন না দিয়া যে উচ্চাঙ্গের উপন্যাস লেখা সম্ভব তারাশঙ্কর তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রতিভার স্বর্ণে রাজনৈতিক আবেদনের অপব্যবহাররূপ খাদ মিশানো আছে। এই খাদের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের উপর তাঁহার ভবিষ্যৎ আর্টের উৎকর্ষ-অপকর্ষ নির্ভর করিবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি আশু জনপ্রিয়তার মোহ অতিক্রম করিয়া চিরন্তনতার দুরূহতর অনুশীলনে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করিতে পারিবেন কিনা এই প্রশ্ন সমালোচকের মনে আবর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

কুচবিহারী কাণ্ড।

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়।

পাঁচপুরের পঞ্চাননের জীবনে, ১৯১৫ সালটা তিনটি ঘটনার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। ঐ বছরেই তাহার বিয়ে হয়; ঐ বছরেই সে বি-এ ফেল করে এবং ঐ বছরের শেষের দিকেই তাহার বাবা হার্ট ফেল করিয়া মারা যান।

পাঁচপুরের মধ্যে একমাত্র পঞ্চাননই, ফেল্ করিলেও, বি-এ-র ধাপ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল—যদিও ডিঙাইতে পারে নাই। সুতরাং গ্রামের মধ্যে পঞ্চানন নামজাদা ব্যক্তি। কিন্তু তা' সত্ত্বেও, শুধু পঞ্চানন বলিলে কেহই তাহাকে চিনিবে না; যেহেতু.....

'যেহেতু'টা একটু বিশদভাবে বলা দরকার।

পাঁচপুর গ্রামটা নদীয়া জেলার মধ্যে। পাঁচপুরের ক্রোশ-আড়াই দূরে—অশ্বত্থডাঙ্গা। অশ্বত্থডাঙ্গার পঞ্চানন ঠাকুর ও-তল্লাটে খুব বিখ্যাত ও জাগ্রত। যাহাদের সন্তান হয় না, বা হইয়া বাঁচে না, তাহারা এই পাঁচুঠাকুরের দোর ধরিয়া 'মানত্' করিলে, সন্তান হয় এবং রক্ষা পায়। তাই এ-অঞ্চলে পাঁচুঠাকুরের দোর-ধরা ছেলে মেয়ের সংখ্যা অধিক—শতকরা প্রায় বিশ-পঁচিশ জন। ইহাদের সকলেরই নাম—ছেলে হইলে পঞ্চানন, মেয়ে হইলে—পঞ্চাননী। পাঁচপুরের পঞ্চাননের সংখ্যা, বর্ত্তমানে—সাত জন। সুতরাং সহজে যাহাতে সনাক্ত করিতে পারা যায়, সেজন্য প্রত্যেক পঞ্চাননের সঙ্গে সাধারণে একটি করিয়া—বিশেষণ যোগ করিয়া দিয়াছে। ইহাকে নামের নেজুড় বলা চলে না; টিকি বলা যাইতে পারে। পাঁচপুরের সপ্ত পাঁচুর টিকি যথাক্রমে—বগাই' 'নেকো' 'টেরো' 'মোটা' 'ন্যাটা' 'বেঁটে' 'বোকা'—অর্থাৎ বগাই পাঁচু, নেকো পাঁচু টেরো পাঁচু, মোটা পাঁচু, ন্যাটা পাঁচু, বেঁটে পাঁচু এবং সকলকে ঝক্ মারিয়া আমাদের পঞ্চানন—বোকা পাঁচু। কিন্তু এই গৌরব-আখ্যা কেন যে তাহাতে বর্ত্তিত হইয়াছিল, কোন্ সূত্রে তাহার এই টিকিকরণ হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা কঠিন; যেহেতু বোকামীর কোন চিহ্নই তাহার কথায় ও কাজে পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র সংসারের সকল দিকেই তাহার সতর্ক দৃষ্টি, সকল খুঁটিনাটির প্রতিই তাহার তীব্র লক্ষ্য। বাপ নিতাইচাঁদ মারা যাইবার পর হইতে এই দশ বৎসর কাল সংসারের যেদিকেই জল পড়িয়াছে, বুদ্ধি এবং চাতুর্য্যের সহিত সেই দিকেই সে ছাতা ধরিয়াছে। পিতার আমলে সংসারের যে-একটা বিশৃঙ্খল রূপ ছিল, তাহার আমলে তাহা শৃঙ্খল যুক্ত হইয়াছে। অথচ, সে হইল বোকা-পাঁচু! গভীর জাগতিক রহস্য! বরং তাহার নাম—'কুচ্‌পরোয়া পাঁচু' রাখিলে মানাইত; কারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে অনাবশ্যক ঐ শব্দটীর বহু-ব্যবহার, তাহার একটি মুদ্রাদোষের মধ্যে ছিল।

শ্রাবণ মাস। সারাদিনই আকাশ মেঘে আঁধার আর মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝরঝরানি। ছোট্ট বৈঠকখানা ঘরটিতে একাকী বসিয়া পঞ্চানন অনেক কিছুই ভাবিতেছিল। বাহিরের বারিবর্ষণ আজ যেন তাহার অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার সকল উৎসাহ ও কল্পনাকে ভাসাইয়া দিতেছিল। তারি মধ্যে, অন্তরের অন্ধকারে বারে বারে ফুটিয়া উঠিতেছিল গৌরীর মুখখানা। গৌরী তাহার স্ত্রী; সেই সাবেক কালের স্ত্রীর মত স্ত্রী। সদাহ একগলা ঘোমটা, পদে পদে অনাবশ্যক আড়ষ্টতা, বুকভরা লজ্জা, ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তি, ব্রত-নিয়মের প্রতি প্রীতি, আর হাজার রকম অন্ধ-সংস্কার তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে

সাপের মত জড়াইয়া রাখিয়াছে। আর কোনদিক দিয়াই পঞ্চাননের অশান্তি বা অতৃপ্তি ছিল না; ছিল শুধু—নামের দিক দিয়া এবং গৌরীর দিক দিয়া। পঞ্চানন এরূপ স্ত্রী চায় না। গৌরীকে সে সাবেক কালের অকর্মণ্য গৃহবধূ বলিয়া মনে করে, যারা একালে অচল। স্বামীর সে জীবনসঙ্গিনী নয়। সে চায়—জীবনসঙ্গিনী। মুক্ত জানালার ফাঁকে সিক্ত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিয়া বহুক্ষণ পর্য্যন্ত পঞ্চানন আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভাবিল। তারপর একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল এবং মনে-মনে বলিল—"বুচ্ পরোয়া নেই! দেখা যাক—কি হয়।"

* * * *

শয়নঘরের মেঝেয় বসিয়া পঞ্চানন একটা হিসাবের খাতা দেখিতেছিল আর গৌরী অদূরে চুপ করিয়া বসিয়া সেইদিকে চাহিয়াছিল।

আজ পাঁচসাতদিন হইল পঞ্চানন একখানা খাতা বাঁধিয়া গৌরীকে দিয়াছিল, সংসারের প্রাত্যহিক খরচগুলি তাহাকে সেই খাতায় লিখিতে হইবে। এতবড় একটা ভীষণ কাজ লইতে গৌরী কিছুতেই রাজী হয় নাই, কিন্তু পঞ্চানন তাহার আপত্তিতে কর্ণপাত করে নাই। পুরুষ মানুষের মত খাতায় রোজ হিসাব লেখা, গৌরীর এত লজ্জা করে! কেউ যদি কোনদিন দেখিয়া ফেলে তাহা হইলে কি লজ্জার কথা!

খাতা হইতে মাথা তুলিয়া পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল "পঁয়ত্রিশ আনার ক' আনা নাবে?'

বলিদানের ছাগের মত কম্পিত অন্তরে গৌরী বলিল—'পঁয়ত্রিশ? পঁয়ত্রিশের ত পাঁচ নাবে।'

'পঁয়ত্রিশের পাঁচই নাবে বটে, কিন্তু পঁয়ত্রিশ আনার ত পাঁচ আনা নাবে না; তিন আনা নাববে। আর মিছরী পাঁচ গণ্ডা নয়, পাঁচ পো।'

'ওসব হিসেব-টিসেব রাখতে আমি পারব না।'

'বুচ্ পরোয়া নেই; তোমাকে রাখতেই হবে'—বলিয়া পঞ্চানন খাতাখানা বন্ধ করিল। বাহিরের কে তাহাকে ডাকিতেছিল।

বাহিরে আসিয়া দেখিল, ও-পাড়ার ভয়কালী খুড়া। খুড়া কহিলেন—'বাবাজি, একটি জিনিস আমাকে দিতে হবে।'

পঞ্চানন কহিল—'কি বলুন?'

'একটু পুরণো ঘি, বাবা। কোথাও আর পেলুম না; রাখাল বল্লে, বোকা পাঁচুর কাছে যান, পাবেন।'

পঞ্চাননের মুখখানা বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিল। কি কুক্ষণেই যে তাহার মা পঞ্চাননের দোর ধরিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে মা-বাপের উপর একটা ক্রোধের ভাব জমিয়া উঠিল।

রাত্রে গৌরী পঞ্চাননকে বলিল—'দেখ আজ ক'দিন হল 'অম্বল'টা আমার বড্ড বেড়েচে; কোবরেজ মশায়ের কাছ থেকে ওষুধটা এনে দেবে?'

পঞ্চানন কহিল—'কোবরেজ মশাই বোলচেন, নিয়মে খাওয়া-দাওয়া না করলে, শুধু ওষুধে বিশেষ ফল হবে না। রোজ বেলা দেড়টা দুটোর সময় ভাত খেলে ঐ 'অম্বলে'ই তোমাকে মরতে হবে। দুটি মাছের ঝোল ভাত সকাল-সকাল তোমায় রোজ খেতে হবে।

গৌরী কহিল—'ঠাকুরের ভোগ হবে, তারপর তুমি খাবে, তবে ত আমি খেতে পারব। তার আগে কি করে খাব?'

'কুচ্‌পরোয়া নেই; তার আগে তুমি খেতে পারবে না?'

'তা কি হয়? ঠাকুরের আগে, তোমার আগে আমি কি করে খাব?'

'নিজের শরীর বাঁচাবার জন্যেও পারবে না?'

'না। বেলায় খেলেও যে ওষুধে উপকার হয়, সেই রকম ওষুধ যেন কোবরেজ মশাই দেন। তেমন ওষুধ নেই? ওষুধ ত সব রকমই থাকে।'

পঞ্চানন আর কোন কথা কহিল না।

পরদিন বাজার যাইবার পথে পিছন হইতে পঞ্চাননকে কে ডাকিল—'বোকা দা!'

অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে ফিরিয়া দাঁড়াইতেই নীলমণি কহিল—'কাল নরেন এসেচে। এবার দু'তিন দিন থাকবে।'

নরেন্দ্রনাথ নীলমণির ভগিনীপতি। পঞ্চাননের একজন পুরাতন বন্ধু; কেষ্টনগর কালেজে দু'জনে একসঙ্গে পড়িত। কিন্তু দুই বন্ধুর ভাগ্য দুই জনকে বিপরীত দিকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। একজন পাঁচপুরের 'বোকা পাঁচু' হইয়া অশিক্ষিতা সেকেলে স্ত্রীর স্বামীরূপে পাড়াগাঁর বৈচিত্র্যবিহীন জীবন কাটাইতেছে, আর একজন, নব্য-সভ্য-শিক্ষিতা স্ত্রীভাগ্যে গর্ব্বিত হইয়া, 'কিং ফিমে'র শ্রেষ্ঠ 'আর্টিষ্ট'রূপে সংসারে স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছে। ভাগ্যের এই বিড়ম্বনার কথা ভাবিতে ভাবিতে পঞ্চানন গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। বাড়ী পৌঁছাইয়া দেখিল, সদরের রোয়াকের উপর নরেন তাহার অপেক্ষায় পায়চারী করিতেছে।

পঞ্চাননের মা সেদিন বাড়ী ছিল না। ক্রোশ-তিনেক দূরে নবগ্রামের কালীবাড়ী গিয়াছিল। ভাদ্রমাসে নবগ্রামের বাসীদর্শনে খুব পুণ্য; তাই গ্রামের দশ-বারজন স্ত্রীলোক মিলিয়া খুব ভোরে রওনা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যায় সকলে ফিরিবে।

পঞ্চানন নরেনকে বাড়ীর মধ্যেই লইয়া গিয়া বসাইল এবং গৌরীকে চা ও হালুয়ার ব্যবস্থা করিতে বলিল।

নরেন চোখের চশমাটা খুলিয়া ভাল করিয়া একবার মুছিয়া লইল; তারপর একটা বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া কহিল "দিব্যি আছ বাবা! কোন ঝক্কি নেই। বুড়ী মরে গেলে আর কোন হাঙ্গামাই থাকবে না; তখন শুধু 'হার মেজেষ্টি' আর হিজ্‌ হাইনেস্‌!'—বলিয়া একটা উচ্চ হাসির রোল তুলিল। তারপর চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া বলিল—"গিন্নীর নামটি কি হ্যা? গিন্নী নিজে চা না দিয়ে গেলে কিন্তু খাচ্চি না, কিছুতেই না; তুমি বরং গিয়ে বোলে এস। কি? চুপকরে রইলে যে?"

পঞ্চানন কি একটা দুঃখের কথা ক্ষণেকের জন্য ভাবিয়া লইল; বলিল—"কুচ্‌-পরোয়া নেই, ক'দিন আছ বল।"

"আছি আজ, এবং থাকবো কালও। কৈ, যাও হে; চা কতদূর—দেখে এস।"

পঞ্চানন উঠিয়া রান্নাঘরে গেল এবং দেখিল চা ও হালুয়া তৈরী। গৌরীর একপাল ঘোমটা। ঘোমটা সরাইয়া কহিল "চা ঠাণ্ডা হোয়ে যাবে; নিয়ে যাও।"

"নিয়ে যাব কি, তুমি দিয়ে এস। ও আমার বিশেষ বন্ধু, লজ্জার ত কিছু নেই।"

'আমি দিয়ে আসবো কি গো? সে আমি কিছুতেই পারব না।"

"কুচ্‌-পরোয়া নেই, তোমাকে যাইতেই হবে। মানুষের সামনে মানুষ যাবে, এতে লজ্জা করবার ত কিছু নেই। আমি যাচ্চি, তুমি নিয়ে এস।"—অগত্যা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

গৌরীর গা ঘামিয়া উঠিয়াছিল ; বলিল—"তুমি নিয়ে যাও, আমি কিছুতেই পারবো না ; তোমার পায়ে পড়ি, তোমার....."

বাধা দিয়া বিরক্তভাবে পঞ্চানন কহিল—"কোন কথা নয়, তোমাকে দিয়ে আসতেই হবে।"—পঞ্চানন চলিয়া গেল।

গৌরী—একমিনিট পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর একহাতে চায়ের বাটি, আর এক হাতে হালুয়ার ডিশ্ লইয়া এব-পা এক-পা করিয়া শয়ন ঘরের দিকে অগ্রসর হইল। মুক্ত জানালার ফাঁকে সেই অবস্থায় গৌরীকে বারান্দা দিয়া আসিতে দেখিয়া, নরেন উল্লাসের স্বরে বলিয়া উঠিল—"আরে চমৎকার বউ তোমার হে! ভেরী নাইস্! বাঃ! বাঃ!"

সঙ্গে-সঙ্গেই এককাণ্ড ঘটিয়া গেল। কন্ কন্ করিয়া চায়ের কাপ এবং হালুয়ার ডিশ্ গৌরীর কম্পিত হাত হইতে মেঝেয় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল এবং নিজেকে সে কোনরকমে সামলাইয়া লইয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, টলিতে টলিতে, রান্নাঘরে আসিয়া নির্জীবের মত দেওয়াল ধরিয়া বসিয়া পড়িল।

* * * *

কলিকাতার একটি মেসের দ্বিতলস্থ একখানি কক্ষ। রাত্রি প্রায় একপ্রহর।

"কি হয় বিহারী বাবু?"

একখানা নভেল হইতে মাথা তুলিয়া বিহারী বাবু বলিলেন—"এই একখানা বই পড়ছি।"

"কি বই ওখানা?"

"হৃদয়ে ফুটেছিলো যে কুসুম"।

"বইয়ের নাম ওই অতবড়!—চলুন ; খেতে যাবেন না?"

"কুচ্ পরোয়া নেই, আপনি—অগ্রগামী হোন, আমি পশ্চাদ্গামী হচ্ছি"—বলিয়া বিহারী বাবু—'হৃদয়ে ফুটেছিল যে কুসুম'এ মন সংযোগ করিলেন ; কিম্বা সোজা কথায় বলা যায়,—পঞ্চানন বইখানা আবার পড়িতে লাগিল।

প্রায় একমাস হইল পঞ্চানন কলিকাতায় আসিয়া এই মেসে অবস্থান করিতেছে। এখানে আসিয়াই সে তাহার নাম ডুবাইয়াছে। তাহার চিরকালের চলিত নাম পঞ্চাননকে চাপা দিয়া তাহার উপর তাহার রাশি-নাম 'বিহারী'র লেবেল্ আঁটিয়া দিয়াছে। দীর্ঘ ৩২ বৎসর পরে স-টিকি পঞ্চাননের অকাল-মৃত্যু ঘটলেও, ত্রয়োদীপ্ত বিহারীকে টিকিদানে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। পাঁচপুরের পঞ্চানন কলিকাতায় আসিয়া নিজেকে বিহারীতে পরিবর্ত্তিত করিলেও তাহার ভাগ্যে নূতন টিকিলাভ আপনা হইতেই হইয়া গেল। এই মেসে আর-এক বিহারী বাবুও ছিলেন। এই দুই বিহারী বাবুর মধ্যে প্রথম দিনকতক বিশেষভাবে ঠোকা-ঠুকি হইবার পর, আপনা হইতে যেন ইহার মীমাংসা হইয়া গেল। পুরাতন বিহারী বাবু বিহারী বাবুই থাকিয়া গেলেন ; নূতন বিহারী বাবু হইলেন—'কুচ্বিহারী' বাবু। সহসা এতবড় একটা অঘটন কে ঘটাইল, কবে ঘটাইল, কখন ঘটাইল, কেমন করিয়া ঘটাইল, তাহা নিরূপণ করা দুরূহ ; কিন্তু ঘটিয়াছিল। তার সাক্ষী, উক্ত ভদ্রলোকটি পঞ্চাননকে ডাকিয়া নীচে খাইতে আসিলে, যে পিঁড়িটার উপর বসিতে যাইতেছিলেন, বামুন ঠাকুর সেই পিঁড়িখানাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল—"ওখানায় বসবেন না, ওটা বেহারী বাবুর ঠাঁই।"

"কোন্ বেহারী বাবু?"

"কুচ্বেহারী বাবু।"

সুতরাং পঞ্চানন আর বোকাপাঁচু নয় বা বোকারা' ও নয়;—পঞ্চানন এখন কুচ্‌বিহারী।

কুচ্‌বিহারী দ্বিতলে যে ঘরে থাকে, সেই ঘরের রুজু-রুজু রাস্তার অপর পারের একখানি ঘরের জানালায় প্রায়ই একটি অবিবাহিত তরুণীকে দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময়ে এঘরের জানালার ধারেও কুচ্‌বিহারীর আবির্ভাব ঘটে। রাস্তার একটা ইলেক-ট্রিক পোষ্টে একখানা ঘুড়ি ছিন্নভিন্ন অবস্থায় আটকাইয়া-ছিল। উভয়েই বোধ হয় একই সময়ে ঐ ঘুড়িখানি দেখিতে ইচ্ছা করিত এবং ভালবাসিত, তাই একই সময়ে উভয়ে উভয়ের জানালার সামনে আসিয়া দাঁড়াইত।

জ্যামিতির একটা সূত্র আছে—'যদি দুইটি বস্তুই অন্য আর একটি বস্তুর সমান হয়, তাহা হইলে উক্ত দুই বস্তুও পরস্পর সমান।' এখানে কুচ্‌বিহারী ক এবং তরুণী খ, উভয়েই যখন তুল্যভাবে ঘুড়িখানার প্রতি আকৃষ্ট, তখন ক ও খ উভয়েই সমান; অর্থাৎ উভয়েরই বাক্য সমান, ইচ্ছা সমান এবং অন্তর সমান। এবং এই সমান হওয়ার ফলে—

একদা কোন্ ফাঁকে,
জড়া'ল পাকে-পাকে,
এই দুটি প্রণয়ী হৃদয়।

এবং বিধির বিধান অনুযায়ী, একদা এক হেমন্ত সন্ধ্যায় এই দুটি শিক্ষিত ও শিক্ষিতা অন্তর, পরিণয়ের পুণ্য বন্ধনে আবদ্ধ হইল।

পাঁচপুরের পঞ্চাননের মনের মধ্যে যে দুইটি বিষয়ে অশান্তি ও অতৃপ্তি ছিল, কলিকাতায় আসিবার ফলে তাহা এইভাবে দূর হইয়া তাহাকে পরিপূর্ণ শান্তি ও তৃপ্তির অধিকারী করিয়া তুলিল।

* * * *

শুভবিবাহের পর একমাস এখনো অতিবাহিত হয় নাই; নবদম্পতির মধ্যে নিম্নপ্রকার সুখালাপ হইতে-ছিল।

কুচ্‌বিহারী বলিল—"দেখ কুমকুম, এখন তুমি এক-জনের স্ত্রী হোচ্ছে; এখন তোমার এরকম যার-তার সঙ্গে এখানে সেখানে ঘোরাঘুরি অশোভনও বটে, অন্যায়ও বটে। এরকম চলবে না কিন্তু।"

আই-এ পাশ শ্রীমতী কুমকুম কহিল—"আলবৎ চলবে। বিয়ে হয়েচে বোলে, আমার অন্তরের স্বাধীনতা ত তোমার পায়ে বিসর্জ্জন দিই নি।"

"দাও নি?"

"না। আমি ত আর সেই বক্তিয়ার খিলিজির আমলের অশিক্ষিত তুর্কী স্ত্রী নয়, যেমন শুনতে পাই তোমার দেশের সেই স্ত্রী রত্নটি। কি তার নামটি? সৌরী না? যেমনতরো বিংবা অমনধারা হোলে বোধ হয় আরো মানানসই হোত।"

"কুচ্‌পরোয়া নেই; আজ সারাদিন তুমি ছিলে কোথায়?"

"আজ আমাদের 'নৃত্য-বীথিকা'র অধিবেশন ছিল। তোমায় আমারও একটা প্রশ্ন করবার আছে। তুমি আমাকে না জানিয়ে আমার 'ব্যাঙ্কের বাণ' খুলে কি খোঁজ করত? জানবে, that's a crime!"

"কুচ্‌পরোয়া নেই; আচ্ছা তুমি যাও।"

"আমি ত নিজেদের বাড়ীতেই আছি, যাব কোথা?"

বলা বাহুল্য যে কুচ্‌বিহারী বিবাহের পর হইতেই মেস ত্যাগ করতঃ তল্পি-তল্পা লইয়া শ্বশুরের আলয়ে আসিয়া আছে এবং যে পাঁচশত টাকা সে মেসে জমা করিয়া আসিয়াছিল, তাহা শ্বশুরের হস্তে প্রদান করিয়াছে।

আর একদিনের আলাপ—

'কুম্‌কুম্!'

"আজ্ঞা করুন মহারাজ।"

"তোমার নামটি খুব মধুর!"

"হুঁ, মধুরই মত।"

"তুমি নিজেও খুব সুন্দর; কিন্তু....."

"কিন্তু—মোটে শ'পাঁচেক টাকা সংসারে দিয়েছ, কিছু টাকা কড়ির দরকার হোয়েছে যে। আমাদের দুজনের খরচ ত অনেকই হয়। বাবার কাছে আমার বড় লজ্জা হয়।"

"কুচ্‌পরোয়া নেই। কিন্তু আমি ত এই সেদিন পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা আমাদের দু'জনের খরচের জন্য দিলুম; আবার এরি: মধ্যে ..... "

"সে ত প্রায় মাস দেড়েক হোতে চল্লো। তার থেকে আমার কয়েকখানা সাড়ী, ব্লাউজ, আর কিছু কিছু অন্য জিনিষ কিনতেই ত শ'আড়াই টাকা খরচ হোয়ে গেছে।"

ঘরের ছাদটা যেন নামিয়া আসিয়া কুচ্‌বিহারীর মাথায় চাপিয়া বসিল। কুম্‌কুম্ কহিল—"বার মাসে অন্ততঃ হাজার দুই টাকা খরচ বাবদ তোমাকে বাবার হাতে দিতে হবে ত।"

"কুচ্‌পরোয়া নেই; কিন্তু কি বলচো তুমি? দুটো লোকের জন্তে বছরে দু'হাজার টাকা!"

"তবে কি পাঁচশো টাকায় দু'জনের একবছর চলবে?"

"আজ সুশীল ডাক্তারের গাড়ী করে কোথায় গিয়েছিলে তুমি?"

"সুশীলবাবু বাবাকে দেখতে এসেছিলেন। ভদ্রতার খাতিরে তাঁকে একটু এগিয়ে দাওয়া দরকার ত?"

"এগিয়ে দিতে সারাদিনটা লেল? কুচ্....."

"কুচ্ ডর্ নেহি প্রিয়তম। আমি তোমার জীবন রাসমঞ্চে রাসমন্ত্রী—, তুমি রাসবিহারী, কুম্‌কুমের নালিশের সারাজীবন তোমায় রাজিয়ে রাখবো।"

কুচ্‌বিহারী আর কোন কথা না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

• • • •

আজ দুইদিন হইল কুচ্‌বিহারীর জ্বর হইয়াছে। একেলা বিছানায় শুইয়া থাকিয়া আকাশ-পাতাল অনেক কিছুই ভাবিতেছে। শাশুড়ী এক বাটি জল সাগু মাথার ধারে রাখিয়া দিয়া বলিল—"খেয়ে ফেল বাবা। মুখপোড়া গয়লার ৩-মাসের দুধের দাম বাকী আছে বোলে, একেবারে পুকুরের জলগুলো গুপু ঢেলে দিয়ে যাচ্চে। তার চেয়ে এই জল সাবুই ভাল। খেয়ে ফেল বাবা, নেবু দিয়ে দিয়েছি।"

খানিক পরে বাইরে কোথাও থেকে ঘুরিয়া আসিয়া কুম্‌কুম্ ঘরে প্রবেশ করিল; কহিল—"কেমন আছ?"

"বড্ড মাথাটা ধরেচে।"

কুম্‌কুম্ তৎক্ষণাৎ দেরাজ খুলিয়া একটা অডিকলোনের শিশি বাহির করিয়া এবং তাহাতে নেকড়া ভিজাইয়া কুচ্‌বিহারীর কপালে পট্টি লাগাইয়া দিল।

পরদিন সমস্ত দিনটা কুম্‌কুমকে দেখিতে না পাইয়া কুচ্‌বিহারী শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"কি জানি বাবা, তাদের আজ কিসের মহলিস হবে; এত কোরে বলুম, যে বাড়ীতে অসুখ, আজ আর কোথাও যাস নি, তা ....."

সেদিন অনেক রাত্রে কুম্‌কুম্ বাড়ী ফিরিল। কুচ্‌বিহারীকে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মাথাটা একটু টিপে দোবো?"

"না; কুচ্‌পরোয়া নেই"—বলিয়া কুচবিহারী ওদিকে পাশ ফিরিল।

সে-রাত্রে মোটেই তাহার ঘুম হইল না। সারা রাত ধরিয়া হাজার রকমের চিন্তা তাহার দুর্ব্বল দেহ-মনকে আরো অবসন্ন করিয়া তুলিল। যে তৃপ্তি ও আনন্দের মিথ্যা আশায় সে এক পথ হইতে আর এক পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এখন দেখিল, এ পথের দুঃখ এবং ব্যথা নিদারুণ। সে মরিয়া হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে-সঙ্গে স্থির করিয়া ফেলিল,—"কুচ্‌পরোয়া নেই; এপথও নয়, ওপথও নয়, সন্ন্যাসী হব।"

শেষরাত্রে অতি সন্তর্পণে সে শয্যা হইতে উঠিল। দেখিল, কুমকুমের গলার হার ও কাণ-পাশা জোড়া মাথার বালিশের পাশে রহিয়াছে। শয়নকালে প্রত্যহই কুম্‌কুম্ হার ও পাশা খুলিয়া এইভাবেই রাখিত। কুচবিহারী অতি সাবধানে জিনিষ দুইটি লইয়া, পকেটে রুমালের সঙ্গে জড়াইয়া রাখিল। তারপর নিঃশব্দে দরজার খিল খুলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। সে রাত্রে তাহার জ্বর আসে নাই।

বেলা প্রায় দশটার সময় কুচবিহারী হাওড়া ষ্টেশনে আসিল এবং বুকিং আফিসে একখানা দশটাকার নোট দিয়া বলিল—"একখানা টিকিট দিন ত?"

"কোথাকার টিকিট দেবো?"

"যেখানের হউক দিন—বদ্ধিনাথ কি গয়া; আচ্ছা বেনারসেরই দিন।"

পশ্চিমের গাড়ীর তখন ঘণ্টা দেড়েক দেরী ছিল। টিকিটখানা পকেটে রাখিয়া কুচবিহারী একখানা বেঞ্চের উপর আসিয়া বসিল। আজ সন্ন্যাসের পথে পা বাড়াইবার প্রাক্কালে তাহার মনে অনেক কথা উদয় হইতে লাগিল—

"কুমকুম্! ভাই-এ, পাশ। দেখতে শুনতে বাইরে থেকে চমৎকার! কিন্তু যাক্—ও আর ভাববো না। গৌরি—গৌরি—বর্ত্তমান যুগের অনেক পেছনে পড়ে আছে! একদম সেকেলে প্যাটার্ণ। কিন্তু বেচারা একবারেই নিরীহ! ভারি লাজুক—যেন লজ্জাবতী লতা! বন-হরিণীর মত সদাই যেন সন্ত্রস্ত! অত গো-বেচারিকে নিয়ে .....কিন্তু..... .....কিন্তু কামনাগিনীর চেয়ে বনহরিণী হাজার গুণে ভালো। আমার অসুখ-বিসুখ করলে সঙ্গে-সঙ্গে তারও আহার নিদ্রা বন্ধ। নিজের শরীরের ভালোমন্দের দিকে একেবারেই ওর ..... আর আমার ভালোর জন্য ঠাকুর-দেবতার কাছে কী মাথা ঠুকতেই পারে!"

কুচবিহারী বড় ঘড়িটার দিকে একবার চাহিয়া দেখিল; গাড়ীর এখনো অনেক দেরী। তাহার চিন্তারও বিরাম নাই

"বোকা পাচু! বোকা দা'। বিশ্ব..... কিন্তু মস্ত একটা আত্মীয়তার—একটা ভালোবাসার সুর ছিল ঐ ডাকের মধ্যে। যা'ক ওসব..... কুমকুমরা আর আমার পাত্তাই পাবে না। বলেছি—ময়মনসিংহে দেশ; বোধ হয় একবার সেখানে খোঁজ-খবর করবে। শর্ম্মা এদিকে বেনারস!.....মা, আমায় দেখা না পেলে আর বেশী দিন বাঁচবে না। মাও মারা যাবে, গৌরিও মারা যাবে!..... গৌরি কিন্তু....."

গাড়ী বাঁশী দিতে দিতে প্ল্যাটফরমে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গেই যাত্রীরা সোরগোল তুলিয়া গাড়ীর মধ্যে উঠিতে লাগিল। কুচবিহারীও উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে থেকে কে-একজন জিজ্ঞাসা করিল—আপনি যাবেন কোথায়?"

"বেনারস।"

"ওকি মশাই, টিকিটখানা যে ছিঁড়ে ফেললেন?"

কথার উত্তর না দিয়া কুচ্‌বিহারী একপা একপা করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিল এবং শিয়ালদ'র 'বাসে' চাপিয়া বসিল।

ষ্টেশনে তখন দুই নম্বর প্ল্যাটফরমে রাণাঘাট লোক্যাল দাঁড়াইয়াছিল। তাড়াতাড়ি একখানা টিকিট কিনিয়া গাড়ীর মধ্যে আসিয়া বসিতেই, পাশের এক-জন লোক জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাবেন আপনি?"

"পাঁচপুর।"

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমাল দ্রুমৈঃ
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমম্ রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ।

কবি এই রহস্যময় শ্লোকে তাঁহার অতুলনীয় প্রেম গীতিকাব্য শ্রীগীতগোবিন্দের সূচনা করিয়াছেন। আজ আটশত বৎসর ধরিয়া এই গীতিকাব্যখানি প্রেমিক ভক্ত ও সুরসিক সাহিত্যসাধকগণকে আনন্দ দান করিয়া আসিতেছে। কবির বর্ণনার বিষয় বাসন্তরাস। কিন্তু সূচনা শ্লোকে বর্ষার বর্ণনা নানা প্রশ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। আটশত বৎসর ধরিয়া টীকাকার স্বয়ং ব্যাখ্যাতাগণ এই শ্লোকের নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসা আজিও শেষ হয় নাই। সুতরাং আলোচনারও আবশ্যকতা ফুরায় নাই। আমিও একজন জিজ্ঞাসু। রসজ্ঞগণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের অবতারণা।

গত সন ১৩৩৬ সালে আমার সম্পাদিত "কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ" গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সে সময় আমি এই প্রথম শ্লোকের সম্প্রদায়-সম্মত ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাহার পর দীর্ঘ পঞ্চদশ বৎসর অতীত হইয়াছে। ইতি মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন আবিষ্কারে এই শ্লোকের উপর কথঞ্চিৎ আলোক সম্পাত হওয়ায় নূতন অনুমানের অবকাশও পাওয়া গিয়াছে। এই নিবন্ধে তাহারই আলোচনা করিব।

গত সন ১৩৫০ সালের শ্রাবণ সংখ্যা "ভারতবর্ষে" ভারত প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এম-এ, ডী-লীট্ মহাশয় "শ্রীজয়দেব কবি" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে তিনি "সদুক্তি কর্ণামৃত" হইতে দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের "নন্দ-নিদেশতঃ" শব্দের অর্থ গোপরাজ নন্দের আদেশ ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। শ্রীগীতগোবিন্দের যে

টীকা প্রচলিত আছে। ইহার মধ্যে অসাম্প্রদায়িক টীকাও আছে। "নন্দ নিদেশত." শব্দের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন টীকাকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অনেকে "নন্দ নিদেশতঃ" শব্দের গোপরাজ নন্দের আদেশ অর্থও ধরিয়াছেন। আবার অনেকে এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই। কেহ কেহ "নন্দ নিদেশতঃ" অর্থ "আনন্দ জনক সখী বাক্য" ধরিয়াছেন। আমি কোন লিখিত গ্রন্থ না পাইলেও সম্প্রদায়পরম্পরা প্রচলিত গুরুমুখী সিদ্ধান্ত অনুসারে নন্দ শব্দে বংশী অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলাম। এইরূপ অর্থ গ্রহণে কোন বাধা না থাকিলেও শ্লোকটীর দৃশ্যতঃ আক্ষরিক অর্থ যে গোপরাজ নন্দের আদেশ এবং ইহার অধ্যাত্মিক অর্থের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই ডক্টর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ইহাই বক্তব্য। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্ধৃত শ্লোক দুইটি শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী সংকলিত পদ্যাবলীর মধ্যে আছে। পদ্যাবলীতে দুইটী শ্লোকই সম্রাট লক্ষ্মণ সেনের নামে আছে। কিন্তু সদুক্তিকর্ণামৃতে একটি শ্লোকের রচয়িতা রূপে যুবরাজ কেশব সেনের নাম পাওয়া যাইতেছে। শ্লোক দুইটী এই—

লক্ষ্মণ সেনের শ্লোক—(পদ্যাবলী ২০৩ সংখ্যকশ্লোক)

কৃষ্ণ যদ্ বনমালয়া সকৃতং কেনাপ্যুপি কুঞ্জোদরে
গোপীকুন্তলবর্হদাম তদিদং প্রাপ্তং ময়া গৃহ্যতাম্।
ইত্থং দুগ্ধমুখেন গোপশিশুনাখ্যাতে ত্রপানম্রয়ো
রাধা মাধবয়ো র্জয়ন্তি বলিত স্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥

কৃষ্ণ, আমি কুঞ্জ মধ্যে গোপীকুন্তল (কোন গোপকিশোরীর দীর্ঘকেশ) লগ্ন ময়ূরচন্দ্রিমামাল্যযুক্ত তোমার এই বনমালা প্রাপ্ত হইয়াছি, গ্রহণ কর। কোন দুগ্ধমুখ (অজ্ঞান) গোপশিশুর মুখে এই কথা শ্রবণ জনিত রাধামাধবের লজ্জাবিনম্র স্মেরালস দৃষ্টির জয় হউক। অর্থাৎ এই কথা শুনিয়া রাধামাধবের "চক্ষুস্থির" হইয়াছিল। সেই লজ্জানত ঈষৎহাস্যযুক্ত দৃষ্টির জয় হউক।

কেশব সেনের রচিত শ্লোক—(পদ্যাবলী সং ২০৭)

আহূতাস্ম মহোৎসবে নিশি গৃহং শূন্যং বিমুচ্যাগতা
স্ত্রীঃ প্রেষ্যজনঃ কথং কুলবধূরেকাকিনী যাস্যতি।
বৎস ত্বং তদিমাং নয়ালয়ম্ ইতি শ্রুত্বা যশোদাগিরো
রাধামাধবয়ো র্জয়ন্তি মধুরস্মেরালসা দৃষ্টয়ঃ॥

রাধা আমার উৎসবে আমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছেন। গৃহে দ্বিতীয় কেহ নাই। কুলবধূর একাকিনী যাওয়া উচিত নহে। এদিকে ভৃত্যগণ মধুপানে মত্ত হইয়া রহিয়াছে। অতএব কৃষ্ণ, তুমি ইহাকে গৃহে রাখিয়া আইস। শ্রীমতী যশোদার এই কথা শুনিয়া রাধামাধবের যে মৃদুহাস্যময় মধুর দৃষ্টি বিকশিত হইয়াছিল, সেই দৃষ্টির জয় হউক।

সম্রাট ও যুবরাজ রচিত শ্লোক দুইটী হইতে এই অনুমান স্বাভাবিক যে কবি জয়দেবরচিত শ্রীগীত গোবিন্দের প্রথম শ্লোক পাঠে আনন্দিত হইয়া পিতা পুত্রে ঐ শ্লোক দুইটী লিখিয়া কবিকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। এবং দ্বিতীয় শ্লোকটী জয়দেবরচিত শ্লোকের প্রতিশ্লোক বা প্রত্যুত্তর। কবিরচিত প্রথম শ্লোকের অর্থ—"আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, বনভূমিও তমালতরুনিকরে শ্যামায়মান হইয়াছে। তাহাতে আবার রাত্রি কাল। কৃষ্ণ ভয় পাইয়াছে, হায়, তুমি তাহাকে লইয়া গৃহে যাও, এইরূপ নন্দ নিদেশে গৃহ গমনোদ্যত রাধামাধবের যমুনাতীরবর্তী প্রতি পদতল কুঞ্জতলের নির্জ্জন কেলি জয়যুক্ত হউক!"

কেশব সেন রচিত শ্লোকের "যশোদাগিরো" শব্দের যেমন অন্য অর্থ গ্রহণ করা চলে না, সেইরূপ কবি

রচিত "নন্দ নিদেশতঃ" শব্দেরও অন্য অর্থ অপব্যাখ্যাই হইবে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মূলতঃ ইহাই বলিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে অনুমান করিয়াছেন সম্রাট হয়তো 'রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি' শ্লোকাংশ পাদ পূরণার্থ সভাসদগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কবি জয়দেব তাহারই প্রতি উত্তরে শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, এবং পরে সম্রাট ও যুবরাজ সদুক্তি-কর্ণামৃত ধৃত শ্লোক দুইটী রচনা পূর্ব্বক অন্যরূপেও যে 'রাধা মাধবয়োর্জয়ন্তি' শ্লোকাংশের পাদপূরণ করা যায় এইরূপ দেখাইয়াছিলেন, এই অনুমানের কোন ভিত্তি আছে বলিয়া আমি মনে করি না। কেন করি না তাহা বলিবার পূর্ব্বে শ্রীগীতগোবিন্দ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলা আবশ্যক।

পূর্ব্বে কেহ কেহ এই মত পোষণ করিতেন যে শ্রীগীত গোবিন্দের গান কয়েকটী কবি জয়দেব রচনা করিয়াছিলেন। পরে কেহ শ্লোকগুলি রচনা পূর্ব্বক গানগুলির সংযোগসূত্ররূপে যোগ দিয়া সম্পূর্ণ কাব্য সঙ্কলন করেন অর্থাৎ শ্রীগীতগোবিন্দকে কাব্যের আকার দান করেন। এরূপ অনুমানের একতম কারণ গানগুলি অতি সুললিত ভাষায় রচিত কিন্তু শ্লোকগুলি কঠিন শব্দপূর্ণ কর্ণপীড়াদায়ক কটমট। এই সেদিন পর্য্যন্তও এই মতের প্রতিধ্বনি শুনিয়াছি। সদুক্তিকর্ণামৃত সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার পর এ মত অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে সদুক্তিকর্ণামৃত সঙ্কলন করেন। তিনি কবি জয়দেবের প্রায় সম-সাময়িক বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী ব্যক্তি। তিনি সদুক্তিকর্ণামৃতে শরণ, গোবর্দ্ধন, উমাপতিধর প্রভৃতির কবিতার সঙ্গে জয়দেবেরও ত্রয়োত্রিংশটি বিভিন্ন বিষয়ক কবিতা সংকলন করিয়াছেন। শরণাদি কবিগণ যে লক্ষ্মণ সেনের সভায় বর্ত্তমান ছিলেন, এবিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। জয়দেবরচিত কবিতাগুলির ছন্দ শব্দালঙ্কার অলঙ্কার-পারিপাট্য আদি দেখিয়া অবাধে স্বীকার করিতে হয় যে কবি জয়দেব কোমল কঠোর সর্ব্ববিধ রচনাতেই পারঙ্গম ছিলেন। শ্রীগীত গোবিন্দের প্রস্তাবনায় কবি আপনার সন্দর্ভশুদ্ধির যে শ্লাঘা করিয়াছেন তিনি তাহার অবিসম্বাদী অধিকারের দাবী করিতে পারেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত কবি রচিত তেত্রিশটী শ্লোকের মধ্যে বেণী নিনাদ আদির বর্ণনায় বুঝিতে পারা যায় যে তিনি বৈষ্ণব হইলেও তাঁহার হৃদয় উদার ও মন সর্ব্ববিষয়-গ্রহণক্ষম ছিল। এই তেত্রিশটী শ্লোকের মধ্যে পাঁচটি শ্লোক শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে গৃহীত। সুতরাং কাব্যখানি যে কবির জীবদ্দশাতেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল সে বিষয়েও সন্দেহের কোন কারণ নাই। এখন দেখিতে হইবে—যে শ্রীগীতগোবিন্দ কাব্যখানি রাজা ও রাজসভাসদগণের চিত্ত বিনোদনের জন্য রচিত হইয়াছিল, অথবা কবি আপন অনুকরণীয় মধুর কোমলকান্ত পদাবলীতে উপাস্য শ্রীরাধামাধবের লীলা কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস শ্রীগীতগোবিন্দ কবির উপাস্য দেবতার লীলাবর্ণনাতেই পরিপূর্ণ। এ বিশ্বাসের কারণ কি তাহা বলিতেছি।

শ্রীগীতগোবিন্দ রচনার বহুপূর্ব্বেই গোপীকথা লইয়া কাব্য নাটক ও শ্লোকাদি রচিত হইয়াছিল। ভাসের বালচরিত ইহার একতম প্রমাণ। ভাস খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দের কবি। হাল সপ্তশতীর মধ্যে রাধাকৃষ্ণের কথা আছে। মহাকবি কালিদাস বিষ্ণুর গোপবেশ ও শ্রীবৃন্দাবনের কথা লিখিয়াছেন। ইতিমধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণ যে উপাস্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন অষ্টম শতকের কবি ভট্টনারায়ণের

বেণীসংহারের মঙ্গলাচরণ শ্লোকে নবম শতকের আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধনের ধ্বন্যালোকে সংগৃহীত একটী শ্লোকে এবং একাদশ শতকের কবি ক্ষেমেন্দ্রের দশাবতার চরিতের কয়েকটী শ্লোক হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্ষেমেন্দ্র দশাবতার চরিত রচনা করেন। ১৩৬২ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য্য নিম্বার্ক আবির্ভূত হন। আচার্য্য নিম্বার্কই শ্রীরাধাকৃষ্ণকে উপাস্যরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। প্রস্থান-ত্রয়ের ব্যাখ্যায় সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বৈতাদ্বৈত বা ভেদাভেদ বাদ ইঁহারই প্রবর্ত্তিত। আচার্য্য নিম্বার্কের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ লক্ষ্মণ দেশিকাচার্য্য "সারদাতিলক" সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই সারদাতিলকে—"গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং, গোগোপসংঘাবৃতং কলবেণুরবাদনপরং" গোবিন্দের ধ্যান মন্ত্র আছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণমাধুরী গ্রন্থে বিল্বমঙ্গল রচিত তৃতীয় শতক শ্লোকসংগ্রহে এই ধ্যানমন্ত্রটী পাওয়া যায়। বিল্বমঙ্গল লক্ষ্মণ দেশিকাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং দেখিতেছি গোপীপরিবৃত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত রহিয়াছে। তবে নিম্বার্কের পূর্ব্বে সুসংবদ্ধ ভাবে সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক অপর কেহ রাধাকৃষ্ণের উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন কিনা অনুসন্ধান আবশ্যক।

শ্রীমদ্ভাগবত চারি সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণেরই আদরণীয় গ্রন্থ। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধার নাম নাই। চারি সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রামাণ্য শ্রুতি গোপালতাপনীর মধ্যেও রাধার নাম পাওয়া যায় না। প্রধানা গোপী তাপনীতে গান্ধর্ব্বী নামে পরিচিতা। তাহা হইলে নিম্বার্ক কোন্ প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতে শ্রীরাধাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন? আমি যতদূর জানি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, পদ্মপুরাণ, নারদপাঞ্চরাত্র প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ের প্রামাণ্য গ্রন্থ। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে নিম্বার্কের পূর্ব্ব হইতেই এই সমস্ত গ্রন্থ সম্প্রদায় বিশেষের নিকট প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছিল। আচার্য্য নিম্বার্ক তাঁহার দশশ্লোকীতে উপাস্য নির্দ্দেশ করিতেছেন—

স্বভাবতঃ অপাস্ত সমস্ত দোষম্
অশেষ কল্যাণ গুণৈক রাশিম্।
ব্যূহাঙ্গিনং ব্রহ্মপরং বরেণ্যম্
ধ্যায়েম কৃষ্ণং কমলেক্ষণং হরিম্॥

স্বভাবত সর্ব্বপ্রকার দোষ হীন, অশেষ কল্যাণ গুণরাশি, চতুর্ব্যূহ যুক্ত, বরণীয় পরমব্রহ্ম পদ্মপলাশলোচন হরি শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি।

অঙ্গেতু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানা মনুরূপ সৌভগাং।
সখিসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা
স্মরেম দেবীম্ সকলেষ্ট কামদাম্॥

তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) বামাঙ্গে বিরাজমানা অনুরূপা সৌভাগ্যশালিনী, আনন্দিতা সখীসহস্রপরিসেবিতা, সকল ইষ্টকামদাত্রী বৃষভানুনন্দিনীকে স্মরণ করি।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় পুরুষোত্তমাচার্য্য বলিয়াছেন—দেবীম্ পদে রুক্মিণী দেবীকে এবং উপলক্ষণে সত্যভামা দেবীকে বুঝিতে হইবে। "তথাচ রুক্মিণী সত্যভামা ব্রজস্ত্রীবিশিষ্টঃ শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সাম্প্রদায়িকৈরেকৈঃ সদা উপাসনীয়।" ব্রজস্ত্রী বলিতে তিনি বুঝাইতেছেন—"ব্রজস্ত্রী শব্দবাচ্যাঃ গোপী প্রধানভূতায়াঃ শ্রীবৃষভানুজায়া শ্রীকৃষ্ণেন সহ নিত্যযোগং বিবক্ষন্ত শ্রীবৃষভানুজেতি॥"

(ক্রমশঃ)

গোপালতাপনীতে গোপীনাথ, রমামানসহংস এবং রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা আছে। আচার্য্য নিম্বার্কের মতে রমাকান্ত পুরুষোত্তম কৃষ্ণই উপাস্য এবং তাঁহার মতে রমাই শ্রীরাধা।

ব্রহ্মরুদ্রসুরারাদ্যচর্চ্চিতঃ
চর্চ্চিতশ্চ রময়াকমালয়া।
চর্চ্চিতশ্চ নবগোপবালয়া
প্রেমভক্তি রসশালিমালয়া॥

(সবিশেষ নির্ব্বিশেষ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব)

নিম্বার্কাচার্য্যের রাধা শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী। এই সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিবাহ স্বীকার করিয়া থাকেন। গর্গসংহিতা গোলক-খণ্ডে এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-খণ্ডে এই বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত বলিতেছেন নন্দ ভাণ্ডীরবনে গোচারণে গিয়া কৃষ্ণকে বক্ষে ধারণ করতঃ বটমূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এমন সময় মায়াময় কৃষ্ণের মায়াবশে নভোমণ্ডল হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইল। মহারাজ নন্দ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও কাননাভ্যন্তর শ্যাম বর্ণ দেখিলেন। ঝঞ্ঝাবাত, মেঘের সুদারুণ শব্দ ও ঘোরতর বজ্রনাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। স্থূল বৃষ্টি ধারা পতিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে নন্দ ভীত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণও মায়াকল্পিত ভয়ে রোদন করতঃ পিতার কণ্ঠ ধারণ করিলেন। এমন সময় শ্রীরাধা রাজহংসের ন্যায় মৃদুগমনে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে উপস্থিত হইলেন। নন্দ তাঁহার স্তব করিয়া বলিলেন দেবি, আমি গর্গমুখে শুনিয়া আপনাকে জানিয়াছি। আপনি লক্ষ্মী হইতেও শ্রীহরির অধিক প্রিয়তমা। এই বালক মহাবিষ্ণু হইতেও শ্রেষ্ঠ। এখন এই আপনার প্রাণ-নাথকে গ্রহণ করুন।

গর্গসংহিতা বলিতেছেন—

গুপ্তং বিদং গর্গমুখেন বেদ্মি
গৃহাণ রাধে নিজনাথমঙ্কাৎ।
এনং গৃহং প্রাপয় মেঘভীতং
বদামি চেত্থং প্রাকৃতে গুণৈশ্চ॥

তোমার তত্ত্ব আমি গর্গমুখে গুপ্তভাবে জানিয়াছি। আমার ক্রোড় হইতে নিজনাথকে গ্রহণ কর। কৃষ্ণ মেঘ হইতে ভীত হইয়াছে। ইহাকে গৃহে লইয়া যাও।

শ্রীরাধা কৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া সুদূর দেশে গমন পূর্ব্বক রাসমণ্ডলকে স্মরণ করিলেন। রাসমণ্ডল আবির্ভূত হইলে স্বয়ং ব্রহ্মা আসিয়া শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহ যথাবিহিত সম্প্রদান করিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও গর্গসংহিতা)

আমার মনে হয় শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের এই বর্ণনারই ইঙ্গিত রহিয়াছে। শ্রীগীতগোবিন্দের পৌরাণিক মূল অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে শারদ রাসের বর্ণনা আছে। জয়দেব বাসন্তরাসের বর্ণনা করিয়াছেন। একমাত্র ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণেই বাসন্তরাসের বর্ণনা পাওয়া যায়। পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে দন্তবক্রবধের পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা হইতে ব্রজে আগমন পূর্ব্বক দ্বিতীয়বার রাসের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই সমস্ত আলোচনায় আমরা দেখিতেছি পুরাণের সঙ্গে জয়দেবের পরিচয় ছিল। এ সম্বন্ধে একটী কথা বিচার্য্য। যে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বাসন্তরাস, বর্ষাবর্ণনাত্মক শ্লোকে সে কাব্যের সূচনা হইবে কেন? কোন টীকাকারই এই শ্লোকটীকে পরিত্যাগ করেন নাই। অনেকেই এই শ্লোকটীকে আশীর্ব্বাদ নমস্কার ও বস্তুনির্দ্দেশ রূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং এই শ্লোকের গুরুত্ব অস্বীকার করিবার

উপায় নাই। সদুক্তিকর্ণামৃত প্রকাশিত হওয়ার পর এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে আমরা জয়দেবের প্রণীত শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থ কবি প্রণীত যথাযথ আকারেই পাইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে প্রথম শ্লোকও কবি জয়দেব রচিত, এবং ইহার সঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ও গর্গসংহিতার ঐক্য আছে।

এ কথা বলিবার আরও একটী কারণ আছে। পরকীয়া নায়িকা লইয়া অভিসার আদি বর্ণনার আবশ্যকতা থাকে না। একমাত্র শ্রীবৃন্দাবনের গোপীলীলা ভিন্ন অন্যত্র কোন সৎকাব্যে সাধারণ পরকীয়া প্রসঙ্গ আছে বলিয়া মনে হয় না। জয়দেব শ্রীরাধাকে পরকীয়া নায়িকা রূপেই চিত্রিত করিয়াছেন। অথচ কাব্যমধ্যে বর্ণনা করিতেছেন—"পরস্পরের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমরা যখন মিলিত হইবে এবং সম্ভাষণ দ্বারা উভয়ে উভয়কে জ্ঞাত হইয়া রসাবেশে প্রীতিলাভ করিবে তখন—

"দম্পত্যোরিহ কো ন কো ন তমসি ব্রীড়া বিমিশ্রোরসঃ।"

অন্যত্র—"রেজিঃ কামশরৈরমন্থতমভূদ্ভ্রাম্যন্নঃ কীলিতম্।"

এই যে দম্পতি ও পতি শব্দ ইহা পরকীয়া নায়িকার প্রযুক্ত হইবে কেন? শ্রীমদ্ভাগবতেও এইরূপ পতি শব্দের প্রয়োগ আছে। জয়দেবের কাব্য রসাভাস দোষ দুষ্ট, আশা করি এ কথা কেহ বলিবেন না। জয়দেব এ ক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ করিয়াছেন। এই জন্যই জয়দেবের রাধা—"অবিবিক্ত পরকীয়া পরকীয়া"—গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ঐ বিবাহ কথা যে ভক্ত সমাজে বিশেষরূপ প্রচারিত ছিল, মহাকবি সুরদাসের নিম্নোক্ত কবিতা হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। কবিতাটীর সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক অপেক্ষা ব্রহ্মবৈবর্ত্তেরই সম্পূর্ণ ঐক্য রহিয়াছে।

গগন গরজি মহরাই জুরী ঘটাকারী।
পৌন ঝকঝোর চপলা চমকি চহুঁ ওর
সুবন তনচিতে নন্দ ডরত ভারী॥
কহো বৃষ ভানুকী কুঁবরি সোঁ বোলিকৈ
রাধিকা কানহ ঘর লিয়ে জা রী॥
দো ঘর জাহ সঙ্গ নভ ভয়ো শ্যাম রঙ্গ
কুঁবর গহো বৃষভান্ বারী॥
গয়ে বনঘনওর নংল নন্দকিশোর
নবল রাধা লয়ে কুঞ্জ ভারী॥
অঙ্গ পুলকিত ভয়ে মদন তিনতনভয়ে
সুর প্রভু শ্যাম শ্যামাবিহারী॥

গগনে ঘন ঘোর গর্জ্জন। আকাশে কাল মেঘের ঘটা। দমকা বাতাসের কাপটা। বিদ্যুৎ চমকাইতেছে। পুত্রের দেহের দিকে তাকাইয়া নন্দ ভয় পাইয়াছেন। তিনি বৃষভানু কুমারীকে বলিলেন রাধা তুমি কানাইকে ঘরে লইয়া যাও। দুজনে একসঙ্গে ঘরে যাও। আকাশের রং কাল। বৃষভানুবালা কুমারকে গ্রহণ করিলেন। নওল নন্দকিশোর নওলী রাধাকে লইয়া গহন বনে এক নূতন কুঞ্জের দিকে চলিয়া গেলেন। অঙ্গ পুলকিত হইল; সুরদাসের প্রভু শ্যাম এবং শ্যামা বিহারীর এই তিন জনের তনুকে মদন জয় করিল। লক্ষ্য করিবার বিষয় জয়দেব সুসংবদ্ধের জন্য প্রথম শ্লোকে নক্ত অর্থাৎ রাত্রির অবতারণা করিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে, গর্গসংহিতায় অথবা সুরদাসের কবিতায় রাত্রির কোন প্রসঙ্গ নাই।

জয়দেবের মত সৌভাগ্যবান কবি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের কুমারসম্ভবও যেন

সম্প্রদায়ের নিকট শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা লাভ করে নাই। কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দ সকল সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের নিকটই শাস্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং তদীয় অনুগত রায় রামানন্দ প্রভৃতি রসিক, ভক্ত ও কবিগণ শ্রীগীতগোবিন্দগ্রন্থকে শ্রীমদ্ভাগবতের কবিত্বময় ভাষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। মহাকবি কালিদাসও পুরাণের অনুসরণ করিয়াছেন। হর-গৌরীর, অনাদি পুরুষ প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত সম্ভ্রম লইয়া মর্য্যাদানুরূপ ভাষা এবং ছন্দেই তিনি কুমারসম্ভব রচনা করিয়াছেন। কবিত্বে এবং প্রতিষ্ঠায় তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এ সৌভাগ্য তাঁহারও হয় নাই। জানিনা সেই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সেই প্রেম-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র এই আদিরসাত্মক কবিনির্ম্মিতির মধ্যে সেই রসবস্তুকে কোন্ রূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, রসভাবের কি মধুর আস্বাদন লাভ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য শ্রীগীত-গোবিন্দ তাঁহার নিত্যপাঠ্য গ্রন্থরূপে, অন্তরঙ্গ আস্বাদনীয় গ্রন্থরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বাহিরের মানুষ আমরা—বাহিরের দৃষ্টি দিয়া মাত্র এইটুকুই দেখিয়াছি যে নিশ্চিত মৃত্যু আসন্ন জানিয়া পার্থিব সাম্রাজ্য ধূলি-মুষ্টির মত পরিত্যাগপূর্ব্বক যে রাজর্ষি অপার্থিব রাজ্যের সংবাদ শুনিবার আকুলতায় পরম ভাগবত শ্রীশুকদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, যে প্রশ্ন শ্রবণে উল্লসিত হইয়া শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন—

সম্যগ্ব্যবসিতবুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেব কথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতি॥

কবি জয়দেব সেই শুকপদাঙ্ক অনুসরণে করিয়াছেন। জাতির জিজ্ঞাসায় যুগপ্রয়োজনেই তিনি আমাদিগকে শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলা কথা শুনাইয়াছেন।

বাগ্দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা
পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেতং
এতং করোতি জয়দেবকবিঃ প্রবন্ধম্॥

(ক্রমশঃ)

"গরিলারে গেরিলারা করিছে নকল"

শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত

শতাব্দীর সভ্যতার নামে—
আদিম অসভ্য যুগ প্রচলিত আজো।
ক্ষুধার উলঙ্গ প্রকাশ—
আরো যেন—স্পর্দ্ধিত, উদ্যত—
মানুষের ইতিহাস মানুষেরে করে পরিহাস—
ক্রমবিকাশের পথে—
আত্মাবমাননা—হিংসা দ্বেষ
আরো কত আদিম প্রেরণা—
হিমালয় সম অন্তরায়।
মানুষের হিত লাগি যত নব দান—
ধ্বংস হয়ে যায় এর দাবাগ্নিতে;
সুতরাং মূল্য নাই এর।

বুভুক্ষার বুঝি এই রূপ—
তিন হাত মানুষের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা—
জন্মিল কেমনে?

প্রাগৈতিহাসিক যুগ আসে নাই ফিরে—
আছে আজো নবতম বেশে—
চিনিতে কি পারো না ইহারে—?
রূপান্তর বিষ-তীর বিষ-বাষ্পে আজি—
পর্ব্বত কন্দর ছাড়ি মাটি কেটে—
লুকায় নিম্নেরে—অন্যেরে বধিতে সঙ্গোপনে।
দ্বিপদ গেরিলারা—বনে বনে গরিলারে
করিছে নকল—
উপনা ছাড়িয়া শেষে বলে যাই তবে।
ভ্রূণ হতে ধীরে ধীরে জন্মিল যে
কর্কটিকা মাতার জঠরে—
জননীর হত্যাকারী তারা।
সাবধান হও;
সেদিন আগত বুঝি—
আপনার রক্ত দিয়ে মানুষ করিবে তার
আপন তর্পণ—চির শান্তি নাশি।

নরনারায়ণ সেনানিবাস *

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ

চতুঃষষ্টি তন্ত্রশাস্ত্র একবাক্যে করে সমর্থন,
প্রশস্ত উত্তর দিক শক্তি-পীঠ করিতে অর্চ্চন।
মূল-শক্তি-পীঠ তাই উত্তরেতে হইল স্থাপিত,
উত্তর-সাধক-পীঠ দক্ষিণ অংশেতে নিরূপিত।
দুটি মহা-শক্তি-পীঠ মহনীয় কল্পনার ছবি,
বর্ণনার ভাষা নাই—রূপ দিতে হার মানে কবি।

* * * *

কোচবিহারের আদি পুণ্যশ্লোক নৃপকুলমণি,
মহারাজ 'বিশ্বসিংহ' বিশ্বে যার চির যশঃধ্বনি।
শ্রেষ্ঠ পুত্রদ্বয় তার—জ্যেষ্ঠ **নরনারায়ণ** ভূপ,
উপনাম 'মল্লদেব' মল্লযুদ্ধে জগতে অনুপ।
দশভুজা দশভুজে একদা যাহারে ক্রোড়ে ধরি'
অভয়া অভয়া-সাজে বসেছিলা সিংহাসন'পরি।
দিগ্বিজয়ী মহাবীর 'বিক্রম-আদিত্য' অবতার,
অনুজন্মা 'চিলারায়' সেনাপতি স্বয়ং যাহার।
করধৃত করবাল ভ্রাতৃদ্বয় পশিলে সমরে,
সম্মুখে বিজয়লক্ষ্মী দিত দেখা জয়মালা করে।
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে যার হিমাচল ছিল ছত্রধারী,
বঙ্গ-সিন্ধু যোগাইত পাদপদ্ম প্রক্ষালন-বারি

---

* স্বর্গীয় পুণ্যশ্লোক মহারাজ নরনারায়ণের নামে প্রতিষ্ঠিত সেনানিবাসের উদ্দেশে রচিত।

ভারত-গগন-রবি যোগাইত প্রথম কিরণ,
পশ্চিমে কাঞ্চনজঙ্ঘা জয়কেতু শোভিত হিরণ।
সম্মুখ সমরে হয়ে রুদ্রতেজে প্রতিহত গতি,
দিত কর নতশিরে অর্দ্ধশত সামন্ত নৃপতি।

* * * *

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তেজে স্বকুল-কমল প্রকাশিলা,
দুষ্কীর্ত্তি দলিয়া পদে ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিলা।
মহা-মহা-উপাধ্যায়ে সভাস্থল ছিল সমুজ্জ্বল,
প্রয়োগ-রত্নমালাদি আজো যার নিদর্শন স্থল।*
জ্ঞান বিদ্যা সদাচার ন্যায় নীতি করিয়া বিকাশ,
সাধন-উচিত ধামে চলিলা তেয়াগি' মর্ত্ত্যবাস।

* * * *

পৌনে চারিশত বর্ষ অবসানে সে স্তিমিত দীপ,
উজলিলা দৃপ্ত-তেজে সিংহাসনে উদি' জগদ্দীপ।
সিংহের বিক্রম যত করিবর ভাল বুঝে চিতে,
বীরের মর্য্যাদা দান উপযুক্ত বীরে পারে দিতে।
যোগ্যে যোগ্য যোজনায় যথা মণি-কাঞ্চনের শোভা,
তেমতি এ প্রতিষ্ঠান শৌর্য্য-বীর্য্যবান-মনোলোভা।
যুগ-উপযোগী শক্তি গঠনের মূল কেন্দ্র স্থান,
নব নব প্রচেষ্টায় হবে হেথা ক্রম-বর্দ্ধমান।
বিস্মৃতির স্মৃতিকল্পে প্রতিষ্ঠানদ্বয় বক্ষে ধরি,
ধন্য হ'ল আমাদের পূত কোচবিহার নগরী।

* বিশেষ বিবরণ খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত কোচবিহারের ইতিহাসের ১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ধূলি-কণা

অধ্যাপক শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্-সি

কঠিন পদার্থ যখন অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় বিভক্ত হইয়া বায়ু মণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে তখন এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাকে ধূলিকণা বলা হয়। বাতাস, বৃষ্টি, আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন, তাপ, জীব এবং উদ্ভিদ দেহের পচন ক্রিয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর ধূলিকণা ছড়াইয়া পড়ে। কোন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর এই ধূলিকণার পরিমাণ নির্ভর করে। ইহা ছাড়া বর্ত্তমান সভ্যতে কলকারখানার অন্ত নাই। যন্ত্র চালনায় প্রচুর ধূলিকণার উৎপত্তি হয়। শক্তি উৎপাদনের জন্য যে কয়লা বা তৈল পোড়ান হয় তাহার ধোঁয়া এবং যন্ত্রের প্রতিটি নড়াচড়া অসংখ্য ধূলিকণা সৃজন করে। "Every fire whether for the production of heat or power, every grinding or rubbing action and in general all mechanical function and industrial and constructional activity creates dust." ধূলি যন্ত্রযুগের একটা অভিশাপ। ইহা কোন অঞ্চলের শ্রমিক এবং বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন রোগ বিস্তার করিয়া প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ লোকের অকালমৃত্যু ঘটাইয়া থাকে।

সমস্ত ধূলিকণার আকার এক নহে। ইহাদের আকার ১৫০ মাইক্রণ (১ মাইক্রণ এক ইঞ্চির পঁচিশ হাজার ভাগের এক ভাগ) হইতে ০·৫ মাইক্রণ পর্য্যন্ত হয়। আমরা নিঃশ্বাসের সহিত যে সমস্ত ধূলিকণা গ্রহণ করি তাহাদের আকার ০·৫ মাইক্রণ হইতে ১০ মাইক্রণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ বাতাসে ১·৫ মাইক্রণ অপেক্ষা বড় ধূলিকণা থাকে না। মিল অঞ্চলের ধূলিকণার আকার ১ মাইক্রণ হইতে ৩ মাইক্রণ পর্য্যন্ত হয় এবং এই অঞ্চলের বাতাসে ধূলিকণার পরিমাণ বিশুদ্ধ বাতাসের ধূলিকণার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী। কারখানা ঘরের বদ্ধ বাতাসে প্রতি ঘনফুটে প্রায় দুইশত লক্ষ ধূলিকণা থাকে—বিশুদ্ধ বায়ুতে প্রতি ঘনফুটে পঞ্চাশ লক্ষ ধূলিকণা ভাসিয়া বেড়ায়।

ধূলিকণা বাতাসে ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং অতি ধীরে ধীরে মাটির উপর জমা হয়। আকারে বড় এবং ভারী কণা শীঘ্রই মাটিতে পড়িয়া যায়। এই জন্য সীসক, পারদ, বেরিয়ম প্রভৃতি ভারী ধাতুর কণা বেশী দূর ছড়াইতে পারে না। ধোঁয়া, আলকাতরা, আর্সেনিক এবং গন্ধক হইতে প্রস্তুত দ্রব্যাদির কণা হালকা বলিয়া দীর্ঘকাল বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায় এবং বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে।

সাধারণতঃ ভারী ধাতু যথা সীসক, পারদ, বেরিয়ম, দস্তা এবং এই সমস্ত ধাতু হইতে প্রস্তুত বিভিন্ন সামগ্রীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমূহ রোগসংক্রামক ধূলিকণার পর্য্যায়ভুক্ত। এই সমস্ত কণা নিঃশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করে এবং রক্তের সহিত মিশিয়া নানা রোগ উৎপন্ন করে। দরজা জানালায় যে রং ব্যবহৃত হয় তাহাতে লেড্ অক্সাইড্ (Lead oxide) এবং লেড্ কার্ব্বনেট্ (Lead Carbonate) ব্যবহৃত হয়। যে স্থানে এই রং প্রস্তুত হয় শুধু যে সেই স্থানের বায়ুমণ্ডলেই রঙের কণা ছড়াইয়া পড়ে তাহা নহে। আমাদের ঘরের দরজা জানালা হইতে রৌদ্রবৃষ্টির জন্য এই সমস্ত রঙের কণা বাসগৃহের বাতাসে ছড়াইয়া যায় এবং নিঃশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করিয়া "সীসক্ বিষক্রিয়া" ঘটাইবার সম্ভাবনা থাকে। ডাঃ কে, বাগ্‌চী (Chemical Examiner to the Government of Bengal) বলেন যে হিন্দু পরিবারে বিবাহিত মহিলাগণ যে সিঁদুর ব্যবহার করেন উহাতে একজাতীয় সীসকের গুঁড়া বর্ত্তমান। এই কারণে হিন্দুগৃহের বাতাসে সর্ব্বদাই সীসকের কণা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান বলিয়া "সীসক বিষে" আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। যে সমস্ত কারখানায় আর্সেনিক হইতে নানা রকমের রঙ, ইঁদুরমারা বিষ, আগাছাধ্বংস করিবার ঔষধ ইত্যাদি প্রস্তুত হয় সেই সকল কারখানা এবং আশেপাশের বায়ুমণ্ডল আর্সেনিকের কণা ভাসিয়া বেড়ায় বলিয়া স্থানীয় লোকেরা "আর্সেনিক বিষে" আক্রান্ত হয়। জিঙ্ক্ অক্সাইড্ (Zinc oxide) প্রস্তুত করিবার সময় ইহার কণা ফুসফুসে প্রবেশ করিলে এক প্রকার রোগ জন্মে। এই রোগকে "Metal fume fever" বলে। চূণের কণাও রোগসৃষ্টি করে।

করলা, লৌহ, বালি, টিন, এস্‌বেষ্টস্ প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত সূক্ষ্মকণা ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিলে "ফুস্‌ফুসের ধূলিরোগ" (Dust disease of the lungs) নামে এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। গ্রানাইট পাথর, কোয়ার্জ, বালি প্রভৃতির কণা "সিলিকোসিস্" (Silicosis) নামে এক রোগ সৃষ্টি করে। এই রোগ "খনিমজুরের যক্ষ্মা" নামেও অভিহিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার খনিমজুরদের মধ্যে এইরোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়; এই রোগে আক্রান্ত হইলে রোগের শেষ অবস্থায় রোগটি যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, প্লুরেসি প্রভৃতিতে দাঁড়াইয়া যায়। বিশেষ করিয়া যক্ষ্মারোগ ত হইবেই। এবং শুধু যে খনি অঞ্চলের শ্রমিকেরাই আক্রান্ত হয় তাহা নহে। যে সমস্ত মিল অঞ্চলে লৌহ বা ইস্পাত নির্ম্মিত দ্রব্যাদি তৈয়ারী হয় সেই স্থানের শ্রমিক এবং বাসিন্দারা "সিলিকোসিস" রোগে আক্রান্ত হয়। পরে এই রোগ যক্ষ্মায় পরিণত হয়। ইহার কারণ লৌহের কারখানায় ঘষামাজা এবং ছাঁচের কাজের জন্য প্রচুর পরিমাণে বালি ব্যবহৃত হয়। কাজেই বাতাসে বালির কণা বর্ত্তমান থাকে এবং রোগসৃষ্টির সহায়তা করে

যে স্থান কলকারখানা হইতে বহুদূরে অবস্থিত—যেমন গ্রাম অঞ্চল—সেই জায়গার বাতাসে যে ধূলিকণা থাকে তাহা নির্দ্দোষ বলা যাইতে পারে। এই সব ধূলিকণা নিজেরা রোগসৃষ্টি করে না কিন্তু রোগবীজাণু বহন করে। এই রোগবীজাণুর মধ্যে এনথ্রাক্স, ডিপ্‌থেরিয়া, যক্ষ্মা, বসন্ত প্রভৃতি প্রধান।

উপরে যে বিভিন্ন রকমের ধূলিকণার উল্লেখ করা হইল ইহা ব্যতীত জীবদেহ এবং উদ্ভিদের পচনক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন ধূলিকণা এবং রঙ, বারুদ, নানাবিধ ঔষধ, তুলা ও পশমের কণা নানাবিধ ব্যাধি সৃষ্টি করে। ফুলের রেণু, ঘোড়া ও বিড়ালের লোম, পালক, যব ও চাউলের খোসা হইতে যে ধূলিকণা উৎপন্ন হয় তাহা নিঃশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করিয়া "আর্টিকেরিয়া", "একৃজিমা", "পারপারা" (এই রোগে চামড়ার উপর লাল অথবা নীল দাগ দেখা যায়), "এ্যাজ্‌মা" প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করে। কেহ কেহ ঘোড়া বা বিড়াল স্পর্শ করিলে "আর্টিকেরিয়া" রোগে আক্রান্ত হয়। এমন কি ঘোড়া বিড়ালের গায়ের গন্ধেও আর্টিকেরিয়া রোগ হয়।

ধূলিকণা এক হিসাবে সভ্যতার মাপকাঠি। কলকারখানার সংখ্যা যত বৃদ্ধি পায় বাতাসে ধূলিকণার সংখ্যাও তত বেশী হইতে থাকে এবং বিভিন্নজাতীয় ধূলিকণা শিল্প-সমৃদ্ধি নির্দ্দেশ করে।

ডাঃ কে, এস্, বাগ্‌চী কলিকাতার সহিত ইংলণ্ডের লীড্‌স্ সহরের তুলনামূলক আলোচনায় দেখাইয়াছেন যে কলিকাতার বাতাসে তামার সূক্ষ্মকণা প্রায় নাই; লীড্‌স্‌এ তামার কণা অত্যন্ত বেশী। কলিকাতায় সীসকের কণার সংখ্যা যদি ৫ এবং আর্সেনিকের কণা ২০ ধরা যায় তাহা হইলে লীড্‌স্‌এ সীসকের কণা ৩০২৫ এবং আর্সেনিকের ৪৭৬ হইবে। সুতরাং কলিকাতার তুলনায় লীড্‌স্‌এ কত বেশী শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয় তাহার একটা নির্দ্দেশ পাওয়া গেল।

কলকারখানা হইতে যে রোগসংক্রমক ধূলিকণা উৎপন্ন হয় তাহা কলঅঞ্চলের বাতাসেই বদ্ধ থাকেনা; চারিপাশে কিছুদূর পর্য্যন্ত এই ধূলিকণা ছড়াইয়া পড়ে এবং লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দেয়। নিউইয়র্ক সহরের দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যায় যে ঐ সহরের বায়ুমণ্ডলে প্রতিবৎসর ৩০০,০০০ টন ধোঁয়া, আলকাতরা, ছাই প্রভৃতির কণা এবং ৩৫০,০০০ টন গন্ধকের কণা ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু সেখানকার অধিবাসিদের উত্তম স্বাস্থ্য, পুষ্টিকর আহার এবং নানারূপ সাবধানতা অবলম্বনের জন্য রোগ তেমন মারাত্মক হয় না।

কলিকাতা সহরে ক্রমেই কলকারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শীতের রাত্রিতে কলিকাতার বায়ুমণ্ডলে কি পরিমাণ ধোঁয়া এবং ধূলি ছড়ান থাকে তাহা সকলেরই বিদিত। এই ধূলিকণা প্রধানতঃ যক্ষ্মা এবং আরও নানা রোগ সৃষ্টি করিয়া থাকে এবং অধিবাসিদের, বিশেষভাবে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। লীড্‌স্ সহরে আয়তনের তুলনায় কলকারখানা যত বেশী কলিকাতায় তত নহে, কিন্তু ভবিষ্যতে যে হইবে না এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। তখন ধূলিসমস্যা আরও জটিল হইয়া পড়িবে। এই ধূলির হাত হইতে বাঁচিতে হইলে চাই উত্তম আহার এবং স্বাস্থ্যসম্বন্ধে নানারূপ সাবধানতা। আশা করা যায় আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা এই দিকে দৃষ্টি দিবেন।

রাজপরিবারের সংবাদ

মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা কোচবিহারেই অবস্থান করিতেছেন। গত ২৭শে এপ্রিল তিনি মহারাণী ইন্দিরাদেবী বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণী সভায় সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন এবং ২৯শে এপ্রিল ঐ বিদ্যালয়ের বালিকাগণের বার্ষিক "ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা" দর্শনে বালিকাগণকে উৎসাহিত করেন ও ক্রীড়াশেষে পুরস্কার বিতরণ করেন। ৩রা মে তারিখে সুনীতি একাডেমির বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় সভানেত্রীত্ব করিয়া ছাত্রী এবং শিক্ষয়িত্রী-গণকে উৎসাহিত করেন।

দেওয়াস্ রাজ্যের মহারাণী শ্রীশ্রীমেনকাদেবী গত ১৩ই মে কুচবিহারে আসিয়া পৌঁছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার ডি, কে, সেন ; রাজস্বমন্ত্রী রায় বাহাদুর কে, সি, গাঙ্গুলী ; হাউসহোল্ডমন্ত্রী মেজর রাজকুমার আর, সিং প্রভৃতি ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর ১৪ই মে কলিকাতা হইতে কোচবিহারে আসিয়া পৌঁছেন। অপরাহ্নে তিনি মিত্র-পক্ষের "বিজয়-উৎসব" উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত মিলিটারী একাদশ বনাম অবশিষ্ট দলের ফুটবল ম্যাচে মিলিটারী একাদশের অধিনায়কত্ব করেন। ঐদিন সন্ধ্যায় ল্যান্সডাউন হলে বিজয়-উৎসব উপলক্ষ্যে যে বিরাট জন-সভা হয় তাহাতে তিনি সভাপতিত্ব করেন।

ভগবানের কৃপায় রাজপরিবারের সকলে কুশলে আছেন।

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুরের সমরযাত্রা

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর বর্ম্মা-যুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় "লি-অ-জন্" অফিসারের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গত শুক্রবার ১৮ই মে সন্ধ্যা ৭-১০ মিনিটের সময় ট্রেণযোগে কোচবিহার ত্যাগ করেন। যদিও তাঁহার যুদ্ধ-গমনের সংবাদ গোপন রাখা হইয়াছিল তথাপি ষ্টেশনে তাঁহার দর্শন-আকাঙ্ক্ষী অগণিত জনসমাগম হয়। মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা সর্ব্বপ্রথম মহারাজাকে মাল্যভূষিত করেন। পরে অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী এবং মিলিটারী অফিসারগণ মহারাজা ভূপ বাহাদুরকে মাল্যভূষিত করেন। প্রধানমন্ত্রী সর্দ্দার ডি, কে, সেন ও সমবেত সকলের অভিনন্দন-ধ্বনির ভিতর ট্রেণ মহারাজা ভূপ বাহাদুরকে লইয়া প্রস্থান করে।

মহারাজা ভূপ বাহাদুর গত ২১শে মে ভোর ৫-৩০ মিনিটের সময় বিমান-যোগে কলিকাতা হইতে বর্ম্মা যুদ্ধ-ক্ষেত্র অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন

CENTRAL LIBRARY

স্থানীয় সংবাদ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব—

গত ২রা বৈশাখ হইতে ৪ঠা বৈশাখ পর্য্যন্ত তিন দিন কোচবিহার সহরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জন্মোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দ এই উৎসব উপলক্ষ্যে কোচবিহারে আগমন করেন। ২রা বৈশাখ ৺মনোমোহন বক্সী মহোদয়ের বাটিতে বিশেষ উৎসব হয়; পূর্ব্বাহ্নে হোম ও চণ্ডীপাঠ সহকারে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা এবং সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীরামনাম সংকীর্ত্তন ও ভজনাদি হয়। ৩রা ও ৪ঠা বৈশাখ সন্ধ্যায় স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে কোচবিহার রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে দুইটি বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। উভয় দিনই স্বামী সুন্দরানন্দ প্রধান অতিথিরূপে মর্ম্মস্পর্শী বক্তৃতা প্রদান করেন; প্রথম দিনের বক্তৃতার বিষয় ছিল "শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের আদর্শ" এবং দ্বিতীয় দিনের বিষয় ছিল "স্বামী বিবেকানন্দের নারায়ণ জ্ঞানে নরসেবার আদর্শ"। উভয় দিনই সমবেত জনমণ্ডলী মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্বামীজির বক্তৃতা শ্রবণ করেন। অধ্যাপক তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা কুমারী গায়ত্রী দেবী উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত গাহিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে চমৎকৃত করে।

শুভ পুণ্যাহ দরবার—

গত ২৩শে এপ্রিল শুভ পুণ্যাহ উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর রাজবাড়ীর দরবার হলে একটি দরবারের অনুষ্ঠান করেন। রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় দরবার উপলক্ষ্যে সন্ধ্যায় রাজবাটিতে উপস্থিত হইলে, মহারাজা ভূপ বাহাদুরের এ-ডি-সি-ইন-ওয়েটিং তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং রাজকীয় কায়দায় তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট আসনে লইয়া গিয়া বসান। দরবারিগণ পূর্ব্ব হইতেই স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। অতঃপর মহারাজা ভূপ বাহাদুর দুইজন এ-ডি-সি সমভিব্যাহারে দরবারকক্ষে আসিয়া উপস্থিত হন। ক্রমান্বয়ে ১৩টি তোপধ্বনি দ্বারা তাঁহার দরবার গৃহে প্রবেশ ঘোষণা করা হয় এবং রাজকীয় সৈন্যদল সামরিক কায়দায় তাঁহাকে অভিবাদন করে ও রাজকীয় ব্যাণ্ড্ কুচবিহার-সঙ্গীত বাজাইতে থাকে। সুসজ্জিত ও আলোকমালায় পরিশোভিত দরবারকক্ষে মহারাজা ভূপ বাহাদুর যখন রত্নখচিত সিংহাসনে উপবেশন করেন, তখন রাজসভা এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। রাজগুরু কর্ত্তৃক মঙ্গলাচরণের পরে মহারাজা ভূপ বাহাদুরের আদেশক্রমে হাউসহোল্ড মন্ত্রী মহোদয় "দরবার আরম্ভ হইল" বলিয়া ঘোষণা করেন। দরবারিগণ পদমর্য্যাদা অনুসারে ক্রমান্বয়ে মহারাজাকে নজর প্রদান করেন এবং রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় মহারাজার আদেশ লইয়া শুভ পুণ্যাহের উদ্বোধন করেন। পুণ্যাহ শেষে রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় মহারাজা ভূপ বাহাদুরকে পান ও আতর অর্পণ করেন। তৎপরে দরবারিগণকে পান ও আতর প্রদান করা হইলে হাউসহোল্ড মন্ত্রী মহোদয় মহারাজা ভূপ বাহাদুরের অনুমতি লইয়া "দরবার শেষ হইল" বলিয়া ঘোষণা করেন। মহারাজা ভূপ বাহাদুর সৈন্যদলের সামরিক অভিবাদন গ্রহণ ও রাজকীয় ব্যাণ্ডের কুচবিহার-সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে দরবার কক্ষ হইতে প্রস্থান করেন। পর পর ১৩টি তোপধ্বনি দ্বারা দরবারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মহারাণী ইন্দিরা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ ও খেলাধুলা।

গত ২৭শে ও ২৯শে এপ্রিল যথাক্রমে মহারাণী ইন্দিরা দেবী বালিকা বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান এবং ছাত্রীগণের বার্ষিক খেলাধূলা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। পুরস্কার বিতরণী সভার অনুষ্ঠান স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে হয় এবং বার্ষিক খেলাধূলা রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় অনুষ্ঠানেই মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়া বালিকাগণের উৎসাহবর্দ্ধন করেন। শ্রীমতী পারুলরাণী সরকার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক পুরস্কার লাভ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে; আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে এই বালিকাটি এই বৎসর এম্, ই পরীক্ষায় কুচবিহার রাজ্য হইতে বালিকাগণের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে; আমরা শ্রীমতী পারুলরাণীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করিতেছি। পুরস্কার বিতরণী সভায় বালিকারা স্থানীয় লেখক শ্রীযুক্ত সত্যনারায়ণ শুকুল মহাশয়ের "যশোদা দুলাল" নাটিকা অভিনয় করিয়া বিশেষ অভিনয়-নৈপুণ্য প্রদর্শন করে।

খেলাধূলার অনুষ্ঠানটিও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমহারাজ স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ঘন ঘন করতালি প্রদান পূর্ব্বক বালিকাদিগের আনন্দ ও উৎসাহ বর্দ্ধন করেন। শ্রীশ্রীঈশ্বরাণী সাহেবা পুরস্কার বিতরণ করিয়া বালিকাদিগকে উৎসাহিত করেন।

সুনীতি একাডেমির পারিতোষিক বিতরণ।

গত ৩রা মে স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় সুনীতি একাডেমির পারিতোষিক বিতরণী সভা বিদ্যালয়ের হল ঘরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা এই সভায় সভানেত্রীত্ব করিয়া ছাত্রীগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন। সভায় শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর, শ্রীশ্রীঈশ্বরাণী সাহেবা প্রভৃতি উপস্থিত থাকিয়া সভার গৌরব বৃদ্ধি করেন। পুরস্কার বিতরণী উপলক্ষ্যে বিদ্যালয়ের বালিকাগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "লক্ষ্মীর পরীক্ষা" নাটিকা অভিনয় করে; অভিনয় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। অভিনয় ও সঙ্গীত নৈপুণ্যের জন্য তিনটি বালিকা বিশেষ পুরস্কার লাভ করে।

হস্তান্তরিত বিভাগসমূহের জন্য মহারাজা ভূপ বাহাদুরের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুর।

১৯৩৫-৪৬ সালের বাজেটে মহারাজ ভূপ বাহাদুর হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের (শিক্ষা ও স্বাস্থ্য) জন্য নিম্নলিখিত অতিরিক্ত নূতন ব্যয়সমূহ মঞ্জুর করিয়াছেন—

১। ম্যালেরিয়া নিবারণী পরিকল্পনার জন্য ১৫,০০০টাকা
২। ব্যাপক মহামারী নিবারণের জন্য ২০,০০০টাকা
৩। প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বেসরকারী বিদ্যালয়ে সাহায্যের জন্য ১০,০০০টাকা
৪। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহনির্ম্মাণের জন্য ৫০০০টাকা
৫। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার জন্য ... ৬০০০টাকা
৬। মহকুমা বালিকাবিদ্যালয়সমূহ সরকারী বিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য ... ১৫০০টাকা
৭। বিদ্যালয় সমূহে ব্যায়ামশিক্ষার জন্য ... ৬৪৭০টাকা

কুচবিহার রাজ্য ক্রমশঃই নানাদিকে উন্নতিলাভ করিতেছে। রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য মহারাজ ভূপ বাহাদুরের এই সকল অতিরিক্ত নূতন ব্যয় তাঁহার প্রগতিশীল মন ও প্রজানুরক্তিরই পরিচয় দিতেছে।

রবীন্দ্র জন্মোৎসব—

গত ২৫শে বৈশাখ স্থানীয় রামভোলা স্কুলের উদ্যোগে ল্যান্সডাউন হল গৃহে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই

উপলক্ষ্যে এক মহতী জনসভা আহূত হইয়াছিল; রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় এই সভার পৌরোহিত্য করেন। হল গৃহের মঞ্চটি রবীন্দ্রনাথের মাল্যভূষিত মূর্ত্তি ও প্রতিকৃতি দ্বারা সুশোভিত করা হইয়াছিল। সভায় গান, আবৃত্তি, প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল; সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় আরম্ভ হইয়া রাত্রি সাড়ে নয়টার পর সভা ভঙ্গ হয়। সভার কর্ম্মতালিকা বড় দীর্ঘ ছিল বলিয়া এবং সভায় স্থানাতিরিক্ত বহু জনসমাগম হইয়াছিল বলিয়া উদ্যোক্তাগণ সভার শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারেন নাই। দীর্ঘ কর্ম্মতালিকা দুইভাগে ভাগ করিয়া দুই দিন দুইটি সভা আহ্বান করিলে এবং উপস্থিত জনসংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখিলে সভার কার্য্য সুপরিচালিত হইত এবং রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হইত।

কোচবিহারে যুদ্ধবিজয়োৎসব।

প্রায় ছয় বৎসর বিশ্ববিধ্বংসী যুদ্ধের পর জার্ম্মাণী মিত্র পক্ষের নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করে। সম্মিলিত জাতির এই বিজয় উপলক্ষ্যে উৎসব করিবার নিমিত্ত কোচবিহার দরবার ৯ই, ১০ই এবং ১৪ই মে রাজ্যময় ছুটি ঘোষণা করেন। ১৩ই মে রবিবার যুদ্ধজয়ে ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রাজ্যের সকল মন্দিরে, মস্‌জিদে ও গির্জ্জায় বিশেষ পূজা ও উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়। মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে ১৩ই মে তারিখে এক বিশেষ সংকীর্ত্তন হয়। ৯ই হইতে ১৪ই মে পর্য্যন্ত রাজবাড়ী এবং সকল সরকারী গৃহে কুচবিহার রাজ্যের ও সম্মিলিত জাতি সমূহের পতাকা উড্ডীন রাখা হয়।

১৪ই মে তারিখ সমগ্র কোচবিহার সহর আনন্দ মুখর হইয়া উঠে। এই দিন সর্ব্বদিবসব্যাপী নানারূপ অনুষ্ঠান চলিতে থাকে। বেলা ৮-৩০ মিনিটে রাজ্যের সৈন্যদল, পুলিশ ও স্কাউট দল চিলারায় ব্যারাকে একত্রিত হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাসমূহে শোভা যাত্রা করিয়া বেড়ায়। বেলা ৩টার সময় সহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণকে মিষ্টান্ন খাওয়ান হয়; রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিদ্যালয় সমূহের পরিদর্শক এই কার্য্যের তদারক করেন। বেলা ৪টার সময় মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীতে দরিদ্র-নারায়ণের সেবা হয়। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত রাজবাড়ীর খেলার মাঠে মহারাজের সৈন্য দল এবং অন্যান্যের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ্ খেলা হয় হয়। ৬-৩০ মিনিটের সময় স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়; এই সভায় সম্মিলিত জাতিসমূহের যুদ্ধবিজয়ের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। মহারাজ ভূপ বাহাদুর স্বয়ং এক বাংলা বক্তৃতায় সভার কার্য্য উদ্বোধন করেন। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন ধর মহাশয়ের বক্তৃতা ও শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রলাল রায়ের স্বরচিত কবিতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। বিভিন্ন মহকুমায় সদরেও এইরূপ জনসভার আয়োজন হইয়াছিল। সন্ধ্যার সময় সমগ্র সহর আলোকিত করা হয় এবং রাত্রি ৯টার সময় গাইসের মাঠে নানারূপ বাজি পোড়ান হয়।

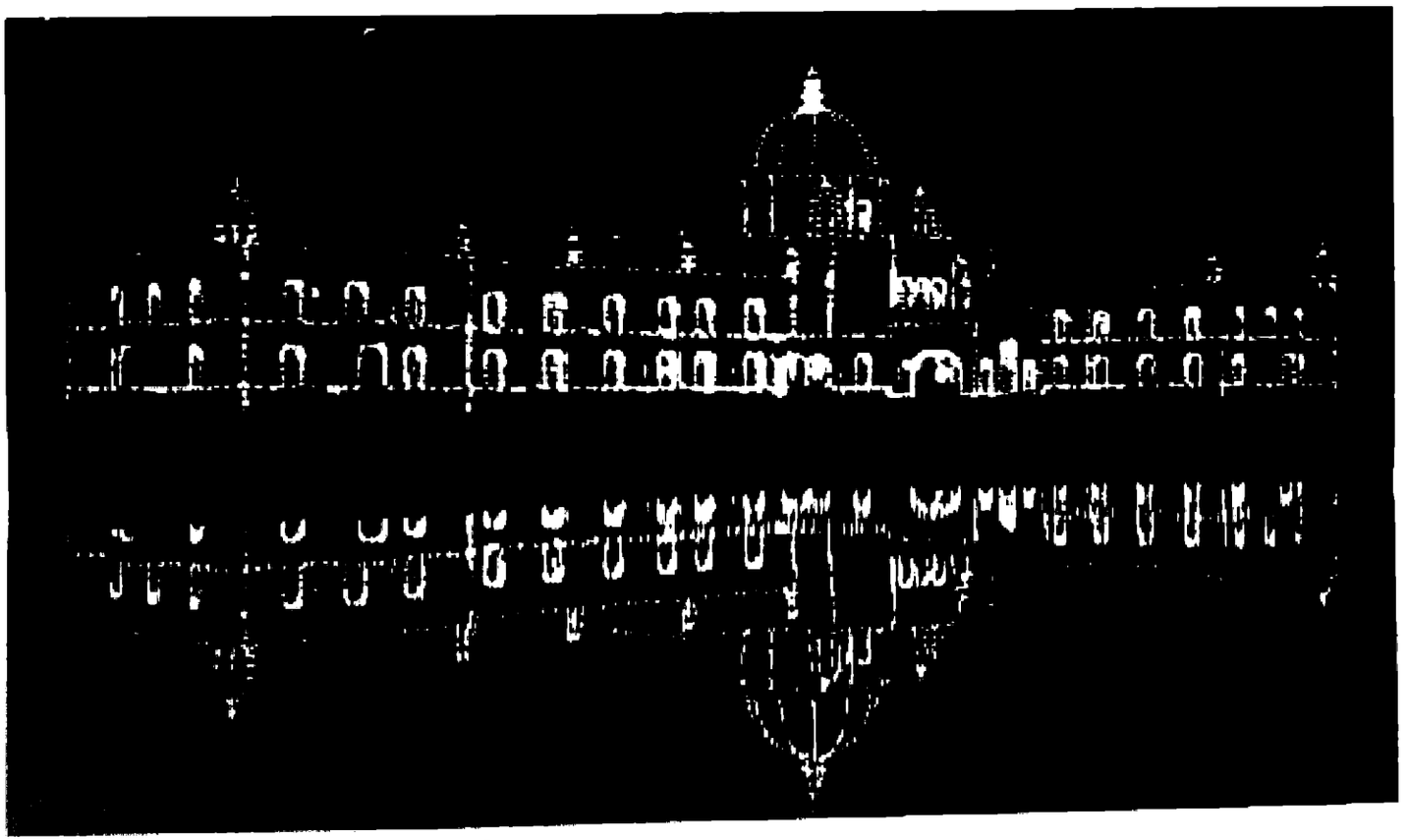

বিজয়-উৎসব উপলক্ষ্যে আলোকিত কোচবিহার রাজপ্রাসাদ

দেশ-বিদেশের কথা

ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান

প্রায় ছয় বৎসর কাল পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলিবার পর ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। পশ্চিম দিক হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার সৈন্যবাহিনীর এবং পূর্ব্ব দিক হইতে সোভিয়েট বাহিনীর চাপে জার্ম্মাণী ক্রমশঃই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছিল; জার্ম্মাণীর বহু ভূখণ্ড মিত্রবাহিনীর কবলিত হওয়ায় এবং রাজধানী বার্লিন রুশ সৈন্যের অধিকারে আসায় জার্ম্মাণী অবশেষে বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। ৭ই মে রাত্রি ১২টা ৪১ মিনিটের সময় ফ্রান্সের অন্তর্গত রেইম্‌স্ সহরের একটি ক্ষুদ্র স্কুলগৃহে আত্মসমর্পণ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই স্কুল গৃহটিতে জেনারেল আইসেনহাওয়ারের প্রধান কার্য্যালয় অবস্থিত। আইসেনহাওয়ারের চীফ্ অফ ষ্টাফ জেনারেল বিডেল মিত্র পক্ষের পক্ষ হইতে এবং জার্ম্মাণ আর্মির নূতন চীফ্ অফ ষ্টাফ কর্ণেল জেনারেল জডোভ আত্মসমর্পণ পত্রে স্বাক্ষর করেন; রাশিয়ার পক্ষ হইতে জেনারেল ইভান্স সাসলোপারোফ এবং ফ্রান্সের পক্ষ হইতে জেনারেল ফ্রাঙ্কোয়া সেভেজ স্বাক্ষর করেন। ৯ই মে বার্লিনে পুনরায় আত্মসমর্পণের চুক্তি স্বাক্ষরের অনুষ্ঠান হয় এবং পশ্চিম রণাঙ্গণের মিত্রবাহিনী ও লালফৌজের চাই কম্যাণ্ডের নিকট জার্ম্মাণীর সমস্ত সশস্ত্র বাহিনী চূড়ান্তভাবে আত্মসমর্পণ করে।

জার্ম্মাণী প্রথমে মিত্রপক্ষের মধ্যে ভেদসৃষ্টির চেষ্টা করে; জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার প্রতি আত্মসমর্পণের প্রস্তাব আসে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জার্ম্মাণী রাশিয়ার সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার সংকল্প প্রকাশ করে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার পক্ষ হইতে এই প্রস্তাব দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া জার্ম্মাণীকে ত্রিশক্তির নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়; এবং পরিশেষে জার্ম্মাণী তাহাতেই সম্মত হয়।

নাৎসী-নায়ক হিটলার বার্লিনেই মারা গিয়াছেন বলিয়া জার্ম্মাণ পক্ষ হইতে প্রচার করা হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার মৃতদেহ না পাওয়া পর্য্যন্ত একথা সকলে বিশ্বাস করিতেছেন না। গোয়েবেলসের মৃতদেহ বার্লিনের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে এবং গোয়েরিংকে যুদ্ধবন্দীরূপে আটক করা হইয়াছে।

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

জাপানও ক্রমশঃ মিত্রপক্ষের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতেছে এবং হীনবল হইয়া আসিতেছে। অবশ্য জাপানীরা মুখে বলিতেছে যে শেষ পর্য্যন্ত অমিতবিক্রমেই তাহারা যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে; কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহারা শান্তির প্রস্তাব করিতেছে এরূপ খবরও পাওয়া যাইতেছে। যাহাই হউক মিত্রপক্ষের রেঙ্গুন বিজয়ের পর ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হইয়া যাইবে এবং ব্রহ্ম পুনরধিকৃত হইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ হইতেও জাপান ক্রমশঃ বিতাড়িত হইতেছে এবং যুদ্ধ ক্রমশঃ জাপানের সন্নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইউরোপীয় যুদ্ধের অবসান হইল; এখন মিত্রপক্ষের সকল যুদ্ধোদ্যম জাপানের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত হইবে। কেহ কেহ মনে করিতেছেন যে রাশিয়াও জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবে; তাহা হইলে অতি অল্পকাল মধ্যেই—বর্ত্তমান বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই—জাপানও বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে।

এই সর্ব্বনাশা যুদ্ধ যত শীঘ্র শেষ হয় এবং পৃথিবীতে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হয় মানবসমাজের ততই মঙ্গল।

স্যানফ্রান্সিস্কো সম্মেলন—

আমেরিকার স্যানফ্রান্সিস্কো সহরে গত ২৫শে এপ্রিল হইতে বিশ্ব-নিরাপত্তা সম্মেলনের বৈঠক চলিতেছে। সম্মিলিত চতুঃশক্তি এই সম্মেলন আহ্বান করেন; পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ ৪৮টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দিয়াছেন। ভারত হইতেও তিন জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে গিয়াছেন। যুদ্ধোত্তর জগতে কিরূপে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহারই আলোচনা এই সম্মেলনে চলিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি যে ঈর্ষা ও সন্দেহের ভাব নেপথ্যে দেখা যাইতেছে তাহাতে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চ্চিল পার্লামেণ্টে এক বক্তৃতায় সত্যই বলিয়াছেন, "স্যানফ্রান্সিস্কোতে যে বিশ্বপ্রতিষ্ঠান গঠিত হইতেছে, উহা যাহাতে নামমাত্রে পর্য্যবসিত না হয় আমাদিগকে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠান যেন শক্তিশালীর বর্ম্মস্বরূপ ও দুর্ব্বলের পক্ষে উপহাস মাত্রে ("shield for the strong and mockery for the weak") পর্য্যবসিত না হয়।"

কলিকাতা হাইকোর্টের নবনিযুক্ত বিচারপতি চক্রবর্ত্তী—

কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্প্রতি হাইকোর্টের বিচারক নিযুক্ত হইয়াছেন এবং গত ২৮শে এপ্রিল বিচারকের কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীর এম্-এ উপাধি লাভ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক হইয়া যান। পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এল পাশ করিয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি একজন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী রূপে খ্যাতিলাভ করেন। বিঙনীরাজ উত্তরাধিকার মামলা, ভাওয়াল মামলা প্রভৃতি বিখ্যাত মামলায় তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিচারপতি নিয়োগের সময় চক্রবর্ত্তী মহাশয় বঙ্গীয় ও কেন্দ্রীয় আয়করের কমিশনারের আইন উপদেষ্টা এবং বাংলার আয়কর ব্যাপারে ভারত সরকারের কৌঁসুলী ছিলেন। এম-এ অধ্যয়ন কালে আমরা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সতীর্থ ছিলাম; তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং তাঁহার দীর্ঘ সফলতাময় জীবন কামনা করিতেছি।

দেশীয় নৃপতি ও মন্ত্রী সম্মেলন—

গত ২১শে ও ৩০শে এপ্রিল বোম্বাই সহরে দেশীয় রাজ্যসমূহের মন্ত্রী সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। কোচবিহারের প্রধান মন্ত্রী সর্দ্দার ডি, কে, সেন মহোদয় এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। ১লা ও ২রা মে তারিখে বোম্বাই সহরেই দেশীয় নৃপতিগণের সম্মেলন হয়; এবং ৩রা ও ৪ঠা মে নৃপতিগণের বিশেষ কমিটির অধিবেশন হয় নৃপতি সম্মেলন ও কমিটির অধিবেশনে ভূপালের নবাব বাহাদুর সভাপতিত্ব করেন। পত্রান্তরে প্রকাশ যে নৃপতি সম্মেলন ও মন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, যুদ্ধ পরিস্থিতি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে শাসন ব্যবস্থার সংস্কার এবং অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর রাজ্যসমূহের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙ্গা ও বর্দ্ধমানের মহারাজার দান

দ্বারভাঙ্গা মহারাজা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। বর্দ্ধমানের মহারাজা উক্ত

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল কলেজ ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন এবং আগামী জুলাই মাসে মেডিক্যাল কলেজের কাজ আরম্ভ হইলে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। দারভাঙ্গা ও বর্দ্ধমানের রাজবংশ চিরদিনই শিক্ষাকল্পে দানের জন্য প্রসিদ্ধ।

ডক্টর সুরেন দাশগুপ্তের লাইব্রেরী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দর্শন-অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বিরাট লাইব্রেরী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করিবার সংকল্প করিয়াছেন। এই লাইব্রেরী বহু অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও মূল্যবান পুস্তকাদিতে সমৃদ্ধ। ভারতে ব্যক্তিগত সংগ্রহরূপে ইহা বোধ হয় অদ্বিতীয়; দর্শন, বিশেষ করিয়া ভারতীয় দর্শন এবং ভারততত্ত্ব (Indology) অধ্যয়ন করিতে হইলে এই পুস্তক সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য। ডক্টর দাশগুপ্ত জীবনব্যাপী প্রচেষ্টায় এই লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিয়াছেন; ইহার মূল্য সওয়া লক্ষ টাকা হইবে। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর পৃষ্ঠপোষকতায় ডক্টর দাশগুপ্ত ১৯১৬ সালে তাঁহার লাইব্রেরী গড়িয়া তুলিতে আরম্ভ করেন; মহারাজা নন্দী অকাতরে এই লাইব্রেরীকে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। ডক্টর দাশগুপ্তের ইচ্ছা যে এই লাইব্রেরীকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর নামে একটি গবেষণাগার গড়িয়া উঠে।

শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবীর জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ

বাংলার বিখ্যাত লেখিকা শ্রীযুক্তা নিরুপমা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছেন। এই পদক স্বর্গগতস্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দানে তাঁহার মাতৃদেবীর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতি বৎসর বাংলার একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিককে এই পদক দেওয়া হয়। প্রথম বৎসরের পদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হইয়াছিল। আমরা বর্ষীয়সী সাহিত্যিকার এই পদকপ্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়াছি। নিরুপমা দেবীর "দিদি", "অন্নপূর্ণার মন্দির" প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সপ্রু রিপোর্ট ও দেশীয় রাজ্য :—

সপ্রু কমিটির রিপোর্ট লইয়া দেশবিদেশে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু রিপোর্টের একটি সুপারিসের প্রতি সাংবাদিকগণের দৃষ্টি তেমন আকৃষ্ট হয় নাই। দেশীয় রাজ্যসমূহের ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সম্বন্ধে কমিটি একটি নূতন সুপারিস করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে এইরূপ বিধান আছে যে লোকসংখ্যার অনুপাতে অন্ততঃ অর্দ্ধেক দেশীয় রাজ্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতে সম্মত না হইলে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা (Federal Government) প্রবর্ত্তিত হইবে না। কিন্তু সপ্রু কমিটি এরূপ কোন সর্ত্ত আরোপের বিরোধী। তাঁহারা বলেন দেশীয় রাজ্যসমূহ ইচ্ছা করিলে পৃথক পৃথক ভাবে বা কয়েকটি রাজ্য একত্রিত হইয়া সম্মিলিত ভাবে ("in blocs") যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের অধিকারী হইবেন, এবং এই যোগদানের সর্ত্ত যুক্তরাষ্ট্র ও দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে আলাপ আলোচনা দ্বারা নির্দ্ধারিত হইবে।

দেশীয় রাজ্যসম্বন্ধে কমিটির আর একটি সুপারিশ এই যে দেশীয় রাজ্যসমূহের সহিত যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক একজন মন্ত্রীর পরিচালনাধীনে থাকিবে। এই মন্ত্রীর তিন হইতে পাঁচজন উপদেষ্টা থাকিবেন এবং এই উপদেষ্টাগণ দেশীয় রাজ্যসমূহের সম্মতি অনুসারে নিযুক্ত হইবেন। সকল জরুরী ব্যাপারে মন্ত্রী এই উপদেষ্টাগণের সহিত পরামর্শ করিবেন এবং আইনে উল্লিখিত কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যাপারে মন্ত্রী উপদেষ্টাগণের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। সপ্ত কমিটির এই সুপারিশ দেশীয় রাজ্য-সমূহের স্বার্থসংরক্ষণে সহায়তা করিবে।

পরীক্ষায় ছাত্রগণের অসাধুতা :—

গত কয়েকবৎসর হইতে পরীক্ষার্থী ছাত্রগণের মধ্যে নানারূপ অসাধুতা ও দুর্নীতির প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। ক্রমশঃ অবস্থা এরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ছাত্রগণ প্রকাশ্যে পরীক্ষার পরিদর্শকগণকে ভয়প্রদর্শন, এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত করিতে ইতস্ততঃ করিতেছে না। গত প্রবেশিকা পরীক্ষায় রংপুর কেন্দ্রে একজন ছাত্রকে অসাধুতার জন্য পরীক্ষাগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করা হয়; স্থানীয় এক বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক মহাশয় এই অসাধু ছাত্রের বহিষ্কারের জন্য দায়ী; স্বীয় কর্ত্তব্য সমাপন করিয়া শিক্ষক মহাশয় যখন গৃহে ফিরিতেছিলেন তখন পথিমধ্যে তিনি নৃশংসরূপে প্রহৃত হন এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় হাসপাতালে নীত হন; হাসপাতালে তাঁহাকে কয়েকদিন অতিশয় আশঙ্কাজনক অবস্থায় কাটাইতে হয়; বিশ্ব-বিদ্যালয় এই ছাত্রকে চিরদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষা দানের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন এবং পরীক্ষায় অসাধুতা নিবারণের উপায় নির্দ্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন। আমরা সাগ্রহে এই কমিটির সুপারিশের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা বলিবার আছে। বর্ত্তমানে সারা দেশময় একটা অসাধুতা ও দুর্নীতির আবহাওয়া বহিয়াছে। উচ্চনীচ ধনীদরিদ্র নির্ব্বিশেষে সমগ্র জাতি যেন একটা দুর্নীতিময় অসাধু জীবন যাপন করিতেছে; ঘুষ, চোরাবাজার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে; অন্যায়, অসত্য, দুর্নীতি কোনটাকেই আর ঘৃণার চক্ষে দেখা কেহ মনে করে না। জাতির মেরুদণ্ড ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং দেশের যাহারা তরুণ, যাহারা ভবিষ্যতের আশাভরসার স্থল তাহাদের মধ্যেও দুর্নীতির বিষ প্রবেশ করিয়া জাতিকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। ছাত্রগণের বর্ত্তমান কলঙ্কজনক মনোবৃত্তি ও অশ্রদ্ধেয় আচরণের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার জন্য আমরা ছাত্র সমাজকেই আহ্বান করিতেছি। যৌবনের ভাবুকতা ও আশাবাদ লইয়া অগ্রসর হইলে তাহারাই দেশময় দুর্নীতি দূর করিতে সক্ষম হইবে।

সরকারী শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা—

ভারত-সরকার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহাদের ভবিষ্যত শিল্পনীতি বিবৃত করিয়া একটি পরিকল্পনা সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে দেখা যায় যে পূর্ব্বতন ঔদাসীন্য নীতি (Laissez faire) পরিত্যাগ করিয়া ভারত সরকার দেশের শিল্পোন্নয়ন নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছেন। অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও কিছু হয় নাই; তবে ভারত-সরকার তাঁহাদের পরিকল্পনার মোটামুটি একটা আভাস দিয়াছেন।

ভারতসরকার আনুমানিক কুড়িটি বৃহৎ শিল্প নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখিতে চাহেন; তন্মধ্যে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, ইঞ্জিন ট্রাক্টর বিমান প্রভৃতি নির্ম্মাণ, জাহাজ নির্ম্মাণ, বৈদ্যুতিক ও ভারী যন্ত্রপাতি নির্ম্মাণ, মেসিন টুল তৈয়ার, রাসায়নিক শিল্প, সিমেন্ট, পাওয়ার এলকোহল, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদন প্রভৃতি প্রধান। এতদ্ব্যতীত সরকার অন্য সকল শিল্পব্যাপারে যেসরকারী চেষ্টা যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে তজ্জন্য আর্থিক ও অন্যবিধ সাহায্য করিবেন। ভারত-সরকার বলেন যে এই উপায় অবলম্বনে ভারতের সমৃদ্ধি অচিরে বাড়িবে এবং অর্জ্জিত অর্থের সুষ্ঠু বণ্টনের দ্বারা দেশের দারিদ্র্য কমিবে এবং দেশময় জীবনধারণের মান বাড়িবে।

ভারত-সরকারের এই পরিকল্পনা দেশেবিদেশে নানা-রূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের শিল্পপতিগণ ইহাতে বহুবিধ অনিষ্টের সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহারা বলেন যে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইলে ব্যক্তিগত শিল্পপ্রচেষ্টা সমাধি লাভ করিবে; তাহা হয়তো করিবে; কিন্তু এক্ষেত্রে ইহাই বড় কথা নয়; আসলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে কিনা তাহাই

প্রধান বিষয়ে। কেহ কেহ বলেন যে এই ব্যবস্থায় বৃটিশ শিল্পী ও পুঁজিপতিদিগেরই সুবিধা হইবে। আমাদের মনে হয় ভারত-সরকারের উপর যদি দেশীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারত-সরকার যদি জনগণের প্রকৃত কল্যাণকামনায় কার্য্য করেন তাহা হইলে এই শিল্পোন্নতি পরিকল্পনায় দেশের মঙ্গল হইবে।

দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা দেশে যে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত স্যার জন উডহেডকে সভাপতি করিয়া একটি দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সম্প্রতি এই কমিশনের রিপোর্টের প্রথমভাগ প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশনের মতে বাংলা দেশে অনশনে পনর লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে; অথচ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা করিলে এই দুর্ভিক্ষ ও লোকক্ষয় নিবারণ করিতে পারিতেন। এই দুর্ভিক্ষের জন্য উৎপন্ন শস্যের ঘাটতি কতকাংশে দায়ী; কিন্তু তাহা হইলেও গভর্ণমেণ্ট পূর্ব্ব হইতে সচেতন হইয়া শস্যসংগ্রহের ব্যবস্থা করিলে এবং দুর্ভিক্ষের সময় তাহার নিয়মিত বণ্টনের ব্যবস্থা করিলে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণ করা কঠিন হইত না, ইহাই কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত। দুর্ভিক্ষের সময় বেপরোয়াভাবে চাউলের চোরাবাজার চলিতে থাকে। গভর্ণমেণ্ট কেবল চাউলের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াই খালাস; কিন্তু নির্দ্ধারিত মূল্যে যাহাতে চাউলের সরবরাহ হয় গভর্ণমেণ্ট তাহার কোন বন্দোবস্ত করেন নাই। কমিশনের সুস্পষ্ট অভিমত এই যে কেবলমাত্র চাউলের ব্যবসায়ে অতি-লোভী ব্যবসায়ীরা দুর্ভিক্ষের সময় ১৫০ কোটী টাকা লাভ করিয়াছিল; এবং এই লাভ যোগাইবার জন্য পনর লক্ষ বাঙ্গালীকে অকালে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর মৃত্যুর বিনিময়ে চাউল ব্যবসায়ীরা হাজার টাকা অতিরিক্ত লাভ করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের একটি কথা বলিবার আছে। সাধারণতঃ সংবাদপত্রসমূহে দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়া থাকে; প্রায়ই বলা হয় দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা মধ্যযুগীয়, নানাদোষদুষ্ট পূর্ণ এবং বর্ত্তমানের সহিত সামঞ্জস্যহীন। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি নানাবিষয়ে ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থা হইতে দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা উৎকৃষ্ট। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ বাংলা দেশের অন্তর্গত কোচবিহার রাজ্যেও দেখা দিয়াছিল; কিন্তু কর্তৃপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়া চাউল সংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং নিয়ন্ত্রিত মূল্যে সরকারী গুদাম হইতে সর্ব্বসাধারণকে প্রয়োজনীয় চাউল সরবরাহ করিয়াছিলেন। চাউলের মূল্য ঊর্দ্ধে কেবল পক্ষকালের জন্য ২০৲ টাকা উঠিয়াছিল; কিন্তু সাধারণতঃ ১০৲ হইতে ১৫৲ টাকার মধ্যেই উহা নামা করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা এই যে, না খাইতে পাইয়া কোচবিহার রাজ্যে কেহ মারা যায় নাই। সমালোচকগণ অনেক সময় ভুলিয়া যান যে দেশীয় রাজ্যের শাসনব্যবস্থার একটা মস্ত সুবিধা এই যে এখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে একটা প্রাণের যোগ থাকে; স্যার সি, ভি, রামন কয়েকদিন পূর্ব্বে এক সাংবাদিক বৈঠকে দেশীয় রাজ্যের এই "personal touch" এর সুখ্যাতি করিয়াছেন।

পঁচিশে বৈশাখ—

পঁচিশে বৈশাখ বাঙ্গালীর জীবনে এক স্মরণীয় দিন। লোকোত্তর প্রতিভা লইয়া ঐদিন রবীন্দ্রনাথ বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অমর অবদানে সমৃদ্ধ হইয়া বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে সম্মানজনক আসন লাভ করিতে সক্ষম হয়। আমরা যে ভাষায় আজ কথা বলি, যে ভাবে ভাবিত হইয়া চিন্তা করি তাহার কতখানি যে রবীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি 'স্বদেশ-আত্মার বাণীমূর্ত্তি' রূপে দেশে দেশে ভারতের সাধনা ও ঐতিহ্যের কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। গত পঁচিশে বৈশাখ তাঁহার জন্মদিনে দেশ বিদেশে সর্ব্বত্র তাঁহার উদ্দেশে স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। মরদেহে তিনি আর ইহলোকে নাই; কিন্তু আমাদের অন্তরে তিনি নবজন্ম লাভ করুন, আমরা সমগ্র হৃদয় দিয়া তাঁহার বাণী গ্রহণ করি, আমাদের সকল কর্ম্মে তাঁহার সাধনা ফুটিয়া উঠুক—তাহা হইলেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন সত্য ও সার্থক হইবে।

খেলাধুলা

মিত্রপক্ষের বিজয় উৎসব উপলক্ষ্যে ফুটবল খেলা—

১৬ই মে মিত্রপক্ষের বিজয় উৎসব উপলক্ষে রাজবাড়ীর মাঠে মিলিটারী একাদশ বনাম অবশিষ্ট কোচবিহার দলের মধ্যে একটি ফুটবল ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। মহারাজা ভূপ বাহাদুর ও ক্যাপ্টেন এস্ রায় মিলিটারী একাদশের পক্ষে খেলেন।

খেলা দেখিবার জন্য বহু জনসমাগম হয়। খেলা আরম্ভ হইবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুই দলের তীব্র প্রতিযোগিতা লক্ষিত হয়। অবশিষ্ট দলের ফরোয়ার্ডগণের মধ্যে এ দাশ গুপ্ত, মণ্ট্ রায় ও ম্যাথাকে বেশ আদান প্রদান করিয়া খেলিতে দেখা যায়। এই দলের হাফ ব্যাক্ কেষ্ট ও কান্তি বেশ ভালভাবে ফরোয়ার্ড লাইনকে বল যোগায়। মিলিটারী দলের গোলকীপার বাবুলাল খুব দক্ষতার সহিত গোল রক্ষা করিতে থাকে; কিন্তু প্রথমার্দ্ধের শেষ ভাগে মণ্ট্ রায়ের কিকে একটি গোল হয়; বাবুলাল প্রথমে বলটি ধরিয়া ফেলে বটে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বলটি তাহার হাত হইতে ফসকাইয়া যায়।

দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম হইতেই মিলিটারী দল আক্রমণ করিয়া খেলিতে থাকে এবং মহারাজা সাহেব অতি সুকৌশলে প্রতিপক্ষের ব্যাকদ্বয়কে অতিক্রম করিয়া একটি গোল করেন। ইহার পরে তীব্র প্রতিযোগিতার সহিত উভয় পক্ষের খেলা চলিতে থাকে। অবশিষ্ট দলের রক্ষিত গোল করিবার কয়েকটি সুযোগ পাইয়াও গোল করিতে পারিলেন না। পরে খেলা শেষ হইবার কয়েক মিনিট পূর্ব্বে মিলিটারী দলের লেঃ ভগবান সিং একটী গোল করেন। ফলে মিলিটারী দল ২-১ গোলে বিজয়ী হন

এসোশিয়েসন ফুটবল (কোচবিহার)

মে মাসের শেষ সপ্তাহে কোচবিহার এসোসিয়েসন ফুটবল কাপ টুর্ণামেণ্ট খেলা আরম্ভ হইবে। এ পর্য্যন্ত বাহির হইতে দিনাজপুর, রংপুর, বুড়ী, গাইবান্ধা, বগুড়া পাবনা, দোমহনি, নিলকামরী, ডোমার, আলিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে খেলোয়াড় দল প্রতিযোগিতায় যোগদানের জন্য আবেদন পাঠাইয়াছেন।

হকিখেলা—

বেটন কাপ প্রতিযোগিতা—

কলিকাতায় বেটন কাপ প্রতিযোগিতামূলক হকি খেলা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। গত ২৮শে এপ্রিল এই খেলার ফাইন্যাল ক্যালকাটা মাঠে খেলা হয়। বি, এন, আর দল ও মহমেডান স্পোর্টিং দলের মধ্যে এই দিন প্রতিযোগিতা হয়। বি, এন, আর দল ৩-১ গোলে মহমেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করে। এইবার লইয়া বি, এন, আর দল পর পর তিনবার বেটন কাপ বিজয়ী হইল; ইতিপূর্ব্বে একমাত্র কাষ্টমস্ দল ছাড়া অন্য কোন দল এইরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

আগা খাঁ কাপ প্রতিযোগিতা—

আগা খাঁ কাপ প্রতিযোগিতা খেলা বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এই খেলার ফাইন্যাল গত ২১শে এপ্রিল কানপুরের কমলা ক্লাব ও ইন্দোরের কল্যাণমল মিল দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ফাইন্যালে কানপুর দল ২-০ গোলে ইন্দোর দলকে পরাজিত করিয়াছে।

ফুটবল খেলা আরম্ভ—

বাংলার ফুটবল খেলার মরসুম আরম্ভ হইয়াছে। খেলোয়ার ও দর্শক উভয়ের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে। গত ১লা মে মঙ্গলবার হইতে কলিকাতা ময়দানে প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগ খেলা আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম দিনের খেলা খুব চমকপ্রদ হয়; এই দিন গত বৎসরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল ডালহৌসী দলকে অতি সহজেই ৩-০ গোলে পরাজিত করে এবং ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব গত বৎসরের শীল্ড বিজয়ী বি, এণ্ড, এ রেল দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। বি, এণ্ড, এ রেল দলের পরাজয় অপ্রত্যাশিত। অদ্য পরাজয়ের মধ্য দিয়া বিভিন্ন দলের লীগ প্রতিযোগিতা খেলা চলিতেছে।

CENTRAL LIBRARY

কুচবিহারের এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান

বসন্ত বিড়ি ফ্যাক্টরীর আর একটী নূতন নমুনা

হাঁস মার্কা বিড়ি

বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট তামাকে প্রস্তুত। পানে অবসাদ দূর করিয়া আনন্দ ও তৃপ্তি আনয়ন করে আসে।

দামে সস্তা—আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করি।

সোল প্রোঃ—শ্রীপাঁচুগোপাল শেঠ

বসন্ত বিড়ি ফ্যাক্টরী কুচবিহার।

জেনে রাখা ভাল—

গুহস্ বুক ডিপো-ই

একমাত্র নির্ভর যোগ্য পুস্তকের ও ষ্টেশনারী দ্রব্যের দোকান।

স্থান—সদর ডাকঘরখানার পশ্চিমে বড় রাস্তার উপর।

এন, সেনের

দাদ ও কাউঁরের মহৌষধ মাত্র তিন দিনে আরোগ্য হয়। মূল্য—এক কৌটা ।৹ আনা মাত্র

পাউডার—এক প্যাকেট ৵৹ দুই আনা মাত্র।

প্রাপ্তি স্থান :—এন, সেন এণ্ড কোং

কুচবিহার বাজার ২০২ নং।

ভি, পি, তেও সরবরাহ করা হয়।

সূচীপত্র

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	স্রষ্টা	(কবিতা)	শ্রীসুধাংশুরঞ্জন মল্লিক	৮৯
২।	অনন্তপথের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ	(প্রবন্ধ)	কলিকাতার শ্রীকালিদাস রায়	৯০
৩।	বঙ্কিমচন্দ্র ও কোমত দর্শন	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপিকা শ্রীঅরুন্ধতী সেন এম-এ	৯৪
৪।	শ্রীমথুরা	(কবিতা)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	৯৭
৫।	অবিনাশবাবুর বার্দ্ধক্য	(গল্প)	শ্রীজগদীশ গুপ্ত	৯৯
৬।	মাটী ও আকাশ	(কবিতা)	শামসুদ্দীন	১০৪
৭।	বর্ত্তমান শিক্ষাধারার দুষ্টিভঙ্গী	(প্রবন্ধ)	শ্রীগীতা গুপ্ত বি-এ, বি-টি	১০৫
৮।	শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক	(আলোচনা)	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন	১০৮

নিবেদন :—

স্বাস্থ্যই সুখের মূল, শরীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হওয়ার জন্যই রোগ দেখা দিয়া থাকে, সেজন্য বুদ্ধিমান লোকে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন, নতুবা সামান্য ব্যাধি পরে কষ্টদায়ক—এমন কি প্রাণঘাতীও হইতে পারে।

যাহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণে সহজেই রোগমুক্ত হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সিটী মেডিক্যাল ষ্টোর, জলপাইগুড়ি সর্ব্ব প্রকার দেশী বিদেশী ঔষধ, রোগীর পথ্য, শিশুর খাদ্য ও পেটেন্ট ঔষধ বাজার চলতি দরে আমদানী ও সরবরাহ করিতেছেন।

সিটী মেডিক্যাল ষ্টোরে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত থাকিয়া সমাগত রোগীগণের পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যাহাতে দেশবাসী অনায়াসে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসার সুবিধা পান ইহাও সিটী মেডিক্যাল ষ্টোর কর্ত্তৃপক্ষের অন্যতম উদ্দেশ্য।

জন সাধারণ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদের শ্রম সার্থক করুন ইহাই আমার নিবেদন।

ডাঃ এ, লতিফ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে কুচবিহার নিবাসী শ্রীমাখনলাল নাথ Surname 'নাথ' পরিবর্ত্তন করিয়া গোস্বামী পদবী গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তাঁহার নাম শ্রীমাখনলাল গোস্বামী বলিয়া চলিবে।

শ্রীমাখনলাল গোস্বামী,
১৯।৩।৪৫।

সূচীপত্র

	বিষয়		লেখক	পত্রাঙ্ক
৯।	চিঠি	(কবিতা)	শ্রীশৈলেন্দ্রলাল রায়	১১৩
১০।	আমনার টুক্‌রো	(গল্প)	শ্রীঅমলেন্দু রায় বি-এ	১১৮
১১।	রাজপরিবারের সংবাদ	...	... ...	১২২
১২।	শোক সংবাদ		... ...	১২৩
১৩।	অশ্রুকণা (শোক-গাথা)		শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ	১২৪
১৪।	স্থানীয় সংবাদ	...	... ...	১২৫
১৫।	দেশবিদেশের কথা	...	... ...	১২৭
১৬।	সাময়িক প্রসঙ্গ	...	... ...	১২৯
১৭।	খেলা-ধূলা	...	... ...	১৩২

বিজ্ঞাপন।

"কোচবিহার রাজ্যস্থিত মাথাভাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ, দিনহাটা ও সদর সবডিভিজন ভুক্ত ব্রহ্মোত্তরের জোত আদি সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে, আবেদন করুন। ১১৫ নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।"

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
নায়েব, বড়কুঠি
কুচবিহার।

কোচবিহার বিখ্যাত শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহার
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটী শাস্ত্রীয় মহৌষধ।

রেজেষ্টরী করা

ধন্বন্তরী পাচন

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের অমোঘ মহৌষধ মূল্য প্রতি বোতল ২৷৷০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

গরুড় মার্কা

শ্বাসশান্তি রস

হাঁপানী ও খাঁ খাঁ কাশের সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

গোবিন্দসুধা— আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত পরম রসায়ন। সেবনে বলপুষ্টি বর্দ্ধিত এবং বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা। ডাকে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

পিত্তশূল সুধা— ইহা পিত্তশূল, অম্লশূল ও অজীর্ণ রোগের মহামহৌষধি সেবনে বুকজ্বালা, চোঁয়া ঢেকুর উঠা অজীর্ণ, পেট কাঁপা পিত্ত ঘটিত পেট ব্যাথা, অগ্নিমান্দ্য, আহারের পর বমি প্রভৃতি এবং অম্লশূল ও তজ্জ পিত্তশূল আরোগ্য হয় মূল্য ২৷৷০ টাকা। ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র।

কলেরা কিওর— কলেরা, উদারময়, পেট কাঁপা অগ্নিমান্দ্য ও সূতিকা প্রভৃতি রোগে সদ্য ফল প্রদ অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

নেত্র সুধা— চক্ষু রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ব্যবহারে চক্ষুউঠা, চক্ষু দিয়া জল পড়া, বেদনা, ছানি দোষ. ঝাপসা দেখা প্রভৃতি চক্ষু রোগ সত্বর আরোগ্য হইয়া দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে। মূল্য ১৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহা,

কাঁইয়াপট্টি, কোচবিহার।

কে, এম্ সরকারের

'ক্ষতবিনাশন'

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতের অব্যর্থ মহৌষধ।

শ্যাঙ্কত, ব্রণের ঘা, অস্ত্র ক্ষত, গুনের ঘা, নাসা ক্ষত, মাথার ঘা, পোড়ার ঘা, আঙ্গুলহারা, কাটা ঘা, নালী পচা ঘা, ফোড়া ঘা, পৃষ্ঠাঘাত, বিষাউজ (বিচ্কু) ঘা, পাচড়া, পাপড়ি ঘা, বাঘীর ঘা, দুষিত ঘা ইত্যাদি যত দিনের যে কোন প্রকার ঘা হউক না কেন বিনা যন্ত্রণায় অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হইবে। এই ঔষধ নির্দ্দোষ উপাদানে প্রস্তুত।

এজেন্ট—মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স, কোচবিহার।

প্রোঃ—কে, এম, সরকার এণ্ড সন্স, হেড অফিস :—মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার।

স্থাপিত ১৮৭৩ ইং

প্রাক্টিস এবং কারখানা ৩৫।১, হ্যারিসন রোড

শো-রুম ৭৮, হ্যারিসন রোড কলিকাতা

রায় ব্রাদার্স

কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম লিথিবার কালি প্রস্তুত কারক

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

আমাদের কারখানায় সুলতে সকল প্রকার লিথিবার কালি, রবার ষ্ট্যাম্প, পিতলের সিলমোহর, সপরাস, ডাই, কপারপ্লেট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী।

১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক সডাক তিন টাকা; মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকার প্রকাশের জন্য লেখা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

৩। অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হয়; অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৪। কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৫। পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি প্রতেকখানি দুই আনা মূল্যে স্বতন্ত্র কিনিতে পাওয়া যায়।

৬। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ

ষ্টেটপ্রেস, কোচবিহার।

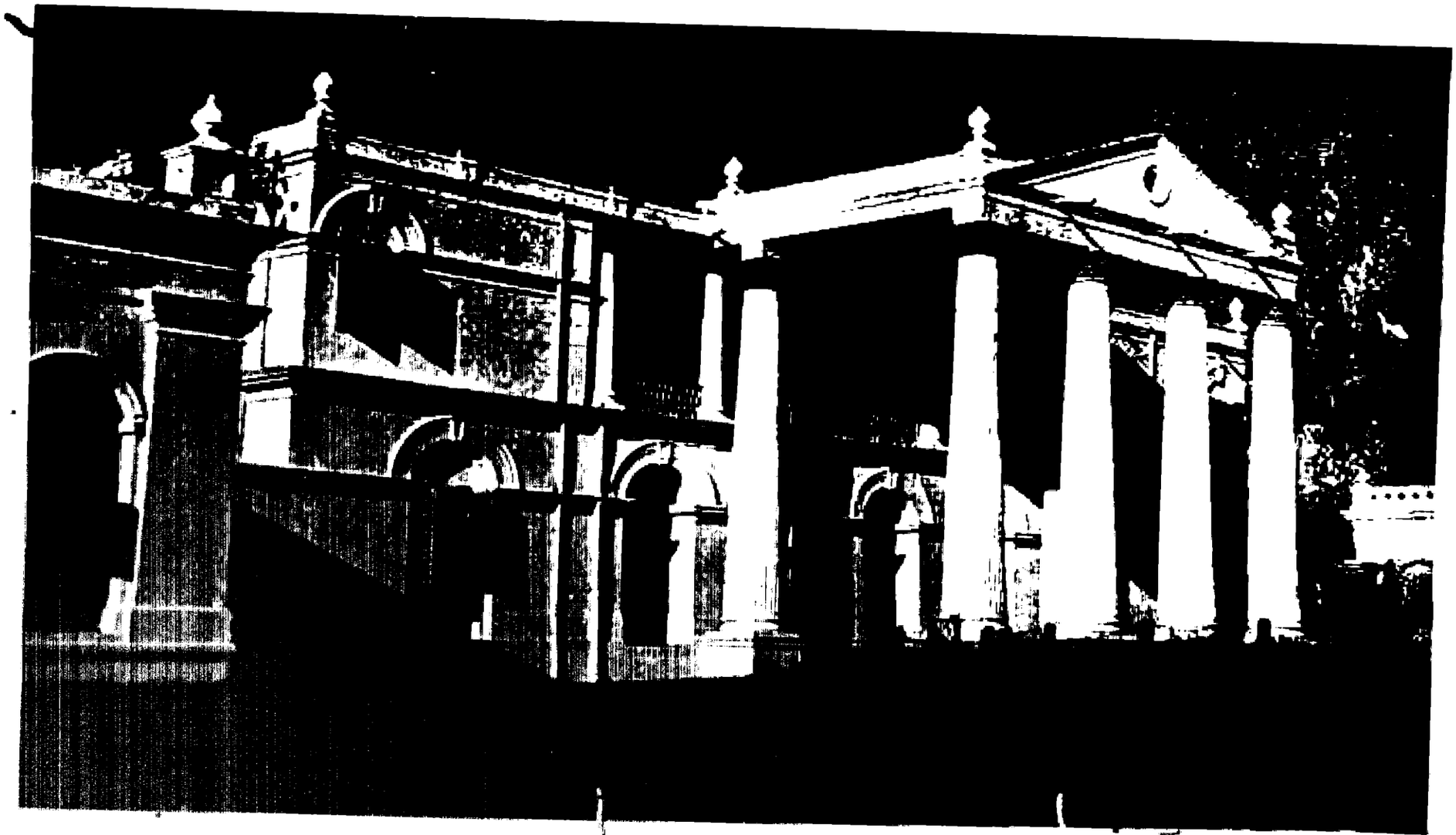

আধুনিক সভাগৃহ—কুচবিহার।

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY

কোচবিহার দর্পণ

অষ্টম বর্ষ | আষাঢ় ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ | ৩য় সংখ্যা

স্রষ্টা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এই বিচিত্র সৌর জগৎ সাগরাম্বরা ধরা,
অতি অপূর্ব্ব জীবমণ্ডল যাঁহার হাতের গড়া
দেবতার ছবি এ মানব জাতি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যাঁর
লোকপিতামহ সে প্রজাপতিরে জানাই নমস্কার।
তুমিও চতুর্ম্মুখের বন্ধু হে কবি ভাতিস্বর,
তোমার সৃষ্টি সৌর-জগৎ চেয়েও বৃহত্তর।
হংস-পুচ্ছ বাহন তোমার হংসের যাহা সার,
ব্রহ্মা কমণ্ডলুর অধিক তোমার মস্তাধার;
অনন্ত তব সৃষ্টির ধারা কত বিচিত্র বেশ,
নিতি নব নব রসের সৃষ্টি প্রতিভার উন্মেষ,
কতই ছন্দ লীলা অভিরাম সত্য চমৎকার
হে কবি তোমারে চরণে নিত্য জানাই নমস্কার।
আধা দেহী তুমি আধেক আত্মা, তুমি নরনারায়ণ
বিধাতার ঠিক পাশেই রয়েছে তোমার পদ্মাসন,
পঞ্চভূতেতে বিবিধ সৃষ্টি করিতেছে নানারূপ
তোমার সৃষ্টি চির সুন্দর পরিশ্রুত নাহি তাপ।
ভক্তিতে প্রেমানন্দে এবং বিস্ময়ে বারবার
সন্ধ্যা ও প্রাতে [illegible] জানাই নমস্কার।

অনন্তপথের যাত্রী রবীন্দ্রনাথ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কবির জীবনের ও প্রতিভার অবিরাম যাত্রা অজানার উদ্দেশে। অজানা কবিকে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু কোন পুরস্কারের লোভে কবির এই অবিশ্রান্ত গতি? কবি ইহার উত্তর দিয়াছেন অনেক কবিতায়। পথের শেষে কি আছে তাহা তিনি জানেন না—তিনি পথ চলার মধ্যেই আনন্দ পান—নিত্যই হাতে হাতে পথেপথেই পুরস্কার পান—এই আনন্দই তাঁহার পাথেয়—এই আনন্দই তাঁহাকে অগ্রগমনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করে। কবি বলিতেছেন—"অজানার সুরে চলিয়াছি দূর হতে দূরে মেতেছি পথের প্রেমে।" পথই—পথশেষ নয়—অনন্ত-পথের পরিব্রাজক কবির পরম বন্ধু।

কবি তাই সেই অজানা পথের যাত্রী। চলার রসেই তিনি মাতিয়া চলিয়াছেন—

"আমি পথিক, পথ আমারি সাথী।*
বত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথচলার নিত্যরসে দিনে দিনে
জীবন ওঠে মাতি।"

অজানার উদ্দেশে চলাই পদে পদে অজানাকে পাওয়া।

"পান্থ, তুমি পান্থ জনের সখা হে,
পথে চলাই সেইত তোমায় পাওয়া।
বিপদ বাধা কিছুই হবে না সে,
ভয়না প'ড়ে কোনো লাভের আশে,
যাবার লাগি' মন তারি উদাস—
যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া।"

অজানার বাঁশির টানেই কবির এই অবিশ্রান্ত চলা।

"আকাশ আমায় ডাকে দূরের পানে
ভাষাবিহীন অজানিতের টানে
সকাল সাঁঝে পরাণ মম টানে
কাহার বাণী এমন গভীর স্বরে।"

কবি অজানার পথে চলিয়াছেন। চলার আনন্দেই বিভোর হইয়া—পথেপথেই তিনি যাত্রার পুরস্কার পাইতেছেন। অজানার উদ্দেশে তাঁহার যাত্রা—পথের শেষে কি লাভ করিবেন তাহা তিনি জানিতেও চান না। কোনও লাভের ভরসা রাখিয়া তিনি চলিতেছেন না। কিন্তু কোনো আশাই কি তিনি পোষণ করেন না? করেন

---

* শুধু অনন্তের পথ নয়, পথ মাত্রই কবির চিত্তকে চঞ্চল করে। কেবল 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির পথ' নয়—সকল পথই কবিকে অনন্তের পথের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। গৃহের চেয়ে পথই তাঁহার আপনার—পথের সঙ্গেই তাঁহার সোক্তি।

"গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশা পথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্তমান নিমিষের শত সহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়া ব্যস্ত।" পথিক কবির অতীতের প্রতি মায়া নাই—ভবিষ্যতের আশা তিনি রাখেন না—Shelley'র Skylark এর মত বর্তমান তাঁহার উপভোগ্য। পথবিলাসী কবি তাই পথের ধর্মও লাভ করিয়াছেন। পথের প্রাণের বাণী আছে—সে বাণীকে তিনি রাজপথের কথায় রূপ দিয়াছেন।

না বলিলে ভুল হইবে। পথের পুরস্কার যাহাই হউক, পথের শেষে যে দীর্ঘ পর্যটনের সুফল পাওয়া যাইবে—এ আশা তিনি পোষণ করেন :

"গতি আমার এসে ঠেকবে যেথায় শেষে,
অশেষ সেথা খোলে আপন দ্বার।"

মরণ যে নবজীবনের সিংহদ্বার এ ধারণা তাঁহার মনে আছে। এই নবজীবনের সৌভাগ্যলাভ—ইহাই সাধকবিকে সারাপথ আশ্বস্ত করিয়া রাখিয়াছে।

"উদয়াচলের যে তীর্থ পথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,

* * *

জীবনের পথ দিনের প্রান্তে এসে
নিশীথের পানে গহনে হয়েছে হারা,
অঙ্গুলি তুলি তারাগুলি অনিমেষে
মাতৈঃ বলিয়া নীরবে দিতেছ সাড়া।
ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
একূল হইতে নব জীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।"

এই নব জীবন এই মর্ত্য লোকে পুনর্জন্ম নয়। কবি হিন্দু বা বৌদ্ধমতের জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী নহেন। এই নবজীবন কোন অজানা পরমাত্মিক মহত্তর লোকে আত্মবিকাশ—আত্মার পরিপূর্ণতা।

এই যে অজানার পথে অবিরাম গতি এই গতিও রুদ্ধ্যা নয়। কবি চলিতে চলিতে দুই ধারে সৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়াছেন। তাঁহার নিজের সৃষ্টির মায়ায় আসক্ত হইয়া তিনি মধ্যপথে থামিতেছেন না। কবি এই সৃষ্টিকে 'উৎসবশেষের পানপাত্রের মত চরণে ঠেলিয়া চলিয়া যান।

কবি বলেন—নিজের সৃষ্টিই একটা বাঁধন্। যত-গুলি বাধা অবিরাম অগ্রগতির পথে যাত্রা ব্যাহত করে আপন সৃষ্টির মায়া তাহাদের মধ্যে অন্যতম। নিজের সৃষ্টির প্রতি বৈরাগ্য রবীন্দ্রনাথের কোন কোন কবিতার প্রধান উপজীব্য। কবি নিজকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

"তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক তীরে
তাকাসনে ফিরে।"

কবির জীবনে অজানার জন্য অসীম ব্যাকুলতা—"তাহার ফলে নিত্য নূতন সাধনাতে নিত্য নূতন বাধা"—তাহারই অভিব্যক্তি নিত্য নূতন। তৃষ্ণা অসীম—তৃষ্ণার তৃপ্তির জন্য প্রার্থনার অন্ত নাই—প্রাপ্তিরও সীমা নাই। ইহাই ত নব নব সৃষ্টির রূপ ধরিতেছে—এ সৃষ্টিতে মায়া থাকিলে আর অসীমের পথে ত আগানো যায় না। কবি তাই বলিয়াছেন—

"পেলেই সেত ফুরিয়ে ফেলি আবার আমি হাত পেতেছি
নিত্য দেওয়া ফুরায় না যে, নিত্য নেওয়া তাই।"

দান ও আদান যেখানে অকুণ্ঠ—সেখানে দেয় বস্তুতে মায়া থাকিবার কথা নয়। এই নিষ্কাম অনাসক্ত দানই তাঁহাকে দিন দিন আগাইয়া লইয়া গিয়াছে—পশ্চাতে টানিয়া রাখিতে পারে নাই।

কবি বলিয়াছেন এই অজানার আহ্বানে ব্যাকুলতা—অসীমের জন্য তৃষ্ণা—পরমাত্মার জন্য জীবাত্মার মিলনাগ্রহ মানবের স্বভাবিক ধর্ম। ইহাকে ইংরাজ কবিরা Yearning for the Infinite বলিয়াছেন। আমরা প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মধ্যে (রমাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্) মাঝে মাঝে ইহাকে স্পষ্ট ভাবে ধরিতে পারি। অন্য সময় এই Yearning বা আকুতি নামা অকারণ—মায়া ঘুমের মধ্যে জড়াইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন "যে ঘুমে উৎসবশেষে

অজানার জন্য তাহা সঙ্গের ক্ষুধা অঙ্গের ক্ষুধা প্রাণের ক্ষুধা মনের ক্ষুধা সব ক্ষুধার সঙ্গে জড়াইয়া নানা আকর্ষণ বেগে আমাদের মনের আকৃতি গড়িয়া তোলে।" (অপূর্ণ)

পূর্ণের পথের যাত্রী আত্মার অমরতা ও অসীমতায় বিশ্বাসী কবির অন্তরে যেমন অসীম তৃষ্ণা—তেমনি অসীম আশা। তিনি জানেন মানুষের কোন সাধনাই ব্যর্থ নয়—যাহা কিছু অসম্পূর্ণ সবই পূর্ণতা লাভ করিবে একদিন :

"এ জন্মের যা কিছু সুন্দর
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানারে
বাজে মনে নহে দূর নহে বহুদূর।"

আমরা এই পার্থিব চোখে কতটুকুই বা দেখি। নদী যেমন অসীমের মধ্যে পূর্ণতা লাভ করে তেমনি অসীমের মধ্যে আমাদের সকল সাধনাই একদিন পূর্ণতা লাভ করিবে। এই সীমার জগতেও আমরা দেখি, যাহার অবসান হইল মনে করি তাহা নব নব রূপে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে ; ক্রমোন্মেষের পথে চলিতে চলিতে আমরা অনেক সময় তাহা ধরিতে পারি না :

"ফুরায় যাহা ফুরায় শুধু চোখে—
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে
আপনি নূতন উঠে ফুটে
জীবনে ফুল কোটা হলে মরণে ফল ফলবে।"

কবি অপূর্ণকে পূর্ণের বিপরীত মনে করেন না—পূর্ণাভিমুখী বলেন :

"জীবনের ধন কিছুই যাবেনা ফেলা
ধূলায় তাদের যত হ'ক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের পরে।"

কবি যে সত্যের উপলব্ধি করিয়া আপনাকে বারম্বার আশ্বস্ত করিয়াছেন সেই সত্যের কথা প্রভুর উদ্দেশে বলিয়াছেন—

"জীবনে যত পূজা হলোনা সারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারাল ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।"

কবি মৃত্যুকেই বলিয়াছেন জীবনপথের শেষ ; কিন্তু ইহা আবার নব নব জীবনের মধ্য দিয়া নব নব লোকে যাত্রার সিংহদ্বার। এই সমস্তই সাধনার কথা। জীবনের অনিবার্য্য পরিণতি মরণকে নিজের মনের মাধুরীদিয়া বরণীর রূপে পরিকল্পিত না করিয়া লইলে তিনি জীবনের গান এমন করিয়া গাহিতে পারিতেন না, মরণের বিভীষিকাই তাঁহার জীবনের রস শোষণ করিয়া লইত।

যৌবনে কবি একদিন গাহিয়াছিলেন—"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"।

ইহা মৃত্যুর বিভীষিকার কথা স্মরণ করিয়া নয়। মর্ত্যভূমির অপূর্ব্ব মাধুরীর আকর্ষণে।

মৃত্যুর বিভীষিকা হরণ এবং তাহাকে মোহন মধুর রূপে অন্তরে বরণ Modern Romantic সাহিত্যের একটী বিশেষ অঙ্গ। ইউরোপীয় সাহিত্যের এই ভাবটি [illegible] নাথের যৌবনের কাব্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। [illegible] বৌদ্ধ-সাহিত্য তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মৃত্যুকে [illegible]

দিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের রচনায় ভারতীয় তত্ত্বসাহিত্যের প্রভাবসম্পাত হইয়াছে। মৃত্যুর পরবর্ত্তী অবস্থার সিদ্ধান্ত করি সে সাহিত্য হইতে গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার মিলনতত্ত্ব তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার "অজানা" "পূর্ণ" "অসীম" "অনন্ত" ইত্যাদি পরমাত্মা ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

যৌবনে মৃত্যুর সম্ভাবনা দূরবর্ত্তী; তাই তাহাকে লইয়া কাব্যের মধ্য দিয়া লীলাবিলাস চলিয়াছে। বার্দ্ধক্যে মৃত্যু আসন্ন, তখন তাহাকে লইয়া আর রস-লীলা চলে নাই। মৃত্যুভয়কে একেবারে অস্বীকার তিনি করিতে পারেন নাই। মৃত্যুভয়কে জয় করিবার জন্য তিনি মৃত্যুর অনেক সঙ্গত ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যে মনোভাব হইতে এইরূপ ব্যাখ্যা-দানের প্রবৃত্তি জন্মে—নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশে তাহারই কথা বলিয়াছেন গঙ্গার উদ্দেশে—

"মানুষের মুখ্যভয় মৃত্যুভয়
কেমনে করিবে তারে জয় নাহি জানে।
তাই সে হেরিছে ধ্যানে—
মৃত্যুবিজয়ীর জটা হতে অক্ষয় অমৃত স্রোতে
প্রতিক্ষণে নামিছ ধরায়।
পুণ্য-তীর্থ তটে সে যে তোমার প্রসাদ পেতে চায়।
সে ডাকিছে মিথ্যা শঙ্কা নাগপাশ ঘুচাও ঘুচাও,
মরণেরে যে কালিমা লেপিয়াছি মুছাও মুছাও,
গম্ভীর ভীষণ মূর্ত্তি মরণের
তব কলধ্বনি মাঝে গান ঢেলে দিক্ তরণের
এ জন্মের শেষ ঘাটে।
শেষ দণ্ডে ভরে দিক্ তার কান
অজানা সমুদ্রপথে তব নিত্য অভিসার গান।"

কবির হিন্দু দেশবাসী যে ভাবে মৃত্যুভয় তরণের সান্ত্বনা খুঁজিয়াছে কবিও সেই ভাবেই অনন্ত পথ যাত্রার পরিকল্পনায় সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের সাধনার সান্ত্বনাও সামান্য নয়। তিনি নিজে আপন সৃষ্টির বাঁধনে বাঁধা পড়েন নাই বটে—কিন্তু তিনি ইহা মর্ম্মে মর্ম্মে জানিতেন তাঁহার ভৌতিক দেহের ধ্বংস হইলেও তিনি তাঁহার অমর সৃষ্টির মধ্যে চিরদিন তাঁহার মমতাময়ী মর্ত্তাভূমিতে অমর হইয়াই থাকিবেন। জীবনের সাধনায় তিনি যে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন—তাহা তাঁহাকে হাসিমুখে মরণকে বরণ করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছে। এই পরিতৃপ্তি তাঁহার অনন্ত পথের পাথেয় হইয়াছে। এই পরিতৃপ্তির বাণী তাঁহার "**বর্ষশেষ**" কবিতায় অপূর্ব্ব বাণীরূপ ধরিয়াছে। তাহার দুইটি মাত্র স্তবক উৎকলন করি—

"যাত্রা হয়ে আসে সারা আয়ুর পশ্চিম পথ শেষে
ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে।
অস্তসূর্য্য আপনার দাক্ষিণ্যের শেষ বন্ধ টুটি
ছড়ায় ঐশ্বর্য্য তার ভরি দুই মুঠি।
বর্ণ সমারোহে দীপ্ত মরণের দিগন্তের সীমা
জীবনের হেরিনু মহিমা।
ধূলির আসনে বসি ভূমারে হেরেছি ধ্যানচোখে,
আলোকের অতীত আলোকে।
অণু হ'তে অণীয়ান্ মহৎ হইতে মহীয়ান্
ইন্দ্রিয়ের পারে তার পেয়েছি সন্ধান।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা,
অনির্ব্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতে ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

কবি যে ধন লাভ করিয়াছিলেন—তাহাতে মৃত্যুভয়ের মত গুরুদুঃখেও বিচলিত হ'ন নাই। তিনি দৃপ্তকণ্ঠেই বলিতে পারিয়াছিলেন—

"ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন মৃত্যুমহাসাগর সঙ্গমে।"

কবির শেষ গান তাই—

"সম্মুখে শান্তি পারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।"

বঙ্কিমচন্দ্র ও কোমত-দর্শন

অধ্যাপিকা শ্রীঅরুন্ধতী সেন এম্-এ

ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের সময় হইতে ইউরোপীয় সাহিত্য, দর্শন এবং বিজ্ঞান ভারতীয়গণ বিশেষ উৎসাহের সহিত শিক্ষা করিতে লাগিলেন। সেক্সপিয়ার মিলটনের কাব্য, হিল স্পেন্সরের দর্শন, নিউটন কেপলারের বিজ্ঞান ইংরাজী শিক্ষিতগণের মনের উপরে গভীর রেখাপাত করিল। নূতন জ্ঞানের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা পরম পুলকিত হইলেন এবং নানাভাবে ইহাকে আয়ত্ত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। যে সকল পাশ্চাত্য দার্শনিক শিক্ষিত বাঙ্গালীকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিশেষ করিয়া প্রভাবান্বিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক কোমত্ একজন প্রধান। কোমতের দার্শনিক মত তৎকালীন ইউরোপকে গভীররূপে আন্দোলিত করিয়াছিল এবং সেই আন্দোলনের ঢেউ বাংলাদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। তাঁহারই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার "অনুশীলনধর্ম্ম" বা "ধর্ম্মতত্ত্ব" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। অনুশীলন ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে কোমত প্রচারিত Positivism মতবাদের মূল সূত্রগুলি জানা দরকার। সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

মানুষ সমাজে বাস করে; ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনের চরমোৎকর্ষ লাভ ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে সকলেরই কাম্য হওয়া উচিত। এই উৎকর্ষ লাভ করিতে হইলে মানুষের হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি এবং কর্ম্মশক্তির পূর্ণ অনুশীলন দ্বারা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে। তাই কোমত বলেন,—"Positivism regulates the whole course of our private and public existence by bringing Feeling, Reason and Activity into permanent harmony." মানবের সকল বৃত্তি সমূহের অনুশীলনে যে চরমোৎকর্ষতা লাভ হইবে তাহাই দেবত্ব। এই দেবত্ব লাভ করাই মানুষের ধর্ম্ম। তাই কোমতের মত Religion of Humanityই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। দেবতার আসনে কোনও কল্পিত দেব দেবীকে বসাইবার প্রয়োজন নাই; Humanityই শ্রেষ্ঠতম দেবতা। মানুষের সকল বৃত্তি, সকল চেষ্টা এই Humanity দেবীকে লাভ করিবার দিকেই প্রসারিত করিতে হইবে। এই দেবীকে জ্ঞানের দ্বারা লাভ করিব, প্রীতির দ্বারা ভক্তি করিব, কর্ম্মের দ্বারা সেবা করিব—ইহাই আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত। তাই কোমত্ বলেন "Towards Humanity, who is for us the only true Great Being, we, the conscious elements of whom she is composed, shall henceforth direct every aspect of our life, individual or collective. Our thought will be devoted to the knowledge of Humanity, our affections to her love, our actions to her service. এই Humanityর আদর্শ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে ব্যক্তিকে সমষ্টির দিকে [illegible] হইবে; আত্মপ্রীতিকে সামাজিকপ্রীতিতে [illegible] হইবে। সামাজিক প্রীতির উপর [illegible]

প্রতিষ্ঠিত। সমাজ-প্রীতি ব্যতীত কি ব্যক্তি কি সমষ্টি কাহারই মঙ্গল নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে যে অনুশীলন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহার অনেকাংশের সহিত কোমতের positivism এর মিল আছে। মানুষের সকল বৃত্তিগুলির পরিপুষ্টি এবং তাহাদের সামঞ্জস্যে পূর্ণ মনুষ্যত্ব এবং এই মনুষ্যত্বই মানুষের ধর্ম্ম—ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মতত্ত্বের মূল কথা। এই তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্যই কোমত-মত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের বৃত্তি-গুলিকে শারীরিক ও মানসিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। মানসিক বৃত্তি আবার তিন প্রকারের—জ্ঞানার্জ্জনী, চিত্তরঞ্জিনী ও কার্য্যকারিণী। জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির সাহায্যে জ্ঞান অর্জ্জিত হয়, চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি আমাদিগকে আনন্দ অনুভূত করায় এবং কার্য্যকারিণী বৃত্তি আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। এই চতুর্ব্বিধ বৃত্তির উপযুক্ত স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যই মনুষ্যত্ব। ব্যায়ামাদির দ্বারা শারীরিক বৃত্তির স্ফূর্ত্তি, বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন, সাহিত্য ও ললিত শিল্পের চর্চ্চাদ্বারা চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির এবং প্রীতি ভক্তি প্রভৃতির অনুশীলন দ্বারা কার্য্যকারিণী বৃত্তির স্ফুরণ—ইহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম। কিন্তু এই সকল বৃত্তির অনুশীলনের সময়ে ইহা সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে কোনও একটি বিশেষ বৃত্তির যেন এত অধিক সম্প্রসারণ না ঘটে যাহাতে অন্যান্য বৃত্তিসমূহ তাহাদের উপযুক্ত স্ফুরণে বাধা পায়। কেন না তাহা হইলে বৃত্তিগুলির পরস্পরের সামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যাইবে। কোমতও এই সামঞ্জস্যের উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন। তাঁহার মতে Feeling, Reason এবং Activityর মধ্যে স্থায়ী সামঞ্জস্য "Permanent Harmony" একান্ত আবশ্যক।

মানবের সকল সৎবৃত্তির উপরে কোমত্ সমাজ-প্রীতির স্থান দিয়াছেন। এই সমাজ-প্রীতি দ্বারা কোমত্ বিশ্বপ্রেম বা সর্ব্বমানবপ্রীতি বুঝিয়াছেন। কোমতের মতে ব্যক্তির চাইতে সমাজ অনেক বড়। ব্যক্তির নিজস্ব সত্তাকে সমাজ সত্তার বিসর্জ্জন দেওয়াই মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আত্মপ্রীতি সকল মানুষের হৃদয়েই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে কিন্তু মানুষ যত এই আত্মপ্রীতির ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে, যত আপনাকে সমগ্র মানব সমাজের সহিত এক করিয়া দেখিতে পারিবে, ততই সে পশুত্ব হইতে দেবত্বে উন্নীত হইবে এবং তাহার পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকশিত হইবে। আত্মপ্রীতি হইতে সমাজ-প্রীতিতে পৌঁছিবার কতকগুলি সোপান আছে। অপত্য-স্নেহ, দম্পতি-প্রেম, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি এই সোপান। কোমত্ বলেন "Intermediate between selflove and universal benevolence, are the domestic affections:—Filial, Fraternal, Conjugal and Paternal. The love of his family leads man out of his original state of self-love and enables him to attain finally a sufficient measure of social love."

বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্বে দেখাইয়াছেন যে আত্মপ্রীতি হইতে স্বজনপ্রীতির দ্বারা দিয়া বিশ্বপ্রীতিতে পৌঁছাইতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র কোমত্ হইতেও আরও অধিক অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র মানবপ্রীতিকেই ধর্ম্মের শেষ সীমানা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। তিনি কোমতের মত Humanityকেই দেবতার আসনে স্থান দেন নাই। তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত; তাই তিনি মানবপ্রীতির পরম্পরায় যে আত্মবিস্মৃতি বা মুক্তি বর্ণিয়াছেন তাহার শেষ বলিয়াছেন। কোমতের মতে সমাজপ্রীতি মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতে আত্মবিস্মৃতির

মানুষের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। মানুষে প্রীতি না থাকিলে অবশ্য ভগবৎ ভক্তি জন্মে না কিন্তু কেবল মাত্র "মানব দেবীর" পূজা বা সেবা করিয়া মনুষ্যজীবনের চরম সার্থকতা লাভ হয় না। ঈশ্বরভক্তি হইলেই মানুষের সব হইল। মানুষের সকল বৃত্তি যখন উপযুক্ত রূপে অনুশীলিত হয় তখন তাহারা সকলেই ঈশ্বরমুখী হয়। "ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন; সেই অবস্থাই ভক্তি। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি ভক্তির অন্তর্গত এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।"

কোমৎ তাঁহার দার্শনিক মত প্রচারের সময় বারংবার বলিয়াছেন যে positivism একটি অবাস্তব মত মাত্র নহে, ইহা বাস্তব কার্য্যকরী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। ইহা শুধু দার্শনিকের আলোচনার বস্তু নহে, ইহাদ্বারা মানব মাত্রেই তাহার জীবন পরিচালিত ও গঠিত করিতে পারে। তিনি বলেন, "Positivism is characterised always by reality and utility, and admits of no degeneration into asceticism or quietism, The love by which it is inspired is no passive principle; while stimulating Reason & Imagination, it does so only to give a higher direction to our practical activity."

বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহার অনুশীলন ধর্ম্মের কার্য্যকারিতার উপর খুব জোর দিয়াছেন। ইহা শুষ্ক মত মাত্র নহে, ইহা বৈরাগ্য কিম্বা কর্ম্মহীনতা শিক্ষা দেয় না। বরং মানুষকে শক্তিতে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে মহান্ করিয়া তোলাই ইহার উদ্দেশ্য। যিনি কেবল মাত্র জ্ঞানী বা কেবলমাত্র বৈরাগী, সংসারের কর্ম্মসমুদ্রে যিনি ঝাঁপাইয়া পড়েন নাই তিনি পূর্ণমানবতা লাভ করিতে পারেন নাই; তাঁহার কোন একটা বিশেষ বৃত্তির চরম অনুশীলন হইয়াছে বটে, কিন্তু অন্য বৃত্তিগুলি তাদৃশ অনুশীলিত না হওয়ায় সামঞ্জস্যের অভাব ঘটিয়াছে। তাই খৃষ্ট কিম্বা বুদ্ধ আদর্শ মানব নহেন। কেননা তাঁহাদের সর্ব্ববৃত্তি সর্ব্বাঙ্গ-সম্পন্ন স্ফূর্ত্তি পায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে পূর্ণ মানবতার আদর্শ আমরা শ্রীকৃষ্ণে দেখিতে পাই। তাঁহার সকল বৃত্তি চরম পরিণতি লাভ করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—"তাঁহার শারীরিক বৃত্তি সকল সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অননুভবনীয় সৌন্দর্য্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাঁহার মানসিক বৃত্তি সকল সেইরূপ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বলোকাতীত বিদ্যা, শিক্ষা, বীর্য্য এবং জ্ঞানে পরিণত এবং প্রীতি বৃত্তির তদনুরূপ পরিণতিতে তিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বহিতে রত।" ধর্ম্মতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র যে মতবাদ প্রচার করিয়াছেন তাহারই পরিপোষক রূপে কৃষ্ণ-চরিত্র গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ মানবিকতার আদর্শ আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

শ্রীমথুরা

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

বৈষ্ণবের মহাতীর্থ আর্য্য-সভ্যতার মণ্যমণি,
কত রাজা রাজা উত্থান পতন, ঐতিহ্যের খনি।
যমুনা হইল পুণ্য এপুরীর পদ প্রক্ষালিয়া,
বৃন্দাবন ধন্য হ'ল মথুরায় প্রসাদ লভিয়া।
জন্ম মৃত্যু নাহি যাঁর যিনি সর্ব্বগত সর্ব্বাশ্রয়,
তাঁরে জন্ম দিয়া ধন্য, মথুরার হেন পরিচয়!
সারা বিশ্ব জগতের যিনি ত্রাতা, যিনি মুক্তিদাতা,
মথুরার কারাগারে বন্দী ছিল তাঁর পিতামাতা।
পারের মালিক যিনি চিরকাল ভবপারাবারে,
হেথা হতে প্রাণভয়ে তাঁরে নিতে হ'ল পরপারে।
দুষ্কৃত-দমন প্রভু পাষণ্ড-নিধনে যুঝি অবিরাম,
এ পুরীর পুণ্য-ঘাটে পরিশ্রান্ত হরি লভিলা বিশ্রাম।
ও পারেতে প্রেমলীলা, এপারে পালিল রাজ্য, বিরহ-বিধুর
চির মধুময়ী সেই কাহিনী গাঁথিয়া কবি রচিল মাথুর।

অবিনাশবাবুর বার্দ্ধক্য

শ্রীজগদীশ গুপ্ত

অবিনাশবাবু আমাদের হামেশাই ভয় দেখান যে, তাঁর বয়সে আমরা কানা আর কুঁজো হইয়া যাইব; শক্তি বলিতে শরীরে কিছু রহিবে না; কাপড়ে হঠাৎ আগুন লাগিয়া গেলেও কোমর তুলিয়া গাত্রোত্থান করিতে আমাদের এত বিলম্ব হইবে যে, যখন ওঠা শেষ হইবে তখন দেখিব দেহের অর্দ্ধাংশ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেছে।—ঐ রকম ভয় দেখাইয়া অবিনাশবাবু কখনো হাসেন, কখনো গম্ভীর হইয়া যান।

অবিনাশবাবু বিগত যুগের মানুষ। বিগত যুগকে যাঁরা অলঙ্কৃত করিয়া বিরাজ করিতেন, তাঁর মত তিনি তাঁদেরই একজন। আমরা আধুনিক, আমরাও মনে করি, আমাদের যুগকে আমরা অলঙ্কৃত করিতেছি, অর্থাৎ আনন্দে যেমন, শক্তিতে যেমন, আবেগেও তেমনি দুর্লঙ্ঘ্য আমরা। অনেক খোঁজ রাখি অবিনাশবাবুর আমলের অর্থাৎ তাঁর যৌবনের দিনের সমসাময়িক লোক কারো কারো সঙ্গে যারা জানিত না সেই সব হেতু নিদান আমরা জানি;

আবিষ্কার করি নাই কিন্তু চমৎকার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা শুনিয়াছি : যেমন সেক্স্ ; সেক্স্ জিনিসটা কি তাহা যেমন করিয়া বিশ্লেষিত আর ব্যাখ্যাত হইয়া এ-যুগকে অবাক্ আর গৌরবান্বিত করিয়াছে ওঁদের আমলে তা হয় নাই। মাতৃ-স্নেহ হইতে রাষ্ট্র এবং সৌর প্রভৃতি যাবতীয় অন্তরগত বৃত্তি প্রবৃত্তি এবং প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের মূলে কাজ করিতেছে একমাত্র ঐ সেক্স্—এই সত্য আমরা জানি, নিরতিশয় পরিস্ফুটভাবে উপলব্ধি করি ; এবং ঐটুকু জানা হইলেই সব জানা হইয়া যায় ইহাও আমরা জানি ; আর, আরো যত যে জানি তার ইয়ত্তাই পাই না। তবু আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য যে, অবিনাশবাবু অতি-আধুনিকতার ধার না ধারিলেও, যা জানিলে অতি-আধুনিকভাবে অপরাজেয় হওয়া যায় ঠিক্ সেই সেই বিষয়ে তিনি একেবারে অজ্ঞ হইলেও, তাঁর সঙ্গে আমরা পারিয়া উঠি না।

বয়সে তাঁহার নাগাল আমরা কোনোদিনই পাইব না ; কারণ তাঁহারো বয়স আমাদের বয়সের সঙ্গে বাড়িবেই। সেদিকে আমাদের ঈর্ষা বা লোভ নাই। অবিনাশবাবুর বয়স ৫৭ আমাদের ২২ হইতে ২৭। মনে হইতে পারে তিনি সাঁতরাইয়া নদীর ওপারের বালিত শুভ্র সৈকতে প্রায় পৌঁছিয়া গেছেন—আমরা কেবল অন্ধকার জলে নামিয়াছি ; তিনি মুখ ফিরাইয়া বুঝি আমাদের দিকে চাহিয়া হাসিতেছেন—যেন বলিতে চান, এই দেখ, জিতেছি।

কিন্তু তা নয় ; দেহের পারিপাট্যে তিনি আমাদের চাইতে ঢের বেশী প্রগতিশীল। উহাই তাঁর দেখাইবার বস্তু ; আমাদের ডাকিয়া তিনি অহরহ তাহাই দেখান—আর ভয় দেখান যে কাপড়ে আগুণ লাগিয়া গেলে আমরা উঠিতেই পারিব না। শুনিয়া আমরা পরাজয় স্বীকার করি ; তাঁহাকে জানাই যে তাঁহার সঙ্গে আমাদের তুলনাই হয় না ; তাঁর যৌবন তিনি রক্ষা করিয়াছেন ; আমরা অন্ধে, অর্থাৎ মুষ্টিযোগ ব্যবহার না করিয়া, যৌবনের অপচয় ঘটাইতেছি।

স্বীকার করিতেই হইবে, অবিনাশবাবু স্বাস্থ্য ভালো—এত ভালো যে, কি কৌশলে নশ্বর শরীরটাকে তিনি ব্যাধিমন্দির হইতে দেন নাই, নির্ব্বিঘ্ন রাখিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিয়া লইতে বারম্বার ইচ্ছা হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কাহাকেও প্রশ্ন করিয়া তাহা জানিবার দরকার হয় নাই—প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই তিনি তাঁর কৌশল উদ্ঘাটিত করিতে থাকেন। আপনার গৌরবের বিষয় যাহা তাহাকে অযাচিতভাবেই উঁচুতে তুলিয়া ধরিয়া লোকে একটু আলাপ আলোচনা আনন্দ করিতেই চায়—অভিনন্দন লাভ করিতে চায়। অবিনাশবাবুর স্বাস্থ্য আর সামর্থ্য তেমনি একটি বিষয়, অন্তত তা গোপনীয় কৌশলের ব্যাপার কিছুই নয়—অবিনাশবাবু কেবল অত্যন্ত সতর্ক, এবং অসামান্য চতুরতার সহিত তিনি অস্বাস্থ্যের ধন উপকূল ধরিয়া ফেলিতে পারেন—রোগলক্ষণ জানেন যত, প্রতি-কারের দ্রব্যগুণ জানেন তার ঢের বেশী। এক কথায় অবিনাশবাবু কবিরাজী মুষ্টিযোগের ভাণ্ডার.....তাঁর বাকোর ভাণ্ডার আরো বড়, সুতরাং কাহারো কিছু জানিতে বাকি নাই।

তৃণাঙ্কুর হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত যাবতীয় সত্তার সঙ্গে অবিনাশবাবু পরিচিত—ঐ সমুদয় সত্তার সম্বন্ধেই তাঁর সহস্র বক্তব্য অনেক—তাঁহাকে নিরুত্তর করিবার উপায় সাধারণ মানুষের জানা নাই ; সুতরাং তিনি জানী ; আর এত পরিপক্ক আর উন্নত যে, তাঁর ঔদ্ধত্য অর্পিত বা প্রদর্শিত শ্রদ্ধার বা কর্ত্তব্যের সবটাই তিনি অবহেলায় অর্থাৎ উদ্দিষ্ট না করিয়া, অন্যে নিবেদন করিয়া [illegible] কখনো ভুল হয় না ; আর, স্থির [illegible] অত্যন্ত একটি মূল্য তাঁর আছে—করাণি [illegible]

আমি তাঁর ঐ ভঙ্গী দেখিয়া শুরুতে একদিন হাসিয়া ফেলিয়াছিলাম—

আমার হাসি দেখিয়া অবিনাশবাবু বলিয়া ছিলেন,—নীলাম্বর, তুমি আমায় হাসিও না।

পরে জানিয়াছিলাম, বিরক্ত হইলে অবিনাশবাবু সকাতরচিত্তে হাসাইতে বারণ করেন; কারণ, তাঁর ধারণা তাঁর বিরক্তি যে উৎপাদন করে সে অজ্ঞ; কাজেই হাসাই উচিত; হাসাইতে বারণ না করিলে রূঢ়তা প্রকাশ পায়।

ব্রহ্মে নমস্কার নিবেদন করা দেখিয়া তাই এখন আর হাসি না।

আমরা সবাই আমলা; কিন্তু অবিনাশবাবুকে স্রেফ আমলা বলিলে তাঁকে খাটো করা হয়—তিনি সেরেস্তাদার; অর্থাৎ কর্ম্মক্ষেত্রে, যেখানে জীবনের ভূমা-সাধনার যথার্থ প্রক্রিয়া, পরীক্ষা, আর তৌলক্রিয়া অবিরাম চলিতেছে সেখানে তিনিই বড়ো—তাহা লইয়া বিসম্বাদ ঘুণাক্ষরেও নাই। যে ব্যক্তি আগে আসিয়া গাছে উঠিতে শুরু করিয়াছে সে উপরে উঠিয়া যাইবেই। আমরা বৃক্ষমূলে আগন্তুক মাত্র—গাছের শুঁড়ি আকড়াইয়া ধরিয়া আর উপর দিকে মুখ করিয়া বুকে হাঁটিতেছি—ইহার মানে এই যে, অবিনাশবাবুর বেতন প্রায় একশত, আমাদের ৩০।৩৫ এর মধ্যে—তুলনায় তুচ্ছ এবং হাস্যকর কয়েকটি টাকা। আমাদের টাকা কয়টিই তুলনায় তুচ্ছ আর হাস্যকর, কিন্তু ব্যক্তি হিসাবে আমরা তুচ্ছ আর হাস্যকর নই—আনন্দের, কৃতজ্ঞতার, নিবৃত্তির আর সান্ত্বনার বিষয় সেটা যে কত তা বলিয়া শেষ করিবার উপায় নাই। অবিনাশবাবুর সজ্জনোচিত মুক্ত হৃদয়ের গুণে বৈতনিক ঐ পার্থক্য মিলন আর আলাপের পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়া যায় নাই। তাহার প্রথম কারণ ইহাই যে, জ্ঞান যখন অত্যন্ত বিকৃত হইয়া ওঠে তখন তার ভয়ঙ্করত্ব আপনিই ঘুচিয়া যায়—তখন জাগে তার দুর্ব্বার, আশুফলপ্রদ, সাকার, নিরবচ্ছিন্ন এবং পরম সহিষ্ণু আত্মবিতরণের স্পৃহা—পাত্রাপাত্র জ্ঞান হারাইয়া তখন সেই জ্ঞান আপনাকে বিলাইয়া দিতে চতুর্দ্দিকে সশব্দে ধাবিত হয়.....

অবিনাশবাবু আমাদের সম্পদ, সুহৃদ এবং সখা প্রথমতঃ ঐ কারণে; আমরা তাঁর অপরিমেয় আর সূক্ষ্ম জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকর শিকার মাত্র।

দ্বিতীয় কারণ এই যে, বয়সের হিসাব করিয়া যাহারা যৌবনযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দেশ করিতে যায় তাহারা ভ্রান্ত—তাহারা দ্রব্যগুণ, ব্যায়াম, ব্রহ্মচর্য্য, আর প্রাত্যহিক স্নানাদি বিষয়ে নিয়মপালনের সুফলের কথা কিছুই জানে না। অমুকের বয়স ৫৭, অতএব সে বৃদ্ধ, এ ধারণা ভুল। দ্রব্যগুণ প্রভৃতির দ্বারা যৌবন রক্ষা পাইতে পারে! সবাই দেখুন, অবিনাশবাবু তাহার উজ্জ্বল নিদর্শন।

অবিনাশবাবু বলেন, 'তোমরা যুবক কিন্তু অক্ষম; আমি সক্ষম।' কিন্তু বলেন না যে, তিনি আশ্রয় আমরা আশ্রিত; অথচ তাঁর স্নেহের আশ্রয়েই আমরা প্রতিপালিত হইতেছি .....

সমস্ত ইতিহাস পদ্ধতি বিধি নিয়ম তাঁর কণ্ঠস্থ, যেমন তাঁর কণ্ঠস্থ হইয়া আছে বাংলা ভাষার বর্ণমালা, অর্থাৎ ঘুণাক্ষরেও বিস্মৃত হইবার উপায়ই তাঁর নাই। হিসাব যেমন আপনিই নড়ে, আইন তেমনি তাঁর আপনি মনে পড়ে—ভাবিতে হয় না। তিনি আমাদের ঐ সেদিন, অনুধাবন আর অনুশীলন করিতে অনুজ্ঞা দেন—

আমরা বলি,—আপনিই আছেন...

কিন্তু ও কথা অফিসের কথা—

তাঁর স্নেহের কথাই বলি। আমরা তাঁর স্নেহের পাত্র, ইহা বিঘোষিত সত্য; আর সেই সূত্রে [illegible]

ঝিঘোষিত সত্য যে, আমাদের চোখমুখের দিকে অর্থাৎ অসুস্থতার বাহ্যিক লক্ষণের দিকে, তাঁর লক্ষ্য সর্ব্বদা.....

আমাদের কাহাকেও শুষ্ক দেখিলেই তিনি চটিয়া যান্—তাঁর মতো সুস্থ আর সক্ষম থাকিতে আমরা পারি না আর জানি না কেন? জিজ্ঞাসা করিয়া এবং অপরাধ লইয়া তিনি অবশ্য অন্য কথা বা কুকথা বলেন না, বলেন নিজের কথা; সহসা দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া এবং ওখনি আঙুল ছাড়িয়া দিয়া তিনি বলেন, নীলাম্বর, এস একদিন খেলি।

—কি খেলা হবে?

—হাডুডু..... ..

—পারবেন না।

"নীলাম্বর, তুমি আমায় হাসিও না। পারব। তিনজন তিন দিক্ থেকে আক্রমণ করো'--একজন যদি জ্যান্ত ফিরে যাও তবে আমি মিথ্যা মানুষ। একাদিক্রমে বারোটি বচ্ছর নব্বই পাউণ্ডের মুগুর বৃথাই ভাঁজিনি। অক্ষয়, তোমার ব্যাপারটা কি? অসুখ কি তোমার?"

কেহই জানি না যে, অবিনাশবাবু ইত্যবসরে অক্ষয়কেও লক্ষ্য করিয়াছেন। অক্ষয় বিস্মিত হইয়া বলিল,—কই, অসুখ নেই ত?

—অক্ষয়, তুমি আমায় হাসিও না। অসময়ে হাই কেউ অমনি তোলে না। তোমার চোখের কোণে ক্লান্তির দুর্ব্বলতা দেখ্‌ছি। ঘুম ঘুম.....গোপন করতে যেও না। আমার কাছে অসুখ গোপন থাকে না। অসংযম না অনিদ্রা?

অক্ষয় হাসিয়া বলিল,—অনিদ্রাই বটে। কাল সারারাত জেগে। একটুও ঘুমুইনি।

—কেন?

—কি জানি! ঘুম এল না।

শুনিয়া অবিনাশবাবু চোখের তারা তেরছা করিয়া উলটাইয়া রাখিলেন; অব্যর্থ মুষ্টিযোগ প্রয়োগ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আনন্দে কিনা জানি না; কিন্তু তিনি খানিকক্ষণ উল্‌টাইয়া রাখিলেন.....

তারপর বলিলেন, মনে পড়েছে। ঘুমের ওষুধ খুব ভালই আছে।—বলিয়া অবিনাশবাবু উঠিলেন। চেয়ারে বসিয়া হাত পা খেলাইতে অসুবিধা হয় বলিয়া বোধ হয় মুষ্টিযোগের বুদ্ধি তেমন পথ পায় না।

উঠিয়া অক্ষয়ের সম্মুখে আসিয়া তিনি দাঁড়াইলেন; বলিলেন,—জানো, অক্ষয়, তোমাকে আমি ঘুম পাড়াতে পারি!

অক্ষয় আপত্তি জানাইল 'কিন্তু হাতে কাজ রয়েছে যে!'

—অক্ষয়, তুমি আমায় হাসিও না। এখনি নয়, রাত্তিরে। তখন হাতে কাজ থাকবে না।... ...তুমি পাগল হয়ে যাও এ ইচ্ছে কারুরই নয়।

—বলেন কি?

—হ্যাঁ, দীর্ঘ অনিদ্রার ফল তাই। কিন্তু অক্ষয়কে ততদূর যেতে আমি দেব না।

—হোমিও.....

আমি নিজের মতো হঠাৎ প্রস্তাব করিতে গিয়াছিলাম; কিন্তু অবিনাশবাবু তাহাতেও অধিকতর বক্র; বলিলেন,—নীলাম্বর, তুমি আমায় হাসিও না। হোমিওপ্যাথি কত! অনিদ্রার কারণ খুঁজে বেড়াও! মানসিক উত্তেজনার এক ওষুধ; শোক তাপ হেতু অনিদ্রার আর এক ওষুধ; অতি-ভোজন, অতি-পরিশ্রম বা নেশার জন্যে অনিদ্রার আর আর ওষুধ; অনিদ্রার আবার আর একটা। ঝঞ্ঝাটের একশেষ! সুধী শীঘ্র

কাকে বলে জানো, অক্ষয়? ঐ শাকের ঝোল খেও, ঘুম হবে। কিন্তু মনে রেখো, সিতাম্বরও সুষণী শাক, কিন্তু ঘুমের কেউ নয়, দাহজ্বরে উপকারক। নীলাম্বর, শিখবে একটা জিনিস?

—শিখব।

—আলকুশীর বীজ ব্যবহার করে দেখ, যৌবন কত মধুময়। —বলিয়া অবিনাশবাবু পিছন্ ফিরিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন,—আমি নিজে তার গুণমুগ্ধ ……

তারপর যাইয়া চেয়ারে বসিয়া তিনি আমাদের দিকে তাকাইয়া এমন করিয়া হাসিতে লাগিলেন যেন অতি সহজেই তিনি আমাদিগকে অত্যন্ত পরাস্ত করিয়াছেন।

আমার বড় কৌতূহল জন্মিল; অনুনয়ের সুরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—আলকুশীর বীজের কি গুণ তা' ভালো করে বুঝিয়ে বলুন না!

অবিনাশবাবু বলিলেন,—নীলাম্বর, তুমি আমায় হাসিও না। আমাকে দেখে বুঝছ' না তার কি গুণ? যৌবনশক্তি অক্ষয় হয়।

যৌবনের উদ্দেশে একটা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া পুনরায় কলম তুলিয়া লইলাম।

অবিনাশবাবুর নিজেরই মারফৎ আমাদের ভিতর, এবং আমাদের মারফৎ আরো ব্যাপকভাবে জানাজানি হইয়া দেশের যাবতীয় লোকেরই বিশ্বাস জন্মিয়া গেছে যে, অবিনাশবাবুর মতো সুস্থ এবং সক্ষম মানুষ বৃদ্ধের দলে ত কেউ নাই-ই, যুবকগণেরও কেহ ঐ বিষয়ে তাঁহার মতো অতটা নহে। এবং আরো জানা হইয়া গেছে যে, সাতান্ন বৎসর বয়সেও তাঁর এই অনন্যসাধারণ সামর্থ্যের আর অনপচয়িত যৌবনের হেতু আর কিছুই নহে, দ্রব্যগুণ—সুষণীর শাক প্রভৃতি এবং আলকুশীর বীজ প্রভৃতি অসংখ্য কাঁচা এবং স্বভাবজ তেজের গুণেই এবং তাহাদের যথাযথ প্রয়োগের ফলেই, তিনি অজর অক্ষয় হইয়া আছেন।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে অবিনাশবাবু যে কত দুর্ব্বল, আর কত পরাজিত তাহা একদিন সামান্য একটি ঘটনাতেই দৈবাৎ প্রকাশ হইয়া পড়িল।

টাউন ইউনিয়ন বনাম ক্যালকাটা চক্সেসেষ্ট্ ইলেভন্ এর ফুটবল ম্যাচ্ দেখিয়া সেদিন ফিরিতেছিলাম—অবিনাশবাবু অবশ্যই আমাদের সঙ্গে ছিলেন—যৌবনের অজুহাতে তিনি তা' থাকেন। খেলাধূলা দেখায় তাঁর অনন্ত উৎসাহ—

বলেন,—ওরা খেলে, কিন্তু তোমরা জানো না, আমি ওদের প্রত্যেকের সঙ্গে বল্ নিয়ে ছুটি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমি ষোল আনা খেলোয়াড়।

—পরিশ্রম বোধ করেন?

—নীলাম্বর, তোমার প্রশ্নটি উত্তম। করি। রক্তে বেগই উত্তেজনা দেখা দেয়; তা'তেই ব্যায়ামের কাজ হয়; শরীর ঘামে।

শুনিয়া আমি হাসিলাম—

অবিনাশবাবু বলিলেন,—নীলাম্বর, তুমি আমায় হাসিও না।

—আজ খেলা কেমন দেখলেন?

—থার্ড ক্লাস্। কিন্তু খেলা যেমনই হোক্, একটারও চেহারা খেলোয়াড়ের মতো দেখলে? দূর দূর! আমার মতো হাড়মোটা একটাও নয়; স্বাস্থ্য আর গড়ন দেখে ঘেন্না ধরে গেছি। ……আমি যখন খেলতাম, তখন একবার হ'ল কি, মুর্শিদাবাদ থেকে এল নবাব বাহাদুরের টিম। আমি ছিলাম হাফ্ ব্যাকে—কুরুক্ষেত্র রণে যথা বীর বৃকোদর! এগোয় কার সাধ্য—দেখতে যদি তখন। ……ওদের সেন্টার ফরওয়ার্ড, ৫ ফুট

১১ ইকি নথা দৈত্যের মতো মানুষটা, আবার লম্ফে ঝম্পে সে ডিগ্‌বাজি খেয়ে উল্টে' উল্টে' পড়্‌তে লাগ্‌ল'।

.....দূর দূর.....মানুষের চেহারা এদের একটায়ো নয়; রোগা গালভাঙ্গা, চোখে যেন ঘুম লেগেই আছে। —দূর দূর

তুচ্ছের প্রতি অপরিসীম অবজ্ঞায় অবিনাশবাবু নিঃশব্দ হইয়া রহিলেন। অক্ষয় জানিতে চাহিল, আপনাকে এখন যদি নামানো হয় তবে অম্‌নি ঘুষে পারেন খেলিতে?

—চোখ বুঁজে, অক্লেশে। এ-ব্যাক্ থেকে ও ব্যাক্ পর্য্যন্ত বল যাবে আকাশ দিয়ে বুলেটের মতো বেগে—এম্‌নি পায়ের জোর আমার এখনো আছে।—বলিয়া অবিনাশবাবু কেবলমাত্র তর্জ্জনী তুলিয়া ও-ব্যাকের অনন্ত দূরত্ব নির্দ্দেশ করিলেন।

এম্‌নি সব অপরাজের উপাখ্যান শুনিতে শুনিতে অবিনাশবাবুর বাসার নিকটবর্ত্তী হইলাম। এইখানেই তাঁহার সঙ্গে আমাদের ছাড়াছাড়ি হইবার কথা; কিন্তু জয়লক্ষ্মীর তিরোধান ঘনাইয়া মূর্ত্ত অদৃষ্ট তখন অবিনাশ বাবুকে বিপরীত দিকে টানিতেছে। দুর্গতি কখন্ কি-আকারে আবির্ভূত হয় তাহার কিছুই ঠিক নাই।

অবিনাশবাবু আমাদের সবাইকে আহবান করিলেন, "চা খাবে চলো"।

—চলুন।

কিন্তু মনে হয় এই আহ্বানের ভিতর অবিনাশবাবুর একটু কপটতা ছিল—বোধ হয় তাঁর আরো প্রমাণ করিবার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি আরো অপরাজেয়।...দেখা গেল, লণ্ঠনের আলোকে চায়ের জন্য বসিয়াই অবিনাশবাবু বলিলেন,—তোমাদের দিকে তাকিয়ে আমার ভারি মমতা জন্মে। দূর দূর...ঐ কি শরীর! আমার বাসায় আমি তোমাদের ব্যায়ামের বন্দোবস্ত করব। ছমাস পর তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমার শারীরিক বলের পরীক্ষা হবে।

বিনয় বলিল,—বেশ হবে কিন্তু!

হ্যাঁ; কারণ, সব সাধনাতেই সুখ আছে, অনির্ব্বচনীয় সুখ। আর, সুখের আকর যৌবন—যত তাজা রাখতে পারবে তত আনন্দ।.....কত গল্পই শুন্‌লাম! শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখে এলাম খেলা—কঙ্কালের নৃত্য! শোনো তবে খেলার গল্প। আমি তখন ডাফ্ কলেজে পড়ি। আমাকে নিয়ে গেল ত্রিপুরার মহারাজা তাঁদের হয়ে কল্‌কাতার এক টিমের সঙ্গে খেল্‌তে। নামটি ছড়িয়েছিল খুবই।.....চা? রাখ্ সামনে।..... নেমে' দেখি, চার পাঁচটা সায়েব রয়েছে ওদের দিকে। আমায় নাম্‌তে দেখেই তারাও একটু থম্‌কে গেল। চিন্‌ত। যাই হোক, খেলা শুরু হল। সে কি খেলা! আমার সঙ্গে এখন তোমরা হেঁটে পারো না—কিন্তু সেই খেলা আমার যদি দেখ্‌তে! পায়ে পায়ে যেন আগুনের ফুল্‌কি ছুট্‌তে লাগল..... হইহই রইরই ব্যাপার; চারিদিক থেকে কেবলি চীৎকার, ব্যাক্ আপ্, অবিনাশ!...আমার তখন সিংহবিক্রম দেহে; যেখানে বল্ সেখানেই আমি—গোরাগুলোর মাথা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটেছি—ছুটেছি ত একেবারে গোল পর্য্যন্ত—সে কি তাণ্ডব!...গোল হয় হয়! এম্‌নি হ'তে হ'তে ওদের হল আমাকে জখম করবার মতলব। তিনটে গোরা তিন দিক্ থেকে বোল্টু-মারা বুট তুলে ছুটে এল আমাকে রুখ্‌তে—খুন করে আর কি! বল্ নিয়ে কিছুতেই এগুতে দেবে না, আমি কিন্তু যাবোই।...ওদের বদ মতলব বুঝতে পেরে একটাকে দিলাম বাঁ দিকে এক ধাক্কা, একটাকে দিলাম ডান দিকে এক ধাক্কা, আর একটাকে দিলাম বুকে এক ধাক্কা; কোথায় রইলো বুট, কোথায়

রইল বিক্রম, আর কোথায় রইলো বল্; তিনজন তিনদিকে ছিট্‌কে পড়ে মিনিট তিনেক উঠ্‌লোই না! আমি ইত্যবসরে বল্ নিয়ে রিয়ার একটি গোল দিয়ে এলাম ···যত নাকায় মহারাজা, তত নাকায় লোকে—পাঁচ সাত মিনিট ক্ল্যাপ্ আর থামে না!

—এখন?—আমি নিষ্প্রয়োজনে জানিতে চাহিলাম।

—নীলাম্বর, তুমি আমায় হাসিও না।

বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অবিনাশবাবু বলিতে লাগিলেন,—"আমার ক্ষয় হয়নি—তখনো যেমন, এখনো তেমন; যেমন ছিলাম, তেম্‌নি আছি। এখনকার কথা কি বল্‌ছ হে! ···দূর দূর···এখনকার খেলা ত' রেখে' এলাম। তোমরা আর ওরা বাইশটা এক দিকে দাঁড়াক, আর আমি একলা এক দিকে দাঁড়াই"···

আমরা চার জন আর ওরা বাইশ জন, এই ছাব্বিশজনের বিরুদ্ধে অবিনাশবাবু একক দাঁড়াইলে অবিনাশবাবুর অনুকূলে দুর্জ্জয় কিছু নিশ্চয়ই ঘটিতে পারিত; কারণ আমরা অশক্ত, কুগঠিত দেহ এবং অলস বলিয়া মানুষের ভগ্নাংশ মাত্র, আর তিনি সুসম্পূর্ণ, বৃকোদরতুল্য অতিমানুষ। অবিনাশবাবুর প্রচলিত এই দম্ভে আমরা কখনো বাধা দিই নাই, আজও দিতাম না; সুতরাং নির্ব্বিবাদে দুর্জ্জয় কিছু ঘটিতই; কিন্তু ঠিক্ এই সময়টিতেই তাঁরই অদৃষ্টাকাশে ধূমকেতুর মত তাঁর গৃহে প্রবেশ করিল বিষ্ণুপদ···

অবিনাশবাবু তাহাকেও অভ্যর্থনা করিলেন; বলিলেন —এস বিষ্টু, বস; চা খাও। খেলা দেখ্‌তে যাওনি?

—না। যাচ্ছিলাম, কিন্তু একটা ব্যাপারে হঠাৎ পথেই দাঁড়িয়ে যেতে হ'ল।

—কেন?

বিষ্টু হাসিয়া ফেলিল; বলিল,—তারি কেলেঙ্কারি, মশায়। মানুষ খুঁজতে ছুটতে হয়েছিল।

—বলো কি? হারালো কে?

একটি বউ। অনন্ত দাসের স্ত্রী। বেচারা মাত্তর মাস সাতেক হল দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে।

—ও! তারপর?

—সে পালিয়েছে! দুপুর বেলাতেও ঘরেই ছিল, তারপর, অর্থাৎ ঘণ্টা দুই দিবানিদ্রার পর, অনন্ত তাকে আর পায়নি'। দোকানের ফড়ে' নারাণ বলে' ছোকরাটারও দেখা নেই।

অবিনাশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—ফুলকুমারীর বয়স কত?

—ফুলকুমারী কে?

—ঐ বউটি।

—কি রকম! জান্‌তেন নাকি?

অবিনাশবাবু এবার হাসিয়া বলিলেন,—বিষ্টু, তুমি আমায় হাসিও না। ফুলকুমারী, অর্থাৎ marked ফুলকুমারী for identification—ঐ নামে তাকে নির্দ্দেশ করা হবে।

অক্ষয় বলিল,—অনন্ত দাসটা কে?

—বাসনের দোকান আছে বাজারে। শিবরাম সোরের দোকানের পিছন দিকে তার বাড়ী। ···হুলুস্থুলুস্ কাণ্ড!—চোখ বড়ো করিয়া বিষ্টু বলিল।

অবিনাশবাবু বলিলেন,—তা ত' হবেই। কিন্তু বল্‌লে না ত' ফুলকুমারীর বয়স কত?

—সতরো আঠারো হবে।

—সেই ফড়ে'র?

অবিনাশ বাবুর জেরার অন্ত নাই—ফড়ে' নারাণের বয়সও তিনি জানিতে চাহিলেন।

বিষ্টু জানাইল: "আমাদের মতো"।

—শেষ প্রশ্ন এই যে, অনন্ত দাসের বয়স কত?

বিষ্টু নির্দোষ ভাবে বলিল,—আপনাদের বয়সী।

কিন্তু ঐ নির্দোষ উক্তি, নিজের প্রশ্নের উত্তর, শুনিয়াই অবিনাশ বাবুর গৌরবর্ণ মুখখানা হঠাৎ অতিরিক্ত লাল হইয়া উঠিল—স্পষ্ট তা' লক্ষ্য করিলাম; এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর লাঠিটা তুলিয়া লইলেন; বলিলেন, হু ফেলুরের সঙ্গে দেখা করে' আসি।— বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন কি আমাদের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিলেন ঠিক্ বুঝা গেল না।

মাটী ও আকাশ

শামসুদ্দীন

আকাশের ভ্রূণগুলি সহসা যেন
জেগে উঠ্‌ল,
ছড়িয়ে দিল তার গান, ছড়িয়ে দিল তার হাসি
আর গেয়ে উঠ্‌ল:
মৃত্যু নীল পাখীদের গান।

মাটীর পাখীরা ঘুমিয়েছিল
ডানা ভাঙা ডালে ডালে
যুগ যুগান্ত কুয়াশার ঢাকা
অস্পষ্ট মায়া জালে—
দিনে জাগা তারার মতন।

ধূসর নিস্তব্ধ আলো-রেখা
তারে জাগিয়ে তুল্‌ল
মায়া।
আর
মমতায়।
বড় করুণ আর শীতল সে স্পর্শ
তাই মিলিয়ে গেল হাসি আর হর্ষ।

ধরণীর পাখীরা ঘুমিয়ে পড়ল
তীব্র অবসাদে
পলাতক জীবনের ব্যর্থ ভারে।

আকাশের ইন্দ্রজালে
সেইত' আছ্‌ন্ন—
জীবনের মৃত্যুবাণ।

বর্ত্তমান শিক্ষাধারার দৃষ্টিভঙ্গী

শ্রীগীতা গুপ্ত বি-এ, বি-টি

সভ্যতার আদিযুগ হতে মানব তার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এসেছে। যুগে যুগে তার মানসিক প্রয়োজন মত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙেছে, এতে পরিবর্ত্তন এনে দিয়েছে, আবার নিজের সুবিধামতন একে গড়ে তুলেছে। নিত্য পরিবর্ত্তনশীল বিচিত্র এই জগৎ; ততোধিক বিচিত্র এই মানবমন। যে ভাঙাগড়া এই জগতে নিরন্তর চলছে, মানবমনেও তার স্পর্শ লেগেছে; সে আর পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায় না, নূতনত্বেই তার জীবন এবং ভেঙেচুরে পথ চলার ছন্দেই তার আনন্দ। অতৃপ্তির মধ্যেই জীবন; তৃপ্তি মানুষ পায় না বলেই তার পুরোণোকে ভাঙবার, নতুন সৃষ্টি করবার প্রচেষ্টার, আর বিরামবিশ্রাম নেই। তৃপ্তি যেদিন আসবে সেদিন হয়ত নতুন কিছু সৃষ্টি করবার ক্ষমতাও মানুষের লোপ পেয়ে যাবে। মানুষের মনের ক্ষুধা মিটাবার জন্য কত শত উপকরণের যে সৃষ্টি হয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। মানুষের আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, এবং তাকে পূর্ণ করে তোলার জন্য চেষ্টারও আর অন্ত নেই; যুগে যুগে এই লীলার অভিব্যক্তি চলছে। মানুষের মনকে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর করে দেবার জন্য চাই শিক্ষা, এবং সেই শিক্ষাব্যবস্থা এমন হবে, যা মানুষকে পরনির্ভরশীল করে গড়ে তুলবে না এবং তাকে আত্মপ্রত্যয় এনে দেবে।

এখন প্রশ্ন এই যে শিক্ষাব্যবস্থাকে কোন্ ভিত্তির উপর গড়ে তুলতে হবে আমাদের, যার ফলে আমাদের শরীর এবং মনের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন হবে। প্রাচীন আদর্শ ছিল এই যে, সমাজের জন্যই মানুষ, এবং সমাজের কল্যাণেই তারও কল্যাণ। অতএব সমাজের কল্যাণের জন্য মানুষকে আত্মোৎসর্গ না করে উপায় নেই। সে তার ব্যক্তিগত সাধ, আশা, ক্ষমতা সবই সমাজের পায়ে বলি দিতে বাধ্য। কিন্তু ক্রমশঃ সেই মত বদল হয়ে মানুষকে প্রাধান্য দেওয়া হ'ল। যীশুখৃষ্টের নীতি—'Sabbath is made for man, and not man for Sabbath' মানুষের হৃদয়তন্ত্রীতে নাড়া দিল। ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা সামাজিক প্রয়োজনীয়তার উর্দ্ধে স্থান লাভ করল। ব্যক্তিকে নিয়েই সমাজ গড়ে উঠেছে। সমাজের প্রতিটি মানুষ শিক্ষায় স্বাস্থ্যে পূর্ণাঙ্গ জীবন যদি লাভ করতে পারে, তবে দেশের এবং সমাজের উন্নতি আপনা হতেই সম্ভব হয়। ফরাসী শিক্ষাবিদ রুশো এবং সুইস শিক্ষাবিদ পেষ্টালৎসি তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থায় সর্ব্বপ্রথম ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁরা বলেন, ছাত্রর মন নিয়েই শিক্ষকের প্রথম এবং প্রধান কারবার। কাজেই তার মানসিক গতিবিধি উন্নতি এবং অবনতি শিক্ষককে বিশেষ ধৈর্য্যের সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ এবং আলোচনা করে দেখতে হবে। শিক্ষক যিনি হবেন, তাঁর যেমন একদিকে সত্যকার জ্ঞান থাকা দরকার, তেমনই আর একদিকে চাই ছাত্রছাত্রীর প্রতি গভীর সহানুভূতি। মরমী মন দিয়ে তাঁকে শিশুর হৃদয় নিয়ে নাড়াচড়া করতে হবে। শিক্ষককে বুঝতে হবে শিশু কি চায়, কতটুকু চায়, কিসে তার বিতৃষ্ণা এবং কোন্ দিকেই বা তার আকর্ষণ রয়েছে। এটুকু উপলব্ধি করতে পারবার ক্ষমতা সবাইর থাকে না। যাঁর আছে,

তাঁকেই যথার্থ ধরণী শিক্ষকের মর্য্যাদা দিতে হবে। শিক্ষার বিধিধারায়—মনস্তত্ত্বের এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হবার পর থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রের বহুল পরিবর্ত্তন এবং প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে; এবং শিশুকেই বর্ত্তমান শিক্ষার কেন্দ্র বলে স্বীকার করা হয়েছে। শিক্ষক যে বিষয়ে শিশুকে শিক্ষা দেবেন তাও যেমন তাকে জানতে হবে, তেমনি যাকে শিক্ষা দিচ্ছেন তার প্রকৃতিকেও সমভাবেই চিনতে হবে। আবার কেবলমাত্র ছাত্রের শৈশব অথবা কৈশোরাবস্থাকে জানলেই চলবে না; তার বিভিন্ন অবস্থার মানসিক পরিবর্ত্তনকে লক্ষ্য করবার মতন সূক্ষ্মদৃষ্টি তাঁর থাকা চাই, এবং তার উপযোগী এমন সব উপকরণ সামনে এনে ধরতে হবে যাকে ছাত্র অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। যে যতটুকু স্বাভাবিক ক্ষমতা এবং কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে তার উপযুক্ত মানসিক খাদ্য তার সামনে এনে ধরতে হবে, যাতে ছাত্রের সময় এবং শক্তির অপচয় না ঘটে। বর্ত্তমানে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে এই—শিশুর সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করে তাকে আদর্শ মানবরূপে গড়ে তোলা। এবং সমাজও প্রত্যেককে এই উন্নতির সহায়তার জন্য সুযোগ সুবিধা দিতে বাধ্য।

শিক্ষাদান ব্যাপারে ছাত্র, শিক্ষক এবং পাঠ্যবস্তু—এই তিনটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। পূর্ব্বে ছাত্র ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষার বস্তু, শিক্ষক এবং পাঠ্যবস্তুর উপরই সম্পূর্ণ জোর দেওয়া হ'ত। ছাত্র ছিল অন্তরালে, শিক্ষকের উদ্দেশ্য ছিল কি করে নির্দ্দিষ্ট সময়ের ভিতর তাকে পঠনীয় বিষয় মুখস্থ করিয়ে দেওয়া যায়। এতে শিশুর স্মরণশক্তি হয়ত প্রখর হ'ত, কিন্তু তার মনন-শক্তি চাপা পড়ে যেত। শিশুকে যা শেখান হচ্ছে তার সে বিষয় গ্রহণ করবার ক্ষমতা আছে কিনা, তার মনের স্বাভাবিক গতিই বা কোনদিকে, এ বিষয় নিয়ে কেউ আলোচনা করতে চাইতেন না। কিন্তু বর্ত্তমান শিক্ষাধারায় আর এই মত কেউ মানতে রাজী নন। এখন শিশুই হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম এবং প্রধান বিষয়বস্তু। শিক্ষক তাঁর শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে থাকবেন অন্তরালে, শিশুকে সামনে রেখে শুধু তার প্রয়োজনানুযায়ী উপকরণ সময়মত জুগিয়ে যাওয়াই তাঁর কাজ। শিশু কি চায়, এটা শিক্ষককে শিশুর প্রকৃতি দেখে বুঝে নিতে হবে। শিক্ষক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন না, যবনিকার অন্তরাল থেকে নীরবে শিশুকে লক্ষ্য করে যাবেন। লোকচক্ষে হয়ত তাঁর নীরবতাই ধরা পড়বে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি সকলের চেয়ে কর্ম্মশীল, কারণ তিনি সর্ব্বদাই সজাগ; শিশু কখন কি করছে না করছে, এদিকে রয়েছে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। শিশুকে ভবিষ্যৎজীবনের জন্য কী আদর্শে গড়ে তুলতে হবে এটাও যেমন শিক্ষককে জানতে হবে, সে বর্ত্তমানে কী অবস্থায় আছে, তার মানসিক গতি কোন দিকে, এও তাঁকে সমভাবেই লক্ষ্য করতে হবে।

প্রাচীন যুগে এই আদর্শকে হয়ত অন্তরে কেউ কেউ গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর বিশেষ কেউ কাজে লাগান নি। উদাহরণস্বরূপ সক্রেতিসের নাম করা যেতে পারে। তিনি এ সম্বন্ধে বলেছেন—'Teacher is the man-midwife of mind.' শিক্ষকের কর্ত্তব্য এই যে তিনি শিশুর অন্তরের বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করবেন এবং তার [illegible] সহায়করূপে শিশুর জীবনে এসে দেখা দেবেন। শিশুর মনের যে স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ এবং বৃদ্ধি [illegible] তার উন্মেষসাধনে সাহায্য করবেন। যদি

যেমন শিশুর জন্মদানে সাহায্য করেন শিক্ষকও সেইরূপ শিশুর মনের নবজন্মদানের সহায়ক হবেন।

শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে মতভেদ রয়েছে—কাহারও মতে চরিত্রগঠনই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য—কেহ বা বলেন স্বাস্থ্য এবং মানসিক সৌন্দর্য্যের অধিকারী হয়ে পূর্ণাঙ্গ জীবন লাভই শিক্ষার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য। ডাঃ নান এই সকল মতের সমন্বয় করবার চেষ্টা করে বলেছেন, মানুষের অন্তরের ব্যক্তিত্বের উন্মেষ সাধনই শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। শিশুর স্বাভাবিক প্রেরণাতে সে যা করতে চায় শিক্ষক যেন তাতে কোন বাধা না দেন। বিশ্ব-জগতে যা কিছু ভাল এবং সুন্দর আমরা দেখি এসবেরই মূলে রয়েছে মানুষের স্বাধীন চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। অবিশ্যি অন্তর্নিহিত ব্যক্তিত্বকে জাগিয়ে তুলতে সমাজের দানকেও উপেক্ষা করলে চলে না। কারণ মানুষমাত্রেই সামাজিক জীব, পাঁচজনের সাহচর্য্য না পেলে সে বাঁচতে পারে না। সেজন্য অপরের খাতিরে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

সকলের ব্যক্তিগত আদর্শ এক নয়। কে কিরূপ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার ভবিষ্যৎজীবন গঠন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে, শিক্ষকের সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার উপকরণ জোগাতে হবে। বিভিন্ন মানুষের মন বিভিন্নমুখী, এবং তাদের অবলম্বিত পথও বিভিন্ন। যার যেদিকে স্বাভাবিক প্রেরণা রয়েছে, তার সে পথ চলার গতি কেউ রোধ করতে পারে না; কারণ মানুষমাত্রেরই অন্তর প্রবাহ স্বতঃউৎসারিত ধারার বয়ে চলতে চায়; এবং তার এই আন্তরিক স্বাধীনতাটুকু কারুর কেড়ে নেবার ক্ষমতা নেই।

অতএব শিক্ষক যেন শিশুকে নিয়মশাসনের নিগড়ে বেঁধে না রেখে; তার নিজস্ব অনুপ্রেরণা অনুযায়ী পথ চলার স্বাধীনতাটুকু শিশুকে দিতেই হবে। শিক্ষক শুধু এইটুকুই দেখবেন, যে তার স্বাধীনতায় যেন অপরের স্বাধীনতার ব্যাঘাত না হয়, অর্থাৎ সে যেন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে না পড়ে।

শিক্ষায় মনস্তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা বুঝে রুশো এবং পেষ্টালৎসি একে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। এবং ফ্রয়েবেল ও হার্বার্ট, ফ্রয়েবেল ও বর্তমানযুগে মাদাম মন্তেসরির শিক্ষাদান ব্যবস্থাতে এই আদর্শই পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁদের শিক্ষাপ্রণালী শিশুর প্রাণে ভীতি জাগিয়ে তোলে নি, তাঁরা খেলার ভিতর দিয়ে শিশুর মনকে আকৃষ্ট করবার চেষ্টা করেছেন। শিশুদের পড়াশোনা তাদের কাছে খেলার মতনই আনন্দদায়ক করতে হবে—এই তাঁদের মত। এ যেন একটা পড়া-পড়া খেলা। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহে এই খেলার ভিতর দিয়ে শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হয়েছে। কারণ শিশু খেলার মতন আনন্দ আর কিছুতেই বোধ করে না। কিণ্ডারগার্টেন, মন্তেসরি এবং হিউরিসটিক শিক্ষাদান প্রণালী এই খেলাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। সেখানে শিক্ষকের উপদেশের কোন প্রয়োজন নেই। রঙীন খেলনা, গিলবোর্ড এবং কাঠের রং চং টুকরো নিয়ে শিশু আপন মনে খেলা করে পড়তে শেখে। তার লেখা এবং পড়ার হাতে-খড়ি, প্রাথমিক অঙ্ক-বিদ্যা সবই এই খেলার জিনিষপত্রের সাহায্যে আপনা হতেই শেখা হয়ে যায়। সে ভুল করে সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের ভুল নিজেই শুধরে নিতে পারে; তাই আর বেশী ভুল করবার অবকাশ তার হয় না।

প্রাচীন আদর্শে ছাত্রের উপর যেন পাঠ্যপুস্তকের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হ'ত। সে ছিল একটা যন্ত্রবিশেষ এবং তার উপর যে ভার অর্পণ করা হত তা নিজের

বহন করতেও বাধা করা হ'ত। এ ব্যবস্থায় শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে, তার মানসিক গতিবিধির বৈচিত্র্যকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হ'ত। শিক্ষাদান বিষয়ে বর্তমান যুগের সাইকোলজিক্যাল পদ্ধতি শিশুমনকে অত্যন্ত সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে বিচার করে, এবং তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, অনুভূতি এবং হৃদয়াবেগকে সবচেয়ে উঁচুতে স্থান দেয়। সাইকোলজিক্যাল পদ্ধতি শিক্ষককে নিজেকে বুঝতে সাহায্য করে, এবং ছাত্রকে বুঝবার দৃষ্টিভঙ্গী এনে দেয়।

শিক্ষকের ক্ষমতা শুধুমাত্র নামেই থাকে; শিশুর কার্য্যকরী ইচ্ছা এবং শক্তির উপর কোন বাধা থাকে না বলে প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই নিজের শিক্ষকের পর্য্যায়ে এসে দাঁড়ায়। এ নিয়ম অনুসারে স্কুলের শিক্ষাদান প্রণালী তাকে আনন্দ দেয়। ক্লাসে বসে তাকে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে হয় না, বাড়ীর আবহাওয়া সে স্কুলে থেকেই অনুভব করতে পারে। কোন বহিঃশক্তি এসে শিশুকে আঘাত করতে পারে না; সে আপনা হতেই হাতে কলমে শেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। এই মনোবিজ্ঞানানুযায়ী শিক্ষাদানের অবশ্যম্ভাবী ফল এই যে, এ শিশুকে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগের অধিকার দেয়। এই স্বাধীনতার অর্থ এই যে, শিক্ষক শিশুর অন্তর্নিহিত ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশে কোন বাধ দেবেন না; অবশ্য শিশুকে তার ব্যক্তিত্বের উদ্বোধনের জন্য স্ব-আরোপিত কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হবে।

আমাদের দেশে এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের এখনও বহুল প্রচার হয় নি। তবে মনীষীরা এই শিক্ষাধারার উপকারিতা বুঝে একে কাজে লাগাবার চেষ্টা করছেন, এবং তাতে আশা হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এই শিক্ষার ফলে আজ যারা শিশু তারা একদিন পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের অধিকারী হবে। কারণ যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। কয়েকটা পাশ দিলে, বা ভাল বক্তৃতা করতে পারলেই প্রকৃত শিক্ষা হয় না।

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও গর্গসংহিতায় রাত্রির কোন উল্লেখ নাই। কবি তাঁহার প্রথম শ্লোকে নক্ত (রাত্রি) শব্দ যুক্ত করিয়া সমগ্র শ্লোকের এক অভিনব রূপান্তর ঘটাইয়াছেন। এবং এই জন্যই সমগ্র কাব্যের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করিয়া এই শ্লোক আশীর্ব্বাদ নমস্ক্রিয়া ও বস্তুনির্দ্দেশক (কাব্যের নান্দী) শ্লোকরূপে পরিচিত হইয়াছে। কবিরচিত শ্লোকের আপাতদৃষ্ট আক্ষরিক অর্থ ভিন্ন অপর কোন অর্থ থাকিবে না, এরূপ কোন নির্দ্দেশ আছে বলিয়া মনে হয় না। বস্তু ইহাই স্বাভাবিক যে শ্লোকের ব্যঞ্জনা হইতেই প্রকৃত রসবোধের সন্ধান পাওয়া যায়। আমি অতঃপর তাহারই অনুসরণ করিতেছি।

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রায় চল্লিশখানি টীকার নাম শুনিয়াছি। টীকা ও ব্যাখ্যা পাঁচখানি মাত্র আমি দেখিয়াছি, ইহার মধ্যে 'নন্দ' শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ আছে। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রচিত সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী টীকায় নারায়ণ দাস কবিরাজ 'নন্দনিদেশ' শব্দে গোপরাজ নন্দের আদেশ অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। মহা মহোপাধ্যায় শঙ্কর মিশ্রের রসমঞ্জরী টীকায় এই মতই গৃহীত হইয়াছে। মেবারের রাণা কুম্ভ শ্লোকের প্রথম দুই পংক্তিকে কৃষ্ণোক্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি 'নন্দ নিদেশতঃ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'নন্দের গৃহ হইতে'। সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার পূজারী গোস্বামী 'নন্দ নিদেশ' শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'আনন্দ জনক সখীবাক্য'। রাণা কুম্ভ কৃষ্ণকে ভীরু বলিয়াছেন—'এভির্ভয় হেতুভিঃস্মরাহতীঃ সোঢ়ুমসমর্থঃ।' পূজারী গোস্বামী শ্রীরাধাকে বলিতেছেন—তৎকৃত বহুনারিকা সম্ভোগ আরোপণে শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইয়াছেন। বৈষ্ণব কবি রসময় দাস—নন্দ শব্দে গোপরাজ নন্দ ও আনন্দজনক সখী বাক্য এই উভয় অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন।

কুঞ্জবন মধ্যে প্রবেশিতে সখীগণ।
কহিছে রাধার কিছু প্রণয় বচন॥
কুঞ্জেতে প্রবেশ কর রাধা ঠাকুরাণী।
প্রিয় সখীর বচন অন্যথা করি মানি॥
কুঞ্জ সজ্জায় কুঞ্জে তুমি করহ প্রবেশ।
শ্রবণ করহ প্রিয় সখীর আদেশ॥
পূর্ব্ব রাত্রে রাস হইতে এলে মান করি।
তদবধি কৃষ্ণ তোমায় অতি ভয় করি॥
কেবল আছেন মাত্র তোমার গোচরে।
কুঞ্জেতে আছেন তাহে বচন না স্ফুরে॥
যদি বল কুঞ্জে প্রবেশিব কোন মতে।
তাহার উপায় সব দেখহ সাক্ষাতে॥
মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডলে।
মেঘাবৃত চন্দ্রমা হইল এই কালে॥
বনভূমি তমালের বর্ণ সেই স্থানে।
শ্যাম বর্ণ হইয়াছে কেহ নাহি জানে॥
যদি বল মনুষ্যের গমনাগমন।
কেমনে চলিবে তার শুন বিবরণ॥
অন্ধকারে অভিসার বেশভূষা করি।
চলহ নিকুঞ্জে সব ভয় পরিহরি॥
আনন্দে নিদেশ পেয়ে চলে দুইজন।
প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে লীলা করে অনুক্ষণ॥
অন্ধ-কুঞ্জ লক্ষ্য করি নানা লীলা করি।
চলিলেন বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহরি॥
প্রিয় মিলনের ইচ্ছা জানি সেই কালে।
মেঘ আসি আচ্ছাদিল গগন মণ্ডলে॥
মেঘাবৃত চন্দ্র পুন রহে সেইখানে।
টীকাকার এই মতে করিলা ব্যাখানে॥
নন্দের আদেশ হৈল কৃষ্ণ ল'য়ে যেতে।
চলিলেন অন্ধকুঞ্জ ক্রমে অলক্ষিতে॥
সঙ্কেত করিয়া ইহা করিল মিলন।
পূর্ব্ব অর্থ কহিয়াছি মূল প্রয়োজন।

এই ব্যাখ্যার সঙ্গে গীতগোবিন্দের সামঞ্জস্য আছে। গীতগোবিন্দেই শ্রীরাধা মানহেতু রাসমণ্ডল ত্যাগ করিয়াছিলেন। রসময় দাস রাসলীলার ইঙ্গিতে বলিতেছেন চন্দ্র এখন মেঘাবৃত আছে। যথা সময়ে পূর্ণরূপে উদিত হইবে। আমি এই শ্লোকের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। বংশীর অপর একটী নাম নন্দ। নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকরে (৫ম তরঙ্গ বহরমপুর সং ৩৯৬ পৃঃ)

সঙ্গীত-পারিজাত হইতে উদ্ধৃত শ্লোকে এই নাম পাওয়া যায়। পরমভাগবত শ্রীল বিল্বমঙ্গলের শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃতের—

"অস্তিত্বস্তরুণী করাগ্র বিলসৎকল্প প্রসূনায়ুতম
বক্ত্র প্রস্তুত বেণু নাদ লহরী নির্ব্বাণ নির্ব্যাকুলম"

এই (দ্বিতীয়) শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট তাঁহার শ্রীকৃষ্ণবল্লভা টীকায় ভক্তিরত্নাকর ধৃত শ্লোকটী অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। হয়তো তিনিও সঙ্গীত পারিজাত অথবা ঐরূপ কোন গ্রন্থ হইতে এই শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্লোকটী এই—

মহানন্দ স্তথা নন্দ বিজয়োঽথ জয়স্তথা।
চত্বার উত্তমবংশা মতঙ্গ মুনি সম্মতাঃ॥
দশাঙ্গুলো মহানন্দো নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানস্তু বিজয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥
চতুর্দ্দশাঙ্গুল মিতো জয় ইত্যভিধীয়তে।
এষা ত্রিধা ভবেদ্ বেণুর্মুরলী বংশিকেত্যপি॥

মহানন্দ, নন্দ, বিজয় ও জয় এই চারিটী উত্তম বংশীর নাম। এই মত মতঙ্গমুনিসম্মত। মহানন্দের মান দশাঙ্গুল, নন্দ একাদশাঙ্গুল, বিজয় দ্বাদশাঙ্গুল ও জয়ের মান চতুর্দ্দশাঙ্গুল। ইহার আবার মণিময় হেমময় ও বংশ নির্ম্মিত ভেদে বেণু, মুরলী ও বংশী এই তিন নাম। শ্রীমদ্ভাগবতের বৃহত্তোষণী টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বংশী সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন—

অর্দ্ধাঙ্গুলান্তরোন্মানং তারাদি বিবরাষ্টকম্।
ততোঽঙ্গুলান্তরে যত্র মুখরন্ধ্রং তথাঙ্গুলম্॥
শিরো বেদাঙ্গুলং পুচ্ছং দ্ব্যঙ্গুলং সাতু বংশিকা।
নবরন্ধ্রযুতা সপ্তদশাঙ্গুল মিতাবুধৈঃ॥
দশাঙ্গুলান্তরা তাচ্চেৎ সা তার মুখরন্ধ্রয়োঃ।
মহানন্দেতি বিখ্যাতা তথা সম্মোহিনীতিচ॥
তবেৎ সূর্য্যান্তরা সা চেৎ তত আকর্ষিণী মতা।
আনন্দিনী তথা বংশী ভবেদিন্দ্রান্তরা যদি॥
গোপানাং বল্লভাসেয়ং বংশুলীতি চ বিশ্রুতা।
ক্রমান্মণিময়ী হৈমী বৈণবীতি ত্রিধা চ সা॥

অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমিত তার আদি অষ্টছিদ্র সমন্বিত এবং সেই অষ্টছিদ্রের এক অঙ্গুলি পরে একাঙ্গুলিপরিমিত মুখছিদ্রযুক্ত বাঁশীর নাম বংশীকা। ইহার শিরোদেশ চারি অঙ্গুল ও পুচ্ছ তিন অঙ্গুল। যে বংশীর পরিমাণ সপ্তদশ অঙ্গুলি, যাহাতে নয়টী ছিদ্র আছে, যাহার তার ছিদ্রের অর্থাৎ নয়টী ছিদ্রের দশাঙ্গুল অন্তরে মুখরন্ধ্র থাকে সেই সম্মোহিনী বংশীর নাম মহানন্দ। তার ছিদ্রে ও মুখবিবরে যাহার ব্যবধান দ্বাদশাঙ্গুল তাহার নাম আকর্ষিণী ও চতুর্দ্দশাঙ্গুল ব্যবধানযুক্ত বংশীর নাম আনন্দিনী। আনন্দিনী রাধালগণের প্রিয়, ইহার অপর নাম বংশুলী। মণিময়, হেমময়, ও বংশ-নির্ম্মিত ভেদে ইহা তিন প্রকার। ভক্তি-রত্নাকর অথবা শ্রীকৃষ্ণবল্লভা ধৃত শ্লোকের "মান" অর্থে তারছিদ্রের সঙ্গে মুখ বিবরের ব্যবধান ধরিলে বৈষ্ণবতোষণীর সঙ্গে প্রায় ঐক্য পাওয়া যাইতেছে। নন্দ ও বিজয়কে আকর্ষিণী বংশী বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। কীর্ত্তনীয়াগণের মুখে একটী শ্লোক শুনিয়াছি।

সঙ্কেতে মুরলীকৈব বংশুলী বেণুচারণে।
বংশী নামাক্ষর দ্বয়ং সর্ব্বকর্ম্ম সুসাধিকা॥

আকর্ষিণী নন্দ ও বিজয় সুবর্ণ নির্ম্মিত এবং এই দুইটীই মুরলী নামে পরিচিত। বংশী ইহাদের সাধারণ নাম। শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিনী বংশুলী বা বাঁশের বাঁশী বেণুচারণে এবং গোপীগণের প্রতি সঙ্কেতে মুরলী বাদন করেন।

ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থখানি এ দেশে প্রচলিত ছিল না। শ্রীমন্ মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

এই গ্রন্থের ৫৬ সংখ্যক শ্লোকে গোলোকের বর্ণনা প্রসঙ্গে বংশীকে প্রিয়সখী বলা হইয়াছে।

• শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবো
দ্রুমা ভূমিশ্চিন্তামণি গণময়ী তোয়মমৃতং।
কথা গানং নাট্যং গমনমপি বংশী প্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥

গোলোকে শ্রীগণ কান্তা, কান্ত পরমপুরুষ, বৃক্ষ সমস্ত কল্পতরু, ভূমি চিন্তামণিময়, জল অমৃত, কথাই গান, গমনই নৃত্য, বংশী প্রিয়সখী, চিদানন্দই জ্যোতি এবং আহাই আস্বাদনীয়। ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থখানি স্মরণাতীত কালে রচিত। ইদানীং কালে শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীও উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থে সহায় ভেদ প্রকরণে বলিতেছেন—

হ্রিয় মব গৃহ গৃহেভ্যঃ কর্ষতি রাধাং বনায় যা নিপুণা
সাজয়তি নিস্পৃষ্টার্থা বর বংশজ কাকলী দূতী॥

লজ্জাহরণ পূর্ব্বক শ্রীরাধাকে গৃহ হইতে বনে আকর্ষণে নিপুণা শ্রীকৃষ্ণের নিস্পৃষ্টার্থা দূতী সদ্বংশজ বংশীধ্বনির জয় হউক। দেখিতেছি প্রাচীন কাল হইতে রাধাকৃষ্ণ লীলায় বংশীর এই প্রাধান্য রহিয়াছে। দাক্ষিণাত্যের আচার্য্য নিম্বার্কই রাধাকৃষ্ণকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি দাক্ষিণাত্যের রাধাকৃষ্ণ উপাসনামূলক মতবাদের সঙ্গে জয়দেবের পরিচয় থাকা সম্ভব। সুতরাং জয়দেব যে বংশী অর্থে নন্দ শব্দ ব্যবহার করেন নাই, ইহা বলা নিতান্তই দুঃসাহসের কাজ। নন্দ শব্দে বংশী অর্থ ধরিয়া গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটী এই রূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে।

"অয়ি ভীরু (ভীরুঃ ইত্যস্য সম্বোধনম্) রাধে ইদং নক্তম্, কালোঽয়ং রাত্রি সময়ঃ। প্রকৃত্যৈব তমসাচ্ছন্নঃ, অতঃ বনভুবঃ শ্যামতয়া মেঘাড়ম্বরত্বাচ্চ সা তামসী রাত্রিঃ নিতরাং তামসী জাতা। অতঃহি স্বভাবতঃ এব ভীরুঃ ভবতীসা, গুরুজনদৌর্জন্যাৎ প্রেষ্ঠ সঙ্গমাৎ ভীতা। অতঃ সদৈব সদবসরং প্রতীক্ষমাণা। অতঃ দিষ্ট্যা সমুপস্থিতোঽয়ং তামসবিহারাবসরঃ ত্বয়া অবশ্যমেব অঙ্গীকার্য্যঃ অতঃ ইমং তৎসন্নিকৃষ্টং নন্দায়ং বংশীবাদকং শ্রীকৃষ্ণং অবিলম্বমেব রয়ং সবেগং গৃহং প্রাক্ সংকেতিতং মহাবিলাসগৃহং প্রাপয় নয়। শ্রীকৃষ্ণেন সহৈব ত্বং সবেগং বিলাসগৃহং গচ্ছ। রয়ং বেগবৎ অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ প্রাপয় ইতি ক্রিয়ায়াঃ বিশেষণম্। এবং মহাবিলাসং সূচয়িত্বা বর্ণয়িষ্যমাণং হৃৎ পরমনিধি মিব সুগুপ্তং সংরক্ষ্য তস্য বিলাসগৃহস্য প্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব পথিপার্শ্বস্থে প্রতিদ্রুমে যাঃ কেলয়ঃ উদিতাঃ তাঃ অপি নিতরাং জয়ন্তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্তন্তে ইতি রসিক কবেঃ আশংসা।"

ইহার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এইরূপ—"আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন, বনভূমিও তমাল তরুনিকরে শ্যামায়মান, তাহাতে আবার রাত্রিকাল। সুতরাং সমস্ত বিশ্বই এক ঘিন্ন কৃষ্ণতায় আবৃত হইয়াছে। হে রাধে, কেন ভয় পাইতেছ? (ইহাই তো অভিসারের উপযুক্ত সময়। অন্ধকারোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া) বেগে দ্রুতগতিতে সংকেত কুঞ্জগৃহে আসিয়া উপস্থিত হও। (আমি পথিপার্শ্বে তরুতলে তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি) এইরূপ (বংশীধ্বনি শুনিয়া) বংশীসঙ্কেতপরিচালিতা শ্রীরাধা অন্ধকারাচ্ছন্ন নিকুঞ্জ গমনপথে প্রতীক্ষা-কাতর শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গনে আবদ্ধা হইলেন। যুগলে মিলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ সঙ্কেত কুঞ্জের অভিমুখে চলিতে চলিতে কালিন্দীকূলে শ্রীবৃন্দা তরুতলে যে লীলা করিয়াছিলেন, শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেই বিজন বিলাসলীলার জয় হউক।"

শ্রীগীতগোবিন্দের "সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ" নামক ৪র্থ সর্গের অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ সংখ্যক শ্লোক দুইটি

এই প্রসঙ্গে আলোচনাযোগ্য। যাঁহারা "নন্দ নিদেশ" শব্দে "আনন্দ জনক সখী বচন" অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রথম শ্লোকের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রীরাধার প্রতি সখীর উক্তি ঐ শ্লোক দুইটী নিজেদের মত সমর্থনার্থ উদ্ধৃত করিতে পারেন।

শ্রীগীতগোবিন্দের "দৃষ্ট বৈকুণ্ঠ" নামক ষষ্ঠ সর্গের সমাপ্তি শ্লোকের সঙ্গে আমাদের আলোচ্য প্রথম শ্লোকের তুলনা করিতে পারি। শ্লোকটি এই—

কিং বিশ্রাম্যসি কৃষ্ণ ভোগিভবনে ভাণ্ডীর ভূমীরুহি
ব্রাতর্যাহি ন দৃষ্টি গোচরমিতঃ সানন্দ নন্দাস্পদম্।
রাধায়া বচনং তদধ্বগ মুখান্নন্দান্তিকে গোপতো
গোবিন্দস্য জয়ন্তি সান্দ্রমতিথি প্রাশস্ত্যগর্ভাগিরঃ॥

প্রথম শ্লোকে আছে "অধ্বকুঞ্জ" এই শ্লোকে আছে "অধ্বগ," সেখানে "নন্দ নিদেশতঃ" এখানে 'নন্দান্তিকে গোপতো।" এই লীলা যে নন্দের নিকট গোপনীয় তাহা এই শ্লোকেই প্রমাণিত হইতেছে। পুরাণের সঙ্গে শ্রীগীতগোবিন্দের ইহাই পার্থক্য। সেখানে "নক্তং" এখানে "সায়ঃ," প্রথম শ্লোকে "রাধামাধবয়ো জয়ন্তি" এই শ্লোকে "গোবিন্দস্য জয়ন্তি।" শ্লোকের অর্থ— "ভাই পথিক, সন্ধ্যাকালে এই ভাণ্ডীর তরুতলে কালসর্পের আবাসস্থলে কেন আসিয়া দাঁড়াইলে? অদূরে ঐ আনন্দময় নন্দালয় দেখিতেছ, ওখানে কেন যাও না? পথিক নন্দালয়ে গিয়া এই কথাগুলি বলিলে নন্দনন্দন এই সঙ্কেত বাণীর প্রকৃত অর্থ গোপরাজ নন্দের নিকট গোপন পূর্ব্বক যে অভিপ্রায়ে পথিকের প্রশংসা করিয়াছিলেন, গোবিন্দের সেই সাভিপ্রায় প্রশংসা বাণীর জয় হউক।"

কৃষ্ণ "ভোগী"—এক অর্থে কৃষ্ণ ভুজঙ্গ কালসর্প; অন্যঅর্থে ভোগী বিলাসী নায়ক কৃষ্ণ। ব্রজবাসী সাধারণের কৃষ্ণদর্শনের স্থান নন্দালয়। কৃষ্ণানুরক্তা গোপী ভিন্ন অপর কাহারো কৃষ্ণ-বিলাসস্থলীতে প্রবেশের অধিকার নাই। আবার সখী ভিন্ন শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসলীলা সন্দর্শনের অধিকার সাধারণ গোপীরও ছিল না। প্রথম শ্লোকে বংশী মুখে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে আহ্বান করিয়াছেন। এই শ্লোকে পথিক-প্রমুখাৎ সঙ্কেত-বাণী প্রেরণে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে আবাহন করিতেছেন।

শ্লোক দুইটী নিখিল বিশ্বমানবের প্রতি আহ্বান বাণীরূপেও ব্যাখ্যাত হইতে পারে। (১) দুর্য্যোগময়ী রাত্রি, অন্ধকারাচ্ছন্ন কণ্টকাকীর্ণ পিচ্ছিল বনপথ; ভীরু, ভয় কি! অগ্রসর হও। (২) এ সংসার কালসর্পের ক্রীড়াভূমি; এখানে অলস বিলাসে মজিয়া বিশ্রামের অবকাশ নাই; বিশ্বমানবের একমাত্র গন্তব্যস্থল অদূরে ঐ আনন্দময় বৃন্দাবনের নন্দনিকেতন, তোমার লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হও।

আরও একদিক দিয়া প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা করা চলে। রাধাকৃষ্ণ লীলা নিত্যলীলা। এ লীলা শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন, শ্রীগীতগোবিন্দেও তেমনই। লীলার নিত্যতা রক্ষার জন্যই কবিকে মেঘমেদুর অম্বর ও রাত্রির অবতারণা করিতে হইয়াছে। লৌকিক জগতে শ্রীহরির শয়ন উত্থান ও পার্শ্ব পরিবর্ত্তন পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিতে হয়। "নিশিস্বপ্নো দিবোত্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনম্।" পুরাণের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া বিধিনিষেধের বাধা নিরসন জন্যই কবির প্রয়াস। বর্ষার বর্ষণাচ্ছন্ন দিনে আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশীতে স্মৃতি বচন নিবেদন করিতেছেন—

পঞ্চস্থ মেঘান্যপি মেঘশ্যামং
হ্যাপ্লাবয়ত্যং স্ক্যিমানাং মহীমিমাং।
নিদ্রাং ভগবান্ গৃহ্নাতু লোকনাথঃ
বর্ষা মিমাং পঞ্চতু মেঘবৃন্দং॥

শ্যামল মেঘের বারিধারায় মহী অভিষিক্ত হইতেছে। হে লোকস্বামি ভগবান, তুমি নিদ্রা গ্রহণ কর। কবির কণ্ঠে তখন উদ্গীত হইতেছে—'রাধামাধবয়োরয়ন্তি যমুনা কূলে রহঃ কেলয়ঃ', ?

শনীর্ষ।

চিঠি

শ্রীশৈলেন্দ্রলাল রায়

তুমি কি জান না সেই রাজ-হংস কথা ?
বইত যে জন অতীত কালে প্রেমের বারতা—
সেই রাজ-হংস কথা ?
নয়নমণ্ডী থাকত চেয়ে নীল আকাশের পানে
দুইটি চোখে অশেষ ব্যাকুলতা
প্রশ্ন কত উঠত জেগে আবেগভরা প্রাণে—
গান দুটিতে উঠত ফুটে পলাশ ফুলের মাদকতা—
জান তো তা ?

ওগো আমার হৃদয়রঙ্গী
হয়তো তোমার সহন সীমার গ্রন্থি
এবার ছিঁড়েই যেতে চায় !
হয় তো এখন নীল আকাশের গায়
হারিয়ে গেছে তোমার দুটি কাল আঁখির তারা
চোখের পাতায় জড়িয়ে আছে করুণ শিশির ধারা !
এবার তবে দিইগো ছেড়ে পত্র-বিহঙ্গিকা—।
আমার বাঁশী, আমার বাণী, আমার লিপিকা
পত্ররূপী হংস বলাকা—
হৃদয় আমার ওরই পাখায় ঢাকা
কণ্ঠে যে ওর জড়িয়ে আছে আমার গীতিকা !
পরাণে ওর আমার প্রাণের শিখা
আনন্দ মোর বেদনা মোর আমার ভালোবাসা
ওরই মুখে ফুটবে তারই ভাষা।

জানি না এই পত্র বিহঙ্গিকা
কখন যাবে তোমার দেশে
রাজ-রসে নিপুণা সেই চটুল সখি বকুল বালিকা

আসবে ছুটে খবর দেবে হেসে
ছন্দ করে বল্‌বে সে যে এসেছে সে! এসেছে সে পত্র বেশে!
আস্‌বে ছুটে প্রিয়ম্বদা অরুণ মালিকা—
কৌতুকে সে টইটম্বুর ঐটেই যেন পড়ে—
প্রিয়তমার মতই প্রিয় নিত্য-রসিকা
ফুটিয়ে হাসি কোমল বিম্বাধরে
বল্‌বে হেসে—ভালো! ভালো!
আমার প্রাণে ফুল ফোটানোর মত— আছে কিনা একটু ওতে আলো।

সোহাগ ভরে ডান হাতেতে এই লিপিকা তুমি
নয়ন মুদে বারেক নিও চুমি—!
যেমন করে রাজহংস-গ্রীবা জড়িয়ে ধরে বিপুল আনন্দে
সে দিনের সে দময়ন্তী চুম্বনেতে ভরেছিল চঞ্চুখানি তার ব্যাকুল বসন্তে।
আনন্দেতে চক্ষু ছল ছল
আমার চিঠি হয় তো প্রিয়া আন্‌বে তোমার নয়ন ভরে জল
সন্ধ্যা কালের কালো দীঘির মত তোমার দুটি আঁখি
কূলে কূলে হয়তো রবে ঢাকি'—!
লুকিয়ে তুমি রাখবে তারে বুকের মাঝে
স্পর্শ যে তার আমার বুকের নিশ্বাসেরই মত তোমার বুকেও বাজে;
ওরই মাঝে আছে প্রিয়া আমার প্রাণের দুরন্ত আহ্বান
বুকের মাঝে চেপে ধ'রে আমার মতই শুনিও ওরে—
তোমার প্রাণের অফুরন্ত গান!
হৃদয়-নীরে করায়ো ওর পূর্ণ অবগাহন—
ও যে আমি! চিঠির ছদ্মবেশে! আমার পরে বিছিয়ে দিও
তোমার প্রাণের সলিল আবরণ।
অম্লান করেই তোমার মাঝেই আমার সমাধি
হোক্‌না প্রিয়া! আমি যে চাই—
তোমার মাঝেই আমার প্রেমের সকল সমাপ্তি।

হয়তো এখন পড়ছ চিঠিখানি!
আমার হাতের কালো আখরগুলি—
তোমার দুটি কালো আঁখির পানে
আছে ওদের নিবিড় আঁখি তুলি'—
সকাল বেলার সোনালি রোদ গোলাপ ফুলের রাগে
দুরন্ত উচ্ছ্বাসে
এনেছে তার রৌদ্র দীপ্ত অরুণ লিপিকা
পাতায় পাতায় শিশিরগুলি করছে গো টলমল
জ্যোতির ললাটিকা।
গোলাপ ফুলের গন্ধবাণী মুক্ত প্রেমোচ্ছ্বাস
তারই লিপি নিয়ে চলে দখিনা বাতাস
ঊর্দ্ধে আকাশ পানে—
অগ্নি অশ্রু বেথায় গলে সূর্য্যের নয়ানে—
হঠাৎ আলোর ঝলক লাগার মত আম্রশাখা হতে
একটি দুটি গানের তীর—
সন্ধানী-পাপিয়া পাঠিয়ে দিল আনন্দরই স্রোতে
ব্যাকুল করে দক্ষিণা সমীর—
কালো আঁখির ঝাঁকের মত এল উড়ে অসংখ্য ভ্রমর—
চুম্বনেতে বন্ধ হোলো পুষ্প আঁখি মোর—।
জানি তুমি পড়ছ চিঠি খানি
একাগ্রতায় হারিয়ে ফেলে তোমার তুমি শুনছে আমার বাণী—
হারিয়ে গেছে বিশ্ব তোমার বিস্মরণের কূলে
আকাশ বাতাস সবই গেছ ভুলে
আছি শুধু আমি—আমার চিঠি—
আর তারই পরে ছড়িয়ে আছে তোমার মনের লক্ষ-আঁখি দিঠি।

এইতো পত্র বিহঙ্গিকা; আমরা দু'জন ভেসে চলি ওরই গতির পাখায়
মহাকালের সকল সীমা এবার যেন এড়িয়ে যাওয়া যায়
জীবন মরণ সকল গণ্ডি শুক্‌নো ধূলোর মত—উড়ছে মোদের পেছন পানে
আমরা দু'জন চল্‌ছি ভেসে নিরুদ্দেশের টানে—

সকল সীমা ছাড়িয়ে প্রিয়া যাত্রা মোদের চলে—
গর্ব-দৃপ্ত গৌরী-শৃঙ্গ মোদের পদতলে।
দুইটি কণ্ঠ আমরা দুইজনে একটি গানে দৃঢ়-আলিঙ্গনে
ঊর্দ্ধে উঠি সুরের হোমানলে
—একান্তে যে মিলিয়ে গিয়ে একটি শুভক্ষণে
ছাড়িয়ে চলি উদয় অস্তাচলে!
অভ্রভেদী গৌরী-শৃঙ্গ ওরই প্রিয়া উর্দ্ধতম শিরে—
খানিক এস দাঁড়াই মোরা ধীরে—
সকল দিকে নীল পারাবার মোদের আছে ঘিরে—
এবার এস খানিক মোরা চেয়ে দেখি মাটির পৃথিবীরে—।
ঐ তো হোথায় দুঃখ সুখ আর ভাঙ্গাগড়ার তীরে—
দুইটি বাহু তুলে কে যেন গো ডাকে মোদের
একটি বিজন স্নেহের স্বপন নীড়ে—
—যেমন করে না জানি কোন চুম্বক আহ্বানে—
—সন্ধ্যা বেলায়
শূন্যে-ওড়া বিহঙ্গদের ফিরিয়ে আনে দুরন্ত কী টানে—
নিস্তব্ধ কুলায়!
যেমন করে মায়ের বুকে শিশু প্রথম আসে—
অমনি মোদের শিশু ভালবাসা—
ঐ খানেতেই দেখেছিল প্রথম প্রভাত খানি
ঐ খানেতেই শিখেছে তার ভাষা—
চল প্রিয়া হোথায় ফিরে যাই—
ঐ আমাদের মাটির ঘরে—
পূর্ণতারই সাগর হোথায় শূন্য কিছুই নাই—
পায়ের তলে স্বর্গ হোথায় লুটিয়ে পড়ে!
কাজ কি প্রিয়া শুনব না কো গ্রহ-তারার গান
ঐ আকাশের পাড়ে—
প্রাণের সুরে হোথায় মোরা মিলিয়ে দেব প্রাণ
মাটির ঘরে পৃথিবীর একধারে!

নিশি ময়ূর নীল আকাশের বুকে
এবার কিগো ছড়িয়ে দিল পাখা
দিনের আকাশ এবার তোমার—
ঐ পাখাতেই পড়ল কিগো ঢাকা !
নীল পালকে চন্দ্র তারার লক্ষ মাণিক জ্বালা
ঐ পাখারই ছাওয়ায় বসে এবার কিগো তোমার সখি চিঠি পড়ার পালা ;
তোমাদের অঙ্গনে কিগো শুভ্র চাঁদের কিরণ তীরে
চন্দ্রমল্লি খুলছে এবার দল ?
চাঁদের চোখের শিশির কণা ফুলের চোখে করছে কি টলমল ?
শান্ত পবন বয় কি ধীরে ধীরে
এমনি রাতে সখি আমার প্রেমের পত্রটিরে—
সঞ্চিত কি কর তুমি আকুল আঁখি নীরে ?
আমার দেশেও এবার আঁধার এল
গুনিয়ে গেল
অন্ধকারের গান !
ক্লান্ত দিনের হ'ল এবার পূর্ণ অবসান !
আঁধার এল ! কালো আঁধার
তোমার চুলের মত চোখের মত কালো—।
ওরই মাঝে টিক্‌রে এসে পড়েছে যে আমার ছাদের পরে—
একটুখানি চাঁদের আলো !—
ভাঙ্গাটবে একটি ছটি রজনীগন্ধা কুটছে অনাদরে
বিছিয়ে দিয়ে গন্ধ মধুজাল মধুর ক'রে নিশাথিনীর কালো !
এই নিশীথের গন্ধ রসের ধারা
ঐ গগনের স্নিগ্ধ চাঁদ আর লক্ষ উজল তারা—
কিছুই সখি ! কিছুই যে মোর লাগছে নাকো ভালো ।
ছিন্ন করে বৃন্তগুলি চন্দ্র তারকার
সাধ্য হ'লে রচি আমি অশেষ অন্ধকার
কালো আঁধার। নিবিড় কালো। তোমার চুলের মত চোখের মত কালো ।

আয়নার টুক্‌রো

শ্রীঅমলেন্দু রায় বি-এ

পাথরের সিঁড়ি ভেঙে তিনি তিন-তলা অবধি উঠ্‌লেন। কিন্তু চাবি দিয়ে তালাটা খুলবার আগে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন দম নেবার জন্য। দরজার গায়ে নেম-প্লেটে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা। মিঃ অবনী রায় মধ্য-রাত্রি তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন। নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দেই বুঝি তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।

বসবার ঘরে আলোটা জ্বালিয়ে তিনি ধপ্ করে বসে পড়লেন একটা চেয়ারে। তিনি আজ ক্লান্ত, অবসন্ন। যদিও বিগত বারো ঘণ্টায় ভিতরে তাঁর দেহ-মন পরিশ্রমের কাজ একটাও করেনি তবু তিনি ক্লান্ত, রাত্রিতে তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ ছিল, যেমন অন্যান্য শনিবারে থাকে। সেখানে প্রচুর খেয়েছেন, হাসি গল্প ক'রেছেন। তারপর সেখান থেকে বেড়িয়ে কিছুটা পথ হেঁটে ট্যাক্সিতে চেপেছেন, আর সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে কখন বাড়ী এসে পৌঁছেছেন—পরিশ্রমের কাজ একটাও হয়নি, তবুও তিনি ক্লান্ত! একপ্রকার তরল ক্লান্তি তাঁর শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে তাকে জড়, মৃতের মতই জীবনশক্তিহীন ক'রে রেখেছে।

"সময় ঘনিয়ে এসেছে," তিনি ভাবলেন।

মিঃ রায়ের বয়স পঞ্চাশ পূর্ণ হয়নি, কিন্তু তাঁকে দেখ্‌লে সত্তোর বছরের বৃদ্ধ বলে ভ্রম হয়। বয়সের হিসাবে আরো দশ বছর আয়ু নির্ব্বিবাদে দাবী করা চলে কিন্তু এমন ক্লান্তির অসাড়তায় তিনি বেশী দিন বাঁচবেন না, বাঁচতে পারেন না।

"তোমার দিন ফুরালো" গুণগুনিয়ে বল্‌লেন তিনি।

আশাহীন ভবঘুরেদের মত মিঃ রায় তাঁর জীবনখাতার পাতা উল্টিয়ে চ'ললেন। কিন্তু কিছুই পেলেন না তিনি, কোন সঞ্চয়ই তাঁর নেই,—সবই যেন অস্পষ্ট, ধূসর, ম্লান, ব্যর্থতায় ভরা। সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর তিনি এই জগতে বসবাস ক'রেছেন কিন্তু কী পেয়েছেন তিনি? কী বহন করে এনে দিয়েছে তাঁকে এই পঞ্চাশ বৎসর? শুধু বার্দ্ধক্য, ক্লান্তি, রিক্ততা আর আজ রাত্রির ভারী কম্বলের মত শ্বাসরোধ-করা তীব্র এক অনুভূতি। হাত এক হাত দূরে টেবিলের উপর কাঁচের গ্লাসে জল; সে জল পান ক'রে হয়ত তিনি সুস্থ বোধ ক'রতে পারেন; কিন্তু হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাস নেবার কথা মনে হতেই তিনি ভগ্নোদ্যমের মত একভাবে পড়ে রইলেন, যেন সম্মুখে এক বিশাল, উত্তুঙ্গ অনতিক্রম্য পর্ব্বতশ্রেণী তাঁকে পার হতে হবে।

সত্যিই এ জীবনটা তাঁর ব্যর্থ; সম্পূর্ণ শোচনীয়রূপে ব্যর্থ। এ জীবনে তিনি যে ফসল ফলিয়েছেন তা শুধু ভস্ম। মানুষের স্মৃতিতে তাঁর কোন স্থান নেই; এক মুহূর্ত্তের জন্যেও নয়। তিনি না পারলেন নিজের জন্য কিছু ক'রতে না পারলেন অন্যের জন্যে। তাঁর এই সোনার জীবন মাটির দরে বিকিয়ে গেল।

জীবনে সুখী হ'তে পারেননি বলে তিনি শোক ক'রতেন না যদি মানুষের কল্যাণের জন্য অন্ততঃ একটা কাজ ক'রে যেতে পারতেন; এবং কর্ম্মযোগী হতে পারেন নি বোলে কোন অনুশোচনাই ক'রতেন না যদি ও জগতে এসে সুখ পেতেন। কিন্তু কর্ম্মী বা সুখী কোনটাই হতে পারলেন না তিনি। অথচ তাঁর [illegible]

চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রী তিনি সসম্মানে অর্জ্জন ক'রলেন, চারদিক থেকে কত প্রশংসা-বাণী এল, কত উচ্চ ধারণা পোষণ করল সবাই তাঁর সম্বন্ধে। বুদ্ধি-দৃপ্ত, প্রতিভাবান কত বিশেষণই না তিনি পেলেন! তিনিও তখন লোকের আশানুযায়ী নিজেকে গড়ে তুলতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হ'লেন। এ জগত থেকে বিদায় নেবার আগে মানুষের হাতে তুলে দেবার মতই সামগ্রী প্রস্তুত ক'রতে লাগলেন। দিনের বেলায় অসুরের মত পরিশ্রম ক'রলেন, রাত্রি বেলায় পরীক্ষার্থীর মত অধ্যয়ন ক'রলেন, অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা ক'রে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার ক'রলেন। নিখুঁত ভাষায় কত উদার প্রশংসাপত্র এসে প'ড়ল তাঁর উপর! তা নিয়ে কী আলাপ আলোচনা! দেশের গুণি-সমাজ তখন তাঁর গ্রন্থকে কেন্দ্র করে কী উল্লাসই না ক'রলেন! কিন্তু দুবছর যেতে না যেতেই নূতনতর তত্ত্ব এসে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলল। লাইব্রেরীতে অন্যান্য অনেক গ্রন্থের মতই তাঁর গ্রন্থ পাঠকসমাজে অপাংক্তেয় হয়ে রইল। আর নিজের বাড়ীতে যে দু একখানা কপি ছিল তাও শেল্‌ফের ধুলোয় সমাধিস্থ হ'ল। তাঁর প্রথম প্রচেষ্টার সমাপ্তি ঘটল এই ভাবে। তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা একখানি নাটক। দেশের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা—পরাধীনতার গ্লানি, দেশবাসীর কর্ত্তব্য, জাতীয়তাবোধের প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সমন্বয়ে তিনি এমন একখানি নাটক লিখতে চেয়েছিলেন যে নাটক দেশের বিভিন্ন নাট্যশালায় অভিনীত হয়ে দেশবাসীর লুপ্ত সত্তা ফিরিয়ে আনবে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করবে পরাধীনতার অসহ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার জন্য, এই দগ্ধভাগ্য শুষ্কম্লান ভারতবাসীর জীবনে যুগান্তর এনে দেবে যেমন গোর্কীর অমর গ্রন্থ "মাদার" একদা রাশিয়ায় এনেছিল। গোর্কী লিখেছিলেন উপন্যাস; তিনি লিখলেন নাটক। অবশ্য সাহিত্যিক হিসাবে নাম করবার ইচ্ছা তাঁর ছিলনা আদৌ। তাঁর সত্যিকারের স্বদেশ-প্রীতিই এর জন্য দায়ী। কিন্তু হায়! সে নাটক এ পোড়া দেশের কোন নাট্যশালাতেই আজ পর্য্যন্ত অভিনীত হয়নি।

এইত গেল সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসরের কর্ম্মতালিকা। কিন্তু বাকী অংশ? যে অংশ কর্ম্মহীন, সেখানে শুধু খেলা! হায় সেখানেও সেই ব্যর্থতা! তিনি যা চাইবেন তা হয়ত হারাবেন ব'লেই চাইবেন; হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে তিনি যা কামনা ক'রবেন হৃদয়ে তা শুধু কাঁটাই ফুটিয়ে যাবে। তাঁর জীবন-ইতিহাসে এই একটি ঘটনারই পুনরাবর্ত্তন। প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল হ'য়ে রইলেন তিনি, আর চিন্তা ভাবনা-গুলোকে ছেড়ে দিলেন স্মরণের স্রোতে। প্রতি মুহূর্ত্তে তারা বাধা পেল আর শুধু আঘাত; ভগ্ন আশা, রুদ্ধ কামনা! শিথিল নিরুপায়ের দৃষ্টিতে তিনি লক্ষ্য ক'রলেন এই অত্যাচার। প্রতিবাদ ক'রবার, বিদ্রোহ ক'রবার সব শক্তি আজ তাঁর লুপ্ত, তিনি আজ ক্লান্ত, ভারী ক্লান্ত, অদৃষ্টের প্রবলতাকে তিনি এক অদ্ভুত প্রশান্তিতে বরণ ক'রে নিলেন।

মৃতের হাতের মত মিঃ রায়ের হাতখানা চেয়ারের হাতলে পড়েছিল। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে গভীর মনো-নিবেশ সহকারে তিনি হাতখানা পরীক্ষা ক'রতে লাগলেন। রক্তহীনতায় বিশ্রী সেই হাত, শুষ্ক ঝ'রে পড়া পাতার মত সেই হাত; হাত নয়ত হাতের কঙ্কাল। এক দৃষ্টিতে তিনি হাতখানা দেখছিলেন, শেষে তাঁর দৃষ্টি নিষ্প্রভ হ'য়ে এল, মাথাটা ঝুঁকে প'ড়ল সামনের দিকে। তাঁর ঘুম পাচ্ছিল এমন নয়; তিনি বড় ক্লান্ত, দুর্ব্বল; তবু ক'ষ্টে মাথাটা তুলে নিয়ে অন্য কামরায় চ'লে গেলেন তিনি। তিনি একটু শীত অনুভব ক'রছিলেন; কিন্তু তাই ব'লে কিছু

গায়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ার চেয়ে ব'সে ব'সে শীতে কাঁপা তাঁর পক্ষে তখন অনেক সহজ।

কী নিশ্চুপ এই পৃথিবী; কী শূন্য এই ঘর! সব চাইতে অসহ্য লাগে তাঁর এই একাকিত্ব। কী বিশ্রী ভয়াল একা তিনি, যেন লোকালয়-হীন, জন-প্রাণীশূন্য বিস্তীর্ণ এক প্রান্তরে তিনি একা। কিন্তু যদি তিনি বিবাহ ক'রে স্ত্রীপুত্র নিয়ে ঘরসংসার ক'রতেন তবে এই শূন্য ব্যাচিলরের ঘরে অসীম শূন্যতায় দিন কাটাতে হ'তনা! সত্যিই, তিনি যে বিয়ে করেননি এইটেই তাঁর সবচেয়ে বড় দুঃখ। কিন্তু যে নারীকে তিনি স্ত্রীরূপে বরণ করতে চেয়েছিলেন তাকে তিনি পাননি। প্রতিমাকে যদি তিনি পেতেন তবে এ জগতের সব ব্যর্থতাকে উপহাস ক'রে চ'লে যেতেন।

প্রতিমাকে যখন তিনি প্রথমে দেখেন তখন তাঁর বয়স বাইশ, প্রতিমার সতেরো। প্রতিমাকে দেখে বিস্ময়ে আনন্দে আপ্লুত হয়েছিলেন তিনি। বিশ্বকর্ম্মা যেন ঠিক তাঁর অন্তরলোকের ফরমায়েস অনুযায়ীই সৃষ্টি করেছিলেন প্রতিমাকে। প্রতিমার ভিতর তিনি দেখতে পেলেন তাঁর মানস-প্রতিমাকে। তিনি বুঝলেন, বেশ বুঝলেন তিনি, প্রতিমাকে বিনে তাঁর বাঁচাই অসম্ভব। দশ বৎসর অপেক্ষা করলেন তিনি প্রতিমার জন্য কিন্তু প্রতিমা বলত, "তোমাকে আমার ভাল লাগে, তাই ব'লে ভালবাসি না, আমাদের ভিতর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মাতে পারে কিন্তু সেখানে ভালবাসার স্থান নেই যার পরিণতি একমাত্র দাম্পত্যজীবনে।" কিন্তু প্রতিমা আর কাউকেও ভালবাসেনি, বিয়েও করেনি। দশ বছর তিনি প্রতিমাদের বাড়ী যাতায়াত করেছেন, আদর আপ্যায়ন থেকে বঞ্চিত হননি একদিনও। প্রাণ খুলে তাঁর সঙ্গে গল্প ক'রেছে প্রতিমা, কতদিন বেড়িয়েছে একসঙ্গে, কতবার তাঁর দুঃখে দুঃখ প্রকাশ ক'রেছে। তিনিও আশা ত্যাগ করেননি একেবারে। কিন্তু একদিন প্রতিমা, কুমারী প্রতিমা বিদায় নিয়েছে এ জগত থেকে। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত অবধি তিনি প্রতিমার সেবা ক'রেছেন। সেই সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে রোগশয্যায় শায়িত প্রতিমার পাণ্ডুর মুখ, ওষুধ পথ্যে ভরা শিয়রের টেবিলটী সব যেন স্পষ্ট ভাসছে চোখের সম্মুখে।

প্রতিমা চ'লে গেল। কিন্তু তিনি বাঁচেন কি নিয়ে? একটা স্মৃতি অন্ততঃ চাই যাকে বুকে ধরে তিনি বাকী পথ চলতে পারেন। হাতীর দাঁতে বসানো সুন্দর একখানা হাত-আয়না ছিল প্রতিমার। সেইটে বেছে নিলেন তিনি। এই আয়নাতে প্রতিমার সুন্দর মুখ কতবার প্রতিফলিত হয়েছে; তার গভীর কালো চোখ আর রাঙ্গা ঠোঁটের ছবি অবিকল ফুটে উঠেছে এই আয়নাতে। তাই আশা হয় প্রতিমার সত্তার একটা অংশ অন্ততঃ বাঁধা পড়েছে এই আয়নাতে; তাই আশা হয় এই আয়নাতে মুখ দেখলে হয়ত প্রতিমার সাড়া মিলতে পারে, অন্তরের অন্তঃস্থলে একটা যোগাযোগ সাধিত হ'তে পারে। এই আয়নাকেই তিনি জীবন পথের অমূল্য পাথেয়রূপে গ্রহণ করলেন।

আয়নাখানা ছিল মিঃ রায়ের চোখের সামনে একটা তেপায়াতে, ঐখানেই ওটা থাকে বরাবর। ঘাড়টা বাঁকিয়ে যথাসম্ভব দৃষ্টিশক্তি প্রয়োগ ক'রে আয়নাটার দিকে তাকালেন তিনি। অপলক নেত্রে অনেকক্ষণ অবধি দেখলেন। "আমাকে বিয়ে করলে হয়ত তুমি এমন অকালে মারা যেতে না, আমার প্রেম, সোহাগ, যত্ন তোমাকে মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে রাখত। তুমি মারা যেতে না।"

এই কয়টি কথা মিঃ রায় বারবার বল্‌লেন। তিনি ক্লান্ত, শক্তিহীন। যেদিকে তাঁর একবার দৃষ্টি পড়ে সেদিক থেকে সহসা চোখ ফিরাতে পারেন না তিনি। যে কথা তাঁর মনে একবারটি উদয় হ'ল সেকথা তাঁর জিহ্বা ও ঠোঁট বারেবারে উচ্চারণ না ক'রে পারল না। অবশ্য এও তাঁর একপ্রকার ক্লান্তি, শক্তিহীনতা।

আয়নাতে একবার নিজের মুখ দেখতে তাঁর ভারী সাধ হ'ল। বহু কষ্টে দেহটি বাঁকিয়ে, ঈষৎ উত্থিত হ'য়ে, একখানা কম্প্র-হস্ত প্রসার ক'রে দিলেন তিনি আয়নাটাকে ধরার জন্যে। আয়নাটা হাত দিয়ে ধরলেন ঠিক। এইবার চেষ্টা ক'রলেন পশ্চাৎ-গতিতে স্বস্থানে ফিরে আসতে। আসছিলেন ঠিক। কিন্তু দুর্ব্বল হস্তের গ্রন্থি কোন্ মুহূর্ত্তে শিথিল হ'য়ে পড়ল। ফ্রেম থেকে চামড়ায় লাগানো আয়নার কাঁচ খুলে এল। কাঁচখানা মেঝেয় প'ড়ে চুরমার হ'য়ে গেল।

কাঁচভাঙ্গার শব্দটা তাঁর বুকে গিয়ে বাজলো। চেয়ারে দেহ এলিয়ে দিয়ে তিনি চোখ্ বুজলেন। বুকটা ধড়ফড় ক'রতে লাগ্‌লো, অনেক দূর থেকে দৌড়িয়ে এসে যেমন হয়। তিনি বুঝলেন, অস্পষ্টভাবে বুঝলেন যে তাঁর সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। ভাঙ্গা কাঁচের টুকরোগুলি তিনি দেখতে পেলেন, কেমন এক ঝাপ্‌সা দৃষ্টিতে। সেই মুহূর্ত্তে সবই তাঁর চোখে অস্পষ্ট, ধূসর। তাঁর একটু শীত করতে লাগলো। তাঁর মনে হোলো যেন তিনি চোখ অন্ধ-করা এক অন্ধকারের ভিতর দুরন্ত গতিতে ছুটে চ'লেছেন আর প্রতি মুহূর্ত্তে কে যেন সর্ব্বাঙ্গে একখানা হিমের হাতের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে, আর তিনি থেকে থেকে আঁৎকে উঠ্‌ছেন। তাঁর মাথার ভিতর সব কিছু যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, আর নানা সুরের সুর তাঁর কানে ধ্বনিত হ'চ্ছে। তিনি অনুভব করলেন যেন তাঁর দুরন্তগতিকে বাধা দিতে তিনি কিছু আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা ক'রছেন। কিন্তু তাঁর দুর্ব্বল মুষ্টি কাউকে বেঁধে রাখতে অক্ষম। তিনি যেন গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছেন সাহায্যের জন্য, অথচ তাঁর গলা থেকে কোন আওয়াজই বেরুচ্ছে না। দুরন্ত গতিতে তিনি শুধু ছুটে চ'লেছেন, আর চ'লেছেন! অসীম শূন্যে তিনি কেবলই পাক খাচ্ছেন।

* * * * *

"ওঃ অনেকক্ষণ শেষ হ'য়ে গেছে," মুখ বিকৃত ক'রে ডাক্তার বল্‌লেন, "ঘণ্টা তিনেক আগেই। তবে কোন কষ্ট পান নাই; পিসফুল ডেথ্।"

"আহা, বেচারী ভদ্রলোক" খেদোক্তি ক'রলেন এক পড়শী। "আরে এযে কাঁচের টুক্‌রো দেখছি!" বিস্ময় প্রকাশ করলেন আর এক পড়শী। "ও, একটা ভাঙ্গা আয়না" সরলভাবে বোঝান তাঁর বন্ধু।*

*বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে।

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুর বর্ত্তমানে ব্রহ্মরণাঙ্গণে অবস্থান করিতেছেন। "দৈনিক কৃষকের" বিশেষ সংবাদদাতার একটি সংবাদে প্রকাশ যে মহারাজা ভূপবাহাদুর মোটা সবুজ রংএর পোষাক পরিধান করিয়া বিবিধ মানচিত্র ও নক্সা বিলম্বিত ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সমরকার্য্যের গুরুদায়িত্ব বহন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহী ও প্রফুল্ল দেখায় এবং অতি পরিশ্রমেও তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করেন না।

শ্রীঈশরাণী সাহেবা শিশুসন্তানদ্বয় সহ গত ১৪ই জুন মটরযোগে দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। তথা হইতে তিনি কলিকাতা হইয়া মহারাজকুমার মেজর ইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণের সহিত আহ্‌মেদ্ নগরে যাত্রা করিবেন।

জয়পুরমহারাণী শ্রীশ্রীগায়ত্রীদেবী ১৭ই জুন প্রাতঃকালে কুচবিহারে পৌছেন ও বৈকালে কুচবিহার এসোসিয়েসন কাপ বিজয়ীদলকে পুরস্কার প্রদান করেন।

গত ২০শে জুন মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণীসাহেবা জয়পুররাজমহিষী শ্রীশ্রীমহারাণী গায়ত্রীদেবী ও দেওয়াস্ (জুনিয়র) রাজমহিষী শ্রীশ্রীমহারাণী মেনকাদেবীর সহিত দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবার আন্তরিক ইচ্ছায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় মহিলাগণকে বয়নশিল্প প্রভৃতি শিক্ষা দিবার জন্য একটী নারীমঙ্গল সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

শোক-সংবাদ

রাজপরিবার ও কুচবিহারবাসিগণকে নিদারুণ শোকসাগরে ভাসাইয়া মহারাজকুমারী রাণী ইলাদেবী গত ২৮শে জুন রাত্রি প্রায় ১টার সময় দুরারোগ্য হৃদরোগে অকালে আগড়তলায় মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

মহারাজকুমারী ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ১লা আক্টোবর তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবার ইচ্ছানুসারে তিনি ইউরোপে ও এদেশে শিক্ষালাভ করেন। গণিতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। প্যারিসে তিনি চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। তাহা ছাড়া গার্হস্থ্যবিদ্যাতেও (House Keeping) তিনি বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। বোলপুর শান্তিনিকেতনে তিনি চিত্রাঙ্কণ ও চারুশিল্প শিক্ষা করেন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ১২ই জুন ত্রিপুরার কুমার রমেন্দ্র কিশোর দেববর্ম্মণএর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আগড়তলায় তিনি তথাকার দেশীয়ভাষা ও বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিলেন। গত ১লা জানুয়ারী তিনি "এ" ক্লাস "পাইলট্" এর সার্টিফিকেট্ প্রাপ্ত হন।

তাঁহার পুত্রকন্যাদের আহার, পরিচ্ছদ, খেলাধূলা, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি তিনি খুব প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। পুত্র কুমার মানবেন্দ্র দেববর্ম্মণ (ভীম) ও কন্যা দেবীকাকে দার্জ্জিলিং এ Residential European Schoolএ রাখিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত একটি শিশুপুত্র রাখিয়া তিনি চিরশান্তিধামে গমন করিলেন।

তাঁহার ন্যায় উদারহৃদয়া ও সর্ব্বগুণশালিনী মহারাজকুমারীর এই আকস্মিক তিরোধানে সমগ্র কুচবিহার রাজ্য গভীর শোকে মুহ্যমান। মাতৃশ্রী মহারাণীসাহেবা, মহারাজ ভূপ বাহাদুর ও রাজপরিবারস্থ সকলকে তাঁহাদের এই গভীর শোকে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

এতদুপলক্ষ্যে রাজকীয় সমস্ত আফিস, আদালত প্রভৃতি তিনদিনের জন্য বন্ধ করা হয়, রাজ্যময় তিন দিন শোকপালনের আদেশ দেওয়া হয় ও রাজপ্রাসাদের পতাকাসমূহ অর্দ্ধনমিত অবস্থায় রাখা হয়। ১লা জুলাই রবিবার সহরের সমস্ত বাজার ও দোকানপাট বন্ধ এবং সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় স্থানীয় ল্যান্সডাউন হলে রায় সাহেব শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকান্ত বসু মজুমদার মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি শোক-সভার অনুষ্ঠান হয়।

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠা ভগিনী
কল্যাণময়ী রাণী ইলাদেবীর মহাপ্রয়াণে

অশ্রুকণা *

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ

অফুরন্ত দু'টি স্নেহ ভাণ্ডারের তুমিই প্রথম অংশীদার,
অনাঘ্রাত পূত প্রথম চুম্বন লভিয়াছ তুমি পিতামাতার।
তুমিই লভেছ নবীন-নবীনা-রাজ-দম্পতি-হৃদি-পরশ,
আদি আদরের আদরিণী তুমি গরবিনী তুমি সদা হরষ।
প্রভাতের প্রজাপতিটি সাজিয়া রাজনিকেতন করিয়া আলা,
যৌবনে ওগো গৌরবময়ি, 'কিশোর' কুলেতে দানিলা মালা।
সদানন্দময়ী আনন্দে মগন বিবাহে তোমার নবীন সাজে,
তোরণে তোরণে ভরিল বেহার—অমরাবতীও মলিন লাজে।
রাজরাজেশ্বরী মহনীয়া বেশে চলিলা হরষে স্বামীর দেশ,
কিছু দিন পরে রূপান্তর সাজ, জননীরূপিণী মাতৃ বেশ।
দু'কোলে উজলে ভীম ও দেবিকা—উজলে ভরত বক্ষ-মণি,
সাক্ষাৎ যেন দুর্গা-প্রতিমা—বিপুল বিভব রূপের খনি।

* * *

সচকিতে কেন হেন শেলাঘাত মহিষমর্দ্দিনী রূপেতে সাজি?
পার্থিব ভোগ দলিয়া চরণে কোন্ সতী-লোকে চলিলা আজি?
ক্লেদ-কলুষিত ধরণীর বুক আর বুঝি তব লাগে না ভালো,
তাই আজ ওগো অমরার দেবি, ত্রিদিব ভবন করিলা আলো।
যাও তবে ইলা—লীলা সঙ্গ তব অশ্রুকণা-ধার-অর্ঘ্য লয়ে,
পূত আত্মা তব রহুক উজলি অরুন্ধতীর সঙ্গী হয়ে।

---

* ১লা জুলাই ল্যান্সডাউন হলে অনুষ্ঠিত শোক-সভায় পঠিত।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন

শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুর ও শ্রীশ্রীমহারাণী মহোদয়ার নিদারুণ শোকে যে সকল রাজকর্মচারী ও অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ তাঁহাদের নিকট সহানুভূতিপূর্ণ শোকলিপি বা বার্তা প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে তাঁহারা অন্তরে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছেন। রাজপরিবারের এই চরম শোকের মুহূর্তে সকলের এই সহৃদয় সমবেদনা তাঁহারা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতেছেন এবং অতিশয় দুঃখের সহিত জানাইতেছেন যে পৃথক পৃথক ভাবে শোকলিপির উত্তরদানে তাঁহারা এ অবস্থায় অসমর্থ।

স্থানীয় সংবাদ

কুচবিহার রাজ্যে কৃষির উন্নতি—

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যন্ত্রের সাহায্যে চাষবাস প্রবর্ত্তন করিয়া রাজ্যস্থ কৃষির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের নিমিত্ত একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য বিদেশে শিক্ষা-প্রাপ্ত উচ্চগুণসম্পন্ন একজন কৃষি-কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন; কৃষি-বিভাগের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। বর্ত্তমান সরকারী কৃষিক্ষেত্রের (State Agricultural Farm) আয়তন বাড়াইয়া ৭৫ বিঘা হইতে ৩২৫ বিঘা করা হইয়াছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ২৫টী কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইয়াছে; প্রতি কৃষিক্ষেত্রে একজন করিয়া কৃষি ডিমন্সট্রেটর নিযুক্ত হইয়াছেন; তিনি উন্নততর চাষবাসের ব্যবস্থা হাতে কলমে দেখাইয়া কৃষকদিগকে ক্রমশঃ এই দিকে আকৃষ্ট করিবেন। এইরূপ প্রত্যেক কৃষিক্ষেত্রের মালিককে সরকার হইতে ১৫০৲ টাকা সাহায্য করা হইবে এবং সরকার উৎকৃষ্ট বীজ, রাসায়নিক সার বিনামূল্যে সরবরাহ করিবেন। রাজ্যের অনাবাদী, পতিত জমিতে যাহাতে ক্রমশঃ চাষবাসের ব্যবস্থা হয় তজ্জন্য সরকার হইতে জোর প্রচার কার্য্য চালান হইতেছে।

কুচবিহারে "অধিক শস্য ফলাও" আন্দোলন—

রাজ্যে যাহাতে আরও অধিক খাদ্যশস্য উৎপন্ন হইয়া রাজ্য খাদ্যশস্য বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ হইতে পারে সেই জন্য দরবার হইতে একটি "অধিক শস্য ফলাও" আন্দোলন চালান হইতেছে। এইজন্য মহারাজা ভূপ বাহাদুর বর্ত্তমান বৎসরে ৬৪,০০০৲ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এই অর্থ দ্বারা বিভিন্ন জাতীয় উৎকৃষ্ট বীজ ও সার ক্রয় করিয়া কৃষকগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে।

কুচবিহারে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধন—

রাজ্যে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কুচবিহার দরবার একটি বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই পরিকল্পনায় রেলপথ, রাস্তা ও যানবাহনের উন্নতির কথা আলোচিত হইয়াছে। বর্ত্তমান মিটারগেজ রেলপথকে ব্রডগেজে পরিবর্ত্তিত করা এবং রাজ্যে রেলপথের আরও বিস্তার সাধন করা এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। রাস্তাঘাটের উন্নতির জন্য নাগপুরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রাদেশিক চীফ্ এঞ্জিনীয়ারগণের কনফারেন্সে গৃহীত সুপারিশসমূহ দরবার গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই জন্য একটি সাব-কমিটি নিযুক্ত করিয়াছেন।

গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ—

রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের অভাব দূর করিবার জন্য রাজসরকার একটি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। গত বৎসর হইতে এই পরিকল্পনা অনুসারে কার্য্য হইতেছে। গত বৎসর এই জন্য ২৪০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরে মহারাজা ভূপ বাহাদুর এই জন্য ২০০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। এই টাকা দ্বারা গ্রামাঞ্চলে কংক্রীটের কূয়া নির্ম্মাণ করা হইতেছে; ইহার ফলে গ্রামবাসীদের পানীয় জলের অভাব দূরীভূত হইবে।

কুচবিহারে গ্রামোন্নয়ন—

কুচবিহার রাজসরকার গ্রামোন্নয়ন নিজেদের একটী প্রধান দায়িত্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিভাবে গ্রামসমূহের

সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি করা যাইতে পারে তজ্জন্য একটি পরিকল্পনা করা হইয়াছে এবং এইজন্য বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। আশী হাজার টাকা গ্রাম্য পথঘাটের উন্নতি সাধনের জন্য ব্যয় করা হইবে এবং প্রয়োজন হইলে সংশোধিত বাজেটে আরও অর্থ মঞ্জুর করা হইবে।

কুচবিহারে কুটিরশিল্পের উন্নতি—

কুচবিহার রাজ্যে কুটিরশিল্পের উন্নতির জন্য একটি কুটির-শিল্প-উপদেষ্টা সমিতি (Advisory Committee for Cottage Industries) নিযুক্ত করা হইয়াছে; আইন সভার একজন বে-সরকারী সদস্য ইহার সভাপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। স্থানীয় বয়ন বিদ্যালয়, পিতলকাঁসার বাসন নির্ম্মাণের সরকারী কারখানা, হাতে তৈরী কাগজের কারখানা প্রভৃতির উন্নতির নিমিত্ত সরকার প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। কুটির শিল্পরূপে চুরুট ও সিগার এখানে তৈয়ারী করা সম্ভব কিনা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান চলিতেছে।

স্থানীয় কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফল—

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে এই বৎসর আই-এ পরীক্ষায় ৪৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৫ জন এবং আই-এস্-সি পরীক্ষায় ৬২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আই-এ পরীক্ষায় ১০ জন ও আই-এস্-সি পরীক্ষায় ১৫ জন পরীক্ষার্থী কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইয়াছে। এই কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা আগামী আগষ্ট মাসে গৃহীত হইবে।

এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের শতকরা পাশের হার আই-এ তে ২৯'১ এবং আই-এস-সি তে ৪০'৩। বর্ত্তমান দুর্ব্বৎসরে স্থানীয় কলেজের সাফল্য প্রশংসনীয়; আমরা এই জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দিত করিতেছি।

উন্নয়ন বিভাগ কর্ত্তৃক বয়ন শিক্ষা ও সূতা বিক্রয়ের ব্যবস্থা—

রাজ্যের উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার জানাইতেছেন যে,—"বর্ত্তমান বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের দরুণ সূতা ও কাপড় অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে। সূতা অভাবে তাঁতিদের তাঁত প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই দুর্দ্দিনে যাহাতে তাঁতিরা তাঁত বুনিয়া নিজ নিজ পরিবারের বস্ত্র সমস্যা দূর করিতে ও কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে তজ্জন্য কুচবিহার উন্নয়ন বিভাগ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন এবং উক্ত বিভাগের বয়নশিল্প বিদ্যালয় হইতে স্বল্প মূল্যে সূতা বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছেন। যাহারা বয়নশিল্প বিদ্যালাভ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে বয়ন-বিদ্যালয়ে সুদক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে বয়নবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়।

কুচবিহার রাজ্যের বয়নশিল্পী তাঁতিগণ ও সূতা ব্যবসায়িগণ উপরোক্ত বয়ন বিদ্যালয় হইতে নিজ নিজ প্রয়োজনীয় সূতা ক্রয় করিতে পারিবেন। কোচবিহার রাজ্যের বাহিরে এই সূতা বিক্রয় করা যাইবে না।"

দেশ-বিদেশের কথা

মহাসমরের গতি—

প্রায় ছয় বৎসর কাল বিশ্বধ্বংসী সংগ্রামের পর প্রায় সর্ব্বদেশের জনসাধারণ শান্তি ও শান্তির একান্ত প্রয়াসী হইয়া পড়িয়াছে। যদিও রণক্লান্ত রাষ্ট্রগুলির আপাততঃ নূতন সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া সম্ভবপর নয় তথাপি নানা শ্রেণীর সংবাদ আলোচনায় প্রতীয়মান হইতেছে : সাময়িক ভাবে অস্ত্র যুদ্ধের অবসান হইলেও ইউরোপে স্নায়ু-যুদ্ধের এখনও অবসান ঘটে নাই ;—এখনও সন্দেহের কালো মেঘ অনিশ্চয়তা পবন-প্রবাহে ইউরোপের গগনপটে যেন কৃষ্ণ যবনিকার ছায়াপাত করিয়া তুলিতেছে। প্রাচ্য রণাঙ্গনে যুদ্ধের জের এখনও প্রবল ভাবে চলিতেছে। ইউরোপের যুদ্ধাবসানের ঘোষণার পর জাপান মিত্রশক্তির সহিত সন্ধির প্রস্তাব পেশ করিয়াছে বলিয়া যে সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল, জাপান তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। তাহারা ৩০ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া দাম্ভিকতার প্রমাণ দিয়াছে। তাহারা ব্রহ্মদেশ হইতে যে ভাবে পশ্চাদপসরণ করিতেছিল, তাহাতেই অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন জাপানীরা ব্রহ্মদেশ পরিত্যাগই সিদ্ধান্ত করিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে তাহাদের প্রতিরোধ শক্তি যেন সে অঞ্চলে ক্রমশঃ ঘনীভূত বলিয়া উপলব্ধি হইতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রণরাননও অপেক্ষাকৃত প্রচণ্ডতর হইয়া উঠিয়াছে। মিত্রপক্ষ সে অঞ্চলে যথেষ্ট সমর-সম্ভার ও সৈন্যদল প্রেরণ করিতেছে। ইহাতে মনে হয় শীঘ্রই মিত্রপক্ষ জাপানের বিরুদ্ধে কোন না কোন স্থলে প্রবল আক্রমণ চালাইবে।

ওকিনাওয়া যুদ্ধের অবসান—

এডমিরাল নিমিৎসের এক বিশেষ ইস্তাহারে প্রকাশ ৮২ দিন যুদ্ধের পর মার্কিণ বাহিনী ওকিনাওয়া দখলের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে। ওকিনাওয়া রিউকিউ দ্বীপমালার একটি প্রধান দ্বীপ এবং খাস জাপানের বৃহত্তম শিল্প-প্রধান অঞ্চল টোকিও ওসাকা ও কোবে হইতে ৪০০ মাইলেরও কম দূরে অবস্থিত। এই যুদ্ধে জাপানীরা সর্ব্বপ্রকার ক্ষয় ক্ষতি উপেক্ষা করিয়া যেরূপ প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াছে তদ্রূপ আর কোন যুদ্ধে করিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই; সুতরাং উভয় পক্ষের সমর-সম্ভার ও জনক্ষয় অপরিমিত রূপে হইয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি :—

বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—১৮) অপেক্ষা প্রায় ছেড় বৎসর অধিক স্থায়ী হইলেও এবারে ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হইয়াছে রয়টারের সংবাদে প্রকাশে যে প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মোট ৯,০৮,৩৭১ জন নিহত ও ২০,৯০২১২ জন আহত হইয়াছিল ; কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধে এপর্য্যন্ত মোট ৩,০৬৯৮৪ জন নিহত ও ৪,২২৪৭৬ জন আহত হইয়াছে। লণ্ডনে বে-সামরিক অধিবাসীর মধ্যে হতাহতের সংখ্যা—হত ২৯,৮৯০ জন এবং আহত ৫০,৪৯৭ জন।

হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড লাইনে ট্রেণ দুর্ঘটনা :—

গত ২১শে মে, রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটার সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের হাওড়া-বর্দ্ধমান কর্ড লাইনে মাঁকরামপুর ষ্টেশনের নিকট এক ট্রেণ সংঘর্ষ হয় ; ৮৩ নং আপ পার্শেল

এক্সপ্রেস ট্রেণ প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে হাওড়া হইতে ছাড়িয়া এক মালগাড়ীর পিছনে ধাক্কা মারায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। ইহাতে ঘটনাস্থলেই ১২ জন নিহত হয় এবং ৬০ জন আহত হয়। আহতদিগকে হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়। নিহতগণের মধ্যে কলিকাতা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের অধ্যাপক পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য অন্যতম ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ও শ্রমিক কল্যাণ সম্বন্ধে ডিপ্লোমা কোর্স :—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সংঘের সহযোগিতায় সাংবাদিকতা শিক্ষার একটি ডিপ্লোমা কোর্স খুলিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শীঘ্রই এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কার্য্য হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

গত ১৯৪২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ইণ্ডিয়ান জুট মিল এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় একটি শ্রমিক কল্যাণ (Labour Welfare) কোর্স প্রবর্ত্তন করেন। বর্ত্তমান বৎসর হইতে এই বিষয়ে ডিপ্লোমা প্রদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই ধরণের শিক্ষা ইহাই প্রথম। কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার, দেশীয় রাজ্যসমূহ এবং শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠানের অধীনে যে সকল শ্রমিক কল্যাণ কর্ম্মচারী কাজ করেন তাঁহারা এই ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্ত্তি হইতে পারিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-আর-এস্ বৃত্তি ও এম্-ডি উপাধি—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৪৩ সালের সাহিত্য-বিষয়ক প্রেমচাঁদ বৃত্তি সম্প্রতি প্রদান করা হইয়াছে। পুরী কলেজের অধ্যাপক শ্যামকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং কলিকাতা বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপক কালিদাস ভট্টাচার্য্য এই বৃত্তি লাভ করিয়াছেন। আমরা বৃত্তিপ্রাপ্ত অধ্যাপকদ্বয়কে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডাক্তার অমিয়ভূষণ মুখোপাধ্যায় এম্-ডি উপাধি লাভ করিয়াছেন। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যাপক ননীগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ননীগোপালবাবু প্রথম জীবনে কুচবিহার জেন্কিন্স স্কুলের ইংরাজীর প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

ডক্টর মেঘনাদ সাহার রাশিয়া গমন—

সোভিয়েট রাশিয়ার বিজ্ঞান পরিষদের ২২০তম জুবিলী উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত আহূত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর মেঘনাদ সাহা রাশিয়া গমন করিয়াছেন। এই উৎসব বিভিন্ন দিবসে মস্কো ও লেলিনগ্রাড্ নগরে অনুষ্ঠিত হইবে। মস্কো হইতে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়া অধ্যাপক সাহা বলিয়াছেন যে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে রাষ্ট্রের উদ্যোগে যে সকল পরিকল্পনা হইয়াছে তাহাদের বিবরণ ভালো করিয়া জানিয়া আসিবেন ; আমরা বিশ্বাস করি অধ্যাপক সাহার অভিজ্ঞতা ভারতবর্ষের কাজে লাগিবে।

মিঃ চার্চ্চিলের পদত্যাগ ও ইংলণ্ডে নির্ব্বাচন—

গত ২৩শে মে মিষ্টার চার্চ্চিল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। রাজা এই পদত্যাগ গ্রহণ করিয়া আবার মিঃ চার্চ্চিলকেই অস্থায়ীভাবে শাসনকার্য্য চালাইয়া যাইবার জন্য প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিল একটি সামরিক মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। ১৫ই জুন বর্ত্তমান পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ইংলণ্ডে নূতন নির্ব্বাচনের তোড়জোড় লাগিয়া গিয়াছে। রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ সাধারণ নির্ব্বাচনের জন্য আগামী

৫ই জুলাই ভোট গৃহীত হইবে এবং ২৭শে জুলাই নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হইবে। ১লা আগষ্ট নূতন পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন হইবে। শ্রমিকদল এই নির্ব্বাচনে সংখ্যাধিক্য লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। পার্লামেণ্টের মোট সদস্য সংখ্যা ৬১৬; শ্রমিক দল প্রায় ৬০০ আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

সম্রাটের জন্মদিনে খেতাব লাভ—

মহামান্য সম্রাটের জন্মদিন উপলক্ষে যাঁহারা খেতাব লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কে-সি-আই-ই উপাধি লাভ করিয়াছেন; কুচবিহার রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট মি টাইসন সি-এস-আই খেতাব পাইয়াছেন এবং লালগোলার জমিদার সুপ্রসিদ্ধ দাতা ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় "রাজা" উপাধি ভূষিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য "মহামহোপাধ্যায়" এবং মাদ্রাজের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর বিমানবিহারী দে "রায় বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছেন। আমরা ইঁহাদের সকলকেই আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাইতেছি।

বিখ্যাত বাঙ্গালী বিজ্ঞানীর পরলোকগমন—

গত ৩রা জুন বিহার গভর্ণমেণ্টের শিল্প-বিভাগের ডিরেক্টর ডক্টর এইচ, কে, সেন কলিকাতায় পরলোকগমন করেন। ডক্টর সেন ভারতের একজন বিশিষ্ট রাসায়নিক ছিলেন। ১৯২০ সাল হইতে বহুদিন তিনি কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ব্যবহারিক রসায়নের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন; ইহার পর তিনি রাঁচীতে লাক্ষা রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউটের ডিরেক্টর হন; পরে মাত্র গত বৎসর তিনি বিহার গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ডক্টর সেনের মৃত্যুতে ভারতের একজন প্রধান বিজ্ঞানীর তিরোভাব ঘটিল।

সাময়িক প্রসঙ্গ

রোল্যাণ্ড কমিটির রিপোর্ট—

বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করিয়া কিরূপে ইহার উন্নতিসাধন করা যাইতে পারে সেই বিষয়ে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত বাংলা সরকার একটি তদন্ত কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ভারত সরকারের বর্ত্তমান অর্থসচিব স্যার আচ্চিবোল্ড রোল্যাণ্ড এই কমিটির সভাপতি ছিলেন। সম্প্রতি এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। কমিটী বলেন যে বাংলার শাসন ব্যবস্থা প্রায় অচল হইবার উপক্রম হইয়াছে; কর্ম্মচারীদের মধ্যে ঘুষ ও দুর্নীতি অতিমাত্রায় বাড়িয়াছে, জনসাধারণের সহিত সরকারী কর্ম্মচারিগণের কোনরূপ যোগ নাই; কর্ম্মচারিগণ আপনাদিগকে জনসাধারণের প্রভু বলিয়া মনে করেন; ইহার ফলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল বা উন্নতি কিছুই হইতেছে না। কমিটি দৃঢ়হস্তে ঘুষ ও দুর্নীতি দমন করিবার পরামর্শ দিয়াছেন এবং সরকারী কর্ম্মচারিদিগকে প্রভুত্বব্যঞ্জক মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া জনসাধারণের সেবকরূপে দেশের প্রকৃত হিতসাধনে মনোনিবেশ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। [illegible]

কমিটি বলেন যে সরকারের সকল উদ্যম বিশেষভাবে দেশের উন্নয়নকল্পে নিয়োজিত হওয়া উচিত; দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসাধারণের শক্তিসামর্থ্য পূর্ণভাবে কাজে লাগাইয়া দেশ যাহাতে শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে সরকারকে প্রধানতঃ সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। কমিটি এইজন্য একটি উন্নয়ন বোর্ড (Development Board) স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন; এবং এই বোর্ডের হস্তে প্রাদেশিক সর্ব্ববিধ উন্নতির পরিকল্পনার ভার ন্যস্ত রাখিতে বলিয়াছেন। আমরা আনন্দের সহিত বলিতে চাহি যে প্রাদেশিক সংকীর্ণ এইরূপ কোন বোর্ড স্থাপনের বহু পূর্ব্বেই কোন কোন দেশীয় রাজ্য—যেমন কুচবিহার রাজ্য—উন্নয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে; এবং এই বোর্ডের পরিচালনায় কুচবিহার রাজ্য সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

সরকারী শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগে সমন্বয়ের অভাব দেখিয়া কমিটি প্রস্তাব করিয়াছেন যে প্রধান মন্ত্রীর হস্তে কোনও বিশেষ বিভাগের ভার (portfolio) অর্পণ না করিয়া তাঁহাকে সাধারণভাবে সরকারের কার্য্য পরিচালন ব্যবস্থায় সমন্বয়সাধনের (co-ordination) ভার দেওয়া উচিত। কমিটি চীফ্ সেক্রেটারী ও সিভিলিয়ান কর্ম্মচারিদের হস্তে আরও অধিক ক্ষমতা অর্পণের সুপারিশ করিয়াছেন। কমিটির অন্যান্য সুপারিশগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি প্রধান—(১) বিভাগীয় কমিশনারের পদ রহিত করা; (২) অধিক সংখ্যায় সাব্‌কেল অফিসার নিয়োগ করা; (৩) বিশেষ বিশেষ পদে সাম্প্রদায়িক হারাহারির পরিবর্ত্তে একমাত্র যোগ্যতা বিবেচনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রার্থী নিয়োগ করা; (৪) স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানে সরকার মনোনয়ন প্রথা রহিত করা। আমরা এই সকল সুপারিশ সমর্থনযোগ্য মনে করি।

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আই-এ, আই-এস্-সি পরীক্ষার ফল—

এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ এবং আই-এস্-সি পরীক্ষার ফল অতীব নৈরাশ্যজনক হইয়াছে। আই-এ পরীক্ষায় ৮০৮৯ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র ২০৫৬ জন এবং আই-এস্-সি পরীক্ষায় ৫৮৫২ জনের মধ্যে মাত্র ২০৫৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে; শতকরা পাশের হার আই-এতে ২৯·১ জন এবং আই-এস্-সিতে ৩৫·২ জন। পূর্ব্বে সাধারণতঃ আই-এ, আই-এস্-সির পাশের হার শতকরা ৫৫ হইতে ৬০ জন হইত; গত বৎসর এই হার কমিয়া আই-এতে ৩৩ জন এবং আই-এস্-সিতে ৪৫ জন হয়; এই বৎসর সহসা এই হার অপ্রত্যাশিতরূপে আরও অনেক কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ নির্দ্ধারণ আবশ্যক।

শোনা যাইতেছে যে ইংরেজীতে পাশের সংখ্যা অত্যন্ত কম হওয়াতেই পরীক্ষার ফলে এই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর নাকি ইংরেজীতে বহু "গ্রেস" নম্বর দেওয়া হইত; এবৎসর তাহা হয় নাই। সহসা পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তনের কি কারণ ঘটিল তাহা আমরা জানি না। অবশ্য ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা শিক্ষার বাহন হইবার পর হইতে ছাত্রগণ ইংরাজী শিখিবার উপর বেশী জোর দেয় না; এবং ইহার ফলে ছাত্রদের ইংরাজী ভাষাজ্ঞানে ক্রমাবনতি ঘটিতেছে। কিন্তু ইহার প্রতিকার করিতে হইলে দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা লইয়া স্কুলের নিম্ন শ্রেণী হইতেই ইংরাজী শিক্ষার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা দরকার; সহসা ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পাশের হার কমাইলে ইহার কোন স্থায়ী প্রতিকার হইবে না। এই প্রসঙ্গে আরও একটি ভাবিবার কথা আছে। ইংরাজী বিদেশী ভাষা; সকল ছাত্রের জন্য ২।৩ পেপার ইংরাজী

পরীক্ষা আবশ্যিক (Compulsory) না করিয়া কেবল ইংরাজী ব্যাকরণ ও রচনা (Grammar & Composition) বিষয়ে একটি আবশ্যিক পেপার রাখিয়া যাহারা ইংরাজীতে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে চাহে তাহাদের জন্য ২।৩টি ঐচ্ছিক পেপার (Optional paper) রাখিলে সকলের পক্ষেই ভাল হয়। ইহার ফলে সকল ছাত্রই ইংরাজীতে কাজ-চালানো জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ ছাত্র ইংরাজীর বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে সক্ষম হইবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

ভারতীয় মুদ্রা সংস্কার—

ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতে প্রচলিত মুদ্রা সংস্কারের এক প্রস্তাব করিয়াছেন। টাকা, আনা, পয়সা বা পাইয়ের হিসাবে যে সকল মুদ্রা চলিতেছে তৎপরিবর্তে গভর্ণমেণ্ট দশমিক পদ্ধতি অনুযায়ী মুদ্রা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন। টাকাকে আর আনা, পয়সা ও পাইয়ে ভাগ করা হইবে না। প্রতি টাকাকে এক শত সেণ্টের সমতুল ধরা হইবে। আধুলি ও সিকির আকারে ও ওজনে কোন পরিবর্তন করা হইবে না; কিন্তু আধুলি ৫০ সেণ্ট ও সিকি ২৫ সেণ্ট নামে পরিচিত হইবে; দুয়ানি, একানি, পয়সা প্রভৃতি খুচরা মুদ্রা উঠাইয়া দেওয়া হইবে; এবং ইহাদের পরিবর্তে ১০ সেণ্ট, ৫ সেণ্ট, ২ সেণ্ট, ১ সেণ্ট ও আধ সেণ্ট মুদ্রা প্রবর্তিত হইবে।

পৃথিবীর বহু দেশে—অবশ্য ইংলণ্ডে নহে—দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। হিসাবের দিক হইতে এই ব্যবস্থা সরল এবং সুবিধাজনক। একমাত্র প্রচলিত সংস্কার ও রক্ষণশীলতা ব্যতীত এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার কিছু নাই। অবশ্য প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হইতে পারে, কিন্তু এই ব্যবস্থার একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে হিসাবপত্র রাখা প্রভৃতি কাজ অনেক সহজ ও সরল হইবে। আমরা জানিতে পারিলাম যে কুচবিহার দরবার এই নূতন প্রস্তাব সমর্থন করেন।

ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রস্তাব—

ভারতের বর্তমান অচল অবস্থা দূরীকরণের নিমিত্ত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একটি প্রস্তাব করিয়াছেন; এই প্রস্তাব গত ১৪ই জুন যুগপৎ ইংলণ্ডে ও ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। রাজপ্রতিনিধি লর্ড ওয়াভেল এক বেতার বক্তৃতায় এই প্রস্তাব ভারতে ঘোষণা করিয়াছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচিত না হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালের জন্য বর্তমান শাসনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যেই একটি নূতন শাসন ব্যবস্থার কথা এই ঘোষণায় প্রচার করা হইয়াছে। কেন্দ্রে একটি নূতন শাসন পরিষদ (Executive Council) গঠিত হইবে। বড় লাট ও প্রধান সেনাপতিকে বাদ দিলে এই পরিষদ সম্পূর্ণ ভারতীয় হইবে। প্রধান সেনাপতি সমর দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সদস্যরূপে থাকিবেন। অন্যান্য সকল দপ্তরের ভার ভারতীয় সদস্যগণের উপর অর্পিত হইবে। বহির্ভারতীয় বিষয় সম্পর্কিত দপ্তর এতকাল বড়লাটের হাতে ছিল; অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তর বরাবর ইংরেজ কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত ছিল; কিন্তু বর্তমান প্রস্তাবে এই সকল দপ্তরের কর্তৃত্বও ভারতীয়দের হাতে আসিবে। অবশ্য বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুসারে বড় লাটের "ভেটো" বা নাকচ করিবার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে; কিন্তু আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে যে এই ক্ষমতা অযৌক্তিকভাবে এবং ভারতের স্বার্থরক্ষা ব্যতীত অন্য কারণে ব্যবহৃত হইবে না। প্রস্তাবিত শাসন-পরিষদ প্রধান প্রধান সম্প্রদায়গুলির প্রতিনিধি এবং সংখ্যায় বর্ণহিন্দু ও মুসলমান সদস্য লইয়া গঠিত হইবে।

ভারতের রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সহিত আলোচনার পর বড়লাট সম্রাটের অনুমোদন সাপেক্ষে নূতন শাসন পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচিত করিবেন। এই সম্বন্ধে বড়লাটকে পরামর্শ দিবার জন্য ২৫শে জুন সিমলায় বড়লাটের প্রাসাদে এক সম্মেলন আহূত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী, মিঃ জিন্না ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সহ ২২ জন নেতাকে বড়লাট আহ্বান করিয়াছেন। বর্তমানে এই সম্মেলন চলিতেছে। আমরা ইহার সাফল্য কামনা করি এবং আশা করি যে সর্বজনসম্মত একটি শাসন-পরিষদ গঠিত হইয়া দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইবে।

খেলাধুলা

কুচবিহার এসোশিয়েসন ফুটবল কাপ টুর্ণামেণ্ট—

এইবারকার খেলায় আলিপুর দুয়ার, দোমহনি, রংপুর, দিনাজপুর, ধুবড়ী, পাইবান্ধা, ডোমার, নীলফামারী, বগুড়া, নওগাঁ পাবনা এবং কুচবিহার "এ" ও "বি" দল যোগদান করিয়াছিল।

কুচবিহার এ দলটি "এ" দল দোমহনি রেল দলকে ৫-১ গোলে পরাজিত করিলে, সকলেই আশা করিয়াছিল যে, কুচবিহারদল বোধহয় কাপবিজয়ী হইতে পারে। দোমহনির সহিত খেলায় কাণ্ট একাই তিনটি গোল করে। অপর দুইটি গোল করে কিরণ ও পটলা। ক্যাপ্টেন এস রায় মেধা ও কান্তির খেলা ভাল হইয়াছিল। এই দিন বেষ্টর ব্যাক্ খেলাও ভালই হইয়াছিল।

সেমিফাইনালে বগুড়া দলের সহিত কুচবিহার দল ২-১ গোলে কতকটা অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হয়। এই দিন দলেরও কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। কেষ্ট, শঙ্কর ও ওয়েশ রক্ষিতের জায়গায় যথাক্রমে অনিল দাশগুপ্ত ব্যাকে, সতীশ হাফে ও শান্তি দত্ত লেফ্ট্-ইনে খেলে। এই দিন প্রথমার্দ্ধে শান্তি দত্ত কাণ্টকে বল না দেওয়ায় কেবল পটলাই রাইট্ আউট্ হইতে ক্রমাগত সেণ্টার করে; কিন্তু কিরণ, শান্তি, ক্যাপ্টেন রায় কেহই গোল করিতে করিতে পারেন না। ২-০ গোলের সময় অবকাশ হয়। দ্বিতীয়ার্দ্ধে ক্যাপ্টেন রায় লেফ্ট্ ইনে খেলেন ও কাণ্টকে বল দিতে থাকেন। কাণ্ট একটি জোড় কিক্ করিলে—বিপক্ষদলের ব্যাকের গায়ে লাগিয়া গোল হয়। ক্যাপ্টেন এস রায় বারের উপর দিয়া 'শট্' করায় একটি অব্যর্থ গোলের সুযোগ নষ্ট হয়। কিরণ ও পটলা যথেষ্ট সুযোগ পাইলেও গোল করিতে পারে নাই। শান্তি দত্তের খেলা নৈরাশ্যজনক হইয়াছিল। মেধা ও কান্তি ভালই খেলিয়াছিল।

নওগাঁদল, দিনাজপুর, পাবনা ও ধুবড়ী দলকে পরাজিত করিয়া এবং বগুড়াদল ডোমার ও কোচবিহার দলকে পরাজিত করিয়া ফাইন্যালে উঠে। ফাইনাল খেলায় বগুড়াদল অনায়াসে নওগাঁদলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে। বগুড়াদল পরপর দুইবার এই কাপ বিজয়ী হইল। খেলার শেষে জয়পুর মহারাণী শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবী বিজয়ীদলকে পুরস্কার প্রদান করেন। শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র বসু মহাশয়ের খেলা-পরিচালনা নির্ভুল হইয়াছিল।

এবার শ্রীশ্রীমহারাজ ভূপ বাহাদুরের অনুপস্থিতি দর্শকগণ ও প্রতিযোগী দলগুলি বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছিল

বিদেশী দলগুলির আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থার কোনও সমালোচ দলগুলির নিকট হইতে শোনা যায় নাই। মহারাজার ক্রীড়া সম্পাদক শ্রীযুক্ত ডি, গুহ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় (পাগলু বাবু) ও শ্রীযুক্ত সুশীল চন্দ্র গুহ বিদেশী দলগুলির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন।

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতা—

কলিকাতা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথমার্দ্ধের খেলা সম্প্রতি শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহাতে ভবানীপুর দল শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে; মোহনবাগান, ইষ্ট বেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং প্রভৃতি নামডাকা দল এবারে ভবানীপুরের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। ভবানীপুর দলের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্বের কথা এই যে এই দল প্রথমার্দ্ধের খেলায় কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করে নাই; প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অপরাজিত রহিয়া গিয়াছে।

সূচীপত্র

	বিষয়		লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	জয়দেব	(প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর এম্-এ	১৩১
২।	শিক্ষার পথ-সঙ্কট	(প্রবন্ধ)	শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত	১৩৬
৩।	কবিগুরু স্মরণে	(প্রবন্ধ)	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	১৩১

নিবেদন :—

স্বাস্থ্যই সুখের মূল, শরীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হওয়ার জন্যই রোগ দেখা দিয়া থাকে, সেজন্য বুদ্ধিমান লোকে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন, নতুবা সামান্য ব্যাধি পরে কষ্টদায়ক—এমন কি প্রাণঘাতীও হইতে পারে।

যাহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণে সহজেই রোগমুক্ত হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সিটী মেডিক্যাল ষ্টোর, জলপাইগুড়ি সর্ব্ব প্রকার দেশী বিদেশী ঔষধ, রোগীর পথ্য, শিশুর খাদ্য ও পেটেন্ট ঔষধ বাজার চলতি দরে আমদানী ও সরবরাহ করিতেছেন।

সিটী মেডিক্যাল ষ্টোরে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত থাকিয়া সমাগত রোগীগণের পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যাহাতে দেশবাসী অনায়াসে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসার সুবিধা পান ইহাও সিটী মেডিক্যাল ষ্টোর কর্তৃপক্ষের অন্যতম উদ্দেশ্য।

জন সাধারণ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদের শ্রম সার্থক করুন ইহাই আমার নিবেদন।

ডাঃ এ, লতিফ।

জমি বিক্রয়।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে চড়চকা সাকিন্থ আমার ১৮ বিঘা খাস মহলের জমি বিক্রয় করা হইবে। জমি সহরের নিকটে এবং নাটাবাড়ী ও তুফানগঞ্জ যাইবার বড় রাস্তার সংযোগস্থল হইতে ২৫ গজ দূরে নাটাবাড়ী যাইবার রাস্তার উপরে। সহরে থাকিয়া সর্ব্বদা জমীর তদ্বির করিবার সর্ব্বপ্রকার সুবিধা আছে। বিশেষ বিবরণের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় খোঁজ করুন।

নিউ টাউনে হরিসভার পার্শ্বে বাড়ী করিবার উপযুক্ত ।১০/০ ধুর জমি বিক্রয় হইবে।

বিনীত—

শ্রীসরোজকুমার চট্টোপাধ্যায়,

(রাজমাতার ঠাকুর বাড়ী সম্মুখে)

মালিনী হোমিও হল।

কোচবিহার।

সূচীপত্র

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
৪।	কা-না-চৌ	(গল্প)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	১৫৭
৫।	মৌচাক	(কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	১৫৩
৬।	তোমার বিরহ মোর এলো কাছে (কবিতা)		শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	১৫৪
৭।	ইটালি পাওনার কথা (প্রবন্ধ)		অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ	১৫৫
৮।	হাস্যরসে কবিশেখর কালিদাস রায় (প্রবন্ধ)		অধ্যাপক শ্রীবিভূতিবিহারী ভট্টাচার্য এম-এ	১৬০
৯।	শ্রাবণ ঘন বরিষণ মেঘ (কবিতা)		শ্রীকিংশেখর গুপ্ত	১১৪
১০।	বনফুল	(কবিতা)	শ্রীসাধনা গুহ বি-এ	১২৪
১১।	রাজপরিবারের সংবাদ		...	১৬৫
১২।	স্থানীয় সংবাদ		... ...	১৬৭
১৩।	দেশবিদেশের কথা ...		...	১৬৮
১৪।	সাময়িক প্রসঙ্গ		... ...	১৭১
১৫।	খেলা-ধূলা		...	১৭৩

বিজ্ঞাপন।

"কোচবিহার রাজ্যস্থিত মাথাভাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ, দিনহাটা ও সদর সবডিভিজন ভুক্ত ব্রহ্মোত্তরের জোত আদি সম্পত্তি বিক্রয় করা হইবে, আবেদন করুন। ১১৫ নং ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।"

শ্রীনিখিলনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,
নায়েব, বড়কুঠি
কুচবিহার।

কোচবিহার বিখ্যাত শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহার
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ কয়েকটী শাস্ত্রীয় মহৌষধ।

রেজেষ্টরী করা

ধন্বন্তরী পাচন

সর্বপ্রকার জ্বরের অমোঘ মহৌষধ মূল্য প্রতি বোতল ২৷৷০ দুই টাকা চারি আনা, মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

গরুড় মার্কা

শ্বাসশান্তি রস

হাঁপানী ও খাঁক কাসের সদ্য ফলপ্রদ মহৌষধ মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

গোবিন্দসুধা— আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রোক্ত পরম রসায়ন। সেবনে বলপুষ্টি বর্দ্ধিত এবং বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা। ডাকে লইলে মাশুলাদি স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

পিত্তশূল সুধা— ইহা পিত্তশূল, অম্লশূল ও অজীর্ণ রোগের মহামহৌষধি। সেবনে বুকজ্বালা, চোঁয়া ঢেকুর উঠা অজীর্ণ, পেট ফাঁপা পিত্ত ঘটিত পেট ব্যাথা, অগ্নিমান্দ্য, আহারের পর বমি প্রভৃতি এবং অম্লশূল ও অম্ল পিত্তশূল আরোগ্য হয় মূল্য ২৷৷০ টাকা। ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র।

কলেরা কিওর— কলেরা, উদারময়, পেট ফাঁপা অগ্নিমান্দ্য ও সূতিকা প্রভৃতি রোগে সদ্য ফল প্রদ অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ২৲ দুই টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

নেত্র সুধা— চক্ষু রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। ব্যবহারে চক্ষুউঠা, চক্ষু দিয়া জল পড়া, বেদনা, ছানি দোষ, ঝাপসা দেখা প্রভৃতি চক্ষু রোগ সত্বর আরোগ্য হইয়া দৃষ্টিশক্তি প্রখর করে। মূল্য ১৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান:—

শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহা,

কাঁইয়াপাটি, কোচবিহার।

কে, এম, সরকারের

'ক্ষতবিনাশন'

সর্ব্বপ্রকার ক্ষতের অব্যর্থ মহৌষধ।

শয্যাক্ষত, ব্রণের ঘা, অস্ত্র ক্ষত, স্তনের ঘা, নাসা ক্ষত, মাথার ঘা, পোড়ার ঘা, আঙ্গুলহাড়া, কাটা ঘা, নালী পচা ঘা, ঘোড়ার ঘা, পৃষ্ঠাঘাত, বিষাউজ (বিচ্‌কু) ঘা, পাচড়া, পাপড়ি ঘা, বাঘীর ঘা, দূষিত ঘা ইত্যাদি যত দিনের যে কোন প্রকার ঘা হউক না কেন বিনা যন্ত্রণায় অল্প সময়ের মধ্যে আরোগ্য হইবে। এই ঔষধ নির্দ্দোষ উপাদানে প্রস্তুত।

এজেন্ট—মুখার্জ্জী এণ্ড সন্স, কোচবিহার।

প্রোঃ—কে, এম, সরকার এণ্ড সন্স, হেড্ অফিস :—মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার।

স্থাপিত ১৮৭৩ ইঃ

অফিস এবং কারখানা ৩৫/১, হ্যারিসন রোড

শো-রুম ৭৮, হ্যারিসন রোড কলিকাতা

রায় ব্রাদার্স

কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম লিথিবার কালি প্রস্তুতকারক

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

আমাদের কারখানায় সুলতে সকল প্রকার লিথিবার কালি, রবার ষ্ট্যাম্প, পিতলের সিলমোহর, সাপরাস, ডাই, কপারপ্লেট ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

নোটীশ।

এতদ্দ্বারা দি কুচবিহার ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন লিমিটেডের ১৫৩ ধারার অন্তর্ভুক্ত আমানতকারীগণকে জানান যাইতেছে যে তাঁহারা তাঁহাদিগের আমানতি টাকা অত পর সম্পূর্ণ উঠাইয়া লইতে পারিবেন এবং ইচ্ছা করিলে পুনরায় নূতন স্থায়ী, অস্থায়ী বা সেভিংস্ ব্যাঙ্ক হিসাবে জমা রাখিতে পারিবেন। তাঁহারা উক্ত টাকার সুদ নির্দ্দিষ্ট হারে পাইতে থাকিবেন।

সুদের হার :—দ্বিবার্ষিক স্থায়ী আমানতে বার্ষিক শতকরা ৪৲ হিঃ এক বৎসরের স্থায়ী আমানতে বার্ষিক শতকরা ৩৲ হিঃ সেভিংস ব্যাঙ্ক ২৲ হিঃ অস্থায়ী আমানতে বার্ষিক শতকরা ১৸০ হিসাবে সুদ দেওয়া হয়।

শ্রীমনোমোহন চৌধুরী, ম্যানেজার।

দি, কুচবিহার ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন লিঃ।

রবীন্দ্রনাথ

কোচবিহার দর্পণ

"তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।"

—রবীন্দ্রনাথ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

অষ্টম বর্ষ | শ্রাবণ ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ | ৪র্থ সংখ্যা

জয়দেব

অধ্যাপক শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র রায় বাহাদুর এম্-এ

কবিশিরোমণি শ্রীজয়দেবের কথা পুরাতন। কিন্তু পুরাতন হইলেও জয়দেব চিরনূতন। জয়দেবের বহু আলোচনা হইয়াছে, হইবে৩০ বহু। তাহার কারণ জয়দেব বাংলা কবিতাধারার মূল প্রস্রবণ। বাংলার এক ক্ষুদ্র পল্লী কেন্দুবিল্ব, সেই পল্লীর কবি নিভৃতে যে গীত গাহিয়া গিয়াছেন তাহা এই অষ্ট শতাব্দী ধরিয়া বাঙ্গালীর প্রাণ মাতাইয়া রাখিয়াছে। জয়দেব হইতেই বাঙ্গালীর গীতিকবিতা। সেই 'কোমলকান্ত পদাবলী' সুরতানলয়ে কীর্তনেরও জন্মদান করিয়াছিল। বৈষ্ণব-গীতিকবিতার তুলনাও সারা বিশ্বে মিলে না, কীর্তনের মত এমন ললিতকোমল, মদিরা-তরল গানও জগতে দুর্লভ। এই জন্য সমস্ত সভ্য জগতে জয়দেবের সমাদর। ইংলণ্ডে Sir Edwin Arnold জয়দেবের কবিতার ঝঙ্কারে এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার ইংরেজি কবিতার সঙ্গে "মা কুরু ধানিনি মানময়ে" বুনিয়া দিয়াছেন। জার্মাণ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় গীতগোবিন্দের অনুবাদ হইয়াছে।

কেহ কেহ অনেক সময় গীতগোবিন্দকে অনুপ্রাস-বহুল শব্দালঙ্কারপ্রধান কাব্য বলিয়া একটু উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। আমরা অলঙ্কারশাস্ত্র হইতে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহার এমন সহজ প্রয়োগের সুযোগ কি পরিত্যাগ করিতে পারি? কিন্তু এরূপ নিশ্চিন্ত মনে আমরা যে সিদ্ধান্ত করি, তাহার মূলে যে

কত বড় অবিচার আছে তাহা ভুলিয়া যাই। আমরা ভুলিয়া যাই যে, জয়দেবের গীতগোবিন্দ একখানি পদানুগতিক ধরণের কাব্য নহে। কালিদাসের সমস্ত কাব্যসৃষ্টির মধ্যে মেঘদূত যেমন মৌলিকতায় এখনও বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করে, জয়দেবের এই গীতিকবিতা তেমনি একখানি মৌলিক কাব্য। ইহার তুলনা প্রাচীন সাহিত্যে বিরল—গীতিকবিতা হিসাবেও বটে, সুরলয়যুক্ত গান হিসাবেও বটে। কালিদাসের প্রসিদ্ধ কাব্য বিক্রমোর্বশীতে কয়েকটি অন্ত্যমিলযুক্ত গান আছে; গানগুলি প্রাকৃতে রচিত, প্রায়ই চর্চরী জাতীয়। কিন্তু জয়দেবের গীতগোবিন্দে ছন্দঝঙ্কারময়ী যে অনবদ্য গীতিকবিতা আমরা পাই, তাহার তুলনা কোনও দেশের সাহিত্যে মিলে না। আধুনিক সমালোচকের বিচারে যদি এই অতুলনীয় মাধুর্য প্রথমশ্রেণীর কাব্যোৎকর্ষ বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলেও মৌলিক স্রষ্টা হিসাবে জয়দেবের স্থান অনতিক্রম্য বলিয়া নিশ্চয়ই স্বীকৃত হইবে। জয়দেব বাংলা কবিতার আদি গুরু। বাংলা কবিতার ছন্দ, প্রকাশভঙ্গী, অনুপ্রাস, কোমলতা ও মধুর সবই জয়দেবের বরহস্তের অমূল্য দান। জয়দেব তাঁর সংস্কৃত পদাবলীতে যে সুরে সুর বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন, বাংলা কাব্যলক্ষ্মীর বীণায় তাহাই আজ পর্যন্ত অনুরণিত হইতেছে।

জয়দেবকে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা কি ভাবে অর্চনা করিয়াছেন, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায় যে, বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁহার স্থান কত উচ্চে:

জয় জয় জয়- দেব দয়াময়
পিরীত রতনখনি।
পরম পণ্ডিত পূজ্য গুণগণ-
মণ্ডিত চতুর মণি॥

* * *

পদ্মাবতী সহ গানে নিক্ষেপ
আনে কি উপমা পাছে।
পশু পক্ষী মুগে শুনিয়া গন্ধর্ব
কিন্নর মরয়ে লাজে॥

—নরহরি দাস।

এই কবিদম্পতি যে গানে অদ্ভুত প্রতিভাশালী ছিলেন, তাহা 'সেক শুভোদয়া' হইতেও জানা যায়। সেক শুভোদয়া সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে লিখিত। সেক শুভোদয়ায় একটি গল্প আছে যে বটুক মিশ্র নামে এক দিগ্বিজয়ী গায়ক লক্ষ্মণ সেনের রাজসভায় আসিয়া জয়পত্র লিখিয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু পদ্মাবতী ও জয়দেব এই দিগ্বিজয়ীকে গানে পরাস্ত করিলেন। গীতগোবিন্দের 'পদ্মাবতীচরণ-চারণ-চক্রবর্তী' দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে, জয়দেবের মনোহর গীতের সঙ্গে পদ্মাবতী নৃত্য করিতেন অথবা উভয়েই নৃত্যগীতের দ্বারা কৃষ্ণের উপাসনা করিতেন।

ভক্তমালে এবং বনমালী দাসে: জয়দেব চরিত্রে জয়দেব সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী ও অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। তাহার মধ্যে একটি প্রবাদ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। জয়দেবের গীতগোবিন্দের একটি পদ ভগবান নিজে পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন। জয়দেব 'স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং' পর্যন্ত লিখিয়া অবশিষ্টাংশ লিখিতে কুণ্ঠিত হইলেন

কৃষ্ণ চাহে পাদপদ্ম মস্তকে ধরিতে।
কেমনে লিখিব ইহা বিষম বড় চিতে॥

কিন্তু ভগবান সে সংশয়ের অবসান করিয়া দিলেন: নিজ পদ্মহস্তে লিখিয়া দিলেন:

দেহি পদপল্লবমুদারম্।

উপরে নরহরি দাসের যে পদটি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতেও আছে :

যার বিরচিত শ্রীগীতগোবিন্দ
এছ সুকৌশল তাতে।
গোবিন্দ আনন্দে 'দেহি পদপল্লব'
আদি বর্ণিলেন যাতে॥

এই সকল কিম্বদন্তী ও প্রবাদ হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, কবির স্বরচিত ভক্তিভাবের উৎস ছিল এবং তাঁহার সমকালে এবং পরবর্ত্তী কালেও জয়দেবের ন্যায় ভক্ত কবি বেশী জন্মগ্রহণ করেন নাই। বাঙ্গালীর মনের স্বাভাবিক ভাবালুতা ও রসপ্রবণতা জয়দেবের কবিতার স্বচ্ছ মুকুরে প্রথম আপনার রূপ দেখিল। বাস্তবিক এমন রূপ ও রসের পসরা লইয়া ইহার পূর্ব্বে বাংলা দেশে কোনও কাব্য আবির্ভূত হয় নাই। বাঙ্গালীর প্রতিভা সাধারণতঃ গীতিকবিতাধর্ম্মী। যে lyric মাধুর্য্য গ্রীকসাহিত্যে পাওয়া যায়, জর্ম্মাণ কবি হাইনের মধ্যে যে রসটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ কবি শেলির মধ্যে যে রসের আভাস মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, তাহারই মধ্যে বাঙ্গালীর কাব্য-প্রতিভার স্বাভাবিক বিলাস দেখিতে পাওয়া যায়। জয়দেবই সেই যাদুকর শিল্পী যিনি রূপে রসে মজাইয়া তাঁর অনুপম চিত্র আঁকিয়াছিলেন।

কাব্যে যতপ্রকার রস আছে, তাহার মধ্যে শৃঙ্গার রসই মুখ্য। বিশ্বের সমস্ত কাব্য ও কবিতার মধ্যে এই শৃঙ্গার রস ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে। সার্ব্বজনীন প্রীতির আস্পদ বলিয়াই শৃঙ্গার রসের নাম মধুর রস। কিন্তু জয়দেব এই মধুর রসকে যে ভাবে পরিবেশন করিয়াছেন তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কেহই সেরূপ পারেন নাই। বস্তুতঃ ভগবান্‌কে মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গার রস রূপে কল্পিত করিয়া তিনি যে ভক্তিভাব ও সাহিত্যরসের মধ্যে এক স্বর্ণশৃঙ্খল নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার। মনে রাখিতে হইবে যে, জয়দেবের কাব্য ধর্ম্মগ্রন্থ নহে, অর্থাৎ মন্ত্রসংহিতাও নয়, ভগবদ্গীতাও নয়। গীতগোবিন্দ কাব্য; কাব্যেই ইহার প্রধান সম্পদ্। অথচ তাহার মধ্য দিয়া একটি স্বচ্ছন্দ অনুসঙ্গিনী প্রবাহরূপে ভক্তিভাবের ফল্গু ধারা তিনি কেমন করিয়া বহাইলেন, তাহা চিরদিন ভাবুক-মনের বিস্ময়ের বস্তু হইয়া থাকিবে। তিনি যে 'মঙ্গলমুজ্জ্বল গীতি' গাহিয়া গিয়াছেন সেই উজ্জ্বল রসই বৈষ্ণব-কাব্য, বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের সারকথা হইয়া রহিয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে জয়দেবের কাব্যে এই আদি-রসাধিকা শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই সমালোচনা নিছক রুচির উপর নির্ভর করিতেছে। কাব্যের নিয়ামক পরিবর্ত্তনশীল রুচি নহে, খেয়াল নহে, অলঙ্কার শাস্ত্রের ধরাবাঁধা নিয়ম। কাজেই কাব্যের রসসৃষ্টির প্রয়োজনে, অলঙ্কারশাস্ত্রের শাসনে জয়দেব যে চিত্রকাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা সাময়িক রুচির দ্বারা বিচার্য্য নহে। হিন্দুসাম্রাজ্যের অস্তগমন কালে শেষ অকর্ম্ম নরপতির রাজসভার রুচি যদি বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর রুচির দ্বারা সমর্থিত না-ও হয় তাহা হইলেও জয়দেবের অনন্যসাধারণ সৃজনীপ্রতিভার বিলাস ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

গীতগোবিন্দ আদিরসপ্রধান হইলেও জয়দেব যে সহজিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, তাহা বুঝা যায় তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই। তিনি বলিতেছেন যে,

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীম্॥

—গীতগোবিন্দ ১ম সর্গ

সুতরাং জয়দেব যে আদিরসের জন্যই আদিরস সৃষ্টি করেন

নাই, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তিনি গ্রন্থশেষেও এই কথা বলিয়া উপসংহার করিতেছেন :

যদগান্ধর্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্।
তৎসর্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ॥

হে সুধী সজ্জনগণ! যদি সঙ্গীত-শাস্ত্রোক্ত গীতরাগ-তালাদিতে কৌশল, সর্বব্যাপী বিষ্ণুর অনুধ্যান, কাব্যকথায় লীলাতি শৃঙ্গারতত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের বাসনা থাকে, তবে কবি জয়দেব পণ্ডিতের এই শ্রীগীতগোবিন্দ হইতে আনন্দ সহকারে তাহা লাভ করিয়া আশঙ্কাপঙ্ক হইতে বিমুক্ত হউন (পরিশোধয়ন্তু), কারণ জয়দেবের আত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত একতান, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান।

সহজিয়া সম্প্রদায় অনেকটা বৈষ্ণব ভাবধারা অনুসরণ করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ভজন-প্রণালী কিছু ভিন্ন প্রকার। বৈষ্ণবেরা যেমন রাধাকৃষ্ণলীলাকে সর্বপ্রকার কামগন্ধবিবর্জিত ভাবে গ্রহণ করিবার প্রয়াসী, সহজিয়ারা তাহা নহেন। তাঁহাদের সহজসিদ্ধি বা সহজানন্দ যৌন প্রবৃত্তির একান্তবর্জননিষ্ঠ নহে। জয়দেবের মত যে ইঁহাদের অনুকূল ছিল না, তাহা বুঝা যায় শ্রীচৈতন্যের অনুরাগ হইতে। শ্রীচৈতন্য যে জয়দেবের কাব্যের অনুরাগী ছিলেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। চৈতন্যের প্রিয় পার্ষদ আজীবন ব্রহ্মচারী, সুপণ্ডিত, রসজ্ঞ ও ভক্ত স্বরূপ দামোদর জয়দেবের পদাবলী গান করিয়া চৈতন্য-দেবকে তাঁহার দিব্যোন্মাদ দশায় আনন্দ দান করিতেন। এই জন্য অদ্যান্ত বৈষ্ণবমহাজনগণের অগ্রণী রূপে জয়দেব এখনও বঙ্গদেশে পূজিত হইয়া থাকেন।

শিক্ষার পথ-সঙ্কট

শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

জন্মাবধি আমরা শুনে আসছি স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখছি ভূমিষ্ঠ হওয়ার মুহূর্ত্ত থেকেই মানুষের সর্ব্ববিধ অধীনতার সূত্রপাত। দৈহিক স্বাধীনতা, অর্থাৎ ইচ্ছামত চ'লে ফিরে বেড়াবার শক্তি, অর্জ্জন করতে যেখানে গোবৎসের মাত্র কয়েক ঘণ্টা লাগে, হয়ত উচ্চস্তরের জীব ব'লেই, মানবশিশুর সেই প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকু অর্জ্জন করতেও কয়েক বৎসর অতীত হয়। মানুষের প্রতি প্রকৃতি প্রথম থেকেই এমন অকরুণ। কেবল কাঁদবার শক্তিই বুঝি মানুষের সহজাত ও জন্মগত। বাকি সবই তাকে শিখে নিতে হয়,—দেখে ও ঠেকে। দেখতে দেখতে, ঠেকতে ঠেকতে মানুষ হাজার হাজার বৎসর ধ'রে নানা শিক্ষায় শিক্ষিত ও নানা দীক্ষায় দীক্ষিত হ'য়ে সভ্যতার বিবর্ত্তন-পথে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে জন্মান্তরিত হ'তে হ'তে আজ এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে—যেখানে সে আষ্টেপৃষ্ঠে নিজের কৃতকর্ম্মের নিগড়ে বাঁধা প'ড়ে গেছে। অন্নে, বস্ত্রে, খেলায়, সাধনায়ই তার বন্ধন। সংসার তাকে বেঁধেছে, সমাজ তাকে বেঁধেছে,

রাষ্ট্র তাকে বেঁধেছে, ধর্ম্মও তার বন্ধন বাড়িয়ে চ'লেছে। শিক্ষা মানুষকে তার জন্মগত অধিকারে কতখানি অগ্রসর ক'রে দিয়েছে, সে পরিচয় আজ জগৎব্যাপী মহাবিপ্লবে নিতান্ত নির্ম্মমভাবে প্রকট হ'য়ে প'ড়েছে। স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে—বিশ্বমানব যুগযুগান্তর শিক্ষা পেয়েও তার অভীপ্সিত পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হ'তে পারেনি,—যে পথে সে আশা করেছিল আত্মার স্বাধীনতা, শান্তি ও কল্যাণ মিল্‌বে।

এসব অবশ্য বড় কথা, সাধারণের সর্ব্বমানবের অন্তর্নিহিত মর্ম্মকথা। হতভাগা ভারতের কথা আজ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। দীর্ঘদিনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে ভারত উপলব্ধি ক'রেছে—যে পথে আজ পর্য্যন্ত তার শিক্ষা চ'লে আস্‌ছে তা ভুলপথ, দাসত্বের রাজপথ। সে পথে কোন দিন চিন্তায় ও কর্ম্মে স্বাধীনতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না। আত্মিক স্বাধীনতা, শান্তি ও কল্যাণের কথা দূরে থাক্—ঔদরিক স্বাধীনতা শান্তি ও কল্যাণও এখানে একান্ত দুর্ল্লভ। এখানকার ও এখনকার স্বাধীনতা ব'লতে—বাঁধা গরুর চ'রে খাবার, খুঁটে খাবার স্বাধীনতা; শান্তি ব'লতে—ক্ষুধাশান্তি; কল্যাণ ব'লতে—পেটের কল্যাণ। ভারতের শিক্ষিতসাধারণ তার লব্ধশিক্ষার ফলে এই নিতান্ত সীমাবদ্ধ আদর্শের পথেও নিজের নিজের চ'রে খাবার খুঁটে খাবার শক্তি অর্জ্জন করে নি। দেশব্যাপী অর্দ্ধাশন অনশন মহামারীর মধ্যে আমাদের শিক্ষা কোন্ আশার বাণী বহন ক'রে আনে? দুর্ভিক্ষের মৃত্যুতাণ্ডবে আমাদের শিক্ষা কোন্ কাজে লাগ্‌ল? নগ্নদেহ নিরন্ন জাতি আজ ছুটে চ'লছে অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের পথে, কে তাকে রোধ করবে? ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, যা কিছু মানুষের লক্ষ্য হ'ক, তাকে খেয়ে-প'রে বেঁচে থাকতে হবে আগে। খাওয়াপরার স্বাধীনতা নিরন্নরের কথা বটে, কিন্তু সেই স্তরেই আছে বৃহত্তর স্বাধীনতার মূল, জীবনরসের যোগান্। এই খাওয়া-পরা বা অন্নবস্ত্রের সমস্যা সার্ব্বজনীনভাবে দূর করবার উপায় এদেশের শিক্ষার মধ্যে নেই, সুতরাং এপথে চ'লে স্বাধীনতার সন্ধানও মিলিবে না।

খাওয়াপরা সমস্যার সমাধান প্রতীচ্যদেশ সুষ্ঠুভাবেই ক'রেছিল। মানুষকে না খেয়ে মরতে হবে না এমন শিক্ষার ব্যবস্থা সে সব দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ থেকে হ'য়েছে। তবুও তাতে মানুষের প্রার্থিত স্বাধীনতা ও কল্যাণ আসে নি। কারণ সে ব্যবস্থা মূলতঃ কেড়ে খাওয়ার ব্যবস্থা। একশ্রেণী অপর শ্রেণীকে শোষণ ক'রে, একজাতি অপরজাতিকে শোষণ ক'রে কি উপায়ে অন্নবস্ত্রের সমস্যা দূর করা যায় সেই শিক্ষাই তারা দিয়ে এসেছে। বিড়ালমাতা যে পদ্ধতিতে তার শাবকদের শিকারকৌশল শিক্ষা দেয় এ যেন সেই পদ্ধতি। তারই ফলে আজ বিশ্বব্যাপী কুরুক্ষেত্র এখনও ধূমায়িত।

সুতরাং অন্নবস্ত্রের সমাধানরূপ শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবতে গিয়েও আমাদের মনে আসে, পরস্পর কাড়াকাড়ি ক'রে খাওয়ার যে শিক্ষা তাতে প্রকৃত স্বাধীনতা, শান্তি বা কল্যাণ আসবে না। সে পথ প্রত্যক্ষ হিংসার পথ। তার একপ্রান্তে উৎকট দেশাত্মবোধ, অপর প্রান্তে সর্ব্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদ। মানবজাতির পক্ষে এটি পথ নয়, মহাপথ। পশ্চিম ঘরে ও বাহিরে যে শিক্ষা প্রবর্ত্তিত ক'রেছে, উভয়ই মানুষের সমান অকল্যাণকর।

কেড়ে খাওয়ার পথ যদি ছাড়তেই হয়, তবে ভাগ ক'রে খাওয়ার পথই ধ'রতে হবে। সকলের প্রয়োজনমত দ্রব্য যথেষ্ট উৎপাদন ক'রে সকলে ভাগ ক'রে খাবে—প্রতীচ্যশিক্ষার প্রতিক্রিয়ারূপে উদ্ভাবিত এই নূতন পথে সোভিয়েট রাষ্ট্রতন্ত্রের শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। রাশিয়ার

নূতন শিক্ষা দেশথেকে সার্ব্বজনীন দারিদ্র্য দূর করেছে বা অদূর ভবিষ্যতে করবে, এতে আর সংশয় নেই। কেউ রাজা কেউ ফকির হয়ে জন্মায়—সে তার পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফলে—এই শিক্ষা মানুষকে চিরকাল পঙ্গু ক'রে রেখেছিল। সোভিয়েট শিক্ষা দেশের দুর্গত সাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছে, দেখিয়ে দিয়েছে,—রাজা ফকিরের পার্থক্য মানুষের ইহকালের কর্ম্মদোষেই ঘটে আসছিল, পূর্ব্ব বা পরকালের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাই সে দেশে অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু এই ভাগ ক'রে খাওয়ার ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আর একটি বিধানও প্রচলিত। সেটি হচ্ছে—উৎপন্নকারীদের উদ্ভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থায় যারা কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করবে, তাদের সমূলে বিনাশ করার বিধান। এ ব্যাপারে আপোষের কোন স্থান নেই; এই বিধি ঐতিহাসিক ভিত্তিতে গাণিতিক সত্যরূপে সেখানে গৃহীত হ'য়েছে। উদ্দেশ্য মহৎ সন্দেহ নেই, কিন্তু পথ সেই হিংসারই পথ। এর প্রতিক্রিয়া কবে কিভাবে জগৎকে আঘাত করবে তা ভাবীকালই বলতে পারে।

Aldous Huxley বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি জগতের আদিযুগ হতে আধুনিকতম কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত বহুবিধ সমাজ ও রাষ্ট্রতন্ত্রের আলোচনা ক'রে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে বিশ্বমানবের প্রকৃত স্বাধীনতা শান্তি ও কল্যাণ একমাত্র অহিংসার পথেই সম্ভব। যুগে যুগে এর পরীক্ষা হ'য়েছে, আজও হচ্ছে। সম্রাট অশোকের সময় রাষ্ট্র এই অহিংসাবাদকে জনশিক্ষার মূলনীতিরূপে গ্রহণ করায় জগতে স্থায়ী কল্যাণ স্থাপিত হবার সম্ভাবনা যেমন ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল, এমন আর কোন যুগে হয় নি। জগতের দুর্ভাগ্য যে অশোক সেই মহৎভার বহন করবার উপযোগী কোন উত্তরাধিকারী বা কর্ম্মীসঙ্ঘ গ'ড়ে যেতে পারেননি। তা যদি পারতেন তবে হয়ত জগতের রূপ চিরদিনের মত বদলে যেত। Huxley আরও বলেন যে আজ পর্য্যন্ত জগতে বহু সাধু মহাপুরুষ ও বহু অদ্ভুতকর্ম্মা বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য মহাপুরুষমাত্রই অবৈজ্ঞানিক, আর বৈজ্ঞানিক কেইই মহাপুরুষ নন। এই বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের পূর্ণসমন্বয় যে মহামানবের মধ্যে হবে তিনিই সম্পূর্ণ অনাসক্ত অথচ বিজ্ঞানদীপ্ত চিত্ত নিয়ে প্রকৃত শিক্ষার মধ্য দিয়ে জগতে শান্তি ও কল্যাণের পথ দেখাতে পারবেন। এই আদর্শে বিচার কোরে হাকস্‌লি দেখিয়েছেন—সাম্যবাদ জগতে স্থায়ী কল্যাণ আনতে পারবেনা; সেও হিংসাশ্রয়ী আসক্তির পথেরই নির্দ্দেশ দিচ্ছে। হাকস্‌লীর বক্তব্য বিচার ক'রে দেখলে অন্ততঃ একথাটা বেশ বুঝা যায় যে বিজ্ঞানবিদগণ যদি সাধুবুদ্ধিসম্পন্ন ও অনাসক্তচিত্ত হ'তেন তবে তাঁদের দিয়ে এত মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হত না। অপরপক্ষে ভগবৎকল্প সন্তদের বাণীর মধ্যে এমন সকল প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা বে-মালুম মিশিয়ে থাকে যে, যে কোন বিচারবুদ্ধিপ্রধান মানবচিত্তকে তা একেবারে বিমুখ করে দেয়।

বুদ্ধের চরণস্পর্শপূত এই দেশেই আমাদের এই ঘোর দুর্দ্দশা ও দুর্ভাগ্যের যুগেই আর একজন মহাপুরুষ আর একবার মানুষকে হিংসার পথ থেকে অহিংসার পথে ফিরিয়ে আনবার সাধনায় মগ্ন। রাষ্ট্র তাঁর অনুকূল নয়; তাঁর সিদ্ধি আজিও মরীচিকাধর্ম্মী। তবু তাঁর আশা ও প্রয়াসের অন্ত নেই। কিন্তু তিনিও হাকস্‌লি-প্রার্থিত বিজ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন সাধু নন। তিনি Miracleএ বিশ্বাসী; ভূমিকম্পের কারণ নির্দ্দেশ করতে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের অনির্দ্দেশ্য পাপের সন্ধান পান।

তবে আমাদের গতি কি? প্রতীচ্য তার কেড়ে-খাওয়ার শিক্ষায় আস্থা রেখে আজও শান্তিহারা; সুখের সন্ধানে ব্যস্ত। প্রাচ্য না-খাওয়ার শিক্ষাকে দীর্ঘদিন পরীক্ষা করে আজ মরণোন্মুখ। হিংসার মধ্যস্থলে সোভিয়েট তন্ত্র বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ভাগ-ক'রে-খাওয়ার শিক্ষার যে নববিধান নির্ম্মিত করেছে তা শোষিত সম্প্রদায়ের পরম আশার বাণী বহন করলেও সত্বপ্রধান সাধুপ্রকৃতি মানব-চিত্তের গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষতঃ যে ব্যবস্থায় সাধু সায় দেয় না ভারতবর্ষ তা কোন দিন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করবে কিনা সন্দেহ। শিক্ষার এই তেমাথা পথসঙ্কটে দাঁড়িয়ে আমরা কি সেই সোনারপাথরবাটিকল্প মহামানবের আবির্ভাব প্রতীক্ষা করতে থাকব—যিনি একাধারে পরম সাধু ও চরম বৈজ্ঞানিক?

কবিগুরু স্মরণে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভক্ত অগণ্য। এই বিরাট বিশ্বে এমন কোন সভ্য দেশ আছে কিনা সন্দেহ, যেখানে তাঁহার কবিপ্রতিভার পূজারী নাই। বিশ্বকল্যাণে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ গুরুদেব বিশ্বমানবের হাতেই নিজেকে অর্পণ করিয়া দিয়া মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের শেষ সঙ্গীতে তিনি এই আশাই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে, বিরাট বিশ্ব যেন তাঁহাকে বাহু মেলিয়া গ্রহণ করে:

"হয় যেন মর্ত্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়।"

তাঁহার এই শেষ আশা পূর্ণ হইয়াছে, হইতেছে এবং আরও হইবে। জগতের বহু মনীষী মুগ্ধহৃদয়ে তাঁহার কাব্যের বিচার এবং বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে জগদ্বরেণ্য কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার জীবনে কবিত্বের এবং ঋষিত্বের আশ্চর্য্য মণিকাঞ্চন যোগের জন্য তিনি ভারতের শ্রেষ্ঠ মহাজনদিগের নিকটেও গুরুদেব আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন।

বহুভাগ্যে আমি অল্প বয়সেই তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম। তিনি আমার মাত্র আট বৎসরের অগ্রজ ছিলেন। তাঁহার পদধূলি পাইবার পূর্ব্বেই আমি তাঁহার পূজনীয় জনক অশেষ ভক্তিভাজন মহর্ষি-দেবের পদধূলি পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলাম।

বেশ মনে আছে, প্রায় বাট বৎসর পূর্ব্বে মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও মিষ্টার আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়দের সঙ্গে মহর্ষিদর্শনের উদ্দেশ্যে রবির উদয়তীর্থ জোড়াসাঁকো ভবনে গিয়াছিলাম। মহর্ষিদেব তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ। একখানি সুন্দর পুষ্পমণ্ডিত আসনে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহার রজতশুভ্র কেশশ্মশ্রু, দ্যুতিমান প্রশস্ত ললাট, প্রশান্ত দৃষ্টি, গৈরিক আচ্ছাদন ও দেহের অনুপম গৌর কান্তি—সমস্তের সমবায়ে তিনি তখন এমন অপূর্ব্ব-দর্শন হইয়াছিলেন যে, আমার মনে হইতেছিল যেন স্বর্গের কোন দেবতা আমাদিগকে কৃতার্থ করিতে মর্ত্ত্যে নামিয়া

আসিয়াছেন। তাঁহার প্রস্ফুটিত শ্বেত শতদল তুল্য পরম সুন্দর পা দুখানি আসনের সম্মুখে প্রসারিত ছিল। বড়, ছোট, সকলেই আমরা তাহা স্পর্শ করিয়া ধন্য হইলাম। সেই পুণ্যস্পর্শ আজিও যেন আমার আঙ্গুলে লাগিয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে এবং সেই পবিত্র স্মৃতির অনীম পুলকে অঙ্গুলিগুলিকে চুম্বন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। এই স্মরণীয় মুহূর্ত্তে মহর্ষিদেবের পুত্রেরাও কেহ কেহ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অদূরে দণ্ডায়মান মনসিজমূর্ত্তি যুবক রবীন্দ্রনাথকে তখনই প্রথম দেখিলাম এবং মুগ্ধ হইলাম।

আমি তখন মফস্বল স্কুলের ছাত্র, মাঘোৎসব দেখিবার জন্য ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিলাম। উৎসবান্তে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলাম; কিন্তু স্মৃতিপটে যে ছবি অঙ্কিত হইয়া গেল, আজ জীবনের শেষ খেয়ায় পৌঁছিয়াও তাহা অবিকৃতই দেখিতেছি।

তিন বৎসর পরে কলেজে পড়িতে যখন কলিকাতায় আসিলাম, তখনই রবীন্দ্রনাথের রচনার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হইল। কিন্তু এই পরিচয়ের মধ্যে একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি ইতিপূর্ব্বেই এমন সকল উৎকৃষ্ট সঙ্গীত ও কবিতা প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন যাহা রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থায়ী গৌরব লাভ করিয়াছে। কিন্তু সে সকলের সঙ্গে পরিচিত হইতে আমার বিলম্ব হইয়াছিল। সমাজমন্দিরে রবিবাসরীয় উপাসনায় হয়ত তাঁহার রচিত গান শুনিয়া থাকিব, কিন্তু উহা কাহার রচনা তাহা আমি জানিতাম না। তাঁহার লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মাসিক পত্রের পৃষ্ঠায়; ঠিক মনে নাই, বোধহয় 'ভারতী'। তিনি যখন কলিকাতার বাহিরে বেড়াইতে যাইতেন, তখন প্রিয়জনের কাছে হাল্কা ভাষার পদ্যে যে সব পত্র লিখিতেন তাহা মাসিকে বাহির হইত। আমি অতি আগ্রহের সহিত তাহা পড়িতাম। উহা আমার বড় ভাল লাগিত। একখানি পত্রে এইরূপ পড়িয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে :—

* * * *

"কেদারার পরে চাপি, ভাবি শুধু ফিলজাফি,
নিতান্তই চুপিচাপি মাটীর মানুষ;
লেখা ত লিখেছি ঢের, এখন পেয়েছি টের,
সে কেবল কাগজের রঙ্গীন ফানুস্।"

* * * *

"মনে পড়ে বরিষার, বৃন্দাবন্ অভিসার,
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ;
শ্যামল তমাল তল, নীল যমুনার জল
আর দুটি ছলছল নলিন নয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে, কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে,
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।" ইত্যাদি—

* * * *

অবশিষ্টাংশ আমার মনে নাই, কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে যে, উদ্ধৃত দ্বিতীয় স্তবকটী পড়িয়া আমার চিত্ত এক অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মধুর রসে বিভোর হইয়া গিয়াছিল। তখন পর্য্যন্ত আমি বৈষ্ণব সাহিত্যের কোন খবরই রাখিতাম না; কিন্তু তথাপি ভাবাবেগে আমার চক্ষুর পাতা ভিজিয়া উঠিতে লাগিল। সেই হইতে এ পর্য্যন্ত আমি অন্ততঃ হাজারবার বন্ধুজনের কাছে এই অভিসার কথাগুলি আবৃত্তি করিয়াছি। এক হিসাবে ইহা আমার জীবনে দীক্ষামন্ত্রের কাজ করিয়াছিল। স্বর্গগত কীর্ত্তন-কলানিধি ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের কথকতার গানে শুনিয়াছিলাম :—

"শ্রীগোবিন্দের নূপুর ধ্বনি দাস গোবিন্দ শুনিল রে।"

বৈষ্ণব পদাবলীকে যদি নূপুর-ধারী যশোদাদুলাল বলিয়া কল্পনা করা যায়, তবে এ কথা বলিতে আমার কিছুমাত্র দ্বিধা নাই যে, এই অভিসার কবিতাটুকুর মধ্য দিয়া আমার

সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সেই যশোদাদুলালের সুমধুর নূপুর-নিক্কণ আমার মানস কর্ণে পৌঁছিয়াছিল। পরে মহাজন-পদাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করিয়া আমার ধারণা জন্মিয়াছিল যে, কবিগুরু হয়ত সেই সুশীতল পবিত্র নির্ঝরে প্রাতঃস্নান সারিয়া তাঁহার জীবনের সুদীর্ঘ জয়যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন বাংলার সাহিত্য-সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। কবি হেমচন্দ্রের মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ প্রায়, নবীনচন্দ্রের মধ্যাহ্ন সমাসন্ন। রবির রেউলে তখনও প্রভাত আরতির সানাই পায়ে নাই; যদিও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বেই নিজকণ্ঠের জয়মাল্য যুবক রবীন্দ্রকে পরাইয়া দিয়া তাঁহার উত্তরাধিকার স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন।

এই সময়ে ভারতবন্ধু মিষ্টার হিউম পরিচালিত ভারতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে কলিকাতার শিক্ষার্থী যুবকদিগের চিত্ত সময় সময় বেশ আলোড়িত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, বাগ্মীশ্রেষ্ঠ দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথের বজ্রনির্ঘোষ কলিকাতার ছাত্রসমাজে এক অভিনব রাষ্ট্রচৈতন্যের সঞ্চার করিতেছে এবং ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রচারিত সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী বাংলার শিক্ষিত সমাজে এক নূতন চিন্তা ধারা বহিয়া আনিয়াছে। হিন্দু সমাজের জীর্ণ প্রাচীরের ভাঙ্গন খুব দ্রুত গতিতে চলিতেছে, কিন্তু নূতন সংগঠনের কোন বিশেষ প্রয়াস দেখা দেয় নাই। হেমচন্দ্রের শিখা, নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ ও বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্-মুকুটধারী আনন্দমঠ বাংলার শিক্ষিত যৌবনকে একটা নূতন কিছুর জন্য চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে।

ইহা ছিল একটা যুগসন্ধিক্ষণ। বাংলার এক শ্রেষ্ঠতম অভিজাত পরিবারের দুলাল, "স্বভাবের শিশু, সুধাতে পালিত, কল্পনা হীরার খনি" স্বরূপ যুবক রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বসাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র রচনায় তপস্যামগ্ন। তখনও কেহ জানিত না যে, রবির জন্মকালে অখিলরসামৃতমূর্তি নারায়ণ তাঁহার কণ্ঠ এবং অধর নিখিলামৃতরসে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার মার্জিতরুচি, সংস্কৃতি, চালচলন, আচারব্যবহার, বেশভূষা ও ভাষৈবিশিষ্ট্যে—সাধারণ বাঙ্গালী সমাজের প্রায় শত বর্ষ অগ্রবর্তী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এবং ওই গুণই ঐ পরিবারের সহিত সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর অন্তরের যোগ ছিল সামান্য, কবিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিস্ময়-মিশ্রিত একটা শ্রদ্ধা যে ছিল না তাহা নহে। তাঁহারা ছিলেন সমাজ-দ্রোহী রাজা রামমোহন রায়ের পতাকাবাহী ব্রাহ্ম; কাজেই সাধারণ হিন্দুরা তাঁহাদিগকে বিশেষ সুনজরেও দেখিতেন না। তাহা ছাড়া শাশ্বত সত্য এবং সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবার এবং উপভোগ করিবার মত রসানুভূতিসম্পন্ন অন্তরের সংখ্যাও ছিল খুব সীমাবদ্ধ। কাজেই প্রথম দিকটায় এই উদীয়মান বিরাট প্রতিভার সমজদার পাঠক মিলিয়াছিল অল্প, অসমজদার সমালোচক মিলিয়াছিল বহু। বলিতে কি রবীন্দ্ররচনার প্রতিকূল সমালোচনা করাই তখন এক শ্রেণীর লোকের অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

'পলাশীর যুদ্ধে'র অমরকবি নবীনচন্দ্রের নবরচিত মহাকাব্য 'কুরুক্ষেত্র' এবং 'রৈবতকে'র নাম তখন সকলেরই মুখে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক বহু প্রশংসিত এই দুইখানি উৎকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গালী পাঠকসমাজে তখন বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিল এবং সাহিত্য পত্রিকায় মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের লিখিত উহার বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ সুসমালোচনাও বাহির হইয়াছিল। ফলে কবি হিসাবে নবীনচন্দ্র তখন রবীন্দ্রনাথকে একপ্রকার আড়াল করিয়াই বঙ্গসমাজের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রামায়ণ,

মহাভারতের দেশে মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার, কুরুক্ষেত্র ও রৈবতকের মতন মহাকাব্যের পক্ষে সুনাম অর্জন করা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ; কিন্তু গীতিকবিতা যতই মনোরম, যতই প্রতিভাদীপ্তিসমুজ্জ্বল হউক না কেন, অনভ্যস্ত পাঠকের চিত্তে উহার রসানুভূতি সঞ্চারিত হইতে সময় লাগে। বিশেষতঃ, গতানুগতিকতাই মানুষের স্বভাব। নূতন সরণী যতই চিত্তাকর্ষক হউক না কেন, অনভ্যস্ত পথচারী সেদিকে পা ফেলিতে প্রথমটা দ্বিধা করিবেই। রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্যই ছিল নূতনত্ব, নূতন ছন্দ, নূতন ভাব, নূতন চিন্তা, নূতন আদর্শ, ভাষার এবং ব্যঞ্জনার নূতন ভঙ্গি; অথচ তাঁহার প্রতিভা ছিল এতই ব্যাপক, এতই সত্য, এতই উজ্জ্বল এবং এতই তীক্ষ্ণ যে, তাহা অস্বীকার করিবারও উপায় ছিলনা; কাজেই অক্ষম সফরীর দল এই গরুড়বাহনের বিরুদ্ধে নিষ্ফল পুচ্ছচালনা আরম্ভ করিল এবং অন্তর্নিহিত ঈর্ষা-বহ্নিতে নিজেরাই পুড়িয়া মরিতে লাগিল। দেশের লোকের কাছে এইরূপ অবাঞ্ছিত ব্যবহার পাইয়া কবি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। বলিতে লজ্জা হয় যে, বিশ্বের সাহিত্যিক দরবার তাঁহাকে 'নোবেল' পুরস্কারের তক্‌মা পরাইয়া দিবার পূর্ব্বে তাঁহার দেশবাসী তাঁহাকে কোনরূপে সম্মানিত করে নাই। বাঙ্গালীর ইহা দুরপনেয় কলঙ্ক। নূতন সৃষ্টি করিতে যাইয়া মাইকেল মধুসূদনকেও প্রথম বয়েষ্ট বিড়ম্বিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু পরিণামে তিনি "অকাল কোকিল, মরুস্থল তরু, অনীর দেশের বারি" রূপে অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। কবিগুরুর ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হয় নাই। রবীন্দ্রনাথকে শুধু কবি বলিলে অর্দ্ধেক মাত্র বলা হয়; কারণ তাঁহার সর্ব্বমুখী প্রতিভার আশ্চর্য্য সৃজনীশক্তি এবং তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব ছিল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। দেশবাসী উপেক্ষা বা প্রতিকূল সমালোচনা তাঁহাকে ব্যথিত করিলেও কোনদিন দমাইতে পারে নাই। তাঁহার আত্মবিশ্বাস ছিল অপরাজেয়। তিনি ঐ সকল বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া অজস্র লিখিয়া চলিলেন,—কাব্য, উপন্যাস, নাটক, গল্প, প্রবন্ধ, গীতিকবিতা, প্রেমসঙ্গীত, রসসঙ্গীত, জাতীয় সঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত; আরও কত কি! আর একটা মজার ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁহার কিছু নূতন লেখা বাহির হইলে, তাঁহার নিন্দুকেরাই সর্ব্বাগ্রে উহা পড়িত এবং নিশ্চয়ই উপভোগ করিত। কোন সভাসমিতিতে রবি ঠাকুর বক্তৃতা করিবেন বা প্রবন্ধ পড়িবেন, সংবাদ বাহির হইলে সভা-স্থল জনসমুদ্রে পরিণত হইত। তিনি ছিলেন কম্বুকণ্ঠ। শঙ্খধ্বনির গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্য দুইই তাঁহার কণ্ঠস্বরে মিশ্রিত ছিল। তাঁহার প্রায় সকল সভাতেই আমি উপস্থিত থাকিতাম। বক্তব্য বিষয়ে তাঁহার বিচার এবং বিশ্লেষণের মধ্যে যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং প্রকাশভঙ্গির মৌলিকতা থাকিত, তাঁহার সমসাময়িকদিগের মধ্যে একমাত্র বার্নার্ডশ ব্যতীত আর কাহারও লেখায় তাহা দেখা যায় নাই। কোন কোন সভায় তাঁহার বক্তৃতা বা প্রবন্ধ আমাকে এতই মুগ্ধ করিত যে সে বিষয়ে আমার মনোভাব আমি তাঁহাকে পত্রদ্বারা না জানাইয়া স্থির থাকিতে পারিতাম না। সেই সকল পত্রের তিনি যে উত্তর দিতেন তাহা খুব সংক্ষিপ্ত হইলেও বিনয়ে এবং সৌজন্যে অতুলনীয় ছিল। সামনাসামনি বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলিবার আগ্রহ জানাইয়া একবার তাঁহাকে চিঠি দিয়াছিলাম। উহা পাইয়াই তিনি আমাকে জোড়াসাঁকো ভবনে আহ্বান করিলেন। সেও অর্দ্ধশতাব্দী কি আরও কিছু বেশী আগের কথা। নীচের তলার একখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কামরা, খুব আসবাবে

সুনিপুণ ভাবে সজ্জিত; সেখানে বসিয়া তিনি লিখিতেছিলেন। তিনি আমাকে অতিশয় আন্তরিকতা-পূর্ণ সাদর সম্ভাষণ জানাইয়া তাঁহার পার্শ্বেই বসিবার আসন নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। আমি বলিলাম, অনেক দিন হইতে আপনাকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা অন্তরে জমিয়া আছে। তিনি বলিলেন, বেশ, জিজ্ঞাসা কর।

আমি—আপনি যে ইদানীং মিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিতেছেন, উহা যদি অমিত্রের ছন্দেই পড়িতে হয় তবে আর মিল রাখিবার প্রয়োজন কি? আমার মনে হয় যে, আপনি ঐ মিলের শাসন স্বীকার করায় আমাদিগকে যতটা দিতে পারিতেন তাহার চেয়ে কম দিতেছেন।

কবি—না, তোমার কথা ঠিক নয়। অমিত্রের ছন্দে পড়লেও পরপর মিলের ধাক্কাটা কাণে না লেগে যায় না, আর কাণে সেটা মন্দও লাগে না। ঝর্ণার জল যে খাতে ঝরে যায়, তা যদি মসৃণ হয় তবে স্রোতের গতিটা টেরই পাওয়া যায় না, কিন্তু ঐ খাতের বুকে মাঝে মাঝে উপলের বাধা থাকলে, তাতে ধাক্কা খেয়ে জলটা ওঠে নেচে নেচে, আর তখন তা দেখে চোখ বলে—বাঃ স্রোতটি চলেছে ত বেশ। আচ্ছা, আমি তোমাকে পড়ে শোনাই তা হলেই তোমার কাণ যা বলে তা থেকে তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে।

ইহার পরে তিনি তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে তিন চারি মিনিট আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন, আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মতন তাহা শুনিলাম।

কবি—আর একটী কথা তোমাকে আমি বলতে চাই। দেখো, ঐ যে মিলটি, ওকে বাণীর পদ্মাসনের সম্মুখে কবির কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি বলে জেনো।

আমি—আচ্ছা, কবিতা কি কেবল অক্ষরের গণা-গাথা সংখ্যা, ছন্দ, যতি এবং মিলের দ্বারাই স্থির হয়, না ওর আরও কোন কষ্টিপাথর আছে?

কবি—তুমি যে সবের নাম করলে, কবিতা রচনায় ঐগুলির প্রয়োজন থাকলেও ঐগুলিই কবিতার প্রাণ বা কষ্টিপাথর নয়। ওর বিচারক তোমার সমঝদার অন্তর এবং তোমার সমঝদার কাণ। তোমার রসগ্রাহী অন্তরে যে (Type) আদর্শ, বিদ্যমান আছে, সে যখন জয়ধ্বনি করে কোন রচনাকে কবিতা বলে রায় দেয়, তখন উহা যে কবিতা সে বিষয়ে আর সন্দেহের অবসর থাকে কি? এই ধর যেমন ফরাসী বিপ্লবের সময়ে সেখানকার রাণীর নির্দ্দয় হত্যাব্যাপারে বাগ্মী বার্কের খেদোক্তি:—Oh, what a revolution and what an heart must I have to contemplate without emotion, that elevation and that fall! একে কি তুমি পদ্য বলবে না গদ্য বলবে?

ইহার অল্পদিন পূর্ব্বে কবি নবীনচন্দ্র আমার কয়েক জন বন্ধুর কাছে রবিবাবুকে শ্লেষ করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন—"রবি? ও ত, হরিদাসী বৈষ্ণবী, ও বলে যায়, ছুঁয়ে যায় না।" বন্ধুরা কবির এই দীন ভক্তকে অপ্রিয় কথাগুলি বেশ রসাও করিয়াই শুনাইলেন এবং বিদ্রূপ করিয়া আরও বলিলেন—তোমার ঐ রবিবাবুটী যত বাজে চুটকি চাটকি কবিতা লিখিয়া বাহবা নিতে চান, লিখুন দেখি 'কুরুক্ষেত্রে'র মতন একখানা কাব্য। কথাগুলি আমার প্রাণে লাগিয়াছিল। সাক্ষাতের শেষ দিকে আমি একটু বেসামাল হইয়াই কবিকে ঐ কথা-গুলি বলিয়া ফেলিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম তিনি নিশ্চয়ই উত্তেজিত হইবেন। কিন্তু কবি ছিলেন অতি

রাশভারী গম্ভীরপ্রকৃতির লোক, সহজে বিচলিত হইতেন না। তিনি একটু মুচকি হাসিয়া বলিলেন—"না, না, ও কিছু নয়, নবীনবাবু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করে থাকেন।" তারপরে অতি সহজ ভাবে বলিলেন—"দেখো, তোমরা যারা আমাকে ভালবাসো, তারা ঐ নিয়ে দুঃখ বা ঝগড়া করোনা; আমার যাতে রুচি তাই আমি লিখে যাচ্ছি, মহাকাব্য রচনায় রুচি আমার নাই, হয়ত শক্তিও নাই।" তাঁহাকে যেবনটি দেখিব বলিয়া আশা করিয়া গিয়াছিলাম, তাহার চাইতে অনেক বড় দেখিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার পদধূলি লইয়া সেবারের মতন বিদায় নিলাম।

সুদীর্ঘ কাল পূর্ব্বের এই কথোপকথন ঠিক্‌ঠিক্ মনে রাখা এবং এতকাল পরে অবিকল ব্যক্ত করা খুবই শক্ত, তবু আমি চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। ঐ দিনটী আমার জীবনের একটী স্মরণীয় দিন ছিল বলিয়া উহা আমি ভুলিতে পারি নাই।

সেদিনের সাক্ষাৎ বেশ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল এবং আরও অনেক বিষয়ে তাঁহার মতামত জানিতে চাহিয়া সদুত্তর পাইয়াছিলাম। সে সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ বর্ত্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজন।

ক্রমে ক্রমে রবির প্রখর রশ্মিজাল সমস্ত বাধা এবং আবরণ ছিন্নভিন্ন করিয়া বাংলার সাহিত্য গগন উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। নিন্দুকের প্রগল্‌ভ রসনাও সংযত হইয়া আসিল। বাংলার অসীম দুর্ভাগ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একপ্রকার অকালেই লোকান্তরিত হইলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার শূন্য সিংহাসনে বসিলেন এবং আমরণ অক্ষুণ্ণ গৌরবে সেখানে উপবিষ্ট থাকিয়া উহাকে অসীম মহিমায় মণ্ডিত করিয়া গিয়াছেন। এখন আবার সে সিংহাসন শূন্য, আরও কতকাল শূন্য থাকিবে কে বলিতে পারে?

কবিগুরুর কাব্যসাধনায় সঙ্গীতের স্থানই বোধ হয় সকলের উপরে। প্রায় দুই সহস্র অতি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। স্বরচিত সঙ্গীতে সেই যাদুকর সুরশিল্পী নিজেই সুর যোজনা করিতেন এবং অমিয়কণ্ঠে উহা গাহিয়া যে শুনিত তাহাকেই মজাইতেন। ভীষণপ্রকৃতির বিষধর সাপও সঙ্গীতে মুগ্ধ হয় বলিয়া শুনিয়াছি। তাঁহার সঙ্গীতে মুগ্ধ হয় নাই এমন পাষাণ হৃদয় বাংলায় কেহ ছিল না, এখনও নাই। সঙ্গীতের প্রভাবেই তিনি সকল প্রতিকূলতা জয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া আমি মনে করি।

আমাদের এই সোনার বাংলা গানেরই দেশ। এমন সুমধুর সঙ্গীত পৃথিবীর আর কোন দেশে রচিত হইয়াছিল বলিয়া শুনি নাই। বাংলার আগমনী-গান ও মা যশোদার গোপালবাৎসল্য-গীতি বিশ্বসাহিত্যে অনুপম। বাংলার 'বন্দেমাতরম্' এখন সারা ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। চতুঃষষ্টি-সুলক্ষণযুক্তা জননী বঙ্গভাষা একদিন জগতে ভাষার রাণীরূপে বন্দিতা হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করি। সেই আশাতেই কবিগুরু সারাজীবন এমন অসীম বিশ্বাসে কঠোর তপস্যা করিয়া গিয়াছেন। সেই শুভদিন যখন আসিবে, তখনই রবীন্দ্র সাহিত্যের এবং সঙ্গীতের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হইবে। রবীন্দ্রনাথের নিজের মুখে তাঁহার গান শুনিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছিল, তাঁহারা জানেন সে গানের প্রভাব ছিল কি গভীর, চিত্তে তার স্পর্শ ছিল কি মৃতসঞ্জীবন। মাঘোৎসবে তিনি যখন তাঁহার স্বরচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীত তন্ময় হইয়া গাহিতেন এবং সুরের ও ভাবরসের অমৃত-ধারায় উপাসকমণ্ডলীর শ্রবণ মন প্লাবিত ও অভিষিক্ত করিয়া দিতেন, তখন মুগ্ধ আত্মার মধ্য

ভাঙ্গিয়া যাইত। শুনিয়াছি তিনি যখন একদিন তাঁহার রচিত স্বর্গের বর্ণনাযুক্ত—

"ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম ভবজলধির পারে
অপূর্ব্ব শোভন জ্যোতির্ম্ময়"

গানটি গাহিতেছিলেন, তখন উহা উপাসনান্তে মহর্ষি দেবের শ্রুতিগোচর হইলে তিনি নাকি বিস্ময়ে ও আনন্দে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—"ওরে দেখেছে রে দেখেছে!"

স্বদেশী যুগে কবিগুরু যে সকল প্রাণ-মাতান জাতীয় সঙ্গীতে দেশমাতৃকার পূজার নৈবেদ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে সমগ্র বাংলায় যে অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনা ও কর্ম্মপ্রেরণা আনিয়াছিল তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। তিনি তাঁহার স্বদেশকে **বিশ্বদেবতার** মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে দেখিয়াছিলেন এবং "মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা মোর সনাতন স্বদেশে" বলিয়া তাঁহার বন্দনা করিয়াছিলেন। অসীমের উপাসক গুরুদেব "এই ভারতের **মহামানবের** সাগর তীরে" তাঁহার চিত্তকে ধীরে উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে তাঁহার স্বদেশ-প্রেম বিশ্বপ্রেমেরই অঙ্গীভূত ছিল। এই বিষয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহনের সঙ্গে তাঁহার আদর্শ ছিল অভিন্ন। কবিগুরুর এই বিশ্বপ্রেম হইতেই তাঁহার বিশ্বভারতী জন্মলাভ করিল।

এতদিনের সাধনায় তাঁহার কাব্যভাণ্ডারে যে অমূল্য রত্নসম্ভার সঞ্চিত হইয়াছিল তাহারই সামান্য কয়েক খণ্ড হীরা মাণিক ইংরাজী ভাষার সূত্রে গ্রথিত করিয়া **গীতাঞ্জলি** রূপে তিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করিলেন। এই রত্নমালার স্নিগ্ধ জ্যোতি বিশ্বের কাব্য-রসিকদিগকে মুগ্ধ করিল। তিনি দুর্লভ "নোবেল" পুরস্কার লাভ করিলেন। ইহার ফলে সমগ্র সাহিত্য-জগৎ যখন তাঁহার জয়নাদে মুখরিত হইয়া উঠিল, তখন আর তাঁহার দেশবাসীর সন্দেহ রহিলনা যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার তথা ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

এইবারে কবির সাহিত্যসাধনাকে বিকৃতি দিয়া সমালোচকের দল তাঁহার বিশ্বভারতীর বিরুদ্ধে তাহাদের শরজাল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু কবি-গুরু ছিলেন সব্যসাচী, একলাই দুহাতে উহা ঠেকাইয়া চলিলেন। এই সময় হইতেই বিশ্বভারতীর জন্য তাঁহার বিশ্বপরিভ্রমণ আরম্ভ হইল।

সভ্যজগতের প্রাচীন এবং নবীন সকল দেশ হইতেই তাঁহার সাদর আহ্বান আসিতে লাগিল এবং সর্ব্বত্র তিনি এরূপ বিপুল সম্বর্দ্ধনা লাভ করিতে লাগিলেন যাহা পৃথিবীর আর কোন সাহিত্যিকের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। তাঁহার মুখে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও আদর্শের বার্ত্তা শুনিয়া সভ্যজগৎ মুগ্ধ হইল। এইরূপে বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া তিনি অদম্য উৎসাহে বিশ্বের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত তাঁহার "সনাতন স্বদেশের" বার্ত্তা এবং বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য এবং আদর্শ প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। বার্দ্ধক্য বা ব্যাধি তাঁহার উদ্যমকে পরাভূত করিতে পারিল না। জগতের বহু মনীষী মহাজন তাঁহার বিশ্বভারতীর পুণ্যক্ষেত্র শান্তি-নিকেতনে আসিলেন এবং কবিগুরুর আদর্শনিষ্ঠা ও সংগঠনশক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বিশ্বভারতীর কল্যাণে সারাজীবন প্রাণপাত চেষ্টা করিয়া তাঁহার সেই সাধনার পরমধন তিনি ইহলোক হইতে বিদায়কালে তাঁহার দেশবাসীর হস্তে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। আমাদের খুব ভরসা আছে যে, দেশবাসী গুরুদেবের তাক পতাকা তুলিয়া ধরিবে এবং বিশ্বভারতীকে সমৃদ্ধ করিবে।

কবিগুরুর সংগীতসাধনার কথা বলিয়াছি, কিন্তু নৃত্যকলার প্রচারে তাঁহার অক্লান্ত নির্ভীক চেষ্টাও স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মানুষের সর্ব্বাঙ্গে তিনি চির-সুন্দরের প্রকাশ দেখিয়া কিরূপ মুগ্ধ হইতেন তাহা তাঁহার ভাপানের পত্র যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহারা নিশ্চই জানেন। নৃত্যের মধ্য দিয়া যে মানুষের সর্ব্বাঙ্গের সঙ্গীত শ্রুত হয়, রসগ্রাহী জনের তাহা অবিদিত নহে। এই সুরনরবাঞ্ছিত বিশিষ্ট কলাটিই এই আত্ম-বিস্মৃত জাতির নারী সমাজে পুনঃ প্রচার করিতে যাইয়া গুরুদেবকে চতুর্দ্দিক হইতে কত যে নিন্দা, তিরস্কার, কুৎসা এবং গ্লানির পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে চিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া উঠে। কিন্তু সমাজে সত্য, শিব এবং সুন্দরের প্রতিষ্ঠায় তিনি কোন বাধা, কোন বিঘ্ন, কোন নিন্দা, কোন কুৎসা, কোন গ্লানি বা তিরস্কার গ্রাহ্যই করিতেন না। জীবনের অতি কঠোর পরীক্ষার দিনে তিনি কোথা হইতে চিত্তে এত বল এবং অভয় পাইতেন ভাবিলে বিস্মিত হইয়া যাই। এইখানে মনে পড়িতেছে জীবনের কল্যাণব্রত উদ্‌যাপন করিতে যাইয়া এতদপেক্ষায় বহুগুণে কঠোরতর পরীক্ষার মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহনের চিরস্মরণীয় বাণী: * * * * * * But these however accumulated I can tranquilly bear, trusting that a day will arrive, when mey humble endeavours will be viewed with justice, perhaps, acknowledged with gratitude. At any rate, whatever men many say, I cannot be deprived of this consolation that my motives are acceptable to that Being who beholds in secret and compensates openly.

'আমার বিরুদ্ধে আমার দেশবাসীর এই সমস্ত নিন্দা তিরস্কার ও উপদ্রব যতই পুঞ্জীভূত হউকনা কেন, আমি উহা অক্ষুব্ধ চিত্তে সহ্য করিতে পারি এই বিশ্বাসে যে, এমন একদিন আসিবে যখন আমার এই সামান্য শুভ চেষ্টাগুলি ন্যায়বিচার লাভ করিবে, হয়ত কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকৃত হইবে। তাহা হউক বা না হউক, মানুষ যাহাই বলুক না কেন, অন্ততঃ এই সান্ত্বনা হইতে আমাকে কেহই বঞ্চিত করিতে পারে না যে, আমার উদ্দেশ্য সকল সেই পরম দেবতার গ্রহণযোগ্য হইতেছে, যিনি গোপনে দেখেন এবং প্রকাশ্যে পুরস্কৃত করেন।'

মহর্ষিদেবের পুত্র হিসাবে কবিগুরু রাজা রামমোহনের মানস-পৌত্র ছিলেন বলা যায়। সুতরাং আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি রাজার লোকত্তর গুণসমূহের অধিকারী হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কবিগুরু বলিতেন তাঁহার জীবনে যৌবনের অবসান নাই। শুধু তাহাই নহে; তাঁহার জীবনে আনন্দের ও উৎসবেরও অবসান ছিল না। জগতের আনন্দ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি ধরায় আসিয়াছিলেন। সে যজ্ঞে তিনি নিজেও কম আনন্দ দান করিয়া যান নাই। উৎসব এবং আনন্দই ছিল তাঁহার কবিচিত্তের খোরাক। কত বসন্তোৎসবে ও কত শারদোৎসবে তিনি তাঁহার ছাত্র ছাত্রীদের হাত ধরিয়া নটরাজের ন্যায় বিহ্বলনৃত্য করিয়া গিয়াছেন,—তাহা কি ভোলা যায়? কত অভিনয় করিয়া, কত গান গাহিয়া, কত আবৃত্তি করিয়া তিনি দর্শক এবং শ্রোতাদিগকে আনন্দ প্রবাহে ডুবাইয়া গিয়াছেন, তাহাও কি ভোলা যায়? সেই অফুরন্ত যৌবনের, অফুরন্ত আনন্দের এবং অফুরন্ত উৎসবের অমর কবিকে আমরা নমস্কার করি।

চার বৎসর পূর্ব্বে এই ধারা শ্রাবণেরই এক সর্ব্বনাশা দিনে কলিকাতা মহানগরীর লক্ষলক্ষ নরনারীর অশ্রুধারার মধ্যে কবিগুরু তাঁহার সাধনোচিত আনন্দ-লোকে মহাপ্রস্থান করেন। আমাদিগকে অভয় দিয়া তিনি বলিয়া গিয়াছেন :—

"ওরে ভয় নাই, তোর ভয় নাই ;
নিঃশেষে প্রাণ, যে করিবে দান,
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"

তিনি বিশ্বজনহিতায় নিজেকে নিঃশেষে দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অক্ষয়, তিনি মৃত্যুঞ্জয়। আমরা তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি, এবং তাঁহার অতুলনীয় কবি মহিমার জয়ঘোষণা করি :—

জয় হে মরণজয়ী, তব জয়।

কা-না-চৌ

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

গ্রামের তরুণের দল হঠাৎ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। অধীর উৎসাহের সহিত সকলেরই মুখে সনৎ সেনের নাম ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল।

গ্রামের প্রান্তে, মাঠের ও-পারে, রেলওয়ে ষ্টেশন এবং তাহারই সংলগ্ন ষ্টেশন মাষ্টারের কোয়াটার। সনৎ সেন—ষ্টেশন মাষ্টার বঙ্কুবাবুর ভাগিনেয়। বছর দুই আগে সে একবার এখানে আসিয়াছিল। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে, দু'চারদিনের মধ্যে সে আবার এখানে আসিতেছে এবং এখন হইতে এইখানেই থাকিবে।

সনৎয়ের আকৃতি দীর্ঘ, দেহের হাড়গুলো মোটা-মোটা, রং গৌর, মাথায় একমাথা কোঁকড়া চুল। একজন নাম-করা স্পোর্টস্‌ম্যান সে। হাই জাম্প, লং জাম্প, দৌড় সাইকেল রেস্, সাঁতার, ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতিতে এ-অঞ্চলে তা'র জোড়া নাই। গ্রামের তরুণের দল এই কারণেই তাহাকে ভালবাসে এবং ভক্তি করে। সম্প্রতি তাহারা গ্রামে একটা ফুটবল, ক্লাব বসাইয়াছে। সনৎ সেন যখন এই মাহেন্দ্রক্ষণে আসিয়া পড়িতেছে, তখন তাহাকেই ক্লাবের ক্যাপ্‌টেন্ করিতে হইবে এবং তাহা হইলেই এ-তল্লাটে তাহাদের ক্লাবই যে শীর্ষস্থানে উঠিবে, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

যথাদিনে সনৎ সেন আসিয়া পড়িল। পরের দিন অপরাহ্নে ষ্টেশনের সামনেকার ফুটবল মাঠে একটা উৎসবের আয়োজন হইল এবং তরুণের দল তাহাকে মাল্য-চন্দনে ভূষিত করিয়া তাহাদের অন্তরের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিল। অভিনন্দনের উত্তরে সনৎ সেন সকলের অন্তরকে আশা উৎসাহে নাচাইয়া দিয়া অনেক কিছুই বলিল এবং তার মধ্যে এ কথাও বলিল যে, ক্লাবকে উন্নত করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক এবং তজ্জন্য গ্রামবাসী সকলের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া একটা ফণ্ডের সৃষ্টি করিতে হইবে।

নবীন উৎসাহ; যেমন কথা, সঙ্গে সঙ্গেই কাজ আরম্ভ। পরদিনই চাঁদার খাতা বাঁধা হইয়া নিম্নোক্তরূপে চাঁদা-আদায় চলিতে লাগিল :—

জয়কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুবিহারী রায় ...	২৲
ভুজঙ্গ পাল	।৹
রামরতন সিমলাই	৷৹
মঙ্গলা দাসী	১৲
জনৈক বন্ধু	॥৹
পরিমল রক্ষিত	১৲
ত্রিদিবনাথ বসু...	২৲—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সপ্তাহ-খানেকের চেষ্টায় এবং ঘোরাঘুরিতে চাঁদার খাতায় টোট্যাল যোগ দিয়া দেখা গেল—১৩১৸৶০। তখনো অনেকের কাছে যাওয়া বাকী। তার মধ্যে কালীনাথ চৌধুরী .. ..,... ..

সর্ব্বনাশ! এ কী ঘটিয়া গেল! যে নাম এ-গাঁয়ে ভুলেও কেহ কখনো মুখে আনে না, যে নামে ভাতের হাঁড়ি ফাটে, সারাদিন না খেয়ে উপবাসে কাটে, কলমের মুখে অসাবধানে সেই নাম বাহির হইয়া গেল! কিন্তু—যাহা হইয়া গেল তাহার আর চারা নাই। যাহা ভাগ্যে আছে তাহাই ঘটিবে। ঘটুক। কিন্তু আর ও নাম মুখে আনা হইবে না। যে নামে তাহাকে সকলে ডাকে আমরাও সেই নামে তাহাকে ডাকিব। সে নাম হইতেছে—কা-না-চৌ।

পরদিন ক্লাবের কয়েকজন চাঁদার খাতা লইয়া কানাচৌর কাছে গিয়া হাজির হইল। কানাচৌ কহিল—'চাঁদা! কিসের চাঁদা?'

সকলে বলিল—'ফুটবল ক্লাবের।'

হরিপদ বলিল—'দেখুন না, গ্রামের প্রায় সকলেই দিয়েছে।'

খাতার নামগুলা পড়িতে পড়িতে কানাচৌ কহিল—'তা ত দেখতে পাচ্চি; কিন্তু আমাকে মাপ করতে হবে, আমার এক পয়সাও দেবার ক্ষমতা নেই।'

রমেশ কহিল—'কিন্তু সকলেই যখন দিয়েছে, তখন আপনাকে ও কিছু দিতে হবে; নইলে আমাদের ক্লাবের খরচা চলবে কেমন কোরে বলুন।'

একটা মস্ত হাই তুলিয়া কানাচৌ কহিল—ক্লাবের আবার খরচা কি, আমি ত বুঝতে পারি না। আমরাও ত এক কালে খেলেচি; আমাদেরও ক্লাব ছিল। গাছ থেকে পটা-পট্ বাতাবি লেবু ছিঁড়ে বল করতুম আর তাই নিয়ে সারা মাঠ ছুটোছুটি করতুম। তারপর এটুকখানি চুপ করিয়া কিছু একটা ভাবিবার পর কহিল—'তা' এসেচ যখন আশা কোরে, কিছুতেই ত আর ছাড়বে না, সাধ্যমত কিছু দি—নিয়ে যাও'—বলিয়া একটা ঘসা আনি বাক্স হইতে বাহির করিয়া হরিপদর হাতে দিল। হরিপদ লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—এক আনা! চার পয়সা! আপনাকে অন্ততঃ পাঁচটা টাকা দিতেই হবে!'

দুই চোখ কপালে তুলিয়া কানাচৌ কহিল—'পাঁ-চ টা-কা! তাহোলে আমি পাঁচবার ধরে মরে যাব। যা দিলুম, ও-ই দেবার আমার সাধ্য নেই।'

রমেশ কহিল—"তা'ও ত দেখচি আনিটা ঘসা!"

কার্ত্তিক গোড়া হইতেই মনে মনে রাগিতেছিল। এক্ষণে দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল—"আয়, আয়; ঐ ঘসা আনির দামই দশটাকা। চৌখুড়ো যা দিয়েছে, ঢের দিয়েছে!"

কানাচৌকে অনেকেই চৌখুড়ো বলিয়া ডাকিত; অর্থাৎ চৌধুরী খুড়া।

বৈকালে খেলার মাঠে সদর সেনের উপস্থিতিতে এই ব্যাপার লইয়া একটা হাস্যকর আলোচনা আলোচনা চলিল।

রমেশ কহিল—"কান্তিঃ বোলেচে, ঐ খসা-আলির সামেই দশটাকা: সুতরাং চৌখুড়োর কাছ থেকে যেন-তেন প্রকারেই দশটা টাকা আদায় করতেই হবে। কান্তিকের মুখের কথাটাকে সত্য করে তুলতে হবে।"

হরিপদ কহিল—"সে আশা আর করো না। ও-লোকের কাছ থেকে দশটাকা! সূর্য্যদেবের পশ্চিমে উদয় হওয়া যদিও সম্ভব হয়, কিন্তু চৌখুড়োর কাছ থেকে দশটাকা আদায় করা.....অসম্ভব! অসম্ভব!"

রমেশ কহিল—"আলবৎ! দশটাকা ওর কাছ থেকে আদায় করতেই হবে!"

অনেকে অনেক কিছুই বলিল। সনৎ এ পর্য্যন্ত চুপ করিয়াই ছিল; এক্ষণে কহিল—"চুপ্ কর্ তোরা; একটা রাত আমায় ভাবতে দে যে কি উপায়ে ওর কাছ থেকে টাকা বার করা যেতে পারে। আজকের রাতটা ভেবে কাল মৎলব বার কোরব।"

পরদিন সকলে যথাসময়ে খেলার মাঠে আসিয়া জানিতে পারিল যে মৎলব ঠিক হইয়া গিয়াছে।

* * * *

ষ্টেশান থেকে কিছু দূরে একটা দীঘি আছে। স্থানটি গ্রামের বাহিরে। দীঘির চারি পাড়ের বড় বড় গাছগুলির জন্ত সমগ্র স্থানটি ছায়াচ্ছন্ন। তন্মধ্যে বহু পুরাতন বিশালকায় একটা বটবৃক্ষ আছে। কিছুদিন হইতে সেই বটবৃক্ষমূলে এক নবীন সন্ন্যাসী প্রতি বৃহস্পতিবার আসিয়া আসন গ্রহণ করেন এবং ঘণ্টা চারি পাঁচ তথায় বসিয়া ধ্যান-ধারণা করিয়া চলিয়া যান। তরুণের দল সন্ধান পাইয়া সেই সন্ন্যাসীর কাছে যায়। তিনি তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া বলেন—"তোমাদের ক্লাবের জন্ত যে ১৩৮৲ টাকা চাঁদা উঠেচে, আমি তা ডবল কোরে দেবো; অর্থাৎ ১৩৮৲ টাকাকে আমি ২৭৬৲ টাকা কোরে দোবো।"

সকলে বিস্ময়ের সহিত তাঁর এই প্রস্তাবে রাজী হয় এবং তিনি মন্ত্রবলে চাঁদার ঐ ১৩৮৲ টাকাকে দ্বিগুণ—অর্থাৎ ২৭৬৲ টাকাতে পরিণত করিয়া দেন। সন্ন্যাসী সকলকে বলেন যে, এ কথা যেন গ্রামের কেহ জানিতে না পারে। এ সব গোপনীয় বিদ্যা যত্র-তত্র প্রচার নিষেধ।

তথাপি সেদিন সকালে হরিপদ এবং রমেশ কানাচৌর কাছে আসিয়া বসিল এবং একথা-সেকথার পর সন্ন্যাসী এবং তাহার অদ্ভুত শক্তির কথা পাড়িল।

কানাচৌ কহিল—"বলিস্ কিরে! এমন ক্ষমতা? নিশ্চয়ই তাহোলে কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ-টুরুষ হবে।"

হরিপদ বলিল—"তার আর কোন ভুল আছে?"

"আশ্চর্য্য ব্যাপার ত! ১৩৮৲ টাকাকে ২৭৬৲ কোরে দিলে?"

"তাই ত দিলে, চৌখুড়ো। তবে, একথা কাউকে বলতে তিনি নিষেধ করে দিয়েছেন; তাঁকে আমরা বড্ডই ভালবাসি, তাই বল্লুম। এ সব কথা যেন আর কেউ না শোনে।

"আমার আর কে আছে যে শুনবে? সংসারে ত আমি একা। আর, গাঁয়ের লোকের সঙ্গে আমি ত বড় মিশি না, কোথাও যাইও না, সুতরাং ....."

"সুতরাং, আর কেহ বলবার লোক তোমার না থাকলেও, চৌখুড়ো, তোমার টাকা আছে ঢের। সেই টাকাদের তুমি বলবে, আর, তারা ঝন্-ঝন্ কোরে বেজে উঠে পাড়াময় কথাটা জানিয়ে দেবে!"—বলিয়া রমেশ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কানাচৌ কিন্তু একমনে কি একটা ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ ধরিয়া ভাবিবার পর কহিল—"হরিপদ, বাবা! আমার একটিবার তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে হবে। তোদের আমি নিজের ছেলের মত মনে করি। একটিবার তাঁর সঙ্গে আমার .. ..উঃ! অসাধারণ ক্ষমতা ত! যত টাকা, তার ডবল কোরে দেবে! বাবা রমেশ! বাবা হরিপদ! সেই মহাপুরুষের দর্শন একটিবার আমায় করিয়ে দিতে হবে; নইলে আমি তোদের পায়ে মাথা খুঁড়ে আত্মঘাতী হ'ব।" বলিয়া কানাচৌ উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেল এবং একটি দুয়ানি হাতে বাহিরে আসিয়া কহিল—"হরিপদ, সেদিন ছিল না বলে দিতে পারিনি; আরও দু আনা তোদের চাঁদার খাতায় জমা কোরে নিস্ বাবা।"

অনেক কথার পর অগত্যা হরিপদ ও রমেশ সামনের বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে চৌধুড়োকে সন্ন্যাসীর কাছে লইয়া যাইতে রাজী হইল। রমেশ কহিল—"তাঁর পাদোদক খেয়ে দেখবেন চৌধুড়ো, সদ্য-ফোটা যুঁইফুলের গন্ধ; অথচ ঐ দীঘির একটু জল নিয়ে, তাঁর পায়ের বুড়ো আঙুলটা একটু ছুঁইয়ে দেবেন মাত্র!"

অতঃপর সন্ন্যাসী সম্বন্ধে আরো দু' একটা অদ্ভুত কথা জানাইয়া হরিপদ ও রমেশ বিদায় গ্রহণ করিল। কানাচৌ বিস্ময়, লোভ এবং আশা উৎসাহে অভিভূত হইয়া, তন্ময়চিত্তে বসিয়া-বসিয়া আকাশ-পাতাল কত-কি ভাবিতে লাগিল।

বৃহস্পতিবার। অপরাহ্ন কাল।

দীঘির পাড়ের নির্জন বটবৃক্ষতলে সন্ন্যাসীকে ঘিরিয়া ভক্তের দল নির্বাক হইয়া বসিয়া আছে। একধারে জোড়হাত বুকে ঠেকাইয়া কানাচৌ সতৃষ্ণনয়নে ভক্তিপ্লুত-মনে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার দিকে তাকাইয়া সন্ন্যাসী কহিলেন—"যা বেটা কচুপাতার কোরে দীঘির খোড়াসে পানি লে আয়; চরণামৃত কোরে দি, খা।"

শশব্যস্তে উঠিয়া কানাচৌ ফটাস্ করিয়া একটা কচু-পাতা ছিঁড়িয়া লইল এবং তাহাতে করিয়া একটুখানি দীঘির জল আনিয়া সন্ন্যাসীবাবার সম্মুখে ধরিল। তিনি তাহাতে দক্ষিণ পায়ের বুড়া আঙুলটি ঈষৎ ঠেকাইয়া দিয়া কহিলেন—"লে বেটা, খেয়ে ক্যাল; মঙ্গল হবে।"

পরম আনন্দে এবং ভক্তিভরে কানাচৌ সেই কচুপাতার জলটুকু গলায় ঢালিয়া দিল। দিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার আনন্দ এবং বিস্ময় শত গুণ বাড়িয়া গেল। তাঁর চরণামৃতে যুঁই নয়—প্রস্ফুটিত গোলাপের গন্ধ! গললগ্নীকৃতবাসে কানাচৌ সন্ন্যাসীবাবার পদমূলে প্রণাম করিয়া, তাঁহার মুখের দিকে ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সন্ন্যাসীবাবা তাহার অন্তরের কথা যেন বুঝিলেন; কহিলেন—"তোর যেন কিছু বলবার আছে, মনে হ'চ্চে।"

হাত দুটি জোড় করিয়া কানাচৌ কহিল—"হ্যাঁ বাবা একটু গোপনেই আপনাকে তা.....

তখন যুবকদের উদ্দেশে সন্ন্যাসী কহিলেন "তোমরা সব একটু দীঘির চারদিকে বেড়াও গে যাও; বিশ-পঁচিশ মিনিট পড়ে সব এসো।"

তাঁহার কথায় সকলে চলিয়া গেল। সঙ্গে-সঙ্গে কানাচৌ একেবারে সন্ন্যাসীবাবার পায়ে লুটাইয়া পড়িল; কাতর কণ্ঠে কহিল—"আমাকে বাবা, একটু দয়া করতেই হবে, নইলে আপনার পা আমি কিছুতেই ছাড়বো না।"

তাহার কাতরতা দর্শনে সন্ন্যাসীঠাকুর তাহাকে দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে তাহার মত গরীব আর কেহ নাই; তাহার বংসামান্য যাহা পুঁজি আছে কৃপা করিয়া তাহা দ্বিগুণ করিয়া দিতে হইবে।

সমস্ত শুনিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের তাহার প্রতি দয়া হইল; জিজ্ঞাসা করিলেন—"কত টাকা তোর আছে?"

কানাচৌ সমস্যায় পড়িল। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়—হাজার দশেক; কিন্তু একেবারে দশ হাজারের কথা বলিয়া কেমন বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। আগে বৎসামান্য কিছুর উল্লেখ করিয়া দেখা যাউক কিরূপ ফল হয়। প্রথম ক্ষেপে সুফল পাওয়া গেলেই, তখন হাতে-পায়ে ধরিয়া ঐ দশ হাজারকে বিশ হাজার করিয়া লইলেই চলিবে। সুতরাং একটু ঢোক গিলিয়া কানাচৌ কহিল—"বড় গরীব বাবা! কিছুই নেই! শ'দুই-আড়াই টাকা মাত্র আমার পুঁজি। তোমার পায়ে ধরি বাবা, দাও এটাকে ডবল কোরে; তুমি আমার ধর্ম্ম বাপ, বাবা; আমায় বাঁচাও।"

সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রাণ এই কাতরোক্তিতে খুবই গলিয়া গেল। তিনি আদেশ করিলেন—"কাল সন্ধ্যার পর টাকা নিয়ে এখানে আসবি। শুধু তোর জন্য কাল আমি এখানে থাকবো। সমস্ত দিন আহার করবি না, শুধু ফল খেয়ে থাকবি। যা, আজ ঘরে যা।"

আর একবার ভাল করিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুরের পায়ের ধূলা লইয়া কানাচৌ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাকে কহিলেন—"এ কথা আর কা'কেও বলবি না, তা হোলে ও-সব কিছু আর হবে না। খুব সাবধান! যা, চলে যা।"

পরদিন শুধু দুইটা কলা আর একটা বেল খাইয়া কাটাইয়া সন্ধ্যার পর কানাচৌ আড়াইশো টাকার ছোট্ট একটা পুঁটুলি সমেত বটবৃক্ষ তলায় আসিয়া হাজির হইল। সন্ন্যাসী ঠাকুর ধ্যানমগ্ন ছিলেন। তাঁহার সেই গভীর ধ্যান পায়ের শব্দে ভাঙ্গিল না। কানাচৌ অতি সন্তর্পণে একধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শঙ্করীর ক্ষীণচন্দ্রের সরু একখানা ফালি বড় বকুল গাছটার ফাঁকে দেখা যাইতেছিল। চারিদিক নিস্তব্ধ—নিঝুম। সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শুধু একটানা ঝিঁঝিঁর রবে সমস্ত স্থানটা মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল।

কিছু পরেই সন্ন্যাসী ঠাকুরের ধ্যানভঙ্গ হইল। কানাচৌর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"এসেছিস? টাকা এনেচিস?"

প্রণাম করিয়া টাকার পুঁটুলিটা কানাচৌ তাঁর সামনে দিতে গেলে সন্ন্যাসী ঠাকুর হা—হা করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওসব আর আমার সামনে বার করিসনি, আমাকে দেখাসনি। ওসব অর্থমনর্থং আমি দেখতে চাই না। সামনে—দীঘির ঐ কোণায় বড় আমগাছটা দেখতে পাচ্ছিস ত?"

সেইদিকে চাহিয়া কানাচৌ—"হ্যাঁ বাবা, পাচ্ছি।"

"আমি মন্তর বলতে থাকি, তুই তোর টাকার পুঁটুলিটা নিয়ে ঐখানে যা। গিয়ে, গাছতলায় পুঁটুলিটা রেখে দিয়ে চলে আয়। আসবার সময় পিছু ফিরে তাকাবি না। বরাবর এইখানে এসে বসবি। যা; ওঠ্।"

সানন্দে ও সোৎসাহে কানাচৌ তাহার আড়াইশো টাকার পুঁটুলিটা লইয়া সামনের অদূরবর্ত্তী সেই আম গাছের তলায় গেল এবং পুঁটুলিটা সেইখানে রাখিয়া সন্ন্যাসীবাবার কাছে আসিয়া বসিল। অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে পুঁটুলিটা সেখান হইতে আবছা দেখা যাইতেছিল। সন্ন্যাসীঠাকুর বলিলেন—"ঐদিকে তাকিয়ে থাক্; কি হয় ছাখ্"—বলিয়া তিনি মনে মনে মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন; আর কানাচৌ একদৃষ্টে তাহার পুঁটুলির দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছু পরেই দেখা গেল, ছায়ার মত কোন অশরীরী প্রাণী গাছ হইতে নামিয়া আসিল এবং পুঁটুলিটা লইয়া আবার গাছের উপর উঠিয়া গেল।

চঞ্চল হইয়া উঠিয়া কানাচৌ কি বলিতে যাইতেছিল, সন্ন্যাসীবাবা বাধা দিয়া কহিলেন—"চুপ্! এখন বাড়ী চলে যা। এইবার গিয়ে অন্নাহার করতে পারিস্। কাল ঠিক এই সময়ে এখানে আসবি; ডবল টাকা পেয়ে যাবি। না; তোর বরাত ভাল। কাকেও এসব কথা জানাবি না। যা, ঘরে ফিরে যা; কাল এলেই ঐ আমতলা থেকে ডবল টাকা পেয়ে যাবি। শিবের দ্বারী নন্দী ভৃঙ্গীকে মনে মনে ধ্যান করবি। যা।"

আশায়-নিরাশায়, আনন্দে-নিরানন্দে, উৎসাহে-সন্দেহে কানাচৌর অন্তরমধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছিল। সে কম্পিত অন্তরে সন্ন্যাসীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া গ্রামের পথে ফিরিয়া আসিল।

* * * *

দিন-দুই পরের কথা।

আবার সেই খেলার মাঠ। আসন্ন সন্ধ্যায় আবার সনৎ সেনকে ঘিরিয়া সেই তরুণের দল।

হরিপদ কহিল—"ওঃ! কিপ্‌টের জাত এইবার ঘন আটকে মরবে! আড়াইশো টাকার শোক ও সহ্য করতে পারবে না।"

রমেশ কহিল—"কিন্তু তোমাকে মানিয়েছে ঠিক সনৎদা; একেবারে হুবহু সন্ন্যাসীবাবা! সেদিন কিন্তু তোমার পাদোদককে ঘুঁটের বদলে গোলাপের গন্ধে আমি থতমত খেয়ে গেছলুম।"

মৃদু হাসিয়া সনৎ কহিল—'ঘুঁইয়ের এসেন্সটা ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই 'এসেন্স অব্ রোজ' বুড়ো আঙুলের মাথায় লাগিয়ে এসেছিলুম।'

রাজেন কহিল—'আমগাছটা থেকে নেবে এসে, টাকার পুঁটলিটা নিয়ে আবার উঠতে আমার এত হাসি পেয়েছিল যে, আর একটু হলেই হো হো করে হেসে ফেলেছিলুম।'

সনৎ সেন কহিল—"কিন্তু একটা কথা। হরিপদ যা বলে, আড়াইশো টাকার শোকেই ওর ত বেচারা মারা পড়বে। এক কাজ করা যা'ক; রমেশ বলেছিল—'যেন-তেন-প্রকারেণ দশটা টাকা ওর কাছ থেকে আদায় করতেই হবে'—আমি বলি, তাই করা যা'ক। ওর থেকে দশটা টাকা নিয়ে, বাকী ২৪০৲ টাকা ওকে ফেরত দেওয়া যাক।"

ইহা লইয়া কিছুক্ষণ আলোচনা হইবার পর সকলেই এই কথায় সম্মত হইল এবং স্থির হইল, আজই রাত্রে কোন অদ্ভুত উপায়ে কানাচৌর ২৪০৲ টাকার পুঁটুলি তাহাকে ফেরত দেওয়া হইবে। সে অদ্ভুত উপায় যে কি হইবে, সেই সম্বন্ধে সনৎ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা উত্তরাইয়া গিয়াছিল।

ঠিক ঐ সময়ে আর একজন জীবন্মৃত ব্যক্তি দুঃখে, ক্ষোভে, নিরাশায় সপ্তমীর আবছা আলো আঁধারের মধ্যে দীঘির পাড়ের সেই আমতলায় কিছু একটার আশায়, পাগলের মত ইতস্তত অন্বেষণ করিয়া ঘুরিতেছিল। আজ দুই দিন ধরিয়া সে স্নানাহার ভুলিয়া এইখানে এই ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর মনে মনে শিবের দ্বারী নন্দী-ভৃঙ্গীর নাম জপ করিতেছে।

সে—কানাচৌ।

মৌচাক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

যেখানে যখন হেরি আমি মৌচাক
ম্লান করে দেয় মানুষের যত জাঁক।
কোমল স্বর্ণে গঠিত কক্ষগুলি,
দেখিয়া রাজার প্রাসাদ যাই যে ভুলি।
মধু কারবার চলেছে অনুক্ষণ
মধুর রাজ্যে শুনি মধু গুঞ্জন।

২

কবি ও শিল্পী মিলেছে এখানে যেন
কোথা শুঁটীদের পরিমণ্ডল হেন?
কোথায় এমন হইতে দেখেছে লোক
রূপদক্ষ ও সুর-শিল্পীর যোগ?
কোথায় এমন রস-রসিকের হাট?
এক সাথে কোথা এত কবি সম্রাট?

৩

রসে পরিপূর পড়ে নাকো উচ্ছলি,
লক্ষ বুকের ওই ত গীতাঞ্জলি।
বকুল মউল রসালের দান যারা
তৃণ কুসুমের দানেতে হয়েছে হারা।
ফুল-মাধুকরী করিয়া বিপুল শ্রম
রচিত হয়েছে এই যে মধুক্রম।

৪

রসের সঙ্গে মিলিয়াছে হেথা সুর
কর্ম্মের সাথে সঙ্গীত সুমধুর।
দানেতে ইহার নামের গন্ধ নাই
অসংবিতের পরিচয় শুধু পাই
যেথা হেরি আমি মৌমাছি মৌচাক
সেই আনন্দে বিস্ময়ে নির্ব্বাক।

তোমার বিরহ মোর এলো কাছে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

বিরহণ্ঠনভরা কাজল প্রহরে অশ্রু ভাসে
নয়নে আমার, রজনীগন্ধার বনে ছুটে আসে
উদ্‌ভ্রান্ত সমীর, ঝরে পড়ে স্মরণের গন্ধরেণু
হৃদয় অঙ্গন তলে,—তুমি নাই, প্রাণে ব্যথা পেনু।
মেঘের মৃদঙ্গ বাজে, ধরণীর এলো পূর্ব্বদ্বারে
ঝরঝর ঝরিষণ ধারা, বসে আছি অন্ধকারে।
নিশীথিনী চলে অভিসারে অরণ্যের অন্তরালে,
চমকে বিজলী ঘন ভাবাবেশে দিক্‌চক্রবালে।

বিষণ্ণ ছায়ার বুকে জোনাকির জ্বলে দীপশিখা,
সজাগ নয়নে রহে প্রতীক্ষায় কেতকী-যূথিকা
কার লাগি কেবা জানে! তুমি যে আসিবে বর্ষারাতে
বলেছিলে যাবার বেলায়! নিদ্রাহারা দৃষ্টিপাতে
সময় বহিয়া যায়, প্রত্যাশায় বাতায়নে একা,
ভাঙনের গান গাহে ভরা নদী, কাঁদে বনে কেকা।
তোমারি পরশ-রাগে এ জীবন ফুটায়েছি মম,
অগোচরে তুমি কোন্ পথ যাবে বাউলের সম!

গগনের মেঘছায়া দোলে চিত্তে মোর,—শূন্য ঘরে
আমি সঙ্গহারা, বসে ভাবি;—তোমার স্বাক্ষরে
একদা করেছি পূর্ণ মোর মরমের কাব্যখানি,
ভুলেযাওয়া বাণী তব আজ সদা করে কানাকানি।
যে প্রেম ফাল্গুনে মোর এলো কাছে নিশীথ আহ্বানে
সাথে তব, ভাগ্যের দুর্যোগ রাতে তারে কোনোখানে
পাই না খুঁজিয়া প্রিয়! তুমি নিয়ে গেছ চুপে চুপে
তোমার বিরহ মোর এলো কাছে বাদলের রূপে।

ষ্টার্লিং পাওনার কথা

অধ্যাপক শ্রীশ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ

আজকাল ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এদেশের পত্রিকা-সমূহ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ প্রায়ই বৃটিশ সরকারকে ভারতের ষ্টার্লিং পাওনা পরিশোধের জন্য তাগাদা দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের বিবৃতি ও মন্তব্য কতকটা গুরুগম্ভীর হয় বলিয়া প্রাথমিক তথ্যাদির অভাবে সাধারণ দেশবাসী সেইগুলি পাঠ করিয়া ষ্টার্লিং পাওনা নামক বস্তুটির সম্বন্ধে পরিষ্কার কোন ধারণা করিতে পারে না। অবশ্য সংবাদপত্রের দৌলতে উপস্থিত এদেশের সাধারণ শিক্ষিত সমাজ বুঝিয়া লইয়াছে যে, ষ্টার্লিং পাওনার সহিত ভারতের সাম্প্রতিক পণ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের যোগ আছে এবং ব্রিটেন যদি যথাসত্বর এই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা না করে তাহা হইলে ভারতসরকারের পক্ষে আর বেশীদিন ভারতীয় অর্থনীতিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। তবে ষ্টার্লিং পাওনা জমিল কেন, ভারতবর্ষ কোথা হইতে ব্রিটেনকে এত টাকা ঋণ প্রদানে সক্ষম হইল, উত্তমর্ণ হইয়াও ভারতবর্ষ কেন ভিক্ষুকের মত অধমর্ণ ব্রিটেনের নিকট ষ্টার্লিং ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে করুণাপ্রার্থী হইয়া আছে, এ সকল সংবাদ এখনও এ দেশের অনেকেই রাখেন না। বলা বাহুল্য আমাদের অন্নবস্ত্রের সমস্ত সমস্যার মূলে লণ্ডনের ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের শাখায় সঞ্চিত এদেশের যে দেড় হাজার কোটি টাকার মত ষ্টার্লিং পাওনা জমিয়া রহিয়াছে তাহার ইতিহাস ও গুরুত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা ভারতের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে আগ্রহশীল প্রত্যেকেরই থাকা উচিত।

ষ্টার্লিং পাওনা বুঝিতে হইলে ব্রিটেনের সহিত ভারতের বহির্বাণিজ্যের সম্পর্কটিও ভাল করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। আজ ইংরাজ রাজা হইয়া এ দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইলেও আসলে সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর বণিকত্বের মোহ আজিও তাহারা ভুলে নাই। ইংরাজ প্রথমে আসিয়াছিল ভারতের বাণিজ্যবাজার গ্রাস করিতে, আজিও তাহারা ভারতে অবাধ বাণিজ্য চালাইবার অধিকার এবং ভারতের অপরিসীম কাঁচামাল সুলভে সংগ্রহ করিবার সুযোগ বজায় রাখিবার জন্যই বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রকার অসুবিধার মধ্যেও ভারতসাম্রাজ্য দখল করিয়া বসিয়া আছে। সকলেই জানেন যে, ব্রিটেন শিল্পজীবী দেশ হইলেও ব্রিটেনের নিজস্ব কাঁচা মাল নাই বলিলেই চলে এবং সেজন্য ব্রিটেনকে তাহার সাম্রাজ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। ভারতবর্ষের প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ ব্রিটেন সস্তাদরে কিনিয়া লইয়া তাহাদের যে শিল্প পণ্য তৈয়ারী করে সেই পণ্যবিক্রয়েই সমগ্র ব্রিটিশ জাতির গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয়। ভারতের বাজারেও ব্রিটিশ পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে আসে এবং আমরা নিজেদের একগুণ দামের কাঁচামাল হইতে নির্ম্মিত পণ্য চতুর্গুণ দামে ব্রিটিশ বণিকের নিকট হইতে কিনিতে বাধ্য হই। ভারতের দারিদ্র্য অত্যন্ত তীব্র বলিয়া সাধারণতঃ ভারতবাসী তাহাদের প্রয়োজনানুরূপ সর্ব্ববিধ পণ্য যথেষ্ট পরিমাণে কিনিতে পারে না এবং ফলে ব্রিটেন ভারতের বাণিজ্যবাজার গ্রাস করিয়াও এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ লাভবান হইতে পারে নাই। ব্রিটেন এদেশে চল্লিশ কোটি লোককে শিল্পপণ্য জোগায় বটে, কিন্তু সেই পণ্যের হিসাবে গড়ে এক চতুর্থাংশ মূল্যের কাঁচামাল ক্রয় করিলেও এ দেশ হইতে বৎসরে এত বেশী টাকার কাঁচা মাল ক্রয় করে যে,

প্রতিবৎসর ভৈ-ভারতীয় বাণিজ্যিক গতি ভারতের অনুকূলেই থাকে। সাধারণ নিয়ম অনুসারে বাণিজ্যিক গতি ভারতের অনুকূলে থাকে বলিয়া ব্রিটেন হইতে ভারতে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ আমদানী হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যক্রমে যথেষ্ট সস্তায় জোগান দেওয়া এই কাঁচামালের মূল্যের দরুণ ন্যায্য প্রাপ্য সুবিধাটুকুও তাহার ভোগ করা হয় নাই। এই যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের বাণিজ্যিক আনুকূল্যজনিত পাওনা টাকা ভারত সরকার ব্রিটেনেই খরচ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং শুধু এই টাকাই খরচ করেন নাই, প্রতি বৎসর আরও কিছু টাকার স্বর্ণ ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবাসী অবশ্য এই দুর্ভাগ্যের অসুবিধা ভোগ করিয়াছে অনেক, কিন্তু এতকাল ব্রিটেনে ভারত সরকারের প্রতি বৎসর যে বিরাট পরিমাণ অর্থ প্রেরণের বাধ্যবাধকতা ছিল, ভারতের আর্থিক শৃঙ্খলা ক্ষুণ্ণ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকিলেও তাহা পাঠাইতে ভারত সরকার কোনদিন ব্যতিক্রম করেন নাই। ব্রিটেনে ভারতের যে আর্থিক দায়িত্ব ছিল তাহার সৃষ্টি হইয়াছিল কতকগুলি ব্যয়ভার বহনের বাধ্যতা হইতে। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস এবং হাই কমিশনারের অফিসের সমূহ ব্যয় ভারতসরকারকে বহন করিতে হয়, ভারত হইতে যে সকল সামরিক ও বেসামরিক ব্রিটিশ কর্ম্মচারী বৃদ্ধবয়সে পেন্সন লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান তাঁহাদের পেন্সনের টাকা নিয়মিতভাবে ভারতসরকারকে পাঠাইতে হয় এবং রেলপথনির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে ভারত সরকার অতীতে নিজেদের জামিনে ব্রিটেনে যে ঋণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহার সুদের দরুণ মোটা টাকাও প্রতি বৎসর ভারত সরকারের পাঠাইবার কথা। এই ভাবে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ পর্য্যন্ত নানা উপলক্ষে ভারতসরকারকে এত অধিক পরিমাণ টাকা ব্রিটেনে পাঠাইতে হইয়াছে যাহা তাহার বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অপেক্ষা বেশী। সুতরাং প্রতি বৎসর এই বাড়তি টাকার সম পরিমাণ সোনা ষ্টার্লিংয়ের হিসাবে ভারত হইতে ব্রিটেনে প্রেরিত হইবার ফলে শিল্পশ্রীসী ব্রিটেনকে সস্তায় কাঁচামাল সরবরাহকারী ও সেই কাঁচামালে তৈয়ারী বিলাতী পণ্য ব্যবহারকারী ভারতবর্ষ অনুকূল বাণিজ্যগতির সকল সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইয়া ব্রিটেনের নিকট দেনাদার ভারতবর্ষ রূপে পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে।

তারপর ১৯৩৯ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ সুরু হইলে ব্রিটেন ও ভারতের আর্থিক সম্পর্কের মধ্যে গুরুতর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। যুদ্ধের প্রথম দিকে ব্রিটেন অবশ্য নগদ মূল্যে পণ্যাদি ক্রয়ের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে যুদ্ধ ঘোরালো হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের বিপুল খরচ চালানো তাহার পক্ষে অসম্ভব হওয়ায় ব্রিটেন আরম্ভ করে ধারে কারবার। এই সময় অর্থাৎ ১৯৪১ সনের শেষ হইতে জাপান হঠাৎ আমেরিকার সহিত যুদ্ধ বাধাইলে ব্রিটেনের যুদ্ধভার ক্রমে আমেরিকার স্কন্ধে হইয়া পড়ে এবং আমেরিকাও ঋণ ও ইজারা নীতির প্রবর্ত্তন দ্বারা ব্রিটেনকে ধারে পণ্য যোগাইয়া সাহায্য করিতে থাকে। বলা বাহুল্য অতঃপর ধারে পণ্যক্রেতা ব্রিটেন ভারতকে অতিমাত্রায় স্বকার্য্যে ব্যবহার করিতে থাকে এবং এইভাবে পণ্য যোগাইয়া ব্রিটেনের নিকট ভারতের প্রচুর পাওনা জমিয়া যায়। তাহাড়া ১৯৪০ সালের এক চুক্তি অনুযায়ী ভারতের সমরব্যয়ের একাংশ বহনে ব্রিটিশ সরকার যে প্রতিশ্রুতি দেন তদ্ধনাও ভারতের হিসাবে পাওনার পরিমাণ স্ফীততর হইতে থাকে। এইভাবে যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতকে বিলাতী আর্থিক দায়িত্ব পালনের জন্য যে

টাকা পাঠাইতে হইত, তাহা পাঠাইবার আর প্রয়োজন তো থাকেই না, অধিকন্তু ভারতবর্ষই দেখিতে দেখিতে যুদ্ধমান ব্রিটেনের একটি বড় পাওনাদার হইয়া উঠে।

ভারতবর্ষের এই ক্রমবর্দ্ধমান পাওনা হইতে ক্রমে ক্রমে ব্রিটেনের নিকট ভারতের অনেক দেনা শোধ হইয়া যায়। এই দেনার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় ভারতীয় রেলপথ সমূহের জন্য প্রদত্ত ব্রিটিশ মূলধনের কথা। ১৯৩৯ সালে সুদ প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে ইংলণ্ডের নিকট ভারতীয় ঋণের সর্ব্বসমেত পরিমাণ ছিল ৪৩৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা; এই ঋণের প্রায় সবই এখন শোধ হইয়া গিয়াছে, যে সামান্য অংশ বাকী আছে তাহা সর্ব্বসাকুল্যে ৬৭ কোটি টাকার বেশী হইবে না। বলা বাহুল্য এইভাবে ৪ শত কোটি টাকার বেশী বিলাতী ঋণ পরিশোধিত হওয়ায় বৎসরে সুদের দরুণ ভারতের অন্ততঃ ২০ কোটি টাকা বাঁচিয়া গিয়াছে। এই বিলাতী দেনা শোধ হইবার পরও ভারতের পাওনা হিসাবে ব্রিটেনে এখন প্রায় বেড় হাজার কোটী টাকা জমিয়াছে। আর্থিক অনটনের অজুহাতে ভারতীয় পণ্যাদি গ্রহণের জন্য ব্রিটেন এখন নগদ মূল্য দিতেছে না, পাওনা স্বীকার করিয়া ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখায় জমা রাখিতেছে ষ্টার্লিং বণ্ড এবং এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি জামিন করিয়া ভারত-সরকার ভারতের জোগানদার বা পাওনাদারদের দিবার জন্য নোটের পর নোট ছাপিয়া চলিয়াছেন। ব্রিটিশ সরকার এখনও বলেন নাই কবে তাঁহারা এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পরিবর্ত্তে নগদ মুদ্রায় দেনা শোধ করিবেন, অথচ এই প্রাপ্য পরিশোধের আশায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর নির্ভর করিয়াই ভারত সরকার ভারতে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিয়াছেন। যুদ্ধের পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথমে ভারতে চলতি নোটের পরিমাণ ছিল ১৭৮ কোটি টাকা, এই নোট এখন বৃদ্ধি পাইয়া ১১৩৬ কোটি টাকায় পৌঁছাইয়াছে, অথচ এই নোটের জন্য স্বর্ণজামিন ১৯৩৯ সালের তুলনায় এখন কিছুই বাড়ে নাই। সকলেই জানেন যে, নোটের মূল্য কাগজখানি নয়, ইহাতে লিখিত মুদ্রাপ্রদানের প্রতিশ্রুতি, অর্থাৎ চাহিবামাত্র সমমূল্যে স্বর্ণ প্রদানের অঙ্গীকারটুকুই নোটের আসল মূল্য। ভারতের ১১০ শত কোটি টাকার বেশী নোটের পরিবর্ত্তে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে আছে মাত্র ৪৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের স্বর্ণ এবং বাকী টাকা প্রদানের সমস্ত দায়িত্ব নির্ভর করিতেছে ষ্টার্লিং পাওনার রূপান্তরের সম্ভাবনার উপর; এখন ভারতের চলতি নোটের জামিন হিসাবে হাজার কোটি টাকার ষ্টার্লিং সিকিউরিটিকে ধরা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় সহানুভূতিতে বা ফাঁপাট টাকার স্বাচ্ছন্দ্য-লাভের মোহে ভারতীয় মুদ্রানীতির এই শিথিলতায় দেশবাসী আপত্তি করিতেছে না বটে, তবে একথা সত্য যে আর কিছুদিন পরেই অর্থাৎ যুদ্ধের অবসানে আর্থিক বাজারে মন্দাভাব দেখা দিলেই এসম্বন্ধে জনসাধারণ সজাগ হইয়া উঠিবে। এই জন্যই বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণ ষ্টার্লিং পাওনা, পরিশোধের জন্য কড়া তাগাদা দিতে ভারত-সরকারকে উপদেশ দিতেছেন এবং যদি তাঁহাদের এই পরামর্শ ভারতসরকার কার্য্যে পরিণত না করেন, তাহা হইলে ভারতের অর্থনীতিক বিপর্য্যয় যে অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

আগেই বলা হইয়াছে ষ্টার্লিং পাওনার পরিবর্ত্তে অযথা কাগজের নোট ছাপাইয়া ভারতসরকার এদেশে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করিয়াছেন। যুদ্ধের দরুণ অনেকের হাতে আসিয়াছে প্রচুর টাকা; অথচ এই টাকার অনুদ্দেশ্যের মূল্য থাকিলেও তাহার বিনিময়ে বিদেশ হইতে বস্তুপাতি আনিয়া কলকারখানা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইতেছে না। কাগজী নোটে

পরিবর্ত্তে ব্রিটেনের প্রদত্ত স্বর্ণ যদি ভারতসরকারের হাতে আসিত (নোটের পরিবর্ত্তে জামিনস্বরূপ সেই স্বর্ণ যদি রক্ষিত হইত) তাহা হইলে ভারতের মুদ্রাবৃদ্ধির সঙ্গে শিল্পপ্রসার ঘটিয়া সাধিত হইত ভারতের স্থায়ী কল্যাণ, কিন্তু এক্ষেত্রে টাকা বাড়ার অর্থ হইয়াছে যুদ্ধোত্তীন পণ্যাভাবের দিনে অর্থবান ব্যক্তিদের যে কোন মূল্যে সেই পণ্যসংগ্রহের লোভ এবং ফলে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রয়োজনীয় পণ্যাদির অভাবে রিক্ততার শেষপ্রান্তে দুঃখময় জীবনযাপনে বাধ্য হইতেছে। এমন কি এইভাবে সৃষ্ট পণ্যাভাবের দরুণই বাংলার দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। বলা বাহুল্য, দেশের বর্দ্ধিত পরিমাণ টাকা যদি অল্প সুদে বা বিনা সুদে ব্যাঙ্কের খাতায় আটক না থাকিয়া শিল্পাদি সংগঠনে ব্যয়িত হইত তাহা হইলে অন্ততঃ কিছু কিছু কর্ম্মের সংস্থান হইয়া এইসব হতভাগ্যের অনেকেরই জীবনরক্ষার সম্ভাবনা থাকিত। কাজে কাজেই একথা সত্য যে, একদিন ষ্টার্লিং পাওনা ভারতবর্ষ ফিরিয়া পাইলেও এই পাওনা সঞ্চয়ের পশ্চাতে এদেশে অভাব দারিদ্র্য ও মৃত্যুর যে করুণ ইতিহাস সৃষ্টি হইয়াছে, সে ক্ষতি কিছুতেই পূরণ হইবে না।

তাছাড়া এই ষ্টার্লিং পাওনা কবে আদায় হইবে সে সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত আমরা পাওনাদার হইয়াও কোন সঠিক সংবাদ পাই নাই। গত ব্রেটন-উডস সম্মেলনে ইংলণ্ডের পক্ষ হইতে অর্থনীতিবিদ্ লর্ড কেনেস স্বীকার করেন যে, ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং যথাসত্বর ফিরাইয়া দেওয়া উচিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ইহাও বলেন যে, বৃটেনের বর্ত্তমানে যেরূপ আর্থিক অবস্থা তাহাতে তাহার পক্ষে বহির্বাণিজ্য সংগঠন না করিয়া এই দেনা শোধ করা সম্ভব নয়; সুতরাং এজন্য নিরুপায় হইয়াই ইংলণ্ড ভারতকে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিতেছে। যুদ্ধের সর্ব্বগ্রাসী খরচ বহন করিতে ব্রিটেনকে সহায় তাহার বৈদেশিক সম্পত্তির বহুলাংশ হারাইতে হইয়াছে এবং তাহার একমাত্র বাঁচিবার উপায় রপ্তানিবাণিজ্য পর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় ইচ্ছা থাকিলেও ভারতের পাওনা বিরাট পরিমাণ ঋণ পরিশোধ বর্ত্তমানে ব্রিটেনের সাধ্যাতীত বলিয়াই মনে হয়। ভারতের অনেকে অবিলম্বে এই পাওনা ফিরিয়া পাইবার আশায় শিল্প-প্রগতির স্বপ্ন দেখিতেছেন বটে, তবে এইরূপ স্বপ্ন যে অবিলম্বে সার্থক হইবে এমন কোন লক্ষণ এখনও দেখা যায় নাই। বিগত প্যাসিফিক্ রিলেশন্স্ কন্ফারেন্সে এসম্বন্ধে একজন বড় ব্রিটিশ সরকারী কর্ম্মচারী সোজাসুজি যে কথা বলিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলেও আশু ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা কতখানি তাহা পরিষ্কার বুঝা যাইবে। উক্ত কর্মচারী বলিয়াছেন—

"If Indians are basing their plans for the industrialisation of their country on their ability to get within an early period the repayment of their balances in London and the rest of the Empire, they will be disappointed."

এইত গেল ষ্টার্লিং পাওনা ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনার দিক। ইহা ছাড়া এই ঋণ ব্রিটেন যবেই পরিশোধ করুক সেই পরিশোধ তাহারা পূর্ণমাত্রায় করিবে কি না, অর্থাৎ ভারতবর্ষ তাহার পাওনা সম্পূর্ণভাবে আদায় করিতে পারিবে কি না, সে সম্বন্ধেও এখন অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে। সম্প্রতি ব্রিটেনের একখানি সংবাদপত্র এই পাওনার একাংশ ভারতে ফিরাইয়া দিবার উদ্যোগ

প্রচার করিতে শুরু করিতেছে, ভারতবর্ষ যুদ্ধের সময় ব্রিটেনকে যে সকল মাল্ যোগাইয়াছে সেগুলির জন্য দাবী করিতেছে অত্যধিক মূল্য এবং এই মূল্য ন্যায্য ভাবে ধরিলে ভারতের প্রকৃত পাওনা অনেক কমিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য অভিযোগটি সত্যই গুরুতর এবং ইহার সহিত মিত্রপক্ষীয় জাতিসমূহের পরস্পরের সম্বন্ধে সততাবোধের প্রশ্ন জড়ান আছে। তবে সুখের কথা শেষ পর্য্যন্ত এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের খরচপত্র সম্বন্ধে তদন্ত করিতে কয়েকজন বিশেষজ্ঞ লইয়া একটি পার্লামেণ্টারী কমিটি বসিয়াছিল এবং কমিটি সম্প্রতি মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারতসরকার বরাবর ব্রিটিশ সৈন্যদের বা ব্রিটিশ সরকারকে নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই পণ্যাদি সরবরাহ করিয়াছেন এবং মোটের উপর অনেক জিনিষ ব্রিটিশ সরকার ভারতে যে দরে পাইবার সুযোগ পাইয়াছেন, ভারতীয়েরা পর্য্যন্ত সে দরে সে সকল পণ্য কিনিতে পায় নাই। যুদ্ধের প্রথম তিন বৎসর যে দরে বাহির হইতে ভারতে ইস্পাত আমদানি হইয়াছিল, ব্রিটিশ সরকারকে ভারতে ক্রীত ইস্পাতের জন্য তদপেক্ষা এক পয়সা বেশী দিতে হয় নাই এবং প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ তিন বৎসর চলিবার পর ভারতে ইস্পাতের চূড়ান্ত অভাব এবং মূল্য বৃদ্ধির সময়েও মোটের উপর শতকরা ২৭ ভাগের বেশী মূল্য বৃদ্ধির দায় ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপান হয় নাই। কাপড়ের সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। ভারতের জনসাধারণকে বঞ্চিত করিয়াও ব্রিটিশ সৈন্যগণকে ভারতসরকার যথাসম্ভব কাপড় যোগাইয়াছেন এবং এই সময় যখন ভারতের সাধারণ বাজারে কাপড়ের মূল্যবৃদ্ধি পাইয়াছে শতকরা ৪০০ ভাগ, তখনও ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ভারতবর্ষ শতকরা ১০০ ভাগের বেশী মূল্যবৃদ্ধি দাবী করে নাই। পরে আবার উহা হইতেও শতকরা ১৫ ভাগ মূল্যহ্রাসের ব্যবস্থা করিয়া ভারতসরকার যথেষ্ট সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

এইভাবে ভারতের পাওনা টাকার ন্যায্যতা সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ না থাকিলেও এই পাওনা কমাইবার চেষ্টা যখন ব্রিটেনের পক্ষে একবার দেখা দিয়াছে, তখন যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সম্পূর্ণ পাওনা টাকা ফিরিয়া পাওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অনেকেই আশ্বস্ত হইতে পারিতেছেন না। এই অপচেষ্টার প্রথম পরিচয় ব্যর্থ হইলেও পুরো টাকা ফিরাইয়া দিবার মতলব না থাকিলে ব্রিটেনের দিক হইতে ফাঁকি দিবার নূতন কোন চেষ্টা প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। প্রকৃতপক্ষে ষ্টার্লিং সিকিউরিটিতে ভারতের এই বিপুল অর্থ আটক থাকায় ভারতের ক্ষতি হইতেছে অসামান্য। যুদ্ধব্যয় এই টাকা হইতে চালান সম্ভব হইলেও ইহার অভাবে ভারতসরকার ঋণ সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের খরচ চালাইতেছেন এবং এই ঋণপত্র সমূহের জন্য মোটামুটি ভাবে সুদ প্রদান করিতেছেন শতকরা ৩ টাকা হারে। অথচ দুঃখের কথা এই যে ভারতের পাওনা ষ্টার্লিংয়ের জন্য আমরা সুদ হিসাবে অতি সামান্য পরিমাণ অর্থ পাইতেছি। ব্রিটেনেরই বাজারে যখন শতকরা ২ ভাগ ২½ ভাগ সুদের অজস্র ঋণপত্র রহিয়াছে তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ষ্টার্লিং সিকিউরিটি ব্রিটিশ ট্রেজারী বিলে লগ্নী করিয়া উর্দ্ধপক্ষে সুদ পাইতেছে শতকরা ১ টাকা হারে; এবং বলা বাহুল্য, এই ভাবে ১২শত কোটি টাকার বেশী ষ্টার্লিং পাওনার জন্য ভারতের ঋণপত্রসমূহের জন্য দেয় সুদের বিবেচনায় ভারত সরকারকে প্রতি বৎসর অন্ততঃ ২৪কোটি টাকা ক্ষতিস্বীকার করিতে হইতেছে। এই

ভাবে অকারণে দরিদ্র ভারতবর্ষের যে লোকসান হইতেছে তাহা আরও তীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে ষ্টার্লিং পাওনার পরিবর্ত্তে যন্ত্রপাতির আমদানি দ্বারা এ দেশে শিল্প প্রসার হইতেছে না বলিয়া। শুধু ইংলণ্ডকে জিনিষপত্র সরবরাহ করিয়া নয়, আমেরিকাকে জিনিষ-পত্র সরবরাহ করিয়াও ষ্টার্লিংয়ের মত ভারতের বহু পরিমাণ ডলার পাওনা হইতেছে কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের নির্দ্দেশে সেই ডলারের পরিবর্ত্তে ভারতে মার্কিণ শিল্প সামগ্রী না আনাইয়া ভারতসরকার সেই ডলার সমমূল্যের ষ্টার্লিং পাওনায় রূপান্তরিত করিতেছেন এবং ব্রিটিশ সরকার ভারতের পাওনা ডলারের বিনিময়ে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যাইতেছেন নানাবিধ পণ্য। এইভাবে ষ্টার্লিং সিকিউরিটির পাহাড় জমিয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে দেখা দিয়াছে ফাঁপাই টাকার বাহুল্য, পণ্যাভাব, এমন কি অসম্ভব পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দুর্ভিক্ষ; অথচ ভারতের প্রভূত অসুবিধা সৃষ্টি হইলেও ব্রিটিশ সরকার স্বদেশে মুদ্রানীতির সমতা এবং পণ্যের চাহিদা ও জোগানের সামঞ্জস্য বরাবর রক্ষা করিয়া চলিতেছেন।

এই ভাবে দেখিতে গেলে ষ্টার্লিং পাওনা জমিয়া উঠা ভারতের পক্ষে কোনদিক হইতে সুবিধাজনক হয় নাই এবং পাওনাদার হইয়াও এই যুদ্ধের আমলে তাহাকে বহু দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে। এত দুঃখ সহিবার পরও যদি ভারত শতকরা একশত ভাগ পাওনা টাকা ফিরিয়া পায় তাহা নিঃসন্দেহে বহু ভাগ্য বলিয়া মনে করিবে। গত যুদ্ধের অবসানে ভারতের পাওনা ১৯০ কোটি টাকা ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ যুদ্ধঋণবিলে ভারতসাম্রাজ্যের দান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবারও অনুরূপ কিছু ঘটিবে কিনা এখনই বলা সম্ভব নয়।

লর্ড ওয়াভেল সম্প্রতি ভারতের শাসন-তান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে যে সকল প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাতে ভারতের রাজনৈতিক বনিয়াদের সহিত অর্থনৈতিক বনিয়াদ পুনর্গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধেও অনেকে আশাবাদী হইয়া উঠিয়াছেন। লর্ড ওয়াভেলের আন্তরিকতায় আমাদের আস্থা আছে এবং আমরাও আশা করি যে, অতঃপর ব্রিটেনের দিক হইতে বর্ত্তমান নীতি পরিত্যক্ত হইবে। বলা নিষ্প্রয়োজন, এই আশা সার্থক হইলে নবগঠিত ভারত সরকারের দিক হইতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া ভারতের আর্থিক পুনর্গঠনের একমাত্র অবলম্বন ষ্টার্লিং পাওনা যথাসত্বর আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিবার উৎসাহ দেখা যাইবে।

ব্যঙ্গরসে কবিশেখর কালিদাস রায়

অধ্যাপক শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য্য এম্-এ

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ করুণ রসকে হাস্যরসের বিরোধী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ 'করুণা'ই এক হিসাবে হাস্যরসের প্রাণ। তাঁহারা বলেন বাক্য বেশ এবং ব্যবহারের বৈকৃতিই হাস্যরসোৎপত্তির মূল উপায়। এ কথাটা মোটামুটি মানিয়া লইলেও করুণরসকে হাস্যরসের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। কারণ, বাক্য বেশ বা ব্যবহারের যে বিকৃতি—যে বিকৃতি হাস্যোদ্ভবের হেতু—তাহা আমাদের মনে বিশুদ্ধ আনন্দ সঞ্চার করিয়া আমাদের

মুখে হাসি ফুটায় না। বস্তুত তাহা আমাদের অন্তঃকরণে একপ্রকার বেদনার সঞ্চার করে এবং সেই বেদনার ফলেই আমরা হাসি। বেদনার ফলে আমরা হাসি—এই কথা শুনিয়া পাঠকের হাসি আসিতে পারে। তাহারও কারণ ঐ বেদনা। যে ধারণায় আমরা অভ্যস্ত তাহার বিপরীত কথা শুনিলে মন পীড়িত হয়। আমরা জানি আনন্দেই লোকে হাসে এবং বেদনায় কাঁদে, অন্ততঃ দুঃখ পায়। কিন্তু যদি যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারি, বেদনা যেমন কাঁদাইতে পারে তেমনি তাহার হাসাইবারও শক্তি আছে, তাহা হইলে আমাদের পূর্বতন ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং এই আপাতবিরোধী মন্তব্য হাস্যোদ্রেকের কারণ হইবে না।

হাস্যরসের হাসি ক্রন্দনেরই নামান্তর মাত্র। যে পীড়ার মাত্রা অধিক হইলে কাঁদায় তাহাই অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত হইলে হাসায়। সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে আবৃত করিয়া মুখে একটা বীভৎস মুখোস পরিয়া যদি আপনার প্রকাশ্য বন্ধু আপনার সম্মুখে উপস্থিত হন তাহা হইলে বন্ধুর চাপল্যে আপনার হাস্যোদ্রেক করিবে। কিন্তু গভীর রাত্রে একাকী অন্ধকার পথে যাইতে যাইতে যদি সম্মুখে হঠাৎ এইরূপ একটা দৃশ্য চোখে পড়ে তাহা হইলে ভয়ে মূর্ছা যাওয়াও বিচিত্র নয়। উভয়তই মন পীড়া পায়। সে পীড়ার মাত্রা এক ক্ষেত্রে কম অন্য ক্ষেত্রে বেশী।

সাহিত্যিক হাস্যরসকে এইভাবেই বিচার করিতে হইবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে হাস্যরসের পরিধি যতটা সংকীর্ণ বলিয়া বাঙ্গালীর ধারণা, উহা ততটা সংকীর্ণ নয়। প্রাচীন কাল হইতে অধুনাতন কাল পর্যন্ত বহু লেখকের রচনায় বাঙ্গালা সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে। ইহাদের অনেকের লেখায় উচ্চস্তরের হাস্যরস দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের সাহিত্যে তো কথাই নাই প্রাচীন সাহিত্যেও বিশুদ্ধ রসিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কথাই ধরা যাউক। তাঁহার সৃষ্ট ভাঁড়ুদত্তের চরিত্র আধুনিক যুগের মানদণ্ডেও বিচারসহ।

বর্তমান যুগে যাঁহারা হাস্যরসরচনায় বাঙ্গালা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, সুকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। একান্তভাবে হাস্যরসাত্মক রচনা সকলে লিখেন না। কিন্তু যে সব সাহিত্যিক গল্পে উপন্যাসে নাটকে এমন কি প্রবন্ধের মধ্যেও মনোজ্ঞ হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাই কি কম? শরৎচন্দ্রের রচনার প্রতি ছত্রে যে হীরকোজ্জ্বল হাস্যরস দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই তাঁহার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ বলিয়া আমি মনে করি।

হাস্যরসের গবেষণা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নহে। হাস্যরস রচনায় যে সব লেখক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিভা অথবা তাঁহাদের সকলের রচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিবার জন্যও এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আধুনিক বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবি শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের হাস্যরসাত্মক কবিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

কালিদাসবাবু একাধারে প্রবন্ধলেখক, সমালোচক, বৈয়াকরণ এবং সাহিত্য-ঐতিহাসিক। কিন্তু বাঙ্গালাদেশ অর্থাৎ বাঙ্গালার সাধারণ পাঠকসমাজের কাছে তিনি প্রধানতঃ কবি বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিধি যতই বিস্তৃত এবং গভীরতা যতই দূরগামী হউক,

কেহই তাঁহাকে শাস্ত্রী বলিয়া সকুণ্ঠ সম্ভ্রম করিবে না। সকলেই কবিশেখর বলিয়া সাদর সম্মান করিবে। বহুপত্নীক রাজার পাটরাণী একজনই থাকেন! অথচ আর সকল রাণীই যে পাটরাণীর অপেক্ষা রূপেগুণে নিরেস এমন নয়।

কিন্তু কবি বলিয়াও যে সম্মান সমাদর তাঁহার প্রাপ্য তাহারও সবটুকু তিনি পাইয়াছেন কি না তাহা অবশ্যই বিচার করিতে হইবে। আমার মনে হয় তাঁহার কবি-প্রতিভার একটা দিকই আমাদের চোখে পড়িয়াছে, আর একটা দিকে আমরা যথাযোগ্য দৃষ্টি দিই নাই। তাঁহার 'পর্ণপুট', 'বল্লরী' 'ব্রজবেণু' আমাদের যত পরিচিত তাঁহার হাসির কবিতা ততটা পরিচিত বলিয়া মনে হয় না। কালিদাসবাবুর হাসির কবিতাগুলি যে মর্যাদা পাইবার অধিকারী আমার মনে হয় সে মর্যাদা তাহারা পায় নাই।

তাঁহার কবিতার মধ্যে, বিশেষত ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে, অনেক স্থলেই একটু জ্বালা আছে। যে জ্বালা তিনি সারা-জীবনের অভিজ্ঞতায় নিজে লাভ করিয়াছেন সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাকে সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন—পঞ্চশরকে ভস্ম করিয়া শিব যেমন তাহাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। "যাহা কিছু ভুয়ো, ভাঁওতা, মেকি ও ভণ্ডামি এই রচনাগুলির অভিযান তাহারই বিরুদ্ধে।"

বাঙ্গালা ভাষার হালচাল দেখিয়া কবি যে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, সেই ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার 'পাগলা নাচে' কবিতায়। যদি হাতে আইন থাকিত তাহা হইলে যাহাদের পাগলামিবাদে পুরিয়া খুশি হইতেন কবিতায় তাহাদেরই এক হাত লইয়াছেন :

পাগলা নাচে তাধেই তাধেই আগ্‌লারে তোর বাংলাভাষা,
আর না বাঁচে তলিয়ে গেল তোদের গরব তোদের আশা।
কাব্যে নাচে নাট্যে নাচে গল্পে নাচে, পাঠ্যে নাচে
নটরাজের নৃত্য খাসা।

'সুখবর' কবিতায় এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের প্রতি ইঙ্গিত আছে :

শিক্ষিতেরা লিখছিল সব কেবল দেশের চর্মকথা,
খাঁটি জিনিস এবার দেবে, ফুটবে দেশের মর্মব্যথা।
তোল্ পিঠে তোল্ খোল পাখোয়াজ, বঙ্গবাণীর মণ্ডপে আজ
বাজবে মাদল চলবে কেবল রাঙ্গবেশে নাচ সঙ্ তামাসা।

অত্যাধুনিক সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবি বিদ্রূপ করিয়াছেন :

হাঁড়ির খবর নাড়ীর খবর বাদ দিয়ে কি সাহিত্য হয়?
সাহিত্যিক যে দেশের সেবক কাজটা তাহার দায়িত্বময়।
দেখ সারা দেশটা খুঁজে ভরা বমন ঘায়ের পুঁজে,
ম্যালেরিয়া যক্ষ্মাকাশে বাদ দিলে কি চলে রে ভাই?

মলাট পড়িয়া যাঁহারা সমালোচনা করেন, হুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ সমালোচকের অসদ্ভাব নাই, তাঁহাদের প্রতি কবির কটাক্ষ :

বইটা পড়ে লাগল কেমন জানতে তুমি চেয়েছিলে,
ভূমিকাতে যা লিখেছে তার সাথে মোর মতটি মিলে।
কি বলিলে? ভূমিকা নাই? ওঃ তা হবে। সেই কথাটাই
লিখত যদি ভূমিকা কেউ নিশ্চয়ইত নিখুঁত ওরা।

পুস্তক-সমালোচকের উপর কবির ক্রোধটা কিছু বেশী। এই একই বিষয় অবলম্বনে কবি একাধিক কবিতা লিখিয়াছেন। সব কবিতা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই কারণ, বিষয়ের ঐক্যবশতঃ এগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের অভাব। তাহা ছাড়া ইহাদের অধিকাংশই এক ছন্দে রচিত।

সাহিত্যপ্রসঙ্গ ছাড়াও যে সব কবিতা আছে তাহাদের মধ্যে 'মুরুব্বি,' 'হিংসার অপবাদ,' 'কার্পণ্য,' 'ব্যর্থ হিংসা,' 'মিথ্যা অপবাদ,' 'নিজের কথা,' 'মাতৃভক্ত,' 'দাতা,' 'আদর্শ লোকবিচার'—এগুলি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। 'আদর্শ লোকবিচার' সাহিত্য সমালোচনারই রকমফের:

রমেশ রায়ের চাটগাঁ বাড়ী? তবে ত বদ হতেই হবে।
চয় ভাদুরী হাড়-বজ্জাৎ বারেন্দ্র হয় ভদ্র কবে?
গুপ্ত যখন বন্দি যখন
কথ্খনো সে নয় ক সুজন।
বাঙ্গাল নাকি উমেশ চাকী? লোক তো সোজা নয়ক তবে!

যে অসাধু সে যখন সাধুত্বের অহঙ্কার করে, যে মূর্খ সে যখন পাণ্ডিত্য দেখাইতে চায়, যে কৃপণ সে যখন দানের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে তখন সে পরিহাসের পাত্র হয়। কবির লেখায় এইরূপ ভণ্ডামির প্রতি বিদ্রূপ অনেক স্থলেই খুব তীব্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। 'নিজের কথা' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি:

নিজের কথা বলাও করে বলাও যেন একটা দোষ,
আপন কথা একটি দিনও বলেছে এই নন্দ ঘোষ?
এই যে আমার ছোট ছেলে
এম-এ, ল-য়ে বৃত্তি পেলে,
বলিছি কি কন্যা বিয়ে সাধছে হাকিম চন্দ্র বোস?

বিদ্রূপ মাত্রেরই মূলে থাকে একটা আঘাত দিবার চেষ্টা। কার্যতঃ ইহা আঘাতের প্রত্যাঘাত। যে ব্যক্তি স্বীয় কর্মের দ্বারা কবির মনে আঘাত দিয়াছে কবি তাহার প্রতিই বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু বাণ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়াছে কি না বলা বড় কঠিন। যে বাণ একজনকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায় তাহা যেমন সহজে লক্ষ্যবেধ করে বহুকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করিলে তত সহজে করে না। কারণ, লক্ষ্যটা তখন অনেকটা অলক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। কবির বই না পড়িয়া যদি কোনো সমালোচক সমালোচনা লিখিয়া থাকেন কবি তো তাঁহার নাম ধরিয়া গালাগালি দিতে পারেন না, অন্ততঃ দিলে তাহা সাহিত্য হইত না। ব্যক্তির প্রতি যে বিদ্বেষ তাহা এখানে ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া শ্রেণীকে স্পর্শ করিয়াছে। তাই সাহিত্যে ইহা দুঃসহ হয় নাই।

আক্রমণ যত ব্যাপক হয় হাস্যরস ততই উদার এবং উপভোগ্য হইয়া উঠে, দাহ যত কমে হাস্যরসের মাধুর্য ততই বৃদ্ধি পায়। কালিদাসবাবুর রঙ্গ কবিতাগুলিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ কবিতায় পরিপূর্ণ "রসকদম্ব" গ্রন্থখানি যাঁহারা পড়েন নাই তাঁহারা কালিদাসবাবুর আংশিক পরিচয় মাত্র পাইয়াছেন।

"শ্রাবণ ঘন বরিষণ মেঘ"

শ্রীকিরণশঙ্কর গুপ্ত

শ্রাবণ ঘন বরিষণ—মেঘ
গরজে গগনে গগনে
ওপারে উতলা কলাপী—এপারে—
মৌন ধরণী মগনে।
হৃদয় বাঁধন মানে না—
আপন খেয়ালে হারাতে সে চায়—
কোথায় সে তাও জানে না—

যে বায় তাহারে ডাকিছে বিমনা—
এ ঘরে এ মহালগনে।
সব আছে তবু কি যেন কি নাই—
আঁখির তিয়াষা কেন?
সবার মাঝারে খুঁজিয়া ফিরিছে
আপন প্রিয়ারে যেন!
কে দেবে তাহারে কহি—
'যারে চাও আজ সব পাওয়া শেষে
আমি সে পথিক নহি।'

যায় নাকো ধরা সে সুরখানিরে—
যেবা—গান শেষে বাজে সঘনে!

বনফুল

শ্রীসাধনা গুহ বি-এ

দখিন বাতাস যবে এল কুঞ্জবনে,
শুধাইল জনে জনে,—
সুন্দর আসিছে স্বর্ণ রথে,
বনপথে,
আজি তারে কিবা দিবে দান?
পিক কহে দিব শুধু গান,
কহিলা অশথ
কিশলয়ে সাজাইব পথ।

নিরালা কোণেতে ছিল ক্ষুদ্র বনফুল
অনুরাগে উন্মত্ত আকুল,
দখিন বাতাস যবে আসি
শুধাইল তারে হাসি
তুমি তারে কিবা দিবে দান?
"নাহি সাজ, নাহি কোন গান,
প্রেমের পরশ বুলাইয়া পায়
আশীষ মাগিয়া লইব মাথায়"
কহে বনফুল
আনন্দে আকুল।

রাজপরিবারের সংবাদ

মহারাজকুমারী রাণী ইলা দেবীর পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর ব্রহ্মরণক্ষেত্র হইতে এবং মহারাজকুমার শ্রীইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণ ও ঈশরাণী সাহেবা আহ্‌মেদনগর হইতে দার্জ্জিলিংএ শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবার সকাশে আসিয়া উপস্থিত হন। প্রায় এক সপ্তাহ মাতৃসকাশে অবস্থান করিবার পর তাঁহারা দার্জ্জিলিং পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব কর্ম্মস্থলাভিমুখে যাত্রা করেন।

জয়পুরমহারাণী শ্রীশ্রীগায়ত্রী দেবী ও দেওয়াসমহারাণী শ্রীশ্রীমেনকা দেবী দার্জ্জিলিং হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

৺মহারাজকুমারীর পুত্রকন্যাগণ, জামাতা কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ এবং মহারাজকুমারের পুত্র ও কন্যা সহ শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা দার্জ্জিলিংএ অবস্থান করিতেছেন।

স্থানীয় সংবাদ

কুচবিহারে মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র—

ভারতবর্ষে শিশু মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক; ইহার প্রধান কারণ এই যে শিশুজন্মের পূর্ব্বে মাতাদের উপযুক্ত যত্ন লওয়া হয় না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় বাসের ফলে মাতৃগণ যে সকল শিশুর জন্ম দেন তাহারা অধিকাংশই হয় দুর্ব্বল ও রুগ্ন এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। গর্ভিণী মাতাদের এবং নবজাত শিশুর যত্ন লওয়া দেশের ভবিষ্যত মঙ্গলের জন্য একান্ত আবশ্যক; এই জন্য দেশের অজ্ঞ জনসাধারণের সামাজিক চেতনা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে কুচবিহার রাজসরকার সহরের কেন্দ্রস্থলে একটি মাতৃমঙ্গল ও শিশুসদন প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিয়াছেন; ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে মহারাজা ভূপ বাহাদুর স্বয়ং এই প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধনকার্য্য সম্পন্ন করেন; এবং সেই হইতে এই প্রতিষ্ঠান সন্তানসম্ভবা মাতৃগণ ও নবজাত শিশুগণকে নানাবিধ সাহায্য করিয়া আসিতেছে।

রাজসরকার এই প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ করিয়াছেন এবং ইহার পরিচালনাভার রাজ্যের সিভিল সার্জ্জন ও হেল্‌থ অফিসারের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। সদর হাসপাতালের লেডী ডাক্তার প্রত্যহ এই কেন্দ্রে উপস্থিত থাকিয়া মাতা ও শিশুদের প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত একজন নার্স এখানে কার্য্য করিয়া থাকেন; প্রয়োজন মত এই নার্স ও সদর হাসপাতালের ধাত্রী গৃহে গৃহে যাইয়া সন্তানসম্ভবা মাতাদের উপদেশাদি দেন এবং প্রসবকার্য্য সম্পন্ন করান। শিশুগণকে এই কেন্দ্র হইতে বিনামূল্যে দুগ্ধ প্রদান করা হয় এবং স্নান করাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দেওয়া হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের জন্য একজন নারী স্বাস্থ্য-পরিদর্শিকা (Lady Health Visitor) নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের নার্সকে সঙ্গে লইয়া গৃহে গৃহে ঘুরিয়া বেড়ান এবং সন্তানসম্ভবা নারীগণকে খাদ্য, ব্যায়াম, পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দেন এবং প্রয়োজনবোধে তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠানে আসিয়া লেডী ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইতে উৎসাহিত করেন। নবপ্রসূতা মাতা ও নবজাত শিশুগণ সম্বন্ধেও তিনি প্রয়োজনীয় উপদেশাদি দিয়া থাকেন।

কুচবিহার দরবারের আদেশে বিভিন্ন মহকুমা সহরের মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ স্ব স্ব এলাকায় ধাত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন; তাঁহারা প্রসবকার্য্য করান ব্যতীত আসন্ন-প্রসবা ও নবপ্রসূতা মাতৃগণের ও শিশুগণের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া যথোপযুক্ত উপদেশাদি দিয়া থাকেন।

কুচবিহারে যক্ষ্মা-নিবারণ প্রচেষ্টা—

কুচবিহার রাজ্যে যক্ষ্মা-নিবারণ প্রচেষ্টা ১৯৩৬ সালে আরম্ভ হয়; এই বৎসর লেডী লিন্‌লিথ্‌গোর আবেদনে মহারাজ ভূপ বাহাদুর ভারতবর্ষে যক্ষ্মা-নিবারণ ও যক্ষ্মা রোগীদের সাহায্যকল্পে সম্রাট্ বাহাদুরের ভাণ্ডারে ৫০০০ টাকা এবং দার্জ্জিলিংএর যক্ষ্মানিবারণী ভাণ্ডারে ১০০০ টাকা চাঁদা প্রদান করেন। এই সময় কুচবিহার রাজ্যেও একটি যক্ষ্মা-নিবারণী ভাণ্ডার খোলা হয় এবং সরকারী কর্ম্মচারী ও স্থানীয় বেসরকারী ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। প্রচার কার্য্যের সুবিধার জন্য নানাবিধ পুস্তিকা ছাপাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

রাজ্যে একটি যক্ষ্মা-সমিতি State (Tuberculosis Association) স্থাপিত হয় এবং মহারাজা ভূপ বাহাদুর অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার পৃষ্ঠপোষক পদ গ্রহণ করেন। এই সমিতি স্থাপিত হইবার সময় মহারাজা ভূপ বাহাদুরের সভাপতিত্বে একটি সভা হয়; জনসাধারণ যেরূপ উৎসাহের সহিত যক্ষ্মানিবারণ প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছেন তাহাতে মহারাজা আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আশা করেন যে শীঘ্রই এই রাজ্য হইতে যক্ষ্মারোগ বিতাড়নের জন্য সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বিত হইবে।

যক্ষ্মা-সমিতি কুচবিহারে একটি যক্ষ্মা-হাসপাতাল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন; কিন্তু গৃহনির্ম্মাণের মালমশলার দুর্লভতার জন্য আপাততঃ এই সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়। ইহার পরিবর্ত্তে সদর হাসপাতালে যক্ষ্মারোগীদের পরীক্ষার জন্য একটি পৃথক চিকিৎসাগার খোলা হয় এবং হাসপাতালের রেডিওলজিষ্ট ডাক্তার এই সকল রোগীদের পরীক্ষা করিতে থাকেন। এইরূপে কুচবিহার রাজ্যে এই রোগাক্রান্ত রোগীদের সংখ্যা নির্ণয়ের চেষ্টা চলিতে থাকে।

কুচবিহার নগর-সমিতির (Town Committee) স্বাস্থ্য-পরিদর্শক যক্ষ্মারোগের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য চালাইতে থাকেন। ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতা, প্রাচীর-পত্র প্রদর্শন প্রভৃতি দ্বারা এই রোগের কারণ, বিস্তার এবং নিবারণ সম্বন্ধে জনসাধারণকে শিক্ষিত করিয়া তোলা হইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্য-পরিদর্শক গৃহে গৃহে যাইয়াও গৃহস্থদিগকে এই রোগ সম্বন্ধে সতর্ক করিতে ও তাহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ দিতে থাকেন।

মহারাজা ভূপবাহাদুর কসৌলীতে লেডী লিন্‌লিথ্‌গো স্বাস্থ্যনিবাসে একটি কুটির নির্ম্মাণের জন্য ৩০০০৲ টাকা দান করেন; লেডী লিন্‌লিথ্‌গো এই টাকা পাইয়া মহারাজা ভূপবাহাদুরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া এক চিঠি লেখেন এবং এই কুটিরের নাম "কুচবিহার-কুটির" রাখেন। এই কুটিরে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হইবে।

কুচবিহার রাজ্যে চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি—

কুচবিহার দরবার রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সর্ব্ববিধ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। চিকিৎসা বিভাগের কার্য্যকারিতা বাড়াইবার জন্য সম্প্রতি এই বিভাগের পুনর্গঠন করা হইয়াছে। চারি জন নূতন এসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জন নিযুক্ত করা হইয়াছে; ইঁহাদের মধ্যে একজনকে ল্যাবরেটরীর ভার দেওয়া হইয়াছে। ঔষধ এবং যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বরাদ্দ উদারভাবে বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

গ্রামাঞ্চলে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত ডিস্পেন্সারী সমূহের অবস্থার বহুল উন্নতিসাধন করা হইতেছে। সহর ও গ্রামাঞ্চলে ম্যালেরিয়া, বসন্ত ও কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব নিবারণকল্পে রাজ্যের নানাবিধ রোগ-নিবারণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এইজন্য বর্ত্তমান বৎসরের বাজেটে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করা হইয়াছে।

সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে যে মেজর বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় এম্-বি, ডি-পি-এইচ, ডি-টি-এম্ কুচবিহার রাজ্যের হেল্‌থ অফিসার নিযুক্ত হইয়াছেন; তিনি সংক্রামকরোগের হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীরূপেও কার্য্য করিবেন। মেজর মুখোপাধ্যায় শীঘ্রই তাঁহার পদে যোগদান করিবেন।

কুচবিহার নারীমঙ্গল শিল্পালয়—

স্থানীয় মহিলাগণের মধ্যে রুচী ও বয়নশিল্প শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে কুচবিহার দরবার স্থানীয় বালিকা

বিদ্যালয় সুনীতি একাডেমীতে একটি সেলাই-ক্লাস খুলিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহার নাম "কুচবিহার নারীমণ্ডল শিল্পালয়" রাখা হইয়াছে। প্রত্যেক শনিবার স্কুলের পরে ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত এই ক্লাস বসিবে। সুনীতি একাডেমির সেলাই শিক্ষয়িত্রী সেলাই ও নক্সির কাজ শিক্ষা দিবেন এবং সরকারী শিল্পবিভাগের একজন ডিমন্সট্রেটার বয়ন কার্য্য শিখাইবেন। মহিলাগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য বিনাভাড়ায় ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট বিভাগের মোটর বাস পাওয়া যাইবে। শিক্ষার্থী মহিলাগণকে কোনরূপ বেতন দিতে হইবে না। উন্নয়ন বিভাগ প্রয়োজনীয় সূতা, কাপড় প্রভৃতি দ্রব্যাদি মূল্যে মহিলাগণকে সরবরাহ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে প্রস্তুত দ্রব্যাদি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিবেন।

মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবার সভানেত্রীত্বে সুনীতি একাডেমি গৃহে "নারীমণ্ডল শিল্পালয়ের" প্রথম অধিবেশন হয়। শিক্ষালাভেচ্ছু মহিলাগণকে শিল্পালয়ের সম্পাদিকা মিসেস্ ইন্দিরা রায়ের নিকট আবেদন করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

কুচবিহারের উদ্বৃত্ত ধান্য ও চাউল—

বাংলার অভাবগ্রস্ত অঞ্চল সমূহের জন্য কুচবিহার দরবার বাঙ্গলা সরকারের নিকট দেড়লক্ষ মণ চাউল ও ধান বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই ধান ও চাউল কুচবিহারে উদ্বৃত্ত হইয়াছে। ভারতের পূর্ব্ব দেশীয় রাজ্যসমূহের মাননীয় রেসিডেন্ট বাহাদুরের বরাবরে এই সম্বন্ধে বন্দোবস্ত অবলম্বন করা হইতেছে।

সুনীতি একাডেমির ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল—

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে এই বৎসর স্থানীয় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় হইতে ১৭টি বালিকা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছিল এবং তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে। সুনীতি একাডেমির পরীক্ষার ফল বরাবরই সন্তোষজনক; বর্ত্তমান বৎসরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার শতকরা মাত্র ৪৫ জন; এই দুর্বৎসরেও যে সুনীতি একাডেমি হইতে পরীক্ষার্থী সকল বালিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে ইহা সংশ্লিষ্ট সকলেরই কৃতিত্বের পরিচায়ক।

দেশ-বিদেশের কথা

মহাযুদ্ধের গতি—

মহাযুদ্ধের গতি ক্রমশঃই মিত্রপক্ষের অনুকূলে চলিতেছে। ব্রহ্মযুদ্ধে মিত্রপক্ষ প্রায় সর্ব্বত্রই জয়লাভ করিতেছেন; তবে স্থানে স্থানে—যেমন সিতাং নদীর বাঁকে—জাপানীরা মরিয়া হইয়া সংগ্রাম করিতেছে। চীন-জাপান যুদ্ধ অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করিয়া নবম বর্ষে উপনীত হইল; জাপান যত সহজে চীন জয় করিবে ভাবিয়াছিল তাহা পারে নাই; এখন ক্রমশঃ হটিয়া যাইতেছে। চীন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়াছে এবং চীনা সৈন্য ইন্দোচীন প্রবেশ করিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ফিলিপাইনের যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ সম্পূর্ণরূপে জাপকবল-মুক্ত হইয়াছে। জাপানীরা সেখানে ২৩ ডিভিশন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল; উহার প্রায় সমস্তই নিশ্চিহ্ন

হইয়াছে। জেনারেল ম্যাক্-আর্থার তাঁহার এক ঘোষণায় বলেন যে ফিলিপাইনের যুদ্ধে জাপানের বৃহত্তম ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে: এই দ্বীপপুঞ্জ পুনরধিকারের ফলে মিত্রশক্তি একটি বিরাট স্থল, নৌ ও বিমান ঘাঁটি লাভ করিল। এই স্থান হইতে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান অধিকতর সুগম হইবে।

খাস জাপানে আমেরিকার অতিকায় বিমানসমূহ প্রত্যহ বোমাবর্ষণ করিয়া জাপানের শিল্পাঞ্চল বিধ্বস্ত করিয়া দিতেছে। প্রত্যহ জাপানের বিরুদ্ধে তিন হাজার বিমান পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে এবং শীঘ্রই জাপান দ্বীপপুঞ্জে অভিযাত্রীবাহিনী প্রেরণের সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে। এক সংবাদে প্রকাশ যে জাপানে যুদ্ধনেতা ও শিল্পপতিগণের মধ্যে বিরোধের ভাব ক্রমশঃই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে এবং ইহার ফলে জাপানে এক অন্তর্বিপ্লব দেখা দেওয়াও অসম্ভব নহে।

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রীর মৃত্যু ও নূতন প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ—

অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ জন কার্টিন গত ৫ই জুলাই ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি কিছুদিন যাবত দুরারোগ্য হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন এবং ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। গত মে মাস হইতেই তিনি কার্য্যতঃ প্রধান মন্ত্রিত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্থলে মিঃ চিফ্‌লী অস্থায়ীভাবে প্রধান মন্ত্রীর কাজ করিতেছিলেন। মিঃ কার্টিনের মৃত্যুতে মিঃ চিফ্‌লী অস্থায়ীভাবে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

মিঃ কার্টিন একজন বিখ্যাত ও যোগ্য সমরনেতা ছিলেন। ১৯৪১ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী হন; জাপান আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি দেশকে সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত করিয়াছিলেন এবং সুষ্ঠুভাবে যুদ্ধ চালাইয়া গিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য রাজনীতিতেও তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতির পরলোকগমন—

গত ৬ই জুলাই রাত্রি সাড়ে ১১টার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার কলিকাতাস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ব্যবসায় হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে ১৯২৩ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতির কার্য্য করেন। উকীল এবং বিচারক হিসাবে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুনাম ছিল।

বাংলার লাট ও লাট-পত্নীর দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও বেলুড় মঠ পরিদর্শন

বাংলার লাট মিঃ কেসী ও তাঁহার পত্নী মিসেস্ কেসী বাংলার সংস্কৃতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। গত ৮ই জুলাই অপরাহ্ণে তাঁহারা প্রসিদ্ধ দক্ষিণেশ্বর মন্দির পরিদর্শন করেন। তাঁহারা মন্দিরের চারিদিক ঘুরিয়া দেখেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ঘরে বাস করিতেন সেই ঘরও দেখেন। ইহার পর তাঁহারা বেলুড় মঠেও গিয়াছিলেন।

কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মোৎসব—

গত ৮ই জুলাই নৈহাটি কাঁঠালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের ১০৭তম জন্ম-দিবসের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বাসগৃহের সম্মুখে সুসজ্জিত মণ্ডপ মধ্যে এক জনসভার অধিবেশন হয়। সাহিত্যিক লেখক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অমর প্রতিভা এবং সাহিত্যের

বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার অতুলনীয় দানের উল্লেখ করিয়া খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি বক্তা বক্তৃতা দেন।

রুশভাষায় তুলসীদাসী রামায়ণের অনুবাদ—

তুলসীদাসের রামায়ণ ("রামচরিতমানস") সমগ্র হিন্দুভারতের আদরের ও শ্রদ্ধার বস্তু। হিন্দীভাষাভাষী হিন্দু মাত্রেই এই গ্রন্থ ধর্মগ্রন্থরূপে ভক্তিভরে পাঠ করিয়া থাকেন বা ইহার পাঠ শ্রবণ করিয়া থাকেন। আমরা জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে রুশভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ হইয়াছে। রুশ বিজ্ঞানপরিষদের জনৈক সদস্য এই অনুবাদ করেন; এবং সম্প্রতি অনুষ্ঠিত উক্ত পরিষদের জুবিলী উৎসবে অনুবাদের অংশবিশেষ পাঠ করিয়া শুনান। আমরা আশা করি এই অনুবাদের দ্বারা রাশিয়া ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ ঘনিষ্ঠতর হইবে।

১৯৪৮ সালের অলিম্পিক খেলা—

রয়টারের এক সংবাদে প্রকাশ যে সুইজারল্যাণ্ডের লসেন (Lausanne) সহরের মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা ১৯৪৮ সালের অলিম্পিক খেলা লসেন সহরে আহ্বান করিবেন। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের জন্য এই খেলা কয়েক বৎসর স্থগিত রহিয়াছে। শেষ অলিম্পিক খেলা ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে বার্লিনে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল—

এই বৎসর (১৯৪৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় প্রায় ৪২ হাজার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিয়াছিল; তন্মধ্যে মাত্র ১৯৯০ হাজার ছাত্রছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। গত বৎসর উত্তীর্ণের হার ছিল শতকরা ৬৩ জন; এই বৎসর হার কমিয়া ৪৫এ দাঁড়াইয়াছে। প্রকাশ যে ইংরাজীতে অত্যধিক ফেলের জন্য পাশের হার এত কমিয়া গিয়াছে। সহসা ইংরাজীতে এত অধিক ফেলের কারণ কি অনুসন্ধান আবশ্যক; প্রয়োজনমত ইহার সংস্কার করাও দরকার।

ইন্দিরাদেবীর ভুবনমোহিনী দাসী সুবর্ণ-পদক লাভ—

বাংলার খ্যাতনামা লেখিকা ইন্দিরাদেবী এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ভুবনমোহিনী দাসী সুবর্ণ-পদক লাভ করিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষায় সাহিত্য বা বিজ্ঞানে যে মহিলার রচনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনা করেন তিন বৎসর অন্তর তাঁহাকে এই সুবর্ণ পদক প্রদত্ত হইয়া থাকে। গত ১৯৩৫ সাল হইতে এই পদক প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। ইতিপূর্ব্বে নানকুমারী বসু, নিরুপমা দেবী ও অনুরূপা দেবী এই পদক লাভ করিয়াছেন।

ইন্দিরা দেবী প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও বিখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর ("বীরবল") স্ত্রী। ইন্দিরা দেবীর রচনাবলী প্রধানতঃ মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার একখানি প্রবন্ধ সংগ্রহ "নারীর কথা" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার এই সম্মানলাভে আনন্দিত এবং মনস্বিনী মহিলাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

সাময়িক প্রসঙ্গ

বোম্বাইয়ে ভারতীয় রাজন্যবর্গের সভা—

গত ডিসেম্বর মাসে নরেন্দ্রমণ্ডলের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যগণ পদত্যাগ করার ফলে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার অবসান হইয়াছে। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে রাজন্যবর্গের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও স্পেশাল কমিটির সভা হয়; এই উভয় সভায় ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্যগণের পদত্যাগ প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহার ফলে নরেন্দ্রমণ্ডলের স্বাভাবিক কার্য্য পরিচালন ব্যবস্থা পুনরায় ফিরিয়া আসিবে।

বোম্বাইয়ে রাজন্যবর্গ কতকগুলি জরুরী বিষয়ের আলোচনা করেন। ভারতসরকারের ভবিষ্যৎ শিল্পনীতির ফল দেশীয় রাজ্যসমূহের উপর কিরূপ হইবে, ভারতের শিল্পোন্নতিকল্পে ব্রিটিশভারতের সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহের সহযোগিতা কি রূপ ধারণ করিবে ইত্যাদি বিষয়ে রাজন্যবর্গ আলোচনা করেন। নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলার ভূপালের নবাব ব্যতীত নবনগরের জামসাহেব, গোয়ালিয়রের মহারাজা, বিকানীরের মহারাজা, পাতিয়ালার মহারাজা এবং রামপুরের নবাব রাজন্যবর্গের সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বোম্বাইয়ে নরেন্দ্রমণ্ডলের উপদেষ্টা সমিতিরও এক সভা হয়। এই সভায় এক বক্তৃতা প্রদান কালে ভূপালের নবাব প্রসঙ্গতঃ ওয়াভেল প্রস্তাবের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে ভারতীয় রাজন্যবর্গ একান্তমনে কামনা করেন যে ভারতীয় সমস্যার একটি সর্ব্বজনসম্মত সমাধান হউক। ঘটনাবলী দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিতেছে; রাজন্যবর্গ সর্ব্বদাই এই অগ্রগতির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলিতে প্রস্তুত। ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের গভর্ণমেণ্টের সহিত ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সর্ত্তে আবদ্ধ হইবার আশা নবাব বাহাদুর পোষণ করেন। দেশীয় রাজ্যসমূহও ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে এবং প্রজাসাধারণ শাসনব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত হইতেছে। নবাব বাহাদুর আবেগভরে বলেন, "ভারত আমাদের মাতৃভূমি; আমরা এক সুমহান সংস্কৃতির অধিকারী; সাম্প্রদায়িক বিভেদ আমাদের মধ্যে নাই; সমগ্রভারতের অগ্রগতিতে সাহায্য করিতে আমরা সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

অনেক সময় সংবাদপত্রাদিতে বলা হইয়া থাকে যে রাজন্যবর্গের রক্ষণশীল মনোভাবের জন্যই ভারতের অগ্রগতি অবরুদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু ইহা যে প্রকৃত সত্য নহে ভূপালের নবাব বাহাদুরের বক্তৃতা হইতে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

ওয়াভেল প্রস্তাবের ব্যর্থতা—

ভারতের অচল অবস্থা দূরীকরণের জন্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের যে প্রস্তাব বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের মারফৎ এদেশে করা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কংগ্রেস, মুসলীম লীগ প্রভৃতি বিভিন্ন দলকে বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্যপদের জন্য নাম দাখিল করিতে অনুরোধ করা হইয়াছিল। একমাত্র মুসলিম লীগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ভারতীয় দলই বড়লাটের নিকট নাম দাখিল করিয়াছিলেন; কিন্তু মুসলিম লীগ নাম দাখিল করিতে সম্মত হন নাই। মুসলিম লীগ দাবী করেন যে শাসনপরিষদের সব কয়টি মুসলমান পদই মুসলিম লীগের মনোনীত ব্যক্তিগণকে দিতে হইবে। এই দাবী বড়লাট মানিয়া লইতে পারেন নাই। সুতরাং আপাততঃ লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব ব্যর্থ হইল। ১৬ই জুলাই নেতৃসম্মেলনে বড়লাট ঘোষণা করেন যে মুসলিম লীগ

হইয়াছে; কাহারও উপর দোষারোপ না করিয়া বড়লাট বলেন যে এই ব্যর্থতার জন্য তিনিই দায়ী; নেতৃগণ যেন পরস্পরের প্রতি দোষারোপ না করিয়া সংযম অবলম্বন করেন।

রুশ বিজ্ঞান-পরিষদের জুবিলী উৎসব—

রুশ বিজ্ঞান-পরিষদের ২২০তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মস্কো ও লেনিনগ্রাড সহরে বিশেষ জুবিলী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে ডক্টর মেঘনাদ সাহা এই উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। গত পঁচিশ বৎসরে রুশিয়া বিজ্ঞানক্ষেত্রে বিস্ময়কর উন্নতি করিয়াছে; ইহার মূলে রহিয়াছে রুশ বিজ্ঞানপরিষদের সাধনা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টা। রুশরাষ্ট্র বিজ্ঞানকে সর্ব্বতোভাবে শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষিতে নিয়োগ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়া বিজ্ঞান-পরিষদের উপর ইহার ভার ন্যস্ত করেন। তাহার ফলেই রুশ দেশের বর্ত্তমান প্রগতি সম্ভব হইয়াছে। ডক্টর সাহা বলিয়াছেন যে, পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে রুশ দেশ শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে বর্ত্তমান ভারতের মতই পশ্চাৎপদ ছিল, কিন্তু পঁচিশ বৎসরের সাধনার ফলে রুশিয়া আজ জগতের একটি প্রধান শক্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছে। ডক্টর সাহা বলেন যে ৪০ কোটি ভারতীয় নরনারীর দারিদ্র্য, রোগ ও পুষ্টিহীনতা দূর করিতে হইলে ভারতবর্ষকে রুশিয়ার দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হইতে হইবে।

বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক জুলিয়ান হাক্সলীও রুশিয়ার এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি বলেন রুশিয়ার বিজ্ঞান যে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই তাহা হয় নাই। বিজ্ঞান কেবলই যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহা নহে; বহুক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে বিপুল প্রয়োগ ও বিরাট সাফল্য রুশিয়ার দেখা গিয়াছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোথাও তাহা নাই।

বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে কাজে লাগাইতে না পারিলে বর্ত্তমান জগতে টিকিয়া থাকা কঠিন। আমরা আশা করি ভারতবর্ষে অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানের ভিত্তিতে নূতন রাষ্ট্র ও সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া গেল। গত ১২ই হইতে ১৪ই জুলাই পর্য্যন্ত তিন দিন ধরিয়া এই উৎসব হয় এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গ্রাজুয়েটগণকে উপাধি প্রদান করা হয়। তিন দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডক্টর রাধাবিনোদ পাল গ্রাজুয়েটগণকে সম্বোধন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করেন এবং শেষ দিন চ্যান্সেলার বাংলার লাট মিষ্টার কেসী তাঁহার অভিভাষণ প্রদান করেন। ডক্টর পাল গ্রাজুয়েট-গণকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে তাঁহাদিগের সম্মুখে মহান্ কর্ত্তব্যভার রহিয়াছে; তাঁহাদিগকে ইহা বহন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যুদ্ধের ফলে এক নূতন জগৎ সৃষ্টি হইতে যাইতেছে; এই জগতে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যোগ্যতার মান অতীত কালের মান হইতে অনেক উঁচু হইবে; প্রত্যেককে নিজ নিজ যোগ্যতাবলে স্বীয় ভাগ্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। ছাত্রজীবনে গ্রাজুয়েটগণ যে বিচারবুদ্ধি, কর্ম্মপ্রবণতা, সংযম ও ভদ্রতা গুণের অধিকারী হইয়াছেন কর্ম্মজীবনে তাহাই তাঁহাদিগকে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে। ডক্টর পাল আশা করেন যে গ্রাজুয়েটগণ মাতৃভূমিকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির অভিশাপ হইতে মুক্ত করিয়া

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	ঔপন্যাসিক অন্নদাশঙ্কর রায় (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, পি-এইচ্-ডি	১৭১
২।	সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব (প্রবন্ধ)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়	১৮১
৩।	সাহস (গল্প)	শ্রীপঞ্চেন্দ্রকুমার মিত্র ...	১৮৫
৪।	জন্মাষ্টমী (প্রবন্ধ)	শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন	১৯২
৫।	কবিধর্ম্ম ও যুগধর্ম্ম (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-আর-এস, পি-এইচ্-ডি	১৯৬
৬।	যাচন (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীগুরুদেব সেনগুপ্ত এম্-এ	২০৯
৭।	মথোধরা (নাটিকা)	শ্রীযামিনীমোহন কর ...	২০৪

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই স্বাস্থ্যের প্রধান অঙ্গ—

অল্প পয়সায় ও অল্প সময়ে আপনি আপনার
পরিধেয় জামা-কাপড় পরিষ্কার করুন!

কুচবিহারে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান বহু চেষ্টার ফলে আজ আপনাদের সম্মুখে দাঁড়াতে পাচ্ছে।
আপনাদের সহানুভূতির উপরই এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

পি, এস, ওয়ার্কসের কাপড় কাচা সাবান একবার ব্যবহার করুন।

পরিবেশক—

প্রফুল্ল সোপ ওয়ার্কস্,

কোচবিহার।

CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
৮।	আলো আওন আলো (কবিতা)	ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম-এ, পি-এইচ্-ডি ; ডি-লিট্, সি-আই-ই	২০৭
৯।	নতুন বাথা (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২০৮
১০।	আমার মা (কবিতা)	শ্রীজগদীশ গুপ্ত ...	২০৯
১১।	হে মরণজয়ি তোমাকে প্রণাম করি (কবিতা)	শ্রীশৈলেশচন্দ্র রায় বি-এ	২১০
১২।	রাজপরিবারের সংবাদ		২১১
১৩।	দেশবিদেশের কথা ...		২১১
১৪।	খেলা-ধূলা ...		২১৩
১৫।	স্থানীয় সংবাদ ...		২১৫

নিবেদন :—

স্বাস্থ্যই সুখের মূল, শরীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হওয়ার জন্যই রোগ দেখা দিয়া থাকে, সেজন্য বুদ্ধিমান লোকে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন, নতুবা সামান্য ব্যাধি পরে কষ্টদায়ক—এমন কি প্রাণঘাতীও হইতে পারে।

যাহাতে দেশের সর্বসাধারণে সহজেই রোগমুক্ত হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সিটী মেডিক্যাল ষ্টোর, কলিকাতা ভৃতি সর্ব্ব প্রকার দেশী বিদেশী ঔষধ, রোগীর পথ্য, শিশুর খাদ্য ও পেটেন্ট ঔষধ বাজার চলতি দরে আমদানী ও সরবরাহ করিতেছেন।

সিটি মেডিক্যাল ষ্টোরে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত থাকিয়া সমাগত রোগীগণের পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যাহাতে দেশবাসী অনায়াসে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসার সুবিধা পান ইহাও সিটী মেডিক্যাল ষ্টোর কর্তৃপক্ষের অন্যতম উদ্দেশ্য।

জন সাধারণ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদের শ্রম সার্থক করুন ইহাই আমার নিবেদন।

ডাঃ এ, লতিফ।

গোবিন্দসুধা— সেবনে বলপুষ্টি বর্দ্ধিত এবং বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র

পিত্তশূল সুধা— ইহা পিত্তশূল, অম্লশূল ও অজীর্ণ রোগের মহামহৌষধি। মূল্য ১৷৷০ টাকা। ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র।

কলেরা কিওর— কলেরা, উদরাময়, পেট ফাঁপা অগ্নিমান্দ্য ও সূতিকা প্রভৃতির মহৌষধ। ২৲ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

নেত্র সুধা— চক্ষুউঠা, প্রভৃতি যাবতীয় চক্ষু রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান:— শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহা,

কাইয়াপটি, কোচবিহার।

কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী।

১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক সডাক তিন টাকা; মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকার প্রকাশের জন্য লেখা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

৩। অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হয়; অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না।

৪। কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১০৲ টাকা; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৬৲ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা। কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৫। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ,
ষ্টেটপ্রেস, কোচবিহার।

মহারাজকুমারী রাণী ইলা দেবী

CENTRAL LIBRARY

কোচবিহার দর্পণ

অষ্টম বর্ষ | ভাদ্র ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ | ৫ম সংখ্যা

CALCUTTA CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

ঔপন্যাসিক অন্নদাশঙ্কর রায়

ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ, বি-এল্, পি-এইচ্-ডি

অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকের মধ্যে যাঁহারা ব্যক্তিজীবন বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে যে পৃথিবীব্যাপী জটিল চিন্তাধারা ও সমস্যাসঙ্কুলতা মানবমনকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত করিতেছে তাহার আলোচনাতেই মুখ্যভাবে ব্যাপৃত আছেন, অন্নদাশঙ্কর রায় বোধ হয় সেই শ্রেণীর শীর্ষস্থানীয়। তাঁহার মননশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ও সক্রিয়। অতি সহজ সরল কথায়, তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়া তিনি চরম আলোচনার মর্মভেদ করিতে পারেন। ইহা ছাড়া যে সমস্ত নরনারী আত্মকেন্দ্রিক জীবনে সীমাবদ্ধ নহে, বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভ ও আন্দোলন যাহাদের বক্ষস্পন্দনকে দ্রুততর করিয়া ব্যক্তিজীবনকে সমৃদ্ধ করে, পৃথিবীকে নূতন করিয়া গড়িবার আকাঙ্ক্ষা, বিভ্রান্ত জগৎকে নূতন পথনির্দ্দেশের প্রেরণা যাহাদের ব্যক্তিগত কামনা-ভালবাসার প্রকৃতি ও গতিবেগ নির্দ্ধারণ করে, অন্নদাশঙ্করের সুবৃহৎ উপন্যাস 'সত্যাসত্যে' তাহাদের বহিঃপ্রচেষ্টা ও অন্তরের আকুতি সুন্দর অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। আজকাল পাশ্চাত্য দেশসমূহের অধিবাসীর একটা বিশিষ্ট অংশ এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সর্ব্বদা একটা যুদ্ধের উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ায় বাস করে; আপনি আপন দলের মতপ্রতিষ্ঠা ও বিরুদ্ধমত খণ্ডন ইহাদের জীবনের মুখ্যতম প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় ইহাদের রক্তোরক্ত, ইহাদের তীব্রতম অনুভূতি ও কামনার আকাঙ্ক্ষা আলোড়িত হইয়াছে। ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতাকে ইহারা যথাসাধ্য সঙ্কুচিত করিয়া আনিয়াছে। প্রেম, বন্ধুতা, সমবেদনা প্রভৃতি সুকুমার হৃদয়বৃত্তিগুলি এই রণোন্মাদের তালে তালেই স্পন্দিত হইয়াছে; ইহার অনুমতি ব্যতীত এক পাও অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। জীবনকে লইয়া অশ্রান্ত পরীক্ষা চলিয়াছে—ইহাকে সর্ব্বদা নূতন নূতন আদর্শে যাচাই করা হইয়াছে, নব নব অনুভূতির স্পর্শে, নব নব সম্ভার প্রসাদে ইহার উদ্দেশ্য ও যাত্রাপথ নির্ণয়ের চেষ্টা হইয়াছে। রক্তস্রোত ধূলিজালের মধ্যে ইহার চিন্তা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার [illegible]

তরঙ্গোচ্ছ্বাসের কেন্দ্রস্থলে অন্তর-লোকের অভিনয়-লীলা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

অবশ্য এই নূতন প্রণালীর সুবিধা অসুবিধা দুই আছে। পটভূমিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সমপরিমাণে উপলব্ধির গভীরতা কমে। বহির্মুখী জীবনের বিক্ষেপ ইহার রসকে তরল করে, বাহ্যবস্তুর পুঞ্জীভূত চাপে অন্তরের স্বচ্ছন্দ বিকাশ কতকটা প্রতিরুদ্ধ হয়। জীবনের যে স্তরে আমরা তর্ক করি, জগতের কল্যাণ চিন্তা করি, দর্শনগত প্রতিপত্তিবর্দ্ধনে যত্নবান, এমন কি জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তায় মগ্ন হই; আর যে স্তরে ভালবাসি, আত্মবিস্মৃত যৌবন-স্বপ্ন রচনা করি, সহজ আত্মীয়তার টানে আকৃষ্ট হই, হৃদয়ের প্রত্যক্ষ, যুক্তিতর্ক-নিরপেক্ষ অনুভূতির স্পর্শ পাই—এই দুই স্তর সমান গভীর নহে। কাজেই বাদল, সুধী প্রভৃতি চরিত্রগুলি যখন নানা অভিজ্ঞতার স্তর দিয়া, নানা লোকের সাহচর্য্যে ও মতবাদের সংঘর্ষে, বিচিত্র পরিবেষ্টনীতে নিজ আদর্শ খুঁজিয়া বেড়ায়, তখন যেন তাহাদের ব্যক্তিত্বের উপরিভাগের চাঞ্চল্য মননশক্তিতে ভাস্বর ও উত্তেজনায় বেগবান হইয়া উঠে, কিন্তু ইহার গভীরতম রহস্যটুকু ধরা পড়ে না। যে মন পরিবর্ত্তনের তরঙ্গে সর্ব্বদা দোলা খাইতেছে; তাহার আন্দোলনের অস্থির ঝিকিমিকি বিশ্লেষণশক্তির গভীরতাকে প্রতিহত করে। উজ্জয়িনী যতদিন তাহার একনিষ্ঠ হৃদয়বৃত্তি দিয়া বাদলের সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, ততদিনই তাহার গভীরতম পরিচয় আমাদের মনে মুদ্রিত হয়। যখন সে বিলাতে আসিয়া তাহার সহস্র চটুল বিক্ষেপ ও উদ্‌ভ্রান্তকারী মাদক অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বাদলকে ভুলিতে ও নিজের কেন্দ্রচ্যুত মনের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহার একটি সাময়িক, সংশয়জড়িত রূপই আমাদের চোখে ধরা দেয়। পক্ষান্তরে ইহাও সত্য যে ইহাদের প্রাণবেগচঞ্চলতা এইরূপ মতসংঘর্ষের উন্মাদনা ও জনাকীর্ণ সমাজের বিচিত্র প্রভাব আকর্ষণের তির্য্যক্ পথ ধরিয়াই স্বাভাবিক বিকাশ খোঁজে। ইহারা আত্মার সমগ্রতাকে আবিষ্কার করে আদর্শ অনুসরণের প্রেরণায়, তার্কিকতার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আলোকে, স্বপক্ষ-বিপক্ষের সমবেত সহযোগিতায় নিজ মানস অনিশ্চয়তার অপসারণে, পথ-চলার গতিবেগের ছন্দে। কাজেই এই সমস্ত কর্ম্মশীলতার সহিত ইহাদের প্রগাঢ়তম হৃদয়ানুভূতিগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। তর্কের উত্তেজনায় ইহাদের হৃদয়বৃত্তি স্ফুরিত হয়; ইহারই ঝোড়ো হাওয়ায় ইহাদের অন্তর-যবনিকা অপসারিত হয়; তীক্ষ্ণ, শাণিত যুক্তি প্রয়োগের ফাঁকে ফাঁকে ইহাদের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আবেগে ভারী হয়ে উঠে। বাদ-প্রতিবাদের কোদালি দিয়া মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে ইহারা অকস্মাৎ হৃদয়ের গভীর স্তরশায়ী কোহিনূরের সন্ধান পায়। তর্ক ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তির আস্ফালন মাত্র নহে, ইহাদের সমস্ত প্রকৃতিটির আত্মানুশীলন। সেইজন্য ইহাদের যে চিত্তবিশ্লেষণের চেষ্টা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অগভীর নহে। এই পথেই ইহাদের সত্য পরিচয় মিলে। মানবজাতির উন্নয়ন ও ভবিষ্যতের পথসন্ধানই বাদলের গভীরতম হৃদয়াকুতিকে গ্রাস করিয়াছে—ব্যক্তিগত প্রেম ইহার সহিত তুলনায় নিতান্ত গৌণ। সুধীও তাহার আদর্শনিষ্ঠার বেদীমূলে তাহার ভালবাসাকে অবিচলিতভাবে বলি দিয়াছে। অবশ্য প্রেমের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই বৃহত্তর আদর্শের শ্রেষ্ঠতা কেবল তর্কে নহে, চরিত্রদিগের কর্ম্মে, ব্যবহারে ও অনুভূতির আন্তরিকতার দিক দিয়া নিঃসংশয়িতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। অন্যথা, melo-dramatic unreality

অতিনাটকীয়, অবিশ্বাস্য অসম্ভবতা আসিয়া পড়িবে। লেখক এই চেষ্টায় মুখ্যতঃ সফল হইয়াছেন বলিয়াই তাঁহার উপন্যাসের উৎকর্ষ।

স্থানে স্থানে ঘটনা-প্রবাহের প্রাধান্যের নিকট চরিত্রস্ফুরণ যে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহার নিদর্শনের অভাব নাই। বাদলকে পরিবর্তনের এত ক্ষিপ্রগতি ঘূর্ণীপাকের মধ্যে ফেলা হইয়াছে যে, তাহার চরিত্রের অগ্রগতি ইহাদের সহিত সমতা রাখিতে পারে নাই। তাহার অবিমিশ্র বুদ্ধিবাদ কি করিয়া সম্পূর্ণ আত্মবিলোপী সেবাব্রতনিষ্ঠায় রূপান্তরিত হইল তাহা অপরিস্ফুট রহিয়াছে। তাহার এই নেশাটুটার কারণও যথেষ্ট মনে হয় না। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বাদলের গভীর অনুসন্ধিৎসা তাহার অথবা লেখকের তীক্ষ্ণ মননশীলতার পরিচয়, কিন্তু এই দার্শনিক উপলব্ধি তাহার চরিত্রের সহিত একাত্মীভূত হয় নাই। তাহার শ্বশুরের মৃত্যুতে তাহার জীবিত থাকার অখণ্ডনীয় প্রমাণ আবিষ্কার হাস্যকর অসঙ্গতিরই সৃষ্টি করিয়াছে। বাদল বহুই আত্মগোলা হউক না কেন, ইহাই যে তাহার মৃত্যুর সহিত প্রথম পরিচয় তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। উজ্জয়িনীর চরিত্রেও তাহার বৈষ্ণব-ভাব-বিহ্বলতা গভীর উপলব্ধি অপেক্ষা অনিচ্ছাকৃত ব্যঙ্গানুকরণের (parody) সহিতই সাদৃশ্যান্বিত। বিলাতে আসিয়া বাদলের সহিত পুনর্মিলনের সম্ভাবনা লুপ্ত হইবার পর তাহার অস্থির চিত্তাকাঙ্ক্ষা নানা বিক্ষেপ ও পরিবর্তনের ধাক্কা বহন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোনো স্থির পরিণতিতে সংহত হয় নাই। ঘটনা-প্রধান, তত্ত্বালোচনা-বহুল উপন্যাসের ইহাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। লেখক তাঁহার সর্ব্বশেষ খণ্ডে উপন্যাসটিকে মহাকাব্যরূপে অভিহিত করিবার দাবী প্রত্যাহার করিয়া ইহার রসোপলব্ধিকে সহজ ও বাধাহীন করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের মহাকাব্যে বিশৃঙ্খলার সীমাহীন ব্যাপ্তি ও বিস্তার; প্রাচীন যুগের মহাকাব্যের সহিত ইহার একমাত্র সাদৃশ্য অতিকায়তায়, ইহার মর্ম্মগত ঐক্যবাণীতে নহে।

অন্নদাশঙ্করের প্রাথমিক রচনাগুলি নিবিড় প্রেম ও বিলাত প্রবাসীর অভিজ্ঞতা লইয়া লেখা—এগুলি অপভাব ও লঘুচপল—প্রায় প্রহসনের লক্ষণাক্রান্ত। 'সত্যাসত্যের' বিরাট ও গভীর তাৎপর্য্যের কোনও পূর্ব্বসূচনা ইহাদের মধ্যে মিলে না। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'অসমাপিকা' বুদ্ধদেব অচিন্ত্য গোষ্ঠীর মনোভাবের চিহ্নাঙ্কিত। সুচারু ও সুরুচির প্রেমের আবির্ভাব যেরূপ আকস্মিক, ইহার ভবিষ্যৎ পরিণতিও সেইরূপ খামখেয়ালী! সুচারু সুরুচির গর্ভে নিজ মানসকন্যার আগমনের জন্য অতিমাত্রায় উৎসুক। যখন সে আবিষ্কার করিয়াছে যে সুরুচি ইতিপূর্ব্বেই অন্তঃসত্ত্বা তখন তাহার প্রণয়িনীর এই অবাঞ্ছিত মাতৃত্বে তাহার দাম্পত্যজীবনে সামঞ্জস্যের আদর্শ রূঢ় আঘাত পাইয়াছে ও তাহাদের প্রাণযোচ্ছ্বাস নানারূপ সূক্ষ্ম, অনির্দ্দেশ্য অতৃপ্তির প্রভাবে মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত এই ক্রমবর্দ্ধমান চিত্তক্ষোভ তাহাদের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে ও সুরুচি শিশুকন্যাসহ আবার পিতৃগৃহে ফিরিয়াছে। এই প্রণয়লীলার সমাজ-তান্ত্রিক ও পারিবারিক দিকটা লেখক একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছেন। গ্রন্থে ভাষার সৌষ্ঠব ছাড়া কোনওরূপ মনস্তত্ত্ব-কুশলতার পরিচয় নাই।

লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আগুন নিয়ে খেলা' এক ইংরেজ তরুণীর সহিত বাঙ্গালী যুবক সোমের চটুল প্রেমাভিনয়ের কাহিনী। যুদ্ধোত্তর যুগে কর্ম্মভারাক্রান্ত, যান্ত্রিকতাশ্লিষ্ট জীবনে নর-নারীর মধ্যে নৈতিক সংযম কত শিথিল হয় ও ক্ষণস্থায়ী প্রণয় বিকশিত হইয়া আবার

ঝরিয়া পড়ে, তাহাই ইহার বর্ণনীয় বিষয়। এ যেন গৃহ ছাড়িয়া পথেই বাসরশয্যা পাতা। এই সম্পর্কের ক্ষণিকতাই ইহাকে একটি করুণ, মধুর সৌন্দর্য্যে অভিষিক্ত করে—সপ্তাহান্তের সম্বন্ধটী জীবনে স্থায়ী করা যাইবে না বলিয়াই একটা ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস মধ্যে মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। এই পলাতক প্রেম বিচিত্র-বর্ণ প্রজাপতির মত চোখের উপর একটা রংএর হিল্লোল খেলাইয়া অন্তর্হিত হয়। হাস্যপরিহাসপূর্ণ, রসিক কথাবার্ত্তার মধ্য দিয়া সুনিপুণ প্রেম নিবেদন এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। বিশ্লেষণ ও চরিত্র সৃষ্টির কোন চেষ্টা নাই—সোম ও পেগি আধুনিক যে কোন তরুণ তরুণীর প্রতিনিধি। মাঝে মাঝে অভিমান ও প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়া এই আকর্ষণের ক্রমপরিণতির স্তর দেখাইবার চেষ্টা আছে, কিন্তু ইহার বিশেষ কোন মনস্তাত্ত্বিক মূল্য নাই। শেষ পর্য্যন্ত বিবাহের সম্ভাব্যতার আলোচনার মধ্যে গ্রন্থের আকস্মিক পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। পথের রোমান্স ঘরের ধরাবাঁধা কাটিনে পর্য্যবসিত হইবার পূর্ব্বেই ধূসর অনিশ্চয়তায় মিলাইয়াছে।

'পুতুল নিয়ে খেলা' 'আগুন নিয়ে খেলা'র শেষাংশরূপে গণ্য হইতে পারে। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থের নায়ক সোম দেশে ফিরিয়া পাত্রী নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে কয়েকটী প্রহসনের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রত্যেক মেয়ের নিকট প্রেম নিবেদনের পূর্ব্বে সে নিজ অতীত ইতিহাস জানাইতে চাহিয়াছে কিন্তু কেহই এ সর্ত্তে তাহাকে গ্রহণ করিতে রাজি হয় নাই। নির্জ্জন সাক্ষাতের অবসর প্রার্থনা প্রত্যেক পরিবারেই তুমুল বিক্ষোভ জাগাইয়াছে। লজ্জাসঙ্কোচের জড়পিণ্ড শিবানী, সঙ্গীত-প্রিয়া সুলক্ষণা, হেডমাষ্টার-দুহিতা বি-এ-অনার্স অমিয়া, ইঙ্গবঙ্গ-সমাজ বিহারিণী প্রতিমা ও অসহযোগ আন্দোলনে সংশ্লিষ্টা মায়া সকলেই কোন না কোন ভাবে নিজেদের অন্তর্নিহিত অনুদার রক্ষণশীলতা ও ইতর সন্দেহপ্রবণতার পরিচয় দিয়াছে। কেহই ভাবী স্বামীর চরিত্রস্খলনকে উদার সহানুভূতি ও সাহসিকতার সহিত গ্রহণ করিতে পারে নাই। কেহ বা চিরাচরিত নীতি, কেহ বা ভাবাবেশ, কেহ বা পিতার প্রতি একান্ত আনুগত্য, কেহ বা সুরুচি, আর কেহ বা শ্লীলতার দিক দিয়া সোমের এই খোলাখুলি স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে। কোথাও কোথাও প্রহসনের আতিশয্যে সম্ভাব্যতা ও সুরুচির সীমা অতিক্রান্ত হইয়াছে। তথাপি বইখানির মধ্যে যথেষ্ট উপভোগ্য সরসতা ও লীলাচঞ্চল প্রাণপ্রবাহের পরিচয় আছে। বিবাহের নামে যে প্রকাণ্ড প্রহসন সমাজে চলিতেছে, যে পুতুল খেলার অভিনয় অনুষ্ঠিত হইতেছে, বিভিন্ন শিক্ষাদীক্ষা ও আবেষ্টনের মধ্যে সেই নির্জ্জীব প্রথাদাসত্বের কবন্ধ নৃত্য লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন। ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন সত্ত্বেও চরিত্রগুলি জীবন্ত ও ব্যক্তিত্ববিশিষ্ট হইয়াছে।

'সত্যাসত্য' সুবৃহৎ উপন্যাস, ছয়টি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহাতে আধুনিক যুগের সমস্ত জটিল সমস্যা, সমস্ত নূতন অনিশ্চয়তামূলক পরীক্ষা, বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ, মানবকল্যাণের পরস্পরবিরোধী আদর্শ অতি সূক্ষ্ম ও নিপুণভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের পুরাতন উদারনৈতিক নীতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ও রাষ্ট্রনিরপেক্ষ স্বাধীন চেষ্টার জয়ঘোষণা, শ্রমিক কমিউনিষ্ট ও বলশেভিক আদর্শের যুক্তিবিচার, গান্ধীবাদ ও অহিংস আন্দোলনের সার্থকতা ও সার্ব্বভৌম প্রয়োগ, বুদ্ধিবাদ ও হৃদয়ানুভূতির তুলনা, যুদ্ধবর্জ্জন ও শান্তিবাদ প্রতিষ্ঠার সম্ভাব্যতা, বিবাহ-বন্ধনের চিরন্তনতা ইত্যাদি যে সমস্ত চিন্তাধারা যুদ্ধোত্তর যুগের সমস্যাপীড়িত মানবমনকে

অহরহ আলোড়িত করিতেছে—তাহারা সকলেই এই উপন্যাসের অধ্যায়গুলিতে, মননশীলতা ও হৃদয়াবেগের সহিত যুক্ত হইয়া প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে। সুতরাং কেবল মননশীলতার মানদণ্ডে উপন্যাসটীর স্থান খুব উচ্চে। কিন্তু ব্যক্তিনিরপেক্ষ মতবাদ আলোচনা ঔপন্যাসিকের চরম উৎকর্ষের পরিচয় নহে। বর্ত্তমান উপন্যাসে বাদল, সুধী ও উজ্জয়িনী এই তিনটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়া এই সমস্ত সমস্যা আবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহারা এই সমস্ত মতবাদ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; এই যুক্তিতর্ক, সর্ব্বত্র না হইলেও অনেক স্থলে, বুদ্ধিগত আলোচনার স্তর ছাড়াইয়া হৃদয়ের গভীরতর প্রদেশে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, অভিজ্ঞতার রূপ ও রংকে বদলাইয়াছে। তা ছাড়া অশোকা তালুকদার, দে সরকার প্রভৃতি আরও কয়েকটি চরিত্র গৌণ হিসাবে প্রবর্ত্তিত হইলেও হৃদয়াবেগের কৌলীন্য-মর্য্যাদার দাবীতে গ্রন্থমধ্যে প্রধানত্বের পর্য্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। তাহারা তর্কে যোগ দেয় নাই, কিন্তু যুক্তিক্ষেপ-প্রতিক্ষেপের ঝড়ে চারিদিকের আবহাওয়ায় যে উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই সুবিধা গ্রহণ করিয়া অন্তরের কামনা স্ফুরিত ও আবেগ-তপ্ত করিয়াছে।

উপন্যাসের নায়ক বাদল যেন এই তর্কের ঝড়ে ও পথ অনুসন্ধানের প্রেরণায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দোলা খাইয়াছে। সুধী আত্মপ্রতিষ্ঠ, নানা অভিজ্ঞতার আলোড়নেও নিজ অন্তরের প্রজ্ঞানুভূতিতে স্থিরতর হইয়াছে। গ্রাম্য সমাজের সহিত একাত্মতা স্থাপন, কলকারখানার বিক্ষেপ হইতে কুটীরশিল্পের অবিক্ষুব্ধ শান্তি ও সন্তোষে প্রত্যাবর্ত্তন, ভারতের সনাতন অধ্যাত্মবাদের পুনরুদ্ধার ও রাজনীতিক্ষেত্রে তাহার প্রয়োগ—ইউরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সমস্ত বিভ্রান্তকারী মানকতার মধ্যে তাহার লক্ষ্য এই আদর্শে অবিচলিত রহিয়াছে। অশোকার ব্যাকুল আবেদন, উজ্জয়িনীর পরমনির্ভরশীল আশ্রয় প্রার্থনা, সুজিতের নীরব প্রকাশকণ্ঠ ভালবাসা—সমস্তই তাহার আদর্শবাদের লৌহবর্ম্মে ঠেকিয়া প্রতিহত হইয়াছে। বিলাত প্রবাসে তাহার পূর্ব্বসংকল্প দৃঢ়তর ও স্পষ্টতর হইয়াছে; তাহার অবলম্বিত পথ যে মানব-কল্যাণের একমাত্র উপায়—ইউরোপের নানামুখী চিন্তাধারা ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার সহিত পরিচয় তাহার এই প্রতীতিকে আরও অসংশয়িত করিয়াছে। এক হিসাবে সুধীর কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই—তাহার অভিজ্ঞতার পরিধির বিস্তার হইয়াছে কিন্তু তাহার মৌলিক প্রকৃতিটী অক্ষুণ্ণ আছে। লেখক সুধীকে সত্যের রূপক হিসাবে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। মনে হয় যে তাহার মানবতার, প্রীতি-স্নেহ-ভালবাসার অন্তরালে তাহার এই রূপক প্রতিভা নৈর্ব্যক্তিক শিখার জ্বলিতেছে। সত্যের মতই তাহার মুখে অপার্থিব জ্যোতিঃ: সত্যের মতই তাহার অনমনীয় দৃঢ়তা। ইহাতে হয়ত মানুষ হিসাবে তাহার আকর্ষণ কিছু কমিয়াছে। একমাত্র উজ্জয়িনীর ব্যবহারের বিচারেই তাহার অমোঘ আদর্শনিষ্ঠা সাময়িকভাবে বিচলিত হইয়াছে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর সমাজনিয়ন্ত্রণই জয়লাভ করিয়াছে। এই সমুদ্রমন্থনের সবটুকু ফেনিল আলোড়ন বাদলের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। বাদলকে লেখক অসত্যের প্রতীক বলিয়া আঁকিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। পাঠকের সৌভাগ্যবশতঃ এই পরিকল্পনা কার্য্যতঃ ফলবতী হয় নাই। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে বাদল অসত্যের নহে, মানবাত্মার মুক্তিসন্ধানের প্রতীক। লেখক অনেক স্থলেই তাহার ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়া তাহার এই রূপকাভাসকে প্রতিবিম্বিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাদলের সগর্ব্ব আত্মপ্রত্যয়, চিন্তা-নায়কের অধিকার

ঘোষণা, ইতিহাসের বিবর্তনধারার নিয়ন্ত্রণশক্তির দাবী, সর্ব্বোপরি তাহার অপরাজেয় আদর্শবাদ—সমস্তই এই রূপকেরই বিচ্ছুরিত জ্যোতিঃ। কিন্তু তথাপি বাদলের মানবতাই আমাদের নিকট তাহার মুখ্য আবেদন। তাহার দুর্ব্বলতা, ব্যাকুল আবেগ, অনুসন্ধানের দুর্দ্দম আগ্রহ, প্রতি চিন্তাধারা ও মতবাদ, সংঘর্ষের অভিঘাতে হৃদয়ের স্নায়ু-তন্ত্রীর তীব্র কম্পন—সবই তাহার মানবিকতার পরিচয়। সে বিশুদ্ধ আদর্শ বা রূপক নহে, সুখদুঃখের অনুভূতিপূর্ণ, বেদনা-আনন্দে তরঙ্গায়িত মানবাত্মা। অবশ্য তাহার আবেগের উৎস ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্ত্তে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ-কামনা ও মুক্তিপিপাসা। রবীন্দ্রনাথের গোরা যেমন মূর্ত্ত স্বদেশপ্রীতি, বাদল সেইরূপ মূর্ত্ত মানবহিতৈষণা—উভয়েরই আদর্শের বিশালতা তাহাদের উপর কতকটা নৈর্ব্যক্তিকতার অর্দ্ধাবগুণ্ঠন আনিয়া দিয়াছে।

'সত্যাসত্য' একখানি বিরাট গ্রন্থ। ইহার জন্য মহাকাব্যের দাবী লেখক নিজেই প্রত্যাহার করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি ইহার মধ্যে একটা মহাকাব্যোচিত বিস্তার ও বিশালতা বিদ্যমান। বিংশ শতাব্দীর মহাকাব্যে গ্রীক্ ও ট্রয় কিংবা রাম-রাবণ ও কৌরব-পাণ্ডবের যুদ্ধের পুনরাবৃত্তি হইতে পারে না। ইহাতে সহস্র প্রকারের বাদ-বিসংবাদ, অসংখ্য মতবৈষম্যের সংঘর্ষ, পথ-অনুসন্ধানের অগণিত বিচিত্র পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা, মানবমনের অশ্রান্ত কর্ম্মশীলতা ও সমস্যাসমাধানের অসীম আকূতি, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য আনিবার জীবনব্যাপী উদ্যম ও সাধনা—এই সকল মিলিয়া এক বিরাট, আপাতদৃষ্টিতে বিশৃঙ্খল ও অসংবদ্ধ, কিন্তু বস্তুতঃ কেন্দ্রাভিমুখী ও নিগূঢ় উদ্দেশ্য প্রণোদিত সমুদ্রমন্থনের সৃষ্টি করিয়াছে। উপন্যাসের পাতাগুলিতে সমস্ত পৃথিবীর প্রতিনিধি, সমস্ত মতবাদের মুখপাত্র ভিড় করিয়া আসিয়াছে। সেখানে সমবেত মানবকণ্ঠের কি বিপুল কোলাহল, শক্তির কি বিচিত্র আত্মপ্রকাশ, আকাঙ্ক্ষার কি অদম্য ঊর্দ্ধগতি, ভাঙ্গাগড়ার কি দুর্দ্দম ইচ্ছা ও দুর্জ্জয় দুঃসাহসিকতা, দৃষ্টিভঙ্গীর কি বিপ্লবকারী অভিনবত্ব! এই বিরাটকায় উপন্যাসের স্বচ্ছ দর্পণে আমরা আধুনিক মানবের অন্তররহস্যের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া চাহে সমগ্র মানবজাতির মুক্তি, সাম্য, সর্ব্ববিধ শোষণের বিলোপ, অনবদ্য সমাজব্যবস্থা, আত্মার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগের উপযুক্ত নিখুঁত, ন্যায়নীতি-নিয়ন্ত্রিত আবেষ্টন। এই নূতন ইচ্ছা তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিয়াছে—ইহার তীব্র আকর্ষণের নিকট তাহার পূর্ব্বতন আদিম সংস্কার ও প্রবৃত্তিগুলি গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্কীর্ণ নীড়রচনা, শুদ্ধশান্ত একনিষ্ঠ প্রেম, অভ্যস্ত কর্ত্তব্যের কক্ষাবর্ত্তন, স্নেহপ্রীতির সহজ আদানপ্রদান, আত্মকেন্দ্রিক জগতে স্বস্তি-রোমন্থন, বৃহত্তর পৃথিবীর সংস্রব এড়াইয়া গজদন্তের গম্বুজে (ivory tower) আশ্রয়গ্রহণ—এই বহু শতাব্দীর সুপ্রতিষ্ঠিত জীবনযাত্রার নিবিড় মোহ সে কাটাইয়া উঠিয়াছে। গত মহাযুদ্ধের যে অগ্নিবেষ্টন তাহাকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় হইতে তাড়াইয়াছে, তাহার সৃষ্টিধ্বংসী অনলশিখরে সমাজের যে বিভীষিকাময় রূপ তাহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, সেই নিরাবরণ অভিজ্ঞতাই অতীতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথকে চিরকালের মত রোধ করিয়াছে। তাই আধুনিক মানুষ আর গৃহী নহে, পথিক; সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী নহে, রিক্ত; সর্ব্বস্বীকৃত আদর্শবাদের দ্বারা সুরক্ষিত নহে, নূতন অবলম্বনের অন্বেষণে উদ্ভ্রান্তচিত্ত; প্রেমিক নহে, রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা প্রেমের বিশুদ্ধিকরণে ও স্বাস্থ্যসংরক্ষণে বিব্রত। সে আর সমতলভূমিতে বিচরণ করে না—সর্ব্বদাই

সমাজের তলদেশ খুঁড়িয়া পাকা বনিয়াদ আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত। বোমাবর্ষণের ভয়ে সে আর ঘর বাঁধে না, তাঁবুতে জীবন কাটায়; তাহার স্থাবরত্ব ঘুচিয়া যাযাবরত্বের পালা সুরু হইয়াছে। প্রেম, বন্ধুপ্রীতি, পারিবারিক বন্ধন, রাজনৈতিক আনুগত্য—সমস্তই আজ তর্কবিতর্ক ও পরীক্ষার বিষয়; অনিশ্চয়তার বাষ্পে আবৃত ও কম্পমান ভিত্তির উপর টলমলভাবে দণ্ডায়মান। সমগ্র পাশ্চাত্য সমাজ সর্বনাশের বংশীরবে কানু-পাগলিনী শ্রীরাধিকার ন্যায় যেন ঘর ছাড়িয়া অভিসারে বাহির হইয়াছে। যে মহামন্ত্রে আবার পৃথিবী স্থির হইবে, বিচলিত ভারসাম্য ফিরিয়া আসিবে, মানুষ আজ তাহারই অনুধ্যানে বিভোর। অন্নদাশঙ্করের উপন্যাসে এই বিপ্লবোন্মুখ, ভারকেন্দ্রচ্যুত, নবীনসৃষ্টির স্বপ্নাবিষ্ট পৃথিবীর সাময়িক উদ্ভ্রান্তরূপ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—ইহা তাঁহার উপন্যাসের সর্বপ্রধান পরিচয়।

সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

শ্রীচৈতন্যের চরিতকারগণের রচনা পাঠে জানা যায়—সে সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে শুধু প্রেমের বন্যা নয়—একটা ভাবের বন্যাও আসিয়াছিল। ইহার ফলে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচুর শস্যসম্পদের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"বর্ষাঋতুর মত মানুষের সমাজে এমন এক একটা সময় আসে যখন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাষ্প প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিতে থাকে। চৈতন্যের পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল। তখন সমস্ত আকাশ প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল। তাই দেশে সে সময় যেখানে যত কবির মন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সকলেই সেই রসের বাষ্পকে ঘন করিয়া কত অপূর্ব ভাষা এবং নূতন ছন্দে কত প্রাচুর্য্যে এবং প্রবলতায় তাহাকে দিকে দিকে বর্ষণ করিয়াছিল।" [সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ]

"মুক্তি কেবল জ্ঞানীর নহে, ভগবান কেবল শাস্ত্রের নহেন, এই মন্ত্র যেমনই উচ্চারিত হইল, অমনি দেশের যত পাখী সুপ্ত হইয়াছিল, সকলেই এক নিমেষে জাগরিত হইয়া গান ধরিয়া দিল। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, বাংলা দেশ আপনাকে যথার্থভাবে অনুভব করিয়াছিল বৈষ্ণব যুগে। এই সময়ে একটা গৌরব সে লাভ করিয়াছিল যাহা অলোক-সামান্য, যাহা বিশেষরূপে বাংলা দেশের, যাহা এ দেশ হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছিল।" [ঐ]

জাতীয় জীবনে এই রস-প্রাচুর্য্যের ফলে শুধু মৌলিক সৃষ্টি নয় অনুবাদ সাহিত্যেরও পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। কেবল বঙ্গ সাহিত্যের নয়, সংস্কৃত সাহিত্যেও একটা ভাবধারার প্রবাহ আসে।

শ্রীচৈতন্যের ঘনিষ্ঠ অনুচর ও ভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদের সংস্কৃতে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁহারা সংস্কৃতে চৈতন্যলীলা সম্বন্ধে, তাঁহার প্রচারিত প্রেমধর্ম সম্বন্ধে এবং শ্রীচৈতন্যপ্রবর্তিত আদর্শে নূতন করিয়া অলঙ্কার, রসতত্ত্ব ও দর্শনের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে ব্রজলীলা বিষয়ক গ্রন্থও অনেক রচিত হইয়াছিল।

ভাগবত ও অন্যান্য গ্রন্থের নূতন করিয়া টীকা, ভাষ্য ও টিপ্পনী রচিত হইয়াছিল। এই সকল গ্রন্থের গ্রন্থকারগণের মধ্যে রূপগোস্বামী, জীবগোস্বামী ও পরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুরের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। রূপগোস্বামী রচনা করেন—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (রসশাস্ত্রের গ্রন্থ—ভক্তি-তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা), উজ্জ্বলনীলমণি (উজ্জ্বল বা মধুর রসের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ এবং অলঙ্কার নির্ণয়), নাটকচন্দ্রিকা (নাটকসম্বন্ধীয় রসতত্ত্বের গ্রন্থ), বিদগ্ধমাধব (নাটক), ললিতমাধব (নাটক), দানকেলিকৌমুদী (রূপক নাট্য), উদ্ধবসন্দেশ (কাব্য), হংসদূত (কাব্য), পদ্যাবলী। জীবগোস্বামী রচনা করেন শ্রীগোপাল চম্পূ, হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গোপাল ভট্টের ষট্‌সন্দর্ভের সর্ব্বসংবাদিনী টীকা। শ্রীগোপাল ভট্ট ও জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ বৈষ্ণব দর্শন-পুস্তক। মুরারি গুপ্ত রচনা করেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতম্ (কড়চা নামে প্রসিদ্ধ)। সনাতন গোস্বামী ভাগবতের টীকা রচনা করেন এবং হরিভক্তিবিলাস নামে বৈষ্ণব স্মৃতি-গ্রন্থ রচনা করেন। রায় রামানন্দ লেখেন জগন্নাথবল্লভ নাটক। কবিকর্ণপূর রচনা করেন—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ, অলঙ্কারকৌস্তুভ (অলঙ্কারের ও রসতত্ত্বের পুস্তক) ও গৌরগণোদ্দেশদীপিকা। কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচনা করেন—শ্রীগোবিন্দলীলামৃত। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রচনা করেন—শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত, গৌরগণচন্দ্রিকা।

এই সকল পুস্তকের অধিকাংশেরই বাংলায় অনুবাদ হইয়াছিল—কোন কোন গ্রন্থের ভাব লইয়া নূতন গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। প্রেমদাস চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের; লোচনদাস জগন্নাথবল্লভ নাটকের শ্লোকাবলীর; যদুনন্দন দাস গোবিন্দলীলামৃত, বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত ও রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ করেন। ভাগবতের অনুবাদ শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ব হইতেই চলিতেছিল। মালাধর বসু গুণরাজ খাঁ সর্ব্বাগ্রে ভাগবতের (১০ম-১১শ স্কন্ধের) অনুবাদ করেন। ইহা শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য নামে প্রসিদ্ধ। প্রায় নিখুঁত পয়ারে ইহা রচিত। এই অনুবাদ আক্ষরিক নয়। দানলীলা ও নারখণ্ড ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। ভাগবতে রাধা নাই—ইহাতে রাধার আবির্ভাব হইয়াছে।* বাঙ্গলার নিজস্ব ভাবধারা তাঁহার অনুবাদের পরিধাতে প্রবাহিত করিয়া কবি শ্রীকৃষ্ণবিজয়কে মৌলিক কাব্যের মর্য্যাদা দিয়াছেন। ইহা কেবল অনুবাদমাত্র হইলে শ্রীচৈতন্যদেব ইহা শুনিয়া আনন্দ পাইতেন না, কারা থাকিতে তাঁহার ছায়ায় রতি হইত না।

রঘুনাথ পণ্ডিত পরে ভাগবতের ১২শ স্কন্ধের অনুবাদ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী নামে প্রকাশ করেন। ভাগবতের অনুবাদকদের মধ্যে মাধবাচার্য্যের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যের ধারায় ইঁহার কাব্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল স্থান পাইতে পারে। ইনি ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই; ভাগবত হইতে শ্রীকৃষ্ণ চরিতাংশ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত বিষ্ণুপুরাণ হরিবংশ

---

*শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের ভাষার নিদর্শন—

সবার হৃদয়ে কানু প্রবেশ করিয়া,
বেণুদ্বারে গোপী চিত্ত আনিল হরিয়া।
ছাওয়ালেরে স্তনপান করে কোন জন,
নিজপতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন।
গাভী দোহায়েন্ত কেহ দুগ্ধ আবর্ত্তনে,
গুরুজন সমাধান করে কোন জনে।
হেনহি সময়ে বেণু করিল শ্রবণে,
চলিল গোপিকা সব যে ছিল যেখানে।

এবং অন্যান্য পুরাণের বহুভাব মিলাইয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা প্রচারের জন্য এই কাব্য রচনা করেন। কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল ভাগবতেরই অনুবাদ। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মাধবাচার্য্যের শিষ্য অদ্বৈতপ্রভুর ভৃত্য কৃষ্ণদাস একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন। তাহাতে ভাগবতের উপাখ্যানের সহিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ড বস্ত্রহরণ পারিজাতহরণ দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি উপাখ্যান মিলাইয়া তিনি এই কাব্য রচনা করেন। ভাগবত অবলম্বনে যাঁহারা কাব্য রচনা করেন তাঁহাদের মধ্যে দেবকীনন্দন কবিশেখরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার কাব্যের নাম গোপালবিজয় কাব্য। ইনি দানলীলায় ভাবে ও ভাষায় বড়ু চণ্ডীদাসের দানলীলার অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহার বড়াই চরিত্র অপূর্ব্ব। এইরূপ বহু গ্রন্থের নাম করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহাদের অধিকাংশই দীপান্বিতার মহোৎসব আলোকিত করিয়া মৃণ্ময়দীপের ন্যায় তুলসীতলার পাশে ক্ষীণকৃত হইয়া আছে—তৈজস প্রদীপের মর্য্যাদা লাভ করিয়া অতি অল্পসংখ্যক গ্রন্থই দেবাঙ্গনের কুলুঙ্গিতে রক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃত তৈজসদীপের গৌরব লাভ করিয়াছে শ্রীচৈতন্যের কয়েকখানি জীবনচরিত। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

১। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২। বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত। ৩। লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল। ৪। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল। ৫। গোবিন্দদাসের কড়চা।

গোবিন্দদাসের কড়চা লইয়া অনেক কচকচি হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন উহা প্রাচীন গ্রন্থই নয়, উহা অর্ব্বাচীন গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন সম্ভবতঃ একটি খণ্ডিত পুঁথি ছিল—শান্তিপুরের জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় উহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন উহা একেবারেই জাল। দীনেশবাবু উহাকে আসল গ্রন্থই মনে করেন। আমাদের মনে হয় একটা 'খণ্ডছিন্নবৃৎক্রান্ত' পুঁথি ছিল, গোস্বামী মহাশয় উহাকে ঢালিয়া সাজিয়াছেন।

এই সকল গ্রন্থ ছাড়া শ্রীচৈতন্যের লীলার ইতিহাস তাঁহার ভক্ত ও পার্ষদগণের জীবনচরিতের মধ্যেও পাওয়া যায়। সেই শ্রেণীর চরিতগ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি উল্লেখযোগ্য :

১। যদুনন্দনদাসের কর্ণানন্দ। ২। নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস। ৩। প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা। ৪। ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ। ৫। নরহরিদাসের অদ্বৈতবিলাস। ৬। হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল। ৭। নরহরি চক্রবর্ত্তীর (ঘনশ্যাম) ভক্তিরত্নাকর, শ্রীনিবাসচরিত ও নরোত্তমবিলাস।

এই সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে ঈশান নাগর মহাপ্রভুর সমসাময়িক। হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গলে মহাপ্রভুর দানলীলা অভিনয়ের কথা আছে। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনের দানলীলা মহাপ্রভু যে উপভোগ করিতেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। বংশীশিক্ষায় মহাপ্রভুর জীবনকথা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরে অনেক আজগুবি কথা থাকিলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছু আছে। ইহাতে পরবর্ত্তী যুগের বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক ও আচার্য্যগণের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য শ্রীনিবাস, শ্যামানন্দ ও নরোত্তম। এই গ্রন্থে রূপসনাতন জীব গোস্বামী লোকনাথ গোস্বামী ইত্যাদি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পরিচয় দেওয়া আছে। গ্রন্থে বহু শ্লোক উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গ্রন্থে সংগৃহীত পদগুলিও সুনির্ব্বাচিত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের ভগবত্তা প্রমাণের বহু গল্প আছে।

একটি গল্প এই—মুরারিগুপ্ত একদিন বহু ভোজ্যদ্রব্য শ্রীকৃষ্ণে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করেন। পরদিন চৈতন্যদেব মুরারির নিকট ঔষধ চাহিয়া বলিলেন—অতিরিক্ত ভোজনে তাঁহার অজীর্ণ হইয়াছে। মুরারি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় এত গুরুভোজন হইল?" প্রভু বলিলেন—"কেন? কাল অত ভোজ্যসামগ্রী তুমিই ত নিবেদন করিয়াছিলে, ভুলিয়া গেলে?" মুরারিগুপ্তকে গরুড় বানাইয়া শ্রীনিবাসের বাড়ীতে প্রভু মুরারির পিঠে চড়িয়া শঙ্খচক্রগদাপদ্ম ধারণ করিয়া ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন—গ্রন্থে একথারও বর্ণনা আছে। অদ্বৈতপ্রভুর জীবনচরিত অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে, এমন কি অদ্বৈতপত্নী সীতা দেবীরও জীবনচরিত আছে। কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর কোন পৃথক জীবনচরিত নাই। চৈতন্যভাগবতেরই প্রায় অর্দ্ধাংশ নিত্যানন্দের জীবনচরিত। নিত্যানন্দদাস নিত্যানন্দপ্রভুর একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছিলেন—তাহা এখন আর পাওয়া যায় না।

এই সকল চরিতশাখার পুস্তক হইতে কেবল শ্রীচৈতন্যদেব নয়—তাঁহার ভক্ত ও অনুচরগণের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা ভক্তির ধূপধূমে সমাচ্ছন্ন। তাহার মধ্য হইতে প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের প্রয়োজন আছে। চৈতন্যদেবের পার্ষদচরগণ ও ভক্তগণ যে মহাপুরুষ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, চরিতকারগণ তাঁহাদের চরিত্র মাহাত্ম্যকে এত বেশি অতিরঞ্জিত করিয়া না দেখাইলেও পারিতেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের মানবিকতা ইঁহারা একেবারে হরণ করিয়া লইয়াছেন। ফলে চৈতন্যদেব আর রক্তমাংসের মানুষ হইতে পান নাই। ইঁহাদের কাছে তিনি ভাব-বিগ্রহ। মানুষ হইয়াই তিনি কত বড়, দেবতাদের চেয়েও বড়, তাহা বুঝিবার জানিবার সুযোগ বা অবসর তাঁহারা দেন নাই। তাঁহারা বলিতে চাহিয়াছেন—মানুষ নহেন বলিয়াই তিনি এত বড়। নিমাই যে সুপণ্ডিত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই; কিন্তু পাণ্ডিত্যই তাঁহার জীবনে বড় কথা নয়, জ্ঞান অপেক্ষা প্রেম যে অনেক বড় এই কথাই তাঁহার জীবনের মূল সূত্র। চরিতকারগণ তাঁহার জীবনে চরম পাণ্ডিত্য আরোপ করিয়াছেন। যে মহাজ্ঞান Revealed (আপ্ত) তাহার নিকট অনুশীলন বা অধ্যয়ন হইতে আহৃত জ্ঞান অতি তুচ্ছ। হজরৎ মোহাম্মদের জীবনের কথা স্মরণ করিলেই তাহা বুঝা যায়।

রূপ, সনাতন, জীবগোস্বামী, রঘুনাথ, নরোত্তম ইত্যাদি সাধকগণ প্রভূত ধনসম্পদ ও মান গৌরব ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেবের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তাঁহাদের মহাপুরুষত্ব ও মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের মহিমা সম্যক্‌ভাবেই উপলব্ধ হয়। অলৌকিক শক্তির বা ঐশ্বর্য্যের আরোপে মনুষ্যত্বের মহিমা ক্ষুণ্ণই হইয়াছে—বৃদ্ধি পায় নাই। চরিতকারগণ শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ও সহযোগিগণকে দেবতার অবতার বলিয়া অথবা রুক্মিণী, সত্যভামা, ব্রজগোপী ও মঞ্জরীগণের অবতার বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহাদের আহারবিহার চালচলন সমস্তকেই অমানুষী ও অপ্রাকৃতলীলা বলিয়া মনে করিয়াছেন। ইহাতে মানুষের মাহাত্ম্য স্বীকার না করিয়া প্রকারান্তরে দেবতারই মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও অনুচরগণ কেবল ঐহিকসম্পদ কেন—স্বর্গ, শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে জন্মের আকাঙ্ক্ষা—এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রার্থনা না করিয়া পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধনের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

চরিতগ্রন্থাবলীর ভাববিলাসের আতিশয্য ও ভাবকতার উচ্ছ্বাসের মধ্যেও এই সত্যটি কোথাও হারাইয়া যায় নাই।

পরবর্ত্তী চরিতগ্রন্থাবলী হইতে ইহাও জানা যায়—এই আদর্শ শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই। ভক্তির অনুশীলন করিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণে ভক্তির কথা ভুলিয়া শেষে মানুষেরই ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষকে জোর করিয়া বাড়াইতে বাড়াইতে তাহাকে দেবতার আসনে তুলিয়া দিয়াছিল। ভক্তের ভক্তিই দেবতার সর্ব্বনাশ সাধন করে—দেবতা ভক্তের পরিচর্য্যায় ক্রমে ভোগবিলাসী হইয়া পড়েন। শ্রীচৈতন্যদেব বিষয়ীর মুখদর্শন করিতেন না এবং জগদানন্দকে স্বাচ্ছন্দ্য ভোগে প্রবর্ত্তনার জন্য তিরস্কার করিতেন। কিন্তু কালক্রমে দেখা যায়, যাঁহারা যৌবনে কঠোর সংযম, ক্ষান্তি, শম ও ব্রহ্মচর্য্যের সাধনা করিয়া নমস্য হইয়াছেন—পরবর্ত্তী জীবনে তাঁহারা ভক্তের সেবায়, আগ্রহে ও পীড়াপীড়িতে বিষয়ভুঞ্জন করিয়া স্খলৎপাদ হইয়াছেন।

ক্রমে বাংলায় গৌরাঙ্গবাদের প্রচার হয়—তাহাতে শ্রীকৃষ্ণের বদলে গৌরাঙ্গেরই উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। বৈষ্ণবগণ তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া গুরুকেই ভগবান করিয়া তুলিলেন—ইহাতে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত মহান্ আদর্শ নষ্ট হইল। আবার সেই চিরন্তন গুরুবাদ ফিরিয়া আসিল; সেই মীননাথ গোরক্ষনাথের পুনরভিনয় হইতে লাগিল। কর্ত্তাভজা দলের সৃষ্টি হইল, সহজিয়াবাদ নূতন আকারে দেখা দিল, বৈষ্ণবধর্ম্ম ও পদাবলীর ভোগানুকূল ব্যাখ্যার সূত্রপাত হইল। যে ধর্ম্ম বৈরাগ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহার সহিত ভোগের ও ভোগী-মানুষের সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতার সন্ধি করিতে হইল।

সাহস

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

কুলমাসিমারা যখন প্রথম আমাদের বাড়ীর নীচেকার ঘরে ভাড়া আসেন তখন বেশীদিন যে তাঁহাদের রাখিতে পারিব, এ আশা আমাদের কাহারও ছিল না। সে অনেকদিনের কথা, এখন থেকে অন্তত দশ বছর আগে—কিন্তু একটু একটু করিয়া তাঁহারা রহিয়াই গেলেন, এবং এই দীর্ঘ দশ বৎসর পরে আজ এমন অবস্থায় ব্যাপারটা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহারা চলিয়া যাইবেন এ সম্ভাবনাই কাহারও মনে আসে না। এমন কি, যে চেঁচামেচি কান্নাকাটি প্রভৃতির জন্য প্রতিবেশীরা আমাদের উপর নোটিশ জারি করিয়াছিলেন যে আমরা যদি সাতদিনের মধ্যে অমন লক্ষ্মীছাড়া ভাড়াটেকে তাড়াইয়া না দিই তাহা হইলে তাঁহারা আদালতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন, তাঁহারাই সেই বস্তুটির অভাবে কাল আমাদের কাছে খোঁজ লইতেছিলেন, হ্যাঁহে, বাড়ী তোমাদের নিস্তব্ধ কেন? ফুলদি (কাহারও বা ফুল পিসিমা) কি চলে গেলেন নাকি? কিম্বা ফুল বৌদির কি অসুখ করেছে নাকি হে? সাড়া শব্দ পাচ্ছিনা যে?

ইতিহাসটা তাহা হইলে খুলিয়াই বলি।

ঘরখানা আমাদের অন্দর মহলের মধ্যেই, কিন্তু জ্যাঠামশাই বুদ্ধি করিয়া বাগানের দিকে তাহার একটা জানালার পরিবর্ত্তে দরজা বসাইয়া সামনে একফালি রক বাহির করিয়া দিয়া সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। ঘরটা পড়িয়াই থাকিত, সুতরাং এই সামান্য খরচার পরিবর্ত্তে ন-টা টাকা আয় বাড়িয়া যাইতে আমরা সকলেই খুসী হইলাম। ভাড়াটের সঙ্গে বন্দোবস্ত রহিল, তাঁহারা তোলা উনুন বাহিরে ধরাইয়া ভিতরেই রান্না করিবেন এবং বাগানের দিকের দরজাটা ব্যবহার করিবেন।

প্রথম যিনি ভাড়াটে আসিলেন তিনি এখানকারই পোষ্ট মাষ্টার, মাস-নয়েক থাকিবার পরই কোয়ার্টার পাইয়া উঠিয়া গেলেন। তাঁহার নাকি এখানে অসুবিধা হইতেছিল। তার পরই আসিলেন ভবেশবাবু বা ফুল মাসিমারা। ভবেশবাবু কী একটা বড় আফিসে কাজ করেন, বেশ লেখাপড়া জানা অমায়িক ভদ্রলোক। জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে খুব দ্রুত আলাপ জমিয়া উঠিল, শ্বশুর বাড়ীর সূত্রে কী একটা কুটুম্বিতাও বাহির হইয়া পড়িল বুঝি—ফলে তখনই একবারে একমাসের ভাড়া অগ্রিম লইয়া তিনি রসিদ লিখিয়া দিলেন।

সেইদিনই অপরাহ্নে তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন। স্বামী আর স্ত্রী, মাত্র দুটি লোক। পোষ্ট মাষ্টারের মত এক পাল ছেলে মেয়ে যে আসিল না ইহাতেই আমরা নিশ্চিন্ত হইয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম; যাক্ বাবা, বাঁচা গেল।

কিন্তু হায়রে। সে আশা যে আমাদের কত মিথ্যা তাহা বোঝা গেল তাঁহারা আসিবার দ্বিতীয় দিনেই। প্রথম দিনটা বোধ হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরেই ভবেশবাবু সংযত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরেরদিন সন্ধ্যার পর তিনি অফিস হইতে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে কী চেঁচামেচি, গণ্ডগোল, কান্নাকাটি! তখন ছোট ছিলাম, সব ব্যাপারটা বুঝি নাই—শুধু শুনিলাম ভবেশবাবু মাতাল হইয়া আসিয়া স্ত্রীকে মার ধোর করিতেছেন। পরে জানিয়াছিলাম যে ইহার আগে এইসব কারণেই কোন বাড়ীতে পাঁচ ছয় মাসের বেশী টিঁকিতে পারেন নাই।

সে যাহা হউক—ভবেশবাবুর মাতলামীর বেশ একটা বিশেষত্ব ছিল। যেদিন পেটে একটু বেশী মদ পড়িত সেদিন বাড়ী ঢুকিতেন তিনি কাঁদো কাঁদো হইয়া। আসিয়াই বাজারের পুঁটুলিটা নামাইয়া 'মেজবউ' বলিয়া একটা হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রকের উপরই বসিয়া পড়িতেন। বলা বাহুল্য ফুল মাসিমার এ সমস্ত লক্ষণই জানা ছিল—তিনি সে আর্ত্তআহ্বানে কর্ণপাত মাত্র না করিয়া গম্ভীরভাবে বাজারের পুঁটুলিটা লইয়া ঘরে চলিয়া যাইতেন এবং যথারীতি নিজের কাজে মন দিতেন। কিন্তু ভবেশ মেসো ছাড়িবার লোক নন্। তিনি তারও পরে 'মেজবৌ-ওক্!' বলিয়া গোটা দুইতিন আর্ত্তনাদ করিতেন, তাহার পর ঘরে ঢুকিয়া মাসিমার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া আকুল কণ্ঠে কাঁদিয়া ফেলিতেন। প্রথম বেগটা না কাটা পর্য্যন্ত শুধুই চলিত কান্না, সে ঝোঁকটা কাটিলে কথা ফুটিত। কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিতেন, 'মেজবৌ আমার হাতে পড়ে কী কষ্টই পেলে, এ'টা দিনের জন্যও তোমাকে সুখী করতে পারলুম না। ওক্!' কিংবা 'মেজবৌ, আমি তোমার অযোগ্য স্বামী, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে বিষ এনে দাও—

খেয়ে তোমাকে অব্যাহতি দিয়ে যাই। আর কত সহ্য করবে!' ইত্যাদি—

ইহার উত্তরে যদি বা ফুল মাসিমা বলিতেন যে, না তিনি সুখেই আছেন, তাহার কোন অশান্তি নাই তাহা হইলেও অব্যাহতি ছিল না—ভবেশ মেসো প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিবেনই যে তিনি ফুল মাসিমার অযোগ্য স্বামী। তিনি ইনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেন, 'মেজবৌ তুমি আমাকে স্তোক দিও না—মেজবৌ, তুমি আমার বুক চেরে মিথ্যে কথা বল্‌ছ—মাইরি বল্‌ছি বিশ্বাস করো, আমি পিশাচ, আমি চামার, আমি ভানোয়ারের অধম' ইত্যাদি।

এ সব ক্ষেত্রে বিরক্ত হইয়া ফুল মাসিমা হয়ত মানিয়া লইতেন যে মেসোমহাশয়ের কথাই ঠিক তখন আবার চলিল অন্য আক্রমণ।

'মেজবৌ মার্জ্জনা কি নেই? তোমার পায়ে পড়ি এবারকার মত মাপ করো—আমি পশু, তুমি ত দেবী —এইবারটি মাপ করো—'

'মাপ করিয়াছি' বলিলেও নিস্তার নাই। 'মেজবৌ সত্যি বল্‌ছ মাপ করেছ? মাইরি? .....না তোমার মনে রাগ রয়েছে। ওঃ কী করব রে? গলায় দড়ি দেব? আপিং খাব? মেজবৌ কী হ'লে তুমি খুসী হও বলো, আমি তাই করছি।'

এ সব কথা শুনিতে ফুল মাসিমার ভাল লাগিত কিনা আমাদের ঠিক জানা নাই তবে ফুলমাসিমা প্রত্যহই খানিকটা করিয়া এই প্রলাপ সহ্য করিতেন; তাহার পর ছাড়িতেন তাঁহার অব্যর্থ অস্ত্র। জোর করিয়া তাঁহাকে টানিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া মাথায় এক বাল্‌তি জল ঢালিয়া দিতেন—ব্যাস্, যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িত। আর সে মানুষই নয়। নিজেই মাথা মুছিয়া ঘরে আসিবেন, সহজ ভাবে কথা কহিবেন, বাজারের দরদস্তুরের কথা আলোচনা করিবেন, চা খাইবেন—শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বা আমাদের ডাকিয়া গল্পই শুরু করিবেন।

কিন্তু বিপদ ছিল যেদিন পয়সা কম থাকিত বা কোন কারণে বেশী মদ খাওয়ার ইচ্ছা হইত না সেই দিনই। বাড়ী ফিরিতেন একেবারে রুদ্রমূর্ত্তিতে। জিনিষ পত্র ফেলিয়া ভাঙ্গিয়া ছড়াইয়া, ফুলমাসিমাকে গালাগালি দিয়া বাড়ী যেন মাথায় করিতেন। তাহার পর, ফুলমাসিমা কোন জবাব দিন বা না দিন, কোন একটা ছুতা ধরিয়া তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া প্রাণপণে ঠেঙ্গাইতেন; প্রথম প্রথম দুই একদিন আমাদের বাড়ীর মেয়েরা উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, (কারণ সে সময়ে আমাদের বাড়ীর পুরুষরা প্রায় কেহই বাড়ী থাকিতেন না) কিন্তু ভবেশবাবুর রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আর কেহ কাছে যাইতে সাহস পান নাই। ইদানীং আবার তাঁহাকে ঐ ভাবে ফিরিতে দেখিলেই ফুলমাসিমা ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতেন।

তবে ভরসার কথা এই যে, ফুলমাসিমাকে খানিকটা মারিবার পর আপনা আপনিই তাঁহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিত। নিজেই কলতলায় গিয়া মাথায় জল দিয়া আসিতেন, ফুলমাসিমার পায়ে ধরিয়া মাপ চাহিয়া লইতেন, তাহার পর বাহিরে গিয়া ব্রাণ্ডি কিংবা কেরোসিন তেল সংগ্রহ করিয়া একটা মাল্‌সাতে শুঁলের আগুণ করিয়া মাসিমার কাল্‌সিটা পড়া জায়গাগুলিতে মালিস ও সেক করিতে বসিতেন। তারপর সারারাত ধরিয়া চলিত মাসিমার সেবা ও তোয়াজ। সে মানুষই নয় আর। এমন কি মাত্রাটা যেদিন একটু বেশী হইয়া

পড়িত সেদিন হোটেলে গিয়া মাসিমার জন্য চপ্ কাটলেটও কিনিয়া আনিতেন।

অবশ্য এ ত গেল ভিতরের কথা—কিন্তু পাড়ার লোকে এ সব ইতিহাসের ধার ধারিতেন না, তাঁহারা শুনিতেন শুধু ঐ চেঁচামেচি কান্নাকাটি। ফলে তাঁহারা অত্যন্ত গোলমাল শুরু করিলেন, একদিন তিন চার জনে মিলিয়া আমাদের জানাইয়াই গেলেন যে সাতদিনের মধ্যে এই লক্ষ্মীছাড়া মাতাল ভাড়াটে উঠাইয়া না দিলে তাঁহারা আদালতের সাহায্য লইতে বাধ্য হইবেন। বাড়ীর লোকরাও যে অত্যন্ত উত্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয় কিন্তু বিপদ বাধিয়াছিল ফুলমাসিমাকে লইয়া, তিনি দুই তিন দিনের মধ্যেই এমন ভাবে সকলের অন্তরঙ্গ ও প্রিয় হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার কল্পনাও হইয়া উঠিল কষ্টকর। মা-ত নিজের বোনের মতই তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, জ্যাঠামশাই তাঁহাদের উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলেই তাঁহার চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া উঠিত। আর শেষ পর্য্যন্ত পাড়ার লোককে ফুলমাসিমাই ঠাণ্ডা করিলেন। নিজে বাঁচিয়া বাড়ীর মধ্যে গিয়া মেয়েদের সঙ্গে ভাব করিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পুরুষরাও কেহ তাহার ভাই, কেহ বোন-পো, কেহবা বাবা হইয়া উঠিলেন, সুতরাং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহাদের তাড়াইবার কথাটা আপনিই চাপা পড়িয়া গেল।

ফুলমাসিমার কথাবার্ত্তায় সব চেয়ে যেটা বিস্ময়কর ছিল সেটা স্বামী সম্বন্ধে তাঁহার সহজ মনোভাব। ভবেশ বাবুর ব্যবহারে তাঁহার যে কোন লজ্জা পাইবার কারণ আছে, অন্য মেয়েরা যে এ ব্যাপারে তাঁহাকে করুণা ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে পারে—এ কথাটা একবারও তাঁহার মাথায় যাইত না। বরং কেহ সেই ধরণের কথা তুলিলে তিনি যেন একটু বিস্মিত দৃষ্টিতেই তাহার দিকে তাকাইতেন। অপরপক্ষ তাহাতেও নিরস্ত না হইলে তিনি নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়া যাইতেন।

একদিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। দুপুর বেলা মেয়েদের আড্ডা বসিয়াছে, ছেলে মানুষ বলিয়া আমরাও সেই ঘরে আছি, কেহ নিষেধ করে নাই। তাহার আগের দিন রাত্রে ভবেশ মেসো একটু বেশী বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহার ফলে আজ সকালে আর ফুলমাসিমা উঠিতে পারেন নাই, অনুতপ্ত মেসোমশাই নিজেই রান্না করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া গিয়াছেন—সেই কথাটাই মাসিমা সগর্ব্বে গল্প করিতেছিলেন। আমার মা শুনিতে শুনিতে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিয়া উঠিলেন, 'তুই থাম ফুল! ও কথা আর বাহাদুরি ক'রে গল্প করিস্ নি। ····৮····তুই বলে তাই ঐ জানোয়ারটার ঘর করিস্, আমি হ'লে অমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করার আগে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম্!'

মা সাধারণতঃ এ ধরণের কথা কখনও ফুলমাসিমাকে বলিতেন না—সেদিন বোধ হয় অত্যন্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই আর নিজেকে সাম্‌লাইতে পারেন নাই, কিন্তু মাসিমা এই রূঢ়তায় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ বিবর্ণ মুখে বসিয়া থাকিবার পর বার-দুই ঢোক গিলিয়া বলিয়া উঠিলেন: ভালবাসে বলে তাই, আপনার বলে তাই, নইলে কে কাকে মারে দিদি!'

তাহার পর আর উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নীচে চলিয়া গেলেন।

মা-ত কথাটা বলিয়া ফেলিয়া অপ্রস্তুত হইয়াছিলেনই। ঘর সুদ্ধ সকলেই আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা

সকলেই ভাবিলাম যে ফুলমাসিমা বোধ হয় কিছু দিন আর আমাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করিবেন না। কিন্তু দেখিলাম যে স্বামীর অপরাধ সহজে ক্ষমা করার অভ্যাস থাকায় সমস্ত অপরাধই তিনি ক্ষমা করিতে শিখিয়াছেন। একটু পরেই কী একটা ছুতায় তিনি উপরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যেন কিছুই হয় নাই এমনি ভাবেই কথাবার্ত্তা শুরু করিয়া দিলেন। আমরা সকলেই নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম; যদিও সেইদিন হইতে মা বা আমাদের বাড়ীর অন্য কেহ ভবেশ মেসো সম্বন্ধে আর কোন কটূক্তি তাঁহার কাছে করেন নাই। যে মানুষ কাহাকেও কখনও আঘাত ফিরাইয়া দেয় না তাহার নিঃশব্দ বেদনার কারণ হইয়া লাভ কি?

এ হেন ফুলমাসিমার সংসার কয়দিন হইতে নিস্তব্ধ হইয়া আছে, বিস্ময়ের কথা বৈ কি! ব্যাপারটার কারণ সম্বন্ধে অতি সতর্পণে অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানা গেল তাহা আরও বিস্ময়কর। ভবেশ মেসো মাতাল হইয়া যাহাই করুন না কেন, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তিনি ফুলমাসিমাকে অত্যন্ত ভয় করিয়া চলিতেন। এই দীর্ঘদিনের মধ্যে আমরা কখনও তাঁহাকে মাসিমার কথার প্রতিবাদ করিতে ত শুনিই নাই—কখনও তাঁহাদের কোন বিষয়ে মতভেদ হইয়াছে এমনও শুনি নাই। হঠাৎ সেদিন কি একটা ব্যাপারে বোধ হয় বাজার যাওয়া লইয়াই, দুজনের একটু মনান্তর হইয়াছিল এবং মেসোমশাই একটু চড়া গলায় কী জবাব দিয়াছিলেন। তাহার ফলে মাসিমা মুখ অন্ধকার করিয়া ছিলেন এবং বাজার হইতে ফিরিবার পরে কথা কহেন নাই এমন কি আহারের সময়েও প্রশ্ন করেন নাই আর কিছু চাই কি না। ফলে, ভবেশ বাবু যখন অফিসে যান তখন খুবই মুহ্যমান অবস্থাতেই বাহির হইয়াছিলেন। ফুলমাসিমার আশা ছিল যে, সেদিন ভবেশ বাবু একটা ভাল রকমের কিছু উপহার লইয়া বাড়ী ঢুকিবেন এবং সন্ধির প্রস্তাব স্বরূপ মদ না খাইয়া ফিরিবেন। কিন্তু ভবেশবাবু সে সব কিছুই করেন নাই, অফিসের বেয়ারা দিয়ে খবর পাঠালেন যে তিনি দিন-তিনেকের ছুটি লইয়া তাঁহার দাদার কাছে আসানসোলে চলিয়া যাইতেছেন—ফুলমাসিমা যেন না ভাবেন।

কথাটা সামান্য, কিন্তু সংবাদটা শুনিবার পর ফুলমাসিমার মুখের যে অবস্থা হইল তাহা অবর্ণনীয়। তিনি দুঃখিত হইয়াছেন, কিম্বা ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, তাহা বিরহ কিংবা ক্ষোভ কিছুই বোঝা গেল না শুধু অপরিসীম একটা বেদনার ছবি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে রাত্রি তিনি রান্না করিলেন না, মায়ের অত্যন্ত পীড়াপীড়িতে আমাদের এইখানেই সামান্য কিছু মুখে দিলেন মাত্র—পরের দিনও তাঁহার সে দিকে কোন চেষ্টা দেখা গেল না; মা অবশ্য নিজেই তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, তুই আর এ কদিন রাঁধিসনি ফুল, ভবেশ যতদিন না আসে আমার এখানেই খাস। ফুলমাসিমা তখন একবার বিষণ্ণ উদাস দৃষ্টিতে মায়ের মুখের দিকে তাকাইলেন কোন জবাব দিলেন না, প্রতিবাদও করলেন না। কিন্তু সেদিন আহারে বসিয়া প্রায় কিছুই খাইলেন না, খানিকটা নাড়াচাড়া করিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

বলা বাহুল্য এতটা বাড়াবাড়ি আমাদের সকলেরই অত্যন্ত খারাপ লাগিল। ফুলমাসিমা কচিখুকী নহেন, অভয় মেসোরও চল্লিশ পার হইয়াছে। তা ছাড়া তাঁহারা নাকি একুশ বৎসর বিবাহিত জীবন যাপন করিতেছেন, এ অবস্থায় স্বামী যদি দুই তিন দিনের জন্য বাহিরে নিয়াই থাকেন ত এত হা-হুতাশ করিবার কি আছে। মা কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইলেও, মুখে তাঁহাকে সান্ত্বনা

দিবারই চেষ্টা করিলেন—কাকীমা-বৌদির দল আড়ালে হাসাহাসি করিতে লাগিলেন প্রচুর।

কিন্তু বিরক্তিটা ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল ফুলমাসিমার রকম দেখিয়া মেয়েলি ভাষায় আপিক্যেতা'রও একটা সীমা থাকা দরকার। অন্য দিন বারোটা বাজিলেই নিজের কাজ করিয়া ফুলমাসিমা উপরে আসিয়া মেয়ে মজলিসে যোগ দিতেন, বেলা চারটার আগে আর নীচে নামিতেন না—ঘুম পাইলে উপরেই কোথাও পড়িয়া গড়াইতেন। অথচ আজ, উপরে খাওয়ার ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও, কোনমতে খালার কাছ হইতে উঠিয়া একেবারে নীচে নামিয়া গেলেন এবং সারাদিন আর ঘর হইতে বাহির হইলেন না। একেবারে সন্ধ্যার পর মায়ের ডাকা ডাকিতে কাপড় কাচিয়া যখন উপরে চা খাইতে আসিলেন তখনও মুখ তেমনি থমথমে, তেমনি উদাস। চা খাওয়া হইয়া গেলে খালি পেয়ালাটা হাতে নাড়াচাড়া করিতে করিতে অস্বাভাবিক রকম মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, দিদি, একটা কথা বলব?

মা একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন, 'অত ভণিতা ক'রে আবার কি বলবি?' 'আজ আর আমার আটা মাখবেন না, আমার একদম খিদে নেই। আমার আমার শরীরটা বড় খারাপ করেছে।'

ইহার পর আর মায়ের ধৈর্য্য রাখা সম্ভব হইল না। এতদিন ঘনিষ্টতাটা প্রায় আত্মীয়তায় দাঁড়াইয়াছিল বলিয়া মা আর ইদানীং কথা বিশেষ হিসাব করিয়া বলিতেন না, আজও মুখে লাগাম রাখিলেন না। একেই অপ্রিয় সত্যভাষণের জন্য পাড়ার মধ্যে তাঁহার খ্যাতি ছিল, তাহার উপর দুইদিন ধরিয়া মনের মধ্যে তাঁহার রোষ ঘুমায়িত হইয়া আজ সকল ধৈর্য্যের সীমা লঙ্ঘন করিল। তিনি কিছুক্ষণ ধরিয়া যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিয়া যখন থামিলেন তখনও কিন্তু ফুলমাসিমা একটি প্রতিবাদের কথা উচ্চারণ করিলেন না, বা উঠিয়াও গেলেন না, শুধু তাহার দুই চোখ প্লাবিয়া গণ্ড বাহিয়া ধারায় ধারায় জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। মা সেই জল দেখিয়াই হউক বা নিজের রূঢ়তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপই হউক—হঠাৎ অত্যন্ত কোমল হইয়া পড়িলেন, কাছে বসিয়া মাসিমাকে একেবারে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, কেন অমন কচ্ছিস বল দেখি ফুল—সত্যি কথা বলবি।'

এবার ফুলমাসিমা একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন। মায়ের গলাটা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ বুকে রাখিয়া আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে নিজেই একটু সুস্থ হইয়া বলিলেন, 'তোমরা যা ভাবছ দিদি তা নয়। এ আমার কপাল পোড়ার কথা যে! আমার আর কিছু কি ভাল লাগছে?'

'সে কিরে। কী বলছিস পাগলের মত!'

'ঠিকই বলছি দিদি'—আর একবার কান্নার জোয়ার আসিল—'এতদিন বিয়ে হয়েছে দিদি, মারুক আর ধরুক, যাই করুক, আমি সত্যি সত্যি রাগ করেছি বুঝতে পারলে ও দুই চোখে অন্ধকার দেখত—পাগলের মত চেষ্টা করত যাতে আমার রাগ ভাঙে, যাতে আমার মুখে হাসি ফোটে—। যতক্ষণ না আমি আবার হেসে কথা কইতুম, ততক্ষণ যেন জ্ঞান থাকত না। এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি দিদি, যত মাতালই হোক না কেন, আমি বিরক্ত হচ্ছি বুঝতে পারলে ওর নেশা পর্য্যন্ত ছুটে যেত। আর সেই লোক কিনা, আমি মুখ ভার করে আছি দেখেও স্বচ্ছন্দে বেরিয়ে গেল, কেন রাগ করলুম একবার জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করলে না, উল্টে একটা চাকর দিয়ে চিরকুট পাঠিয়ে সটান বিদেশে চলে গেল। কী বলছ দিদি, আমার বুকের মধ্যে যে কি আগুন জ্বলছে তা শুধু অন্তর্যামীই

জানেন! এত সাহস ওর আসে কোথা থেকে, অন্তদিকে যদি টান না থাকবে?

শেষের কথাগুলি আবার কান্নায় জড়াইয়া গেল। মা যে কী করে গম্ভীর হইয়া রহিলেন তা তিনিই জানেন। কোনমতে কণ্ঠস্বরে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা টানিয়া আনিয়া কহিলেন, এই কথা! পাগলী কোথাকার, আমি বলি না জানি কি। এ যে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছিস্ ফুল। ···শোন্, মুখ তোল, আমার দিকে চা—ওরে, আমার ঢের বয়স হয়েছে, অনেকদিন ধরে এই এত বড় সংসার চালাচ্ছি, লোক ও ঢের দেখলুম—আমি বলছি তোর কপাল অত সহজে পুড়বে না, ভবেশ সে রকম লোক নয়। তোর ওপরে ওর যা ভালবাসা সে কি এতই ঠুন্‌কো ভাবিস। ···আ আমার কপাল, এতদিনেও বিশ্বাস করতে শিখলি না।

ফুলমাসিমার ললাটের মেঘ কাটিয়া যেন এক ঝলক্ আলো ফুটিয়া উঠিল। তিনি সাগ্রহে মুখ তুলিয়া কহিলেন, 'তুমি সত্যি কথা বলছ দিদি, আমার ভয় নেই? না, আমাকে স্তোক্ দিচ্ছ?'

'না, রে, সত্যিই বলছি।'

'তবে ও অমন করলে কেন?'

'সে যখন তোদের ঝগড়া মিটে যাবে তখন তাকেই জিজ্ঞাসা করিস।'

আবারও ফুলমাসিমার মুখ অন্ধকার হইয়া আসিল। কহিলেন, 'তা ঝগড়াই বা করলে কেন দিদি, এতদিনের মধ্যে ত কখনও আমাদের মনান্তর হয় নি।'

মা কোন মতে ঠোঁট কামড়াইয়া মুখভাব শান্ত রাখিলেন। বলিলেন, 'ওকে কি মনান্তর বলে রে পাগ্‌লী? ও হ'ল ঠোকাঠুকি লাগা! নে, নে, ওঠ্—মরদাটায় জল দে দিকি, কাজ কর।'

ফুলমাসিমা উঠিলেন বটে, সেদিন আহারও করিলেন স্বাভাবিক ভাবেই কিন্তু তাঁহার মনের দ্বিধা বা সংশয় যে একেবারে কাটে নাই তা তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আর কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। কথার ফাঁকে ফাঁকে অকারণ দীর্ঘশ্বাস তাঁহার পড়িতেই রহিল।

হঠাৎ সে মেঘ কাটিল আরও দিন-দুই পরে। ঘোড়ার গাড়ীর শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি ভবেশবাবুর সহিত একটি প্রায় প্রৌঢ়া মহিলা নামিতেছেন, সঙ্গে গুটি-দুই ছেলে মেয়ে। আরও ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে চিনিতে পারিলাম, ইনি ভবেশবাবুর বৌদি। আসানসোলে থাকেন, এতকালের মধ্যে বছর-পাঁচেক আগে একবার মাত্র আসিয়াছিলেন দিন কয়েকের জন্য।

ভদ্রমহিলা গাড়ী হইতে নামিয়া একেবারে ফুলমাসিমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন, 'বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত বুঝি তোদের পাগ্‌লামী ঘোচে না।' কী বলেছিলি ওকে?'

কণ্ঠস্বর অতি কষ্টে ফোটে। অভিমানরুদ্ধকণ্ঠে মালিমা বলেন, কী বলেছি?'

'তা জানিনে বাপু। গিয়ে বলে লাইফ ইন্সিওরের টাকা কটা তোমাদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি, তোমরাই ওকে দেখো, এই আমার ব্যাঙ্কের বই, এই সব কাগজ পত্র—আমি আর এসব কিছু জানি না, আমি আত্মহত্যা করব—'

ফুলমাসিমা জায়ের আলিঙ্গনের মধ্যেই শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে আরও নিবিড়ভাবে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, 'হাঁ, শোন্‌না। সে কিছুতে থামাতে পারি না, বলে আর আমি কিছুতেই এ জীবন রাখব না, আমি মরবই। যত বলি ব্যাপার কি, সব খুলে

বলো তত ঐ এক কথা, ওকে তোমরা দেখো, আর ত কেউ নেই, মোদ্দা আমি মরবই। .....অনেক মাথার দিব্যি টিব্যি দেবার পর শুনি যে তুই নাকি শুধু শুধু ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছিস, আবার ওর ওপরই রাগ ক'রে মুখ ভার ক'রে আছিস - এমন কি ভাত দিয়ে একবার খোঁজ পর্য্যন্ত করিস্ নি যে আর কিছু ওর চাই কিনা—এই বাবুর একেবারে মাথায় আগুন জ্বলে গেছে, এ ছার প্রাণ আর রাখ্‌বে না। ঠাণ্ডা করতে কি পারি—কোন কথা শুনতে চায় না। .....যত সব পাগলের কাণ্ড ত, কী ক'রে বসবে তা কি জানি, তাই আবার নিজেকে আস্‌তে হ'ল। নাও ভাই তোমার জিনিষ বুঝে নাও, আমার সেখানে ঘর-করা সব আতান্তরে ফেলে এসেছি!'

এতক্ষণে মেঘ সত্য-সত্যই কাটিল। কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম কোপ টানিয়া আনিয়া স্বামীর দিকে কটাক্ষ হানিয়া হাসিহাসি মুখে ফুলমাসিমা কহিলেন, 'আ-া, ন্যাকামি!'

জন্মাষ্টমী

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যরত্ন

মথুরার রাজপথে আজ সমারোহের অন্ত নাই। শূরবংশীয় বসুদেব দেবককন্যা দেবকীকে বিবাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। মথুরাধিপতি উগ্রসেনপুত্র কংস পিতৃব্যকন্যার বিবাহে উৎসাহাধিক্যে নবদম্পতির সারথ্যে ব্রতী হইয়াছে। শঙ্খ, মৃদঙ্গ, তূরী, দুন্দুভি প্রভৃতি মঙ্গল বাদ্য বাজিতেছে। দেবকীর পিতা সুসজ্জিত রথ হস্তী অশ্ব দাসী প্রভৃতি যৌতুক প্রদান করিয়াছেন, সেই সমস্ত উপায়নও শোভাযাত্রার শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে। কাতারে-কাতারে নরনারী এই উৎসব দর্শনে সমবেত হইয়াছে। সকলেই আনন্দিত, অকস্মাৎ সমবেত জনতাকে স্তম্ভিত করিয়া কংসের উদ্দেশে কে যেন বলিয়া উঠিল, 'অরে অবোধ, যাহাকে বহিয়া বেড়াইতেছিস্ তার অষ্টম গর্ভ তোকে বধ করিবে।' শুনিবামাত্র কংসের ভাবান্তর ঘটিল, সেই ভোজকুলপাংশন ক্রোধ হইতে তরবারী আকর্ষণ পূর্ব্বক দেবকীর কেশে ধরিয়া তাহার বধসাধনে উদ্যত হইল। খলের স্বভাবই এইরূপ—এই এখনই অত্যন্ত সন্তুষ্ট, পরক্ষণেই ভীষণ রুষ্ট! ইহাদের প্রসাদও ভয়ঙ্কর। বসুদেব অকস্মাৎ এই বিপৎপাতে কিঞ্চিত হইলেন না। সেই নৃশংস নির্লজ্জ খলকে এই নিন্দিত কর্ম্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। বলিলেন লোকে তোমার প্রশংসা করে, তুমি বীর, তুমি কেন এই বিবাহ উৎসবে ভগিনীহত্যায় উদ্যত হইয়াছ। মৃত্যু তো দেহধারীর দেহের সঙ্গেই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আজই হউক আর শতবৎসর পরেই হউক প্রাণীগণকে মরিতে হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। সুতরাং আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী জীবের কাহারো অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। যে হেতু পরের অনিষ্ট করিলে নিজেরও তার উপস্থিত হয়। অতএব এই মৃত্যুভয়বিহ্বলা কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অচেতন প্রায় তোমার অনুজা এই বালিকাকে হত্যা করিও না। কিন্তু কংস প্রতিনিবৃত্ত হইল না।

বসুদেব তাহার নির্ব্বন্ধ দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—দেবকী হইতে তো তোমার ভয়ের কারণ নাই। তুমি দেবকীকে বধ করিও না। দেবকীর পুত্র হইতেই তোমার প্রাণের আশঙ্কা, অতএব দেবকীর গর্ভজাত পুত্রগুলি আমি তোমাকে সমর্পণ করিব। বসুদেব মিথ্যা কথা বলেন না তাহা জানিত বলিয়া কংস ভগিনীবধে বিরত হইল। বসুদেব দেবকী সহ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই কংসের মত অত্যাচারী রাজাই ভারতবর্ষের ইতিহাসে একই মহাসত্যকে পুনঃ পুনঃ প্রকাশিত করিয়াছে। সে সত্য,—অত্যাচারীর মৃত্যুবীজ তাহার অত্যাচারের মধ্যেই নিহিত থাকে। মগধের জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর; শাল্ব, শিশুপাল, পৌণ্ড্রক বাসুদেব, কাল যবন, শিশুপাল, দন্তবক্র প্রভৃতি দুষ্ট রাজগণ ছিল জরাসন্ধের অকৃত্রিম বন্ধু; সুতরাং কংসের স্পর্দ্ধার সীমা ছিল না। সর্ব্বপ্রথম কংসের অত্যাচারই বোধ হয় চরমে উঠিয়াছিল। পৃথিবী আপনার যে দুঃখ কাহিনী ব্রহ্মাকে নিবেদন করিতে গিয়াছিলেন, তাহার সর্ব্বপ্রধান কথা হইল এই রাজগণের অত্যাচার। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

'ভূমির্দৃপ্ত নৃপব্যাজ দৈত্যানীক শতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ॥'

যাহারা রাজা নয়, প্রকৃতি রঞ্জন ও রাজ্য পালন যাহাদের উদ্দেশ্য নয়, যাহারা দৈত্য, রাজার ছলে পৃথিবীকে শাসন ও শোষণ করিতেছে, তাহাদের জন্যই পৃথিবীর এই অভিযোগ। রাজ্য হইতে সত্য অন্তর্হিত হইয়াছে, সাধুব্যক্তিগণ আত্মগোপন করিয়াছেন, প্রতিবাদকারী সাহসীর দল নিশ্চিহ্ন হইয়াছে, রমণীর সতীত্ব বিপন্ন, যুবকের জীবন নিরাপদ নয়, এমন কি নিষ্পাপ শিশুর প্রাণ রক্ষারও কোন উপায় নাই। গৃহে গৃহে পুতনা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অত্যাচার নিবারণের জন্যই ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আমি আবির্ভূত হইব। শীঘ্রই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এই ভারতে দেহ-সর্ব্বস্ববাদ সে দিন এমনই প্রবল হইয়া ছিল যে, "দেবকীর অষ্টম গর্ভ তোমাকে বিনষ্ট করিবে" এই দৈববাণী শুনিয়া কংস দেবকীকেই হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল। যেন দেবকীর মৃত্যুতেই কংস অমরতা লাভ করিবে। এই মনোবৃত্তি পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত হইতেছিল। জীবনের অধিকাংশ দিন শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যে অতিবাহিত করিয়াও উগ্রসেন এই মনোবৃত্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। কুলনাশন মুষল দেখিয়া তিনিও যাদব যুবকগণকে আদেশ করিয়াছিলেন যে 'ঐ মুষলটাকেই ঘষিয়া ঘষিয়া নিশ্চিহ্ন কর।' অর্থাৎ ঐ মুষল নষ্ট হইলেই যেন যাদবগণ মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবেন। ইহারা অভয়ের সন্ধান জানিত না, ইহারা ভীরু, ইহারা জীবন্মৃত। অথচ ইহারাই অত্যাচারী, নৃশংস, নির্লজ্জ।

কালে দেবকী এক পুত্র প্রসব করিলেন। সত্যসন্ধ বসুদেব সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া কংসের নিকট উপস্থিত হইলেন। এরূপ আচরণ অপ্রত্যাশিত, কংস বিস্মিত হইল। শিশুকে ফিরাইয়া দিয়া খুসী হইয়া কহিল—ইহাতে আমার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতে আমার অনিষ্ট হইবে না, দেবকীর অষ্টম পুত্রই আমাকে বধ করিবে দৈববাণীতে এই কথাই শুনিয়াছি। বসুদেব শিশুকে লইয়া ফিরিলেন, কিন্তু মনে শান্তি পাইলেন না, খলকে বিশ্বাস নাই, কি জানি কখন কি মতি হইবে। বসুদেবও কংসের চক্ষুর অন্তরাল হইয়াছেন, অমনি মহর্ষি নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলিলেন, কংস, নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসী গোপগণ, তাঁহাদের পত্নীগণ, বসুদেব প্রভৃতি যাদব ও দেবকী আদি যাদব রমণীগণ এবং তাঁহাদের

জ্ঞাতি বন্ধু ভৃত্যগণ সকলেই দেবতাপ্রায়। এদিকে দেবতাগণও দৈত্যবধের জন্য গোপনে উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। কথা কয়টী বলিয়া নারদ অন্তর্হিত হইলেন। কংসও বসুদেবকে ফিরাইয়া আনিয়া সেই সদ্যোজাত শিশুকে বধ করিলেন। বসুদেব ও দেবকীকে লৌহ শৃঙ্খলে বাঁধিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিলেন। পিতা উগ্রসেনকে এবং সেই সঙ্গে যদু ভোজ অন্ধকগণকে নিগৃহীত করিয়া স্বয়ং শূরসেনের রাজাসনে উপবেশন করিলেন। কংসেরও পাপের ভরা পূর্ণ হইতে চলিল। দেবকীর পুত্রের শাপ মোচনের জন্য এইরূপ মৃত্যুর আবশ্যকতা ছিল। বসুদেবের পুত্রার্পণের কথায় শ্রীশুকদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে কংসের প্রকৃতিরও পরিচয় আছে।

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্য্যং কদর্য্যানাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্॥

সাধুগণের দুঃসহ কি আছে? পণ্ডিতগণ কিসেরই বা অপেক্ষা রাখেন? কদর্য্যগণের অকার্য্য কি আছে? ধৃতাত্মাগণ কি না ত্যাগ করিতে পারেন?

কংস বসুদেবের ছয়টী সদ্যোজাত শিশুপুত্রকেই হত্যা করিল। সপ্তম গর্ভে বলদেব আবির্ভূত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের আদেশে যোগমায়া এই গর্ভ আকর্ষণ করিয়া ব্রজস্থিতা বসুদেবের অপরা পত্নী রোহিণীর গর্ভে স্থাপন করিলেন। কারারক্ষিগণ সংবাদ দিল দেবকীর সপ্তম গর্ভ অকালে নষ্ট হইয়া গেল। এদিকে প্রলম্ব, বক, চাণুর, তৃণাবর্ত্ত, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশি ধেনুক প্রভৃতি অসুর ও বাণ নরক প্রভৃতি অসুরপতিগণের সহিত মিলিত হইয়া মগধরাজ জরাসন্ধের সহায়তায় কংস যাদবগণের উপর ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। যাহারা পারিল পলাইয়া বাঁচিল। কেহ কেহ কংসের অনুবর্ত্তী হইয়া মথুরাতেই বাস করিতে লাগিল। শ্রীভগবানের আবির্ভাবকাল এইবার নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল। বিশ্বাত্মা সর্ব্বান্তর্যামী ভক্তগণের অভয়দাতা শ্রীভগবান বসুদেবের মনে প্রকাশিত হইলেন। দেবকী বসুদেব কর্তৃক সমাহিত সেই সর্ব্বজীব সুখপ্রদ, যোগধারণাদি ব্যতীত স্বয়ং আবির্ভূত ভুবনমঙ্গল সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ শ্রীভগবানকে হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক অবরুদ্ধসিদ্ধিবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। কংস বুঝিতে পারিল আমার প্রাণহারী হরি এ বার আসিতেছেন।

আষাঢ়ের মেঘ দেখিলে যেমন কৃষক, চাতক, ময়ূর ও দাবদগ্ধ পশু ভিন্ন ভিন্ন কারণে হইলেও সমান আনন্দে উল্লসিত হয়, তেমনই দেবকী গর্ভে ভগবান আবির্ভূত হইয়াছেন জানিয়া দেবগণকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মা, নারদ, শিব ও ইন্দ্র আদি কংসকারাগারে আসিয়া শ্রীভগবানের জয় উচ্চারণ করিলেন। কৃষক জানে এই মেঘের জল আমার জীবন ধারণোপযোগী শস্যকে রক্ষা করিবে, নূতন শস্যের হেতুভূত হইবে। ব্রহ্মাও সেইরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন, এই কৃষ্ণ মেঘের কৃপাবারি আমার সৃষ্ট সৃষ্টিকে রক্ষা করিবে, সৃষ্টিকে নূতন রূপ দান করিবে। চাতক যেমন বৃষ্টিবারি ভিন্ন বাপী, কূপ, নদী, তড়াগের জল পান করে না, নারদাদি ভক্তগণও তেমনই শ্রীভগবান পদারবিন্দ ভিন্ন অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিতে পারেন না। মেঘ দেখিলেই ময়ূরের আনন্দ, মেঘের সঙ্গে ময়ূরের এই অহৈতুকী আনন্দেরই সম্বন্ধ। মহাদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধও তদ্রূপ। আর দাবদগ্ধ পশু যেমন মেঘ দেখিয়া আশ্বস্ত হয়, দৈত্যভয়ভীত দেবরাজ ইন্দ্রও শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের সম্ভাবনায় আশ্বস্ত হইয়াছেন। দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছেন, তাহার প্রথম শ্লোকেই তাঁহাদের সমগ্র বক্তব্যের সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। দেবগণ বলিয়াছেন—অয়ি সত্যসঙ্কল্প,

সত্যসাধ-গিত, ত্রিকালসত্য, জগৎকারণ, অন্তর্যামী ও পরমতত্ত্ব, সত্য বাক্য ও সম দর্শনের প্রবর্ত্তক, সত্য-স্বরূপ শ্রীগোবিন্দের শরণাপন্ন হইলাম। দেবদৃষ্টি এবং ঋষিদৃষ্টি ভিন্ন শ্রীভগবানের এই সত্যরূপ দর্শন অপরের পক্ষে অসম্ভব। মানুষ ভগবৎ কৃপায় এই দৃষ্টি লাভ করিতে পারে।

অথ সর্ব্বগুণোপেতঃ কালঃ পরম শোভনঃ; শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের সেই পরম শোভন সর্ব্বগুণোপেত কাল—ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর অর্দ্ধ রাত্র উপস্থিত হইল। দশদিক সুপ্রসন্ন হইল, আকাশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া উঠিল, পৃথিবীর সমস্ত নগর গ্রাম, মঙ্গলসজ্জায় সজ্জিত হইল। সুখসেব্য পুণ্য গন্ধবহ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণের নির্ব্বাপিত প্রায় হোমাগ্নি বিনা আহুতিতে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। নদীর জল নির্ম্মল হইল। হ্রদবক্ষে শতদল বিকশিত হইল, বনরাজি কুসুমে শোভিত হইল, পক্ষিগণ গান করিতে লাগিল, অনিকুল ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সাধুগণের অন্তর প্রসন্ন হইল। স্বর্গে দেব-বাদ্য বাজিতে লাগিল, কিন্নর, গন্ধর্ব্বগণ গান করিতে লাগিল, বিদ্যাধরী ও অপ্সরাগণ নৃত্য আরম্ভ করিল। দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। জলধর সাগরের অনুকরণে মন্দ মন্দ গর্জ্জন করিতে লাগিল। যেন ত্রিভুবন ব্যাপিয়া উৎসবের সমারোহ পড়িয়া গেল। বিশ্বেশ্বর আসিতেছেন, বিশ্বের হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল। কিন্তু মথুরা যেন নিদ্রিত। বিশ্বের মহোৎসব মথুরায় কোন সাড়া জাগাইল না। মথুরার দ্বারে দ্বারে কেহ মঙ্গল কলস স্থাপন করিল না, গৃহে গৃহে উৎসবের আলোক প্রজ্জ্বলিত হইল না। কেহ শঙ্খধ্বনি করিল না কোন পুরনারী উলুধ্বনি দিল না। অত্যাচারিতের আর্ত্তনাদ যেখানে স্তব্ধ, কাহারো কাঁদিবারও যেখানে সাহস নাই, অহিংস সত্যপ্রতিজ্ঞ সাধু বসুদেব অনুকম্পা অর্দ্ধাঙ্গিনী সহ—নির্য্যাতিতা নারীগণের প্রতীক. স্থানীয়া দেবকীর সঙ্গে যেখানে কারারুদ্ধ, অত্যাচারী কংসের মৃত্যুস্বরূপ ভগবান সেই উত্তুঙ্গ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অন্ধকার অবরোধ-কক্ষে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন। লৌহনিগড়ে আবদ্ধ জনকজননী ভিন্ন সে দিন তাঁহাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইবার জন্য কংসভয়ে ভীত মথুরাবাসী কেহ উপস্থিত হইতে পারে নাই। হয়তো বা কংসরাজ্যে—কংসের রাজধানীতে এই আবির্ভাবের কথা কেহ জানিতেও পারে নাই।

পূর্ব্বাকাশে উদিত পূর্ণচন্দ্রের মত দেবকীর কোল আলো করিয়া পূর্ণব্রহ্ম সনাতন স্বয়ং আসিয়া উদিত হইলেন। বসুদেব দেবকীকে তাঁহাদের পূর্ব্ব পরিচয় জানাইয়া আপনার পরিচয় দিলেন। সদ্যোজাত ছয়টী পুত্র মৃত, একটী পুত্র গর্ভ হইতে স্থানান্তরিত। আবার এই সদ্যোজাত পুত্রের আদেশেই বসুদেব তাঁহাকে কংস কারাগার হইতে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিলেন। তাঁহার অদৃষ্টই এইরূপ। ভাগ্য ফলিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। তথাপি তিনি সহ্য করিলেন।

সুদীর্ঘ পঞ্চ সহস্র বৎসর পরে—আবার সেই ভাদ্র মাস, সেই ভাদ্র মাসের রোহিণীসংযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি আসিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এই তিথি আসিয়াছে গিয়াছে, আবার আসিয়াছে। মথুরায় সে দিন উৎসব করিতে পারি নাই, স্বাগত জানাই নাই? আজো কি জন্মাষ্টমীর উৎসবের অধিকার অর্জ্জিত হয় নাই? আজও কি সেই পূর্ণব্রহ্মের উদ্দেশে উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণের শক্তি লাভ করি নাই—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

মানবের মনোরাজ্য যেন কংসরাজ্যে পরিণত হইয়াছে। সমস্ত সাধু প্রবৃত্তি যেন কাহার যাদুদণ্ড স্পর্শে অন্তর্হিত হইয়াছে। পাশ্চিমের সভ্যতা ও সংস্কৃতির আপন আত্মঘাতী প্রকৃতি ভীষণ ধ্বংসযজ্ঞের সৃষ্টি করিয়াছে। দগ্ধীভূত অস্থি মজ্জা বসা মাংসের পূতিগন্ধময় ধূমরাশি দিগন্তকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। হতাহতের মর্ম্মন্তুদ চীৎকার, শোকক্লিষ্টা বিয়োগবিধুরা রমণীগণের কাতর ক্রন্দন, পিতা পুত্র ভ্রাতা বন্ধুর মর্ম্মন্তুদ বেদনাব্যথা অসহনীয় আর্ত্তনাদে আকাশ বাতাস পর্য্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। পশ্চিমের বিষ-বাষ্প পৃথিবীর পূর্ব্ব প্রান্ত সংক্রামিত হইয়াছে। মানুষ মানুষের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপন বিশ্বগ্রাসী লালসার লেলিহান অগ্নিশিখার ইন্ধন জোগাইতেছে। মানুষের খাদ্যে বিষ মিশাইয়া সেই বিষবিক্রয় লব্ধ অর্থে মানুষ আপন বিলাস ব্যসনের উপকরণ সংগ্রহ করিতেছে। অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, ঔষধ নাই, শ্মশানে প্রেতের তাণ্ডব, পিশাচের অট্টরোল, অস্থিমাংসলোভী শৃগাল কুক্কুরের কোলাহল, নিরুপায়ের ক্রন্দন আচ্ছন্ন করিয়াছে। ভূরীভারপ্রপীড়িতা ধরিত্রী পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছেন। ভগবান কি তাহার তরণে অবতীর্ণ হইতেছেন? অদ্যিও বোধ হয় কোন উৎসব হইবে না। অন্ধকারে আবৃত আকাশ, শ্মশানধূমে অবলুপ্ত দিগ্‌দৃশ্য কোথায় কোন্ রুদ্ধ মনোগৃহে, কোন্ ভাগ্যবতীর অন্ধকার অন্তঃকরণ আলোকিত করিয়া তিনি আবির্ভূত হইবেন কেহ জানেনা। নবজলধরশ্যাম শিশু, শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গসুশোভিত উন্নত চতুর্ভুজ, মস্তকে বৈদূর্য্য কিরীট, উদ্ভাসিত জ্যোতির্মণ্ডলে প্রফুল্লিত অনিন্দ্যসুন্দর বদন কমল, অঙ্গে মণিমাণিক্যের ভূষণরাজি, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত চরণ কমলে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া অভয় কণ্ঠে উচ্চারণ করিতেছেন—"অয়মহং ভো" আমি আসিয়াছি। যেন শুনিতে পাইতেছি—

যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

কবিধর্ম ও যুগধর্ম

ডক্টর শ্রী শশিভূষণ দাশ গুপ্ত এম্-এ, পি-আর-এস্, পি-এইচ-ডি

সাহিত্যের আলোচনা করিতে গিয়াও একটি বিশ্বাস বর্ত্তমান কাল বহুচিন্তাশীলের মন অধিকার করিয়া আছে,—সে বিশ্বাসটি এই যে, আমাদের ব্যক্তিসত্তা আমাদের সমাজ-সত্তারই অঙ্গীভূত! ইতিহাসের ক্রমবিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া চলিতেছে এই সমাজ-সত্তার ক্রম-বিকাশ। সাহিত্য বা অন্যান্য শিল্পকলার ভিতর দিয়া এই সমাজসত্তাই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিসত্তার ভিতর দিয়া কেন্দ্রীভূত ভাবে প্রকাশ লাভ করে। সুতরাং এই বৃহত্তর সমাজ-সত্তাকে জুড়িয়া যে ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ধারা প্রবাহিত হয় আসলে তাহাই নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের সকল সাহিত্য এবং শিল্পের নিয়ামক হইয়া দাঁড়ায়। এই বিশ্বাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত আর একটি মতবাদ,—

আমরা বলি, কবিধর্ম স্বসম্পূর্ণ আত্মনিষ্ঠ কোন ধর্ম নহে, উহা তাহার সকল উপজীব্য গ্রহণ করে যুগধর্ম হইতে,—অতএব সে যুগধর্মেরই অঙ্গীভূত।

কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবন ও সমাজ-জীবনের ভিতরকার এই অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ এবং ব্যক্তিজীবনের ক্রমবিকাশের উপরে ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণকে অনেকখানি মানিয়া লইলেও প্রতিভার ক্ষেত্রে ইতিহাসের এই নিয়ন্ত্রণকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইতে প্রস্তুত নই। সাহিত্য-সৃষ্টির পশ্চাতে এইজন্য আমরা দুইটি শক্তিকে স্বীকার করিতে চাই,—একটি ইতিহাসের আবর্তন—যাহা সাধারণ ব্যক্তিজীবনগুলিকে বৃহত্তর সমাজজীবনের সহিত একটা বিশেষ প্রবাহে বিশেষ পরিণতির দিকে টানিয়া লইতেছে; অপরটি প্রতিভা—যাহা এই বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রবাহের মাঝখানে একান্ত একটী খাপছাড়া কিছু না হইয়াও নিজের স্বাতন্ত্র্যের মহিমা প্রকাশ করে। ইতিহাসের সহিত প্রতিভার যোগ অনেক রহিয়াছে; কিন্তু তাহার স্বাতন্ত্র্য এইখানে যে সে ইতিহাসের সহিত যুক্ত থাকিয়াও ইতিহাস ছাড়াও অনেকখানি।

সকল যুগের সকল বিরাট প্রতিভাকেই যে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে মাপিয়া তোলা যায় একথা স্বীকার্য নহে। রবীন্দ্রনাথের সকল সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর দিয়া যে ব্যক্তিপুরুষটি নিজেকে অজস্রভাবে প্রকাশ করিয়াছে, তাহার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙালীর সমাজ-জীবনের কোন যোগ নাই, এমন কথা কেহই বলিবে না। ঐতিহাসিক দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে হয়ত দেখিতে পাইব, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর বৃহত্তর সমাজ-জীবনের অনেক ধর্ম কেন্দ্রীভূত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্মের ভিতর দিয়া; কিন্তু সেইগুলি রবীন্দ্রনাথের সবটা, একথায় মন কিছুতেই সায় দিতে চায় না। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন,—"আমরা যে ইতিহাসের দ্বারাই একান্ত চালিত, একথা বারবার শুনেছি, এবং বারবার ভিতরে ভিতরে খুব জোরের সঙ্গে মাথা নেড়েছি। এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যখানে আমি আর কিছুই নই কেবলমাত্র কবি। যেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত। বাহিরের ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই।.....

.....আমি মনে ভাবতুম সকালবেলা এই আনন্দের অভ্যর্থনা সকল বালকেরই মনে আগ্রহ জাগাত। এই যদি সত্য হত তাহলে সর্বজনীন বালকস্বভাবের মধ্যে এর কারণের সহজ নিষ্পত্তি হয়ে যেত। আমি যে অন্তদিক থেকে—এই অত্যন্ত ঔৎসুক্যের থেকে বিচ্ছিন্ন নই, আমি যে সাধারণ, এইটে জানতে পারলে আর কোন ব্যাখ্যার দরকার হত না.....।

স্কুল থেকে এসেছি সাড়ে চারটের সময়। এসেই দেখেছি আমাদের বাড়ীর তেতালার ঊর্ধ্বে ঘন নীল মেঘপুঞ্জ, সে যে কী আশ্চর্য দেখা! সে একদিনের কথা আমার আজও মনে আছে কিন্তু সেদিনকার ইতিহাসে আমি ছাড়া কোন দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই মেঘ সেই চক্ষে দেখেনি এবং পুলকিত হয়ে যায় নি। এইখানে দেখা দিয়েছিল একলা রবীন্দ্রনাথ। .....আমি একলা যখন বাঙলা দেশের নদী বেয়ে তার প্রাণের লীলা অনুভব করেছিলুম তখন আমার অন্তরাত্মা আপন আনন্দে সেই সকল সুখদুঃখের বিচিত্র আভাস অন্তঃকরণের মধ্যে সংগ্রহ করে মাসের পর মাস বাঙলার যে পল্লীচিত্র রচনা করেছিল তার পূর্বে আর কেউ তা করেনি। কারণ, সৃষ্টিকর্তা তাঁর রচনাশালায় একলা কাজ করেন।"

কিন্তু তাই বলিয়া সাহিত্যরচনায় রবীন্দ্রনাথ যে একেবারেই একক, ইতিহাস যুগধর্মের সহিত তাঁহার কবিধর্মকে যুক্ত করিয়া তাঁহার কবিপ্রতিভাকে যে কোথাও নিয়ন্ত্রিত করে নাই একথাও সত্য নহে। তাহার প্রমাণ মিলিবে রবীন্দ্রনাথেরই একটি কবিতার ভিতরে—

আমি নাবব মহাকাব্য-সংরচনে
ছিল মনে,
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন কিংকিনিতে
কল্পনাটি গেল কাটি হাজার গীতে।
মহাকাব্য সেই অভাব্য দুর্ঘটনায়
পায়ের কাছে ছড়িয়ে আছে কানায় কানায়।
আমি নাবব মহাকাব্য-সংরচনে
ছিল মনে।

—ক্ষণিকা, ক্ষতিপূরণ।

ইহাকে শুধু কবিধর্মের বৈশিষ্ট্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না; সেই কবিধর্মের সহিত যুক্ত হইয়া রহিয়াছে যুগধর্ম।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে। প্রথম প্রশ্ন এই আমরা আজকাল সাহিত্যের ভিতরে যে যুগধর্মের কথা বলিতেছি এই যুগধর্ম কাহাকে বলিব? আমাদের যুগের বাহন উড়োজাহাজ, তাহার গতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। রাষ্ট্রিক, আর্থিক এবং সামাজিক বিপর্যয় এবং তাহার ফলে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের বিক্ষোভ লাগিয়াই আছে। এই বিক্ষোভের ছোটবড় প্রত্যেকটি আলোড়নের নিরন্তর দোলা এবং তাহার ফলে যে ফেনায়িত বাক্যবিচ্ছুরণ তাহাকেই কি যুগ-সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? তাহা হইলে যুগের পরিমাণ সীমা এবং ধর্ম নির্ণীত হইবে কি প্রকারে? অত্যাধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ এই প্রশ্নটাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে, কারণ আমাদের কঠোর যুগানুগত্যের ফলে আমাদের সাহিত্য যে যুগ-সাহিত্য না হইয়া ক্ষণভঙ্গুর সাময়িক সাহিত্য হইয়া উঠিতেছে না, এ জিনিষটি সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত যুগধর্ম কথাটার ভিতরেই স্বভাবত একটা অস্পষ্টতা এবং অপরিচ্ছন্নতা রহিয়া গিয়াছে; সুতরাং তাহার কোন লাক্ষণিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা সহজ নয়। এখানে আমাদের সহায়ক প্রতিভা; তাহার এমন একটা শক্তি আছে যে বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন লাক্ষণিক সংজ্ঞা ব্যতীতই সে যুগধর্মকে চিনিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারে; অথবা বলা যায় যে, সে সর্বদা এত জাগ্রত এবং অবহিত যে যুগধর্মের স্পন্দনগুলিকে সে আপনা হইতেই সর্বদা গ্রহণ করিতে পারে। এই স্পন্দন যে পর্যন্ত কবিচিত্তের ভিতর দিয়া কবি বিবক্ষারূপে কোন একটা বিশেষ রূপ গ্রহণ না করে সে পর্যন্ত সে একটা সাময়িকতার মত্ততাকেই বহন করে,—সেই সাময়িক মত্ততাকে আধুনিকতা বলিয়া ভুল করিবার একটা আকাঙ্ক্ষা সব সময়েই রহিয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সাহিত্যের আকৃতি এবং প্রকৃতি যদি দেশ-কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এতখানি পরিবর্তনশীল হয়, তবে কি সাহিত্যের শাশ্বত স্বরূপ বলিয়া কোন জিনিস নাই?

সাহিত্যের এই শাশ্বত স্বরূপ বলিতে আমরা কি বুঝি? তাহা দ্বারা যদি এই কথাই বলা হয় যে, প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক সাহিত্যেরই দেশকালপাত্র-নিরবচ্ছিন্ন একটি সর্বজনীন এবং সর্বকালিক রূপ রহিয়াছে তবে সে কথা কেহই অস্বীকার করিবে না।

সাহিত্যের সাধারণীকৃতির ভিতরেই এই সর্বজনীনতা এবং সর্বকালিকতার লক্ষণ নিহিত রহিয়াছে; ইহা যেখানে নাই সেখানে মানুষের সঙ্গে মানুষের—যুগের সহিত যুগের যোগের অভাবে 'সাহিত্য'ই গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু সাহিত্যের শাশ্বত-স্বরূপ কথাটার পশ্চাতে প্রায়ই আমাদের গতি-রোধী স্থিতিশীল মনোবৃত্তির পরিচয় মেলে। আমরা সাহিত্যের শাশ্বতরূপ আবিষ্কার করিয়াছি কথার দ্বারা যদি ইহাই মনে করিয়া থাকি যে সাহিত্যের অনড় সমগ্র সত্যটিকে আমরা একেবারে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছি, তবে বলিব,—সেখানে আমরা সাহিত্যের মৃত্যুবাণ আবিষ্কার করিয়াছি। এক্ষেত্রে আমরা বের্গসঁর (Bergson) মতন সম্পূর্ণরূপে গতিবাদী; মানুষের জীবনের সত্য যেমন কোথাও স্থির হইয়া দেখা দেয় না: জীবন-ধারার নিরন্তর আবর্তনের ভিতর দিয়া সে-সত্য যেমন নিরন্তর "হইয়া" উঠিতেছে, সাহিত্যের সত্যও তেমনি নিরবধি কাল এবং বিপুলা পৃথ্বীর বুকে নিত্য নব সৃষ্টির ভিতর দিয়া "হইয়া" উঠিতেছে। এই অখণ্ড প্রবাহের সহিত যুক্ত হইয়া জাগে যে সমগ্র দৃষ্টি তাহার কাছেই ধরা পড়ে সত্যের সন্ধান; আর কোন বিশেষ দেশকালে দাঁড়াইয়া যা কিছু খণ্ডদৃষ্টি তাহাই মিথ্যা। এই জন্যই সাহিত্যের শাশ্বত সত্য "এই"—এবং যুগে যুগে দেশে দেশে তাহার "এইই" হওয়া উচিত তালঠুকিয়া এমন কথা বলিতে যাইবার কোন সার্থকতা নাই। সাহিত্যের মন্দিরে কোনদিন কোন অচল দেবতার প্রতিষ্ঠা চলিবে না; তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে গেলেই সে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মহাকালের রথে নিরুদ্দেশ যাত্রা আরম্ভ করিবে,—দুর্বার তাহার সেই আনন্দ-যাত্রা; প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমাকেই মন্দিরের স্বর্ণাসনে অচল করিয়া রাখা চলে, প্রাণ-চঞ্চল দেবতাকে নহে।

বাহন

অধ্যাপক শ্রীশুকদেব সেন গুপ্ত এম্-এ

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে ভ্রমণের সময়ে দেখিয়াছি ও দেশের লোকেরা মহাবীর বা হনুমানজীর পূজা করে। অনেক যায়গায় দেখিয়াছি প্রায় প্রতিগ্রামেই একটি হনুমানের মন্দির। বীর্য ও বিনয়ের সুন্দর সমন্বয় হনুমানের ভিতর পাওয়া যায়; সুতরাং তিনি পূজা পাওয়ার অযোগ্য নহেন। কিন্তু তবু তখন এই পূজার ব্যাপারটি একটু অদ্ভুত লাগিত। মনে ভাবিতাম হনুমান ত দেবতা নন; হনুমানকে ভগবান রামচন্দ্রের বাহন বলা যাইতে পারে। দেবতার পূজা স্বাভাবিক কিন্তু দেবতার বাহনের পূজার সার্থকতা কি? বাহনপূজার রহস্য তখন ঠিক বুঝি নাই। কিন্তু এখন মনে হয় বাহনপূজা খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক। বাহনতত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্ব মূলে প্রায় একই।

বাহন বলিতে আমাদের মনে হয় সরস্বতীর বাহন হংস, দুর্গার বাহন সিংহ, কালীর বাহন স্বয়ং মহাদেব শিব। সরস্বতী, দুর্গা প্রভৃতির বাহনরূপে কেন হংস সিংহ প্রভৃতির কল্পনা করা হইল সাধকেরা এ সকলের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা

দিয়া থাকেন। আমরা উহার ভিতরে এখন প্রবেশ করিব না। যাহাদ্বারা কোন কিছু বাহিত বা প্রকাশিত হয় আমরা তাহাকেই সেই জিনিষের বাহন বলিতে পারি। ইংরাজী তর্জমায় বাহনের অর্থ 'Medium of expression'; যে তত্ত্ব বা যে দেবতা যাহাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত হন তিনিই সেই দেবতার বাহন। তাই যে সাধক যে দেবতার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে চান, যে দেবতাকে নিজের ভিতরে প্রকাশিত দেখিতে চান, তাহাকে সেই দেবতার উপযুক্ত বাহনরূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। মলিন কাচের মধ্য দিয়া আলোর প্রকাশ সুন্দর হয় না। প্রকাশের যন্ত্রটি, বাহনটি যত সুন্দর হইবে ভিতরের দেবতার প্রকাশও ততটা সুন্দর ও সার্থক হইবে। অন্তরের দেবতা ত আবির্ধর্মী; তিনি ত প্রকাশ পাইতে চান, ভিতরের 'সোনার আলোর কমল কলিকাটি' সহস্রদলের মত ফুটিয়া উঠিতে চায়; কিন্তু আমরা যে তাহাকে গভীর কালো পর্দায় ঘিরিয়া রাখিয়াছি। এই আবরণ যত দূর হইবে, হৃদয় যত স্বচ্ছ হইবে দেবতাও তত প্রকাশিত হইবেন।

সবরকমের সঙ্গীত একই যন্ত্রে ভাল ফোটে না। আবার সুরের তারতম্যের জন্য যন্ত্রটিকে বিভিন্ন ঘাটে বাঁধিয়া নিতে হয়। তেমনি বিভিন্ন দেবতাতত্ত্বের প্রকাশের জন্য বিভিন্ন রকমের হৃদয়যন্ত্রের আবশ্যক। যিনি যে তত্ত্বের সাধনা করিবেন তাহাকে সেই তত্ত্ব প্রকাশের অনুকূল করিয়া নিজেকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সব রকমের কামনা বাসনা সব 'অহং' 'মম' ভাব একেবারে দূর করিয়া মনকে শূন্যে শ্মশানে পরিণত করিতে পারিলেই শ্মশানবাসিনী শ্যামার আবির্ভাব সম্ভব হয়। চিত্তভূমি শ্মশানে পরিণত হইলে আত্মা শবরূপে, স্থির অচঞ্চল শিবরূপে দেখা দেন। স্থির শিবের আধারেই শিবানীর প্রকাশ। সকল ক্রিয়া সকল শক্তির মূল কারণ সেই ইচ্ছাময়ীকে জানিতে হইলে সাধককে শিবত্বলাভ করিতে হইবে। শিব না হইলে শিবানীকে পাওয়া যায় না। শ্রীরামচন্দ্র বীর ও ত্যাগী, সত্যনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ, প্রেমিক ও ভক্ত; রামচরিত্রে বজ্রের কঠোরতা ও কুসুমের কোমলতা উভয়ই পাওয়া যায়। রামচন্দ্রের উপযুক্ত বাহন মহাবীর হনুমান। হনুমান তেজস্বী, হনুমান বীর—সাগর পর্বত রাক্ষস কাহারও কাছে তিনি নত হন নাই। আবার হনুমান সাধক, হনুমান ভক্ত; যেখানে যেখানে 'রঘুনাথ-কীর্তন' সেখানে সেখানেই তিনি 'কৃতমস্তকাঞ্জলি বাষ্প-বারিপূর্ণলোচনে' উপস্থিত। যে সাধক সর্বক্ষণ শ্রীরামচন্দ্রকে নিজের বুকের ভিতরে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করিতে চান তাহাকে ঐ মহাবীরের মত উপযুক্ত বাহন হইতে হইবে। মহাবীরের পূজা তাই রামচন্দ্রের সাধকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

এ সব সাধন জগতের কথা; সাধন জগতের তত্ত্বের মধ্যে প্রবেশ করা এখানে সম্ভব না, এবং সে ক্ষমতাও আমার নাই। ভাবিয়া দেখিলে মনে হয় সাধকই যে শুধু দেবতার বাহন তাহা ত নয়, এই বিশ্বজগতই যে বিশ্বদেবতার বাহন। নদনদীগিরিবনশোভিত এই বিচিত্র ধরণী, এই জীবজগত, মানুষ, মানুষের সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি, মানুষের ভাষা সাহিত্য শিল্পধর্ম—এই সকলের ভিতর দিয়াই যে এক বিশ্বদেবের বিচিত্র প্রকাশ। এই ধরণীর ধূলিকণা, ঐ অসীমপ্রসার আকাশের নক্ষত্ররাজি—এই ভূর্ভুবঃস্ব এই সব ব্যাপিয়া ও সব অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন এক সহস্রশীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ বিরাট পুরুষ। আকাশের তারাগুলি তাঁহারই দীপালি রচনা করে, বাতাসের তরঙ্গ তাঁহারই গান গায়। সরিৎ সমুদ্রে তাঁহারই গতির প্রকাশ; পাষাণের স্তূপের

মধ্যে তাঁহারই জমাটবাঁধা শক্তি; জীব জগতের মধ্যদিয়া তাঁহারই অফুরন্ত জীবনধারা অবিরাম বহিয়া যাইতেছে। মানুষের মন—তাহার জ্ঞানবিজ্ঞান সাহিত্যকলা—ইহার মধ্যদিয়া সেই অসীম ধীশক্তির ঈষৎ স্ফুরণ। ফুলের সুষমা ও শিশুর হাসিতে তাঁহারই স্নিগ্ধ কান্তি। মাতৃহৃদয় সোমুখী হইতে তাঁহারই করুণাগঙ্গার ধারা। আবার যাহা কিছু ভীষণ ও রুদ্র তাহাও তাঁহার অমঙ্গল নাশের রূপ মাত্র। যাঁহার এক হাতে খড়্গ তাঁহারই অন্যহাতে বরাভয়। রুদ্রের দক্ষিণমুখ কল্যাণপ্রদ মুখখানি দেখিয়া লইতে পারিলে রুদ্রকে চিনিয়া লইতে ভুল হয় না। এই বিরাট বিচিত্র জগত সেই জগন্নাথের রথ। বিশ্ব বিশ্বদেবের বাহন। কিন্তু এই রথ, এই বাহন ত পূর্ণাঙ্গ নয়। কত অপূর্ণতা কত ত্রুটি কত বেদনা ব্যর্থতার গ্লানি ইহার সর্ব্বাঙ্গে। অপূর্ণতা আছে বলিয়াই ত জগতের গতি। জগতের সব গতি সব পরিবর্ত্তনের লক্ষ্যই জগতকে উপযুক্ত রথে উপযুক্ত বাহনে পরিণত করা। সব পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া জগত ঐ এক লক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে।

মনের জগত ও বস্তুর জগত যেন হাত ধরাধরি করিয়া চলে। যাহা মনোজগতে ঘটে তাহারই অনুরূপ ঘটনা বস্তু জগতে ঘটে, যাহা বস্তু জগতে ঘটে তাহারই ছবি যেন মনোজগতে ফুটিয়া ওঠে। ভাব জগতের ইতিহাস ও বাস্তব জগতের মূল সুর যেন একই। ভাবের গতি সত্যের দিকে, কিন্তু এই গতি চলে আঁকাবাঁকা পথে; নানা বিরুদ্ধাত্মক অর্দ্ধ সত্যের সমন্বয় সাধনের ভিতর দিয়া পূর্ণ সত্যের দিকে ইহার অভিযান। জীবননদীর আঁকাবাঁকা ঘাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব ঘাটের কড়ি কুড়াইয়া সত্যের থলিটি পূর্ণ হয়। কোন ঘাটই মিথ্যা নয়, কোন কড়িই তুচ্ছ নয়। এই পথ চলাই জীবন, এই কড়ি কুড়াইবার ইতিহাসই সত্যের ইতিহাস। বাস্তব জগতের ইতিহাসও তাই। বিশ্বের বিবর্ত্তনও চলিয়াছে আঁকাবাঁকা পথে, ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যদিয়া অপূর্ণ হইতে পূর্ণের দিকে। মানস জগতের ও বাস্তব জগতের মূলসুর যেন একই ঘাটে বাঁধা। ভাবের প্রকাশ রূপে বাস্তবে; আবার বাস্তবের আত্মার সন্ধান পাই ভাবে। ভাব হইতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসাই ইতিহাস। কবির দৃষ্টিতে সাধকের মানসপটে যে রামত্ব দেখা দিল তাহাই রূপ নিল ঐতিহাসিক রামচন্দ্রের ভিতরে। ভক্তহৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব ও লীলারই প্রকাশ যেন ঐতিহাসিক শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে। এ যুগে দক্ষিণেশ্বরের সাধক সর্ব্বধর্মসমন্বয়ের যে ছবি দেখিলেন ধ্যাননেত্রে তাহাই বোধহয় রূপ নিতেছে বর্ত্তমান কালে। যুগনেতার দৃষ্টিতে যুগের ছবি ফুটিয়া ওঠে। মানবমনের গতি ও পরিণতির ইতিহাসের মধ্যেই বিশ্বের ইতিহাসের আভাস পাওয়া যায়। ইতিহাসের তাৎপর্য্য তত্ত্বে, তত্ত্বের বাস্তব রূপ ইতিহাসে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন আমাদের এই ধরণী নাকি একদিন এক নীহারিকার বক্ষে লীন হইয়া ছিল। মানুষ তাহার সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি লইয়া নিদ্রিত ছিল ঐ নীহারিকারই বুকে। নীহারিকাসাগরে সুরু হইল শক্তির খেলা; তরঙ্গ উঠিল, কত বুদ্বুদ সৃষ্টি হইল, ছড়াইয়া পড়িল দিকে দিকে। এমনি একটি বুদ্বুদে গড়া আমাদের এই ধরিত্রী-মাতা। ধরিত্রীর বুকে ধীরে ধীরে দেখা দিল জল ও পাষাণ। ঐ নীহারিকা ব্যাপিয়া ও অতিক্রম করিয়া যে বিশ্বদেবের অধিষ্ঠান ধরিত্রীর ছোট আঁচলখানিতেও তাঁহারই আসন। ধরণীর পাষাণ আসনে ও প্রশস্ত সাগরশয্যায় নারায়ণ নিদ্রিত থাকিলেন বহুকাল। কিন্তু এই জল ও পাথর যে নিতান্তই অন্নময়, বিশ্বদেবের অপূর্ণ বাহন;—বিশ্বদেবের অনন্ত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য প্রকাশে অক্ষম। অন্নময়ের পরে আসিল প্রাণময় বাহন। পর পর দেখা

দিল মীনকূর্মবরাহ নানারকমের জীব। জীবজগতে কত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইল। মদোন্মত্ত হস্তী, গর্বিত কেশর, রঙীন প্রজাপতি, শিস্-দেওয়া দোয়েলশ্যামা। বিচিত্র, সুন্দর। কিন্তু এও অপূর্ণ। পাখী তাঁহারই গান গায়, কিন্তু জানে না সে কাহার গান গায়—প্রজাপতি তাঁহারই পোষাক পরে, কিন্তু জানে না সে কাহার পোষাক। বিশ্বদেব তাঁহার লীলায় চাহিলেন এমন বাহন যে জানিবে এবং বুঝিবে সে কে এবং কি করিতেছে। তাই আসিল মনেমনোময় সত্তা নিয়া মানববাহন। পশু চলিত চার পায়ে, দৃষ্টি তাহার মাটির দিকে, খাবারের অন্বেষণেই যে ব্যস্ত। মানুষ তাহার নূতন সম্পদ মন লইয়া দু'পায়ে দাঁড়াইল, তাহার দৃষ্টি গেল সম্মুখে বহু দূরে অসীম আকাশে। সে বিস্মিত চোখে চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, বস্তুজগতের অর্থ খুঁজিল। কিন্তু শুধু বাহিরে তাকাইয়া অর্থ মিলিল না। চোখ বুজিল, চিন্তা করিল। ধ্যানে সন্ধান পাইল সেই পরম দেবতার—বুঝিল নিজের অন্তর্যামীর সঙ্গে জগতের নিবিড় যোগ। প্রথম সন্ধানের প্রথম মিলনের আনন্দে গাহিয়া উঠিল জয়গান। ঋকসামের ছন্দে ভরিয়া তুলিল দশদিক। সেই প্রথম মিলনের দিন হইতে আজ পর্যন্ত মানবমনের এক চেষ্টা—জগতের তাৎপর্য্য খুঁজিয়া বাহির করা, বিশ্বের আত্মার সন্ধান করা।

নীহারিকা হইতে যে যাত্রা সুরু হইয়াছিল তাহার পরিসমাপ্তি কি মানবমনে? মানবমনও ত অপূর্ণ। পশুর বিবর্ত্তন হইয়াছে মানুষে। মানুষ চলিয়াছে দেবত্বের দিকে। সাধারণ মানবীর মন সেই অসীম শক্তি, অসীম জ্ঞান প্রকাশ করিতে অক্ষম। মাটির পৃথিবী গঙ্গার প্রপাত ধারণ করিতে পারে না। মাথা পাতিয়া ঐ বেগ ধারণ করিতে মহাযোগী মহাদেবের প্রয়োজন। মহাশক্তির নৃত্যলীলা মহাদেবের বুকেই সম্ভব হয়। বিশ্বদেবের অসীম জ্ঞান অসীম শক্তি প্রকাশের উপযুক্ত বাহনরূপে নিজেকে গড়িয়া তুলিতে চাই মানুষের সাধনা। বিশ্বদেব গড়িয়াছেন মানুষ; এখন মানুষকেও এই ভাঙ্গাগড়ার কাজে যোগ দিতে হইবে—নিজের সাধনাদ্বারা মানব নিজেকে গড়িয়া তুলিবে 'অতিমানবে' (superman)—সেই সত্যময় জ্ঞানময় আনন্দময়ের উপযুক্ত বাহনরূপে। মানুষও এখানে বিশ্বদেবের খেলার সাথী। তাঁহার লীলার, প্রকাশের রহস্যটি বুঝিয়া লইয়া মানুষও যোগ দিবে এই জগতের খেলায়।

শুধু মানুষের প্রাণ ও মন নয়, মনের যাহা কিছু বিকাশ—সমাজ সভ্যতা, ভাষা সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্মদর্শন—এই সকলের ভিতর দিয়াই সেই একের সত্য, মঙ্গল ও সুন্দররূপের প্রকাশ। এই পৃথিবীর বুকে কত ধরণের সমাজ, কত রকমের সভ্যতার উত্থান পতন হইল, কত রাজ্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিল গড়িল। যাহা ভাঙ্গে তাহা কিন্তু একেবারেই ভাঙ্গিয়া যায় না। তাহার সত্যটুকু সে দিয়া যায়। পুরাতন সভ্যতার সত্য নিয়া নূতনের আবির্ভাব হয়। কিন্তু সে নূতনেও অপূর্ণতা থাকে; কালে তাহাতেও ভাঙ্গন ধরে; সেও যায়, আবার নূতন আসে। এই ভাবে পুরাণ ও নূতনের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যদিয়া সমাজ আগাইয়া চলে পরিণতির দিকে, পূর্ণতার দিকে। পশুর বিবর্ত্তন হইয়াছে মানুষে, মানুষ চলিয়াছে দেবতার দিকে। মনুষ্যসমাজের আদর্শ দেবসমাজে পরিণত হওয়া। সেই সমাজ সেই সভ্যতা ততখানি উন্নত, তাহা দেবতার আবির্ভাবের পক্ষে যতখানি অনুকূল। দেবত্ব-বিকাশের অনুকূল সমাজগঠন খুব সহজ কথা নয়। সমাজকে চলিতে হয় সকলকে লইয়া। সকল স্তরের সকল লোকের প্রকৃত কল্যাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে; সকলকে অগ্রগতির পথ দেখাইয়া দিতে হইবে, চলিবার সুযোগ করিয়া দিতে

হইবে। সকলকে নিয়া চলিতে হয় বলিয়াই সমাজের গতি মন্থর। ব্যক্তিবিশেষের পূর্ণতালাভ যত শীঘ্র হইতে পারে, সমাজের পক্ষে তত শীঘ্র সম্ভব নয়; সমাজদেহের পূর্ণতা বহুকাল বহুযুগ সাপেক্ষ।

সভ্যতার ইতিহাসের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার গতিটি বেশ বোঝা যায়। সেই আদিম প্রস্তরযুগের কাহিনী। যার জোর তারই জয়। যে দলপতির শাণিত প্রস্তরখণ্ড যত প্রচুর তাহার প্রভুত্বও তত বেশী। নখদন্তের পরিবর্তে পাথর এই যা প্রভেদ। প্রথম লৌহযুগে মানুষ কিছুটা শৃঙ্খলা ও নিয়মের অধীন হইতে শিখিল, ভাবিতে শিখিল—কিন্তু তবু তার গতি উদ্দাম। উদ্দামগতিতে যাযাবর বেদুইনের দল ছুটিয়া চলিত ঘোড়ার পিঠে লৌহ অস্ত্র হাতে। এখানেও সেই বলেরই জয়। তারপরে আসিল কৃষি-সভ্যতা। কৃষি-সভ্যতায় নারীর দান যথেষ্ট। নারীর স্বভাব স্থিতি, যেমন পুরুষের স্বভাব গতি। নারী প্রথমে গম চিনিল, গমের বীজ ছড়াইল—ছোট ছোট গাছগুলিকে শিশুর মত করিয়া পালন করিল। স্থির গাছগুলি মানুষের উদ্দাম গতিকে রোধ করিল। নদীর তীরে উর্বরক্ষেত্রে গাছের পাশে মানুষ ঘর বাঁধিল। তারপরে নদীর তীরে শ্যামলক্ষেত্রে বহুকাল কৃষি সভ্যতার যুগ চলিল। মানুষ সুন্দরকে বরণ করিতে শিখিল, সাহিত্য সৃষ্টি করিল, দর্শন ও ধর্ম প্রসার লাভ করিল। মানুষ পশুত্ব হইতে আসিয়া মনুষ্যত্বে যেন একটু স্থিতিলাভ করিল। কিন্তু ইহাতেও অপূর্ণতা রহিয়া গেল। কৃষি-সভ্যতায় মানবমনের পূর্ণ বিকাশ হইল না, শক্তির পূর্ণ পরিচয় লাভ করিল না। বুদ্ধির আরও বিকাশ হইল, জড় জগতে নূতন শক্তি লাভ করিল—আসিল যন্ত্রসভ্যতার যুগ। কিন্তু যন্ত্রসভ্যতা যে শক্তি দিল তাহা ব্যবহারের সংযম মানুষ এখনও লাভ করে নাই। নূতন শক্তি পাইয়া মানুষের সুপ্ত পশুত্ব জাগিয়া উঠিল। বহুসত্তা হইয়া উঠিল সর্বগ্রাসী সব কিছুকে গ্রাস করিয়া সে বাঁচিতে চায়। তাই হানাহানি- রক্তের স্রোত। ইহাও টিকিবে না। ভাঙ্গন সুরু হইয়াছে। কৃষি-সভ্যতা ও যন্ত্র-সভ্যতার যাহা শ্রেষ্ঠ যাহা সত্য তাহা লইয়া গড়িয়া উঠিবে নূতন সভ্যতা। এইভাবে চলিলে সভ্যতার ধারা ক্রমশঃ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে, হিংসা হইতে প্রেমের দিকে, দ্বেষ হইতে শান্তির দিকে। আমরা আজিকার এই সঙ্কটের দিনে শুধু প্রার্থনা জানাই—"বিশ্বানি দেব সবিতর্দুরিতানি পরাসুব, যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব।"

আমাদের সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ও দর্শনের ভিতর দিয়াও সেই এক সত্য শিব ও সুন্দরের বিকাশ। শিল্প ও সাহিত্য সুন্দরের বাহন, রসের পরিবেশক। আর "রসো বৈ সঃ"; তিনি ত রসস্বরূপ, রসময়। তিনি যে "মাধুর্য্যলাবণ্য-রসৈকসিন্ধু।" তাঁহারই রসের অনন্তধারা আকাশে বাতাসে অবিরাম ঝরিয়া যাইতেছে। "কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" যদি এই আকাশ বাতাস এই বিশ্বনিখিল তাঁহারই আনন্দময় সত্তায় অধিষ্ঠিত না থাকিত তবে আমাদের জীবনের রস আমরা কোথা হইতে পাইতাম? তাঁহারই স্পর্শে বাতাস মধুময়, তাঁহারই স্পর্শে সিন্ধুর তরঙ্গ মধুময়, তাঁহারই স্পর্শে উষা সন্ধ্যা মধুময়, তাঁহারই স্পর্শে ধরণীর ধূলি মধুময়। এই মধুময় রসময় সত্তার যেটুকু শিল্পীর চোখে, কবির হৃদয়ে ধরা পড়ে তাহাই তাঁহারা রূপায়িত করিয়া তোলেন বর্ণেছন্দেগানে। সাহিত্য ও শিল্পের সার্থকতা এই রসের প্রকাশে ও পরিবেশনে।

দর্শন ও ধর্মের প্রধান লক্ষ্যই বিশ্বের আত্মাকে খুঁজিয়া পাওয়া। দর্শন তাঁহাকে বুঝিতে চায় বুদ্ধি দিয়া। ধর্ম তাঁহাকে পাইতে চায় সমস্ত জীবন দিয়া। মানুষ যে দিন

প্রথম বিস্মিতনয়নে জগতের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছে—ইহার অর্থ খুঁজিয়াছে ও জীবনে বিশ্বাত্মার অনুভূতি চাহিয়াছে সেইদিন হইতেই মানুষ দার্শনিক ও ধার্মিক। কিন্তু আংশিক অর্থ ও সামান্য অনুভূতি লইয়া দর্শন ও ধর্ম খুসী নয়। দর্শন চায় তাঁহাকে পূর্ণভাবে বুঝিতে, ধর্ম চায় তাঁহাকে পূর্ণভাবে জীবনে লাভ করিতে। এই পূর্ণভাবে জানার ও পাওয়ার সাধনা বড়ই কঠিন। কত ব্যর্থতা, বেদনার কাহিনী ইহার সঙ্গে জড়িত। কত ভ্রান্ত মত, কত অন্ধ সংস্কার, কত মিথ্যা কাহিনী মন ভুলাইয়াছে। কিন্তু আবার সে ফিরিয়া আসিয়াছে, আবার সাধনা করিয়াছে। কত আজীবনের সাধনা, কত ত্যাগ বৈরাগ্য, কত ভক্তহৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু জীবনের অসমাপ্ত পূজা কিছুই ব্যর্থ যায় না। জীবনের কোন ধনই ফেলা যায় না। পূর্ণের দিকে যাহার যাত্রা পূর্ণই তাঁহার পুণ্যস্পর্শে তাহার সব অপূর্ণতা দূর করেন; এক জীবনে না হউক, জীবনান্তরে তাহার সাধনা সিদ্ধ হয়। পূর্ণের স্পর্শ যাহারা পাইয়াছেন তাহারা আমাদের ডাকিতেছেন, পথের ইঙ্গিত দিতেছেন—আমরা সে পথে যাইব কি? বিশ্বে যে দেবতার প্রকাশ আমার অন্তরেও ত তিনি। হে মোর অন্তরদেবতা তুমি জাগো, আমাকে বাহন করিয়া তুমি প্রকাশিত হও—'পূর্ণা ভবত্বদ্বিনং ময়ি তে প্রসন্নেচ্ছা।'

মাথাধরা

(নাটিকা)

শ্রীযামিনীমোহন কর

(মিঃ রজত রায় সিগারেট হাতে একটা সোফায় আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। মনে ঝড় বইছে! সিগারেট পর্য্যন্ত জ্বালতে ভুলে গেছে। দূরে আর একটা সোফায় মিস্ নন্দিতা দাস গুপ্তা একটা রুমাল নিবিষ্ট চিত্তে দেখছে। যেন রুমালটা অপূর্ব্ব, পৃথিবীতে এর জোড়া আর নেই।)

রজত—(দু'বার কেসে একটু হেসে) নন্দিতা, সিনেমা যাবে বলেছিলে চল। দেরী হয়ে যাচ্ছে যে।

নন্দিতা—সরি, কাল সকালে যখন কথা দিয়েছিলুম তখন আজ বিকেলে মাথা ধরবে সেটা জানতুম না।

রজত—মাথা ধরেছে? বাড়ীতে অ্যাস্পিরিন আছে?

নন্দিতা—থাকতে পারে। ঠিক জানি না।

রজত—আমি এখুনি গিয়ে কিনে আনছি। কি বল?

নন্দিতা—ধন্যবাদ। কোন দরকার নেই। আপনিই সেরে যাবে।

রজত—না, না। অনর্থক কষ্ট পাবে, শরীর খারাপ করবে—

নন্দিতা—আমার জন্য যে আপনি এতটা মাথা ঘামাচ্ছেন সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।

রজত—বারবার কি যে ধন্যবাদ, ধন্যবাদ—

নন্দিতা—ওঃ! ধন্যবাদ জানানো যে ব্যাড্ ফর্ম সেটা জানতুম না।

রজত—আহা, আমিতো তা বলিনি—

নন্দিতা—আপনি তা বলেন নি। তবে আমারই ভুল হয়েছে।

রঞ্জত—অনর্থক কষ্ট পাবে তাই বলছিলুম—

নন্দিতা—অনর্থক! মানে আমার মাথাব্যথা মিথ্যা!

রঞ্জত—মাইগড। কি বলছ? আমি শুধু জানতে চাইছি যে তোমার মাথা ধরেছে—

নন্দিতা—ভুল বকছি বুঝি। মাথা ধরেনি মিথ্যে করে বলেছি—

রঞ্জত—না না, তা কেন? ডিক্লেস করছি চটকরে গিয়ে দুটো এস্পিরিন এনে দেব।

নন্দিতা—আপনার যখন চট করে যেতে ইচ্ছে করছে তখন আমি জোড় করে আটকে রাখব কেন?

রঞ্জত—সব কথায় আজ ও রকম করছ কেন?

নন্দিতা—কি রকম করছি?

রঞ্জত—কি হয়েছে?

নন্দিতা—জানি না।

রঞ্জত—সমস্ত বিকেলটা পেঁচার মত মুখ করে বসে আছ। কথা কইছ না।

নন্দিতা—কি করব বলুন। ভগবান যদি পেঁচার মত মুখ দিয়ে থাকেন। বড়ই দুঃখিত যে আপনার অমূল্য সময় আমার জন্য নষ্ট হচ্ছে। ফরগুড্‌নেস সেক বোর্ড (bored) ফীল করেও এখানে বসে থাকবেন। যেখানে আনন্দ পাবেন সেইখানে যান।

রঞ্জত—বোর্ড হতে যাব কেন? অন্য কোথাও আমি যেতে চাই না।

নন্দিতা—কিন্তু পেঁচামুখীরা তো আপনাকে আনন্দ দিতে পারবে না।

রঞ্জত—আমি তো তা বলিনি। কি হয়েছে বলনা।

নন্দিতা—কি বলছেন কিছুই বুঝতে পারছিনা। কিসের কি হবে?

রঞ্জত—বুঝতে বিলক্ষণ পারছ। আমি কিছু অন্যায় করেছি?

নন্দিতা—আপনার কার্য্যের বিচার করবার অধিকার আমার নেই।

রঞ্জত—ওরকম ভাবে কথা কইছ কেন?

নন্দিতা—কি রকম ভাবে?

রঞ্জত—আজ সকালে টেলিফোন করতে তুমি ঠিক এইরকম ফোঁস করে উঠলে।

নন্দিতা—কি বল্লেন? আমি ফোঁস করি—সাপ—

রঞ্জত—না, না, আমি তা মীন করিনি।

নন্দিতা—ওঃ আপনি যা বলেন তা মীন করেন না। দেখুন আমার পেঁচা সাপ ইত্যাদি মধুর সম্বোধন শোনার অভ্যাস নেই।

রঞ্জত—আমি তো বলছি আমি তা মীন করিনি। সরি; ক্ষমা কোরো—

নন্দিতা—ক্ষমা চেয়ে অপরাধী করবেন না। তা ছাড়া আমার কাছে আপনি ক্ষমা চাইবেন কেন? ইট ডজ্‌নট মেক এনি ডিফারেন্স আট অল।

রঞ্জত—তুমি আমার উপর রাগ করেছ।

নন্দিতা—কেন?

রঞ্জত—আমিও তো তাই জানতে চাই, কেন? আমি কি করেছি? টেলিফোন ধরে একটা কথাও না বলে তুমি রেখে দিলে।

নন্দিতা—আমার কিছু বলার ছিল না। অনর্থক আপনার কাজের এবং সময়ের ক্ষতি করাটা আমি অনুচিত মনে করলুম। শেষে শুনতেই হত যে আমার জন্য আপনার কাজকর্মের ব্যাঘাত হয়।

রজত—আমি তা কোন দিন বলেছি?

নন্দিতা—বলতে কতক্ষণ?

রজত—আমার কোন কথাই তোমার ভাল লাগছেনা। আমাকে কি তুমি চলে যেতে বল?

নন্দিতা—আমি কিছুই বলি না। আপনার যা ইচ্ছে আপনি করতে পারেন অন্য কোন বেটার (better) জায়গায় যেতে ইচ্ছে হলে আমি নিশ্চই আপনাকে বাধা দেবো না। মিস্ রমলা দাসের বাড়ী যান না। সেও আনন্দ পাবে, আপনিও পাবেন।

রজত—আমি সেখানে যেতে চাই না। সে একটা ফ্লার্ট—

নন্দিতা—ওঃ।

রজত—আই হেট হার।

নন্দিতা—কাল মিসেস্ দে'র বাড়ীতে সে রকম কোন পরিচয় তো পাইনি। ঘৃণা আর ভালবাসার মধ্যে তফাৎটা বড্ড কম।

রজত—কাল ওর সঙ্গে কেন কথা বলছিলুম জান?

নন্দিতা—ভাল দেখতে বলে।

রজত—ভাল খারাপ জানি না। তার ভাই, যে ভাল হকি খেলে, সে আমার ক্লাস ফ্রেণ্ড ছিল। সেই সূত্রে সে যখন কথা কইতে এল—

নন্দিতা—তখন আপনিও গলে গেলেন।

রজত—তখন আমারও কথা বলতে হ'ল। তাছাড়া তখনও তুমি এসে পৌছওনি। তুমি আসতে আমি যখন গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম—'নন্দিতা, কখন এল?" তুমি শুধু "একুণি" বলে অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলে গেলে।

নন্দিতা—সত্যি কথাই বলেছিলুম। আর আপনার নাইস টাইমটাকে ইনটুড করে নষ্ট করতে চাইনি।

রজত—নাইস টাইম না ছাই। পালাতে-পারলে-বাঁচি-ভাব।

নন্দিতা—পালাবার বিশেষ চেষ্টা করছিলেন বলে তো আমার মনে হয় নি।

রজত—সে যে ছাড়তে চায় না। শী ইজ এ ফুল।

নন্দিতা—তবু ভাল যে এটুকু বোঝবার বুদ্ধি আপনার আছে। তার সম্বন্ধে আমার তো চিরকাল ওই রকমই ধারণা। লোকেও তাই বলে।

রজত—তুমি যে পার্টিতে যাবে, রমলাকে সেখানে আর কেউ সুন্দরী বলতে পারবে না।

নন্দিতা—তার কি রকম খ্যাবড়া নাক দেখেছেন? কোথায় জন্য দুঃখ হয়।

রজত—বাঃ। একেবারে খাঁদা। তোমার নাকটা কিন্তু ভারী চমৎকার।

নন্দিতা—যান, কি বাজে কথা কইছেন।

রজত—না সত্যি। যেমন চোখ পটল-চেরা, তেমনি টিকোলো নাক, তুলি দিয়ে আঁকা ভ্রূ, পাতলা গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট—

নন্দিতা—আঃ, কি ঠাট্টা করেন।

রজত—পৃথিবীতে কে সব চেয়ে সুন্দরী জান?

নন্দিতা—না। কে? রমলা?

রজত—রমলা না ছাই। রমলা তোমার পায়ের নখের সমকক্ষ নয়। আমার চোখে তুমি পৃথিবীর সেরা। কাল সমস্ত রাত আমি ঘুমোতে পারিনি। সকালে উঠেই টেলিফোন করতে তুমি চটে আছ দেখে আপিসে কোন কাজ ঠিক মত হয় নি। সোজা সেখান থেকে তোমার কাছে এসেছি, আর তুমি—

নন্দিতা—(দাঁড়িয়ে) ছটা যে বাজে। কখন সিনেমা যাবেন।

স্থানীয় সংবাদ

কুচবিহারে প্রচুর বারিপাত—

এই বৎসর আষাঢ় মাসে কুচবিহারে তেমন বৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু সমগ্র শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস ধরিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতেছে। এত বারিপাতে ধান্যচাষের অসুবিধা হইতেছে; এ বৎসর ফসল পুরা পাওয়া যাইবে না। সমগ্র উত্তর বঙ্গ হইতেই প্রচুর বারিপাতের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। রংপুরের গাইবান্ধা ও নীলফামারী অঞ্চলে এবং বগুড়া ও পাবনা জেলার স্থানে স্থানে প্রবল বন্যা দেখা দিয়াছে।

মেখলিগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জানাইতেছেন যে অতি বৃষ্টির ফলে মেখলিগঞ্জ সহরের নিম্নে প্রবাহিত তিস্তানদীতে ভাঙ্গন সুরু হইয়া নদীর তীরে অবস্থিত কতগুলি বসতবাটি নদী গর্ভে বিলীন হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই ভাঙ্গন বন্ধ হইয়াছে। হলদিবাড়ী অঞ্চলেও তিস্তানদীর প্লাবনে অধিবাসিগণের ও কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে।

সামরিক ব্যবহারে লৌহ ফুসফুস—

কুচবিহার সদর হাসপাতালে একটি "লৌহ ফুসফুস" (Iron lungs) ছিল। আমরা জানিতে পারিলাম যে পার্ব্বতীপুরে সামরিক হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য কুচবিহার দরবার এই লৌহ ফুসফুস ধার দিয়াছেন। এই লৌহ ফুসফুসটি বিলাতের প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ও মানব-প্রেমিক লর্ড নুফিল্ডের আনুকূল্যে পাওয়া গিয়াছিল। ভারতবর্ষে এই জাতীয় "লৌহ ফুসফুস" মাত্র অল্প কয়টিই আছে।

সুইডিস মিশন স্কুলের ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফল—

আমরা স্থানীয় সুইডিস মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নিকট হইতে জানিতে পারিলাম যে এই বৎসর এই স্কুল হইতে ২৫টি বালক ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ১৫টি বালক উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তীর্ণ বালকগণের মধ্যে একজন প্রথম বিভাগে এবং দুইজন দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করিয়াছে। এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার শতকরা মাত্র ৪৫ জন; কিন্তু সুইডিস মিশন স্কুল হইতে শতকরা ৬০ জন পাশ করিয়াছে। আমরা স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ সকলকে এই জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজের বি-এ পরীক্ষার ফল—

এই বৎসর স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে ৩১ জন ছাত্রছাত্রী বি-এ পরীক্ষা দিয়াছিল; তন্মধ্যে ১৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে। উত্তীর্ণগণের মধ্যে একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স ও চারিজন ডিষ্টিংশন পাইয়াছে। এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার শতকরা ৪১ জন, কিন্তু ভিক্টোরিয়া কলেজ হইতে শতকরা ৪৬ জন পাশ করিয়াছে। আমরা জানিতে পারিলাম যে এই বৎসর বি-এ ক্লাসের কোন ছাত্রকেই আটকাইয়া রাখা (detain) হয় নাই; অধ্যক্ষ মহাশয় সকল ছাত্রছাত্রীকেই পরীক্ষা দিবার অনুমতি দিয়াছিলেন; তৎসত্ত্বেও যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার অপেক্ষা কলেজের পাশের

হার উচ্চতর হইয়াছে ইহা প্রশংসার কথা। আমরা আরও জানিতে পারিলাম যে অনুত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে ৮ জন কম্পার্টমেণ্টাল পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইয়াছে।

মিষ্টার এ-সি দত্তের নিয়োগ—

আসাম গভর্ণমেণ্টের ট্রেড্ কমিশনার মিষ্টার এ-সি দত্ত কুচবিহার রাজ্যের কণ্ট্রোলার অফ সেপারেট রেভিনিউ নিযুক্ত হইয়াছেন। মিষ্টার দত্ত পূর্ব্বেও এই পদে কাজ করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি রাজ্যের অর্থ বিভাগের সেক্রেটারী (Financial Secretary) মৌলভী আনসার উদ্দীন আহ্মেদ ছুটিতে যাওয়ায় মিষ্টার দত্ত নিজ কার্য্য ছাড়াও অর্থ বিভাগের সেক্রেটারীর কার্য্য করিতেছেন।

হলদিবাড়ীতে নাট্যাভিনয়—

আমরা জানিতে পারিলাম যে হলদিবাড়ী ক্লাবের উদ্যোগে হলদিবাড়ীতে বিগত ৩০শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট পরপর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দ্বীপান্তর নাটকের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। অভিনয় উৎকৃষ্ট হইয়াছিল এবং স্থানীয় জনসাধারণের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। প্রকাশ যে কানীচরণের ভূমিকায় রণজিৎ বাবুর অভিনয় চমৎকার হইয়াছিল।

রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকীতে ভিক্টোরিয়া কলেজে সভা—

গত বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুবার্ষিকী দিনে স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণের এক সভা হয়। সভায় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন ধর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় ছাত্রছাত্রীগণ রবীন্দ্র সঙ্গীত গান করেন এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করেন। রবীন্দ্র প্রতিভার বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা প্রদান করা হয়। কলেজ ইউনিয়নের উদ্যোগে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে রবীন্দ্র স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য চাঁদা তোলা হয়।

জাপানজয়ে কুচবিহারে বিজয়োৎসব—

জাপান মিত্রপক্ষের নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে এই সংবাদ কুচবিহারে পৌঁছা মাত্র সর্ব্বত্র আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। মিত্রশক্তির বিজয় উপলক্ষ্যে উৎসব করিবার নিমিত্ত কুচবিহার দরবার ১৬ই, ১৭ই এবং ২০শে আগষ্ট রাজ্যময় ছুটি ঘোষণা করেন। ১৯শে আগষ্ট রবিবার যুদ্ধজয়ে ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য রাজ্যের সকল মন্দিরে, মসজিদে ও গির্জ্জায় বিশেষ পূজা ও উপাসনার ব্যবস্থা করা হয়। ঐদিন প্রাতে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে বিশেষ সংকীর্ত্তন হয়। ১৬ই হইতে ২০শে আগষ্ট পর্য্যন্ত রাজবাড়ী এবং সকল সরকারী গৃহে কুচবিহার রাজ্যের ও সম্মিলিত জাতিসমূহের পতাকা উড্ডীন রাখা হয়।

২০শে আগষ্ট বিজয় উপলক্ষ্যে রাজ্যময় নানারূপ আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৮-৩০ মিনিটের সময় রাজ্যের সৈন্যবাহিনী, পুলিশ ও স্কাউটদল টিলারার সেনানিবাসে একত্রিত হয় এবং সেখান হইতে সহরের প্রধান প্রধান রাস্তাসমূহে শোভাযাত্রা করিয়া বেড়ায়। বিকাল ৩টার সময় কলেজে ও সহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীগণকে মিষ্টান্ন খাওয়ান হয়; রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী, কলেজের অধ্যক্ষ এবং বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক মহাশয়গণ এই কার্য্যের তদারক করেন। বিকাল ৬টার সময় মদনমোহন ঠাকুরবাড়ীতে দরিদ্রনারায়ণের সেবা হয়। ৬টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত পুলিশ মাঠে রাজ্যের সৈন্যবাহিনী

এবং অন্যান্যের মধ্যে ফুটবল ম্যাচ খেলা হয়। এই খেলায় অন্যান্য দল ৫-১ গোলে বিজয়লাভ করে।

১৯শে আগষ্ট সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় কুচবিহার সহরে ল্যান্সডাউন হলে রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় সম্মিলিত জাতিসমূহের জয়ের জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। বিভিন্ন বক্তা এতদুপলক্ষে বক্তৃতা প্রদান করেন। রাজ্যের মহকুমা সহরগুলিতেও এইরূপ জনসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

কুচবিহারে বস্ত্রবণ্টন—

কুচবিহারে বস্ত্রের রেশনিং প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। দুর্গাপূজা ও ঈদ সমাগত; এই উপলক্ষে জনসাধারণের বস্ত্রের প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া কর্তৃপক্ষ আপাততঃ মাথাপিছু ৮৪ গজ কাপড়ের বরাদ্দ স্থির করিয়াছেন। ৩রা সেপ্টেম্বর হইতে ১০ই অক্টোবর পর্য্যন্ত এই বরাদ্দ অনুযায়ী অনুমোদিত দোকানসমূহ হইতে রেশন কার্ড দেখাইয়া বস্ত্র ক্রয় করা যাইবে। ৮৪ গজ কাপড়ের মধ্যে প্রত্যেকে একখানি ধুতি কিম্বা সাড়ী এবং ৩০ গজ অন্য কাপড় (লুঙ্গি, মার্কিন, ভয়েল, ছিট প্রভৃতি) লইতে পারিবেন। বর্ত্তমান সময়ে এই কাপড় পাওয়ায় জনসাধারণের অনেক সুবিধা হইবে। মফঃস্বলেও বস্ত্র বণ্টনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

স্থানীয় কলেজে সৈনিকদের অনাচার—

গত ২১শে আগষ্ট মঙ্গলবার বেলা প্রায় এগারটার সময় কুচবিহার সৈন্যবাহিনীর দুইজন সিপাহী একটি সাইকেলে চড়িয়া কলেজ হোষ্টেলের সম্মুখের রাস্তা দিয়া যাইতেছিল। সিপাহী দুইটির সাইকেলের সহিত বিপরীত দিক হইতে আগত এক ভদ্রলোকের সাইকেলের সংঘর্ষ হয়। ইহাতে সিপাহী দুইটি ভদ্রলোককে মারপিট করিতে থাকে; ইহা দেখিয়া হোষ্টেল হইতে কয়েকজন ছাত্র ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং সিপাহীদিগকে নিরস্ত করে। হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং ছাত্রদিগকে হোষ্টেলে ফিরাইয়া আনেন; একটি পুলিশ কনষ্টেবল সিপাহীদিগের সাইকেলটি থানায় লইয়া যায়।

ইহার পরে দুপুর প্রায় বারোটার সময় দুইজন সৈনিক কর্ম্মচারী কলেজে আসিয়া অধ্যক্ষ মহাশয়ের খোঁজ করেন; অধ্যক্ষ মহাশয় তখনও কলেজে আসেন নাই; কলেজের একজন কেরাণী তাঁহাদিগকে একটু অপেক্ষা করিতে বলেন কিন্তু তাঁহারা অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া যান। পরে বেলা প্রায় দুইটার সময় একজন মিলেটারী সুবেদার আসিয়া অধ্যক্ষের সহিত দেখা করেন এবং বলেন যে হোষ্টেলের ছাত্রেরা একখানি মিলিটারী সাইকেল হোষ্টেলে আটক করিয়া রাখিয়াছে এবং সেইজন্য সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর সাহেব তাঁহাকে পাঠাইয়াছেন। অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে বলেন যে ছাত্রেরা সাইকেল হোষ্টেলে আনে নাই, একজন পুলিশ কনষ্টেবল উহা থানায় লইয়া গিয়াছে; মেজর সাহেব ইচ্ছা করিলে অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহার সম্মুখে হোষ্টেল খানাতল্লাস করাইতে প্রস্তুত আছেন। সুবেদার তখন চলিয়া যান।

ইহার পর বেলা চারিটার সময় স্থানীয় কলেজ, ভেনকিন্স স্কুল ও কলেজ হোষ্টেলে এক শোচনীয় কাণ্ড ঘটে। কুচবিহার সৈন্যবাহিনীর শতাধিক সিপাহী অতর্কিতে কলেজ, স্কুল ও হোষ্টেলে প্রবেশ করিয়া ছাত্র ও শিক্ষকগণকে প্রহার করে। হোষ্টেলের ছাত্রগণের উপর বেশী আক্রমণ হয়। সৈনিকগণ সেখানে নিঃসহায় ছাত্রগণের উপর অত্যাচার করে। দুইটি ছাত্রকে তাহারা দোতলা হইতে

নীচে ফেলিয়া দেয়। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল অত্যাচার করিবার পর সৈনিকগণ চলিয়া যায়।

আহতদিগের মধ্যে ৫৭ জন হাসপাতালে চিকিৎসার্থ প্রেরিত হয়; তন্মধ্যে ১৭ জন বাদে আর সকলকে প্রাথমিক সাহায্য দিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ১৭ জনকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হয়। হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষের অসামান্য তৎপরতা এবং জনসাধারণ ও ছাত্রছাত্রীগণের সেবাশুশ্রূষা ও সাহায্যের ফলে তাহারা সকলেই সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

দার্জ্জিলিঙে মহারাণী সাহেবা, প্রধান মন্ত্রী মহোদয় ও হাউসহোল্ড মন্ত্রীমহোদয়কে টেলিগ্রামে ও টেলিফোনে ঘটনার সংবাদ দেওয়া হয়। ২২শে আগষ্ট বুধবার সন্ধ্যায় হাউসহোল্ড মন্ত্রীমহোদয় মোটরযোগে দার্জ্জিলিং হইতে কুচবিহারে উপস্থিত হন এবং ঘটনাসম্বন্ধে সরকারী উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ও জনসাধারণের প্রতিনিধিগণের সহিত আলোচনা করেন। তিনি ছাত্রদিগকে তাহাদের নিরাপত্তা ও অপরাধীদের শাস্তি সম্বন্ধে আশ্বাস প্রদান করেন। শতাধিক সিপাহী ও দুইজন সৈনিক কর্ম্মচারীকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থাও তিনি করেন।

মহারাণী সাহেবা এবং প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ও দার্জ্জিলিং হইতে কুচবিহারে উপস্থিত হন। তাঁহারা হাসপাতালে আহতদের অবস্থা পরিদর্শন করেন। প্রধানমন্ত্রী মহোদয় অসুস্থ; কিন্তু অসুস্থতা সত্ত্বেও ঘটনার সংবাদ পাইয়া তিনি দার্জ্জিলিং হইতে কুচবিহারে উপস্থিত হন। দুই দিন কুচবিহারে থাকিয়া তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যান। সেখানে এসোসিয়েটেড প্রেসের নিকট এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ভারত সরকারের রাজনৈতিক বিভাগের সহিত পরামর্শ করিয়া অভিযুক্ত সৈনিকগণের বিচারের জন্য শীঘ্রই একটি বিশেষ নিরপেক্ষ আদালত গঠিত হইবে।

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপ বাহাদুর বর্ত্তমানে সামরিক কার্য্যে ভারতের বাহিরে আছেন। তাঁহার নিকটও এই ঘটনার সংবাদ পাঠান হইয়াছে।

এই ঘটনায় সহরবাসিগণ অত্যন্ত উত্তেজিত ও আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডবিধানের আশ্বাস পাইয়া সহরবাসীর আতঙ্ক দূর হইয়াছে এবং সহর শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। সহরের কাজকর্ম্ম যথানিয়মে চলিতেছে।

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
১।	রবীন্দ্রপ্রতিভার এক দিক (প্রবন্ধ)	কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় ...	২১৯
২।	শ্যামদেশে ভারতীয় সভ্যতা (প্রবন্ধ)	ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী এম-এ, ডি-লিট	২২৩
৩।	স্বর্গবাস (গল্প)	শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়	২২৬
৪।	শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা (প্রবন্ধ)	শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম-এ ...	২৩২
৫।	উপনদী (উপন্যাস)	শ্রীমনিলকুমার ভট্টাচার্য্য	২৩৭
৬।	পদার্থের রূপান্তর (প্রবন্ধ)	শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম-এস-সি	২৪২
৭।	পরিচয় (গল্প)	শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল ...	২৪৯
৮।	স্বভাবোক্তি (প্রবন্ধ)	অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার দাশ গুপ্ত এম-এ ...	২৫৪
৯।	শারদীয় (কবিতা)	শামসুদ্দীন	২৫৬

বিশুদ্ধ নেপানি তামাকে প্রস্তুত—

বকুল বিড়ি

স্বাদে ও গন্ধে—অতুলনীয়

পানে—অবসাদ দূর করে

কুচবিহারে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠান আপনাদের সহানুভূতির উপর নির্ভর করে।

পরিবেশক—

এস্ বণিক,

কুচবিহার।

CENTRAL LIBRARY

সূচীপত্র

	বিষয়	লেখক	পত্রাঙ্ক
১০।	শ্যামসুন্দর (কবিতা)	শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	২৫৭
১১।	ওরে বাবার মন (কবিতা)	শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	২৫৮
১২।	রাজপরিবারের সংবাদ		২৫৯
১৩।	স্থানীয় সংবাদ		২৫৯
১৪।	দেশবিদেশের কথা		২৬০
১৫।	সাময়িক প্রসঙ্গ		২৬২
১৬।	খেলাধূলা		২৬৪

নিবেদন :—

স্বাস্থ্যই সুখের মূল, শরীর ক্রিয়ার ব্যতিক্রম হওয়ার জন্যই রোগ দেখা দিয়া থাকে, সেজন্য বুদ্ধিমান লোকে সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করেন, নতুবা সামান্য ব্যাধি পরে কষ্টদায়ক—এমন কি প্রাণঘাতীও হইতে পারে।

যাহাতে দেশের সর্ব্বসাধারণে সহজেই রোগমুক্ত হইতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সিটী মেডিক্যাল ষ্টোর্স. জলপাইগুড়ি সর্ব্ব প্রকার দেশী বিদেশী ঔষধ, রোগীর পথ্য, শিশুর খাদ্য ও পেটেন্ট ঔষধ বাজার চলতি দরে আমদানী ও সরবরাহ করিতেছেন।

সিটী মেডিক্যাল ষ্টোরে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত থাকিয়া সমাগত রোগীগণের পরীক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। যাহাতে দেশবাসী অনায়াসে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে ঔষধ. পথ্য ও চিকিৎসার সুবিধা পান ইহাও সিটী মেডিক্যাল ষ্টোর কর্তৃপক্ষের অন্যতম উদ্দেশ্য।

জন সাধারণ সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আমাদের শ্রম সার্থক করুন ইহাই আমার নিবেদন।

ডাঃ এ, লতিফ।

গোবিন্দসুধা— সেবনে বলপুষ্টি বর্দ্ধিত এবং বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৷৷০ দেড় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

পিত্তশূল সুধা— ইহা পিত্তশূল, অম্লশূল ও অজীর্ণ রোগের মহামহৌষধি। মূল্য ২৷৷০ টাকা। ভিঃ পিঃ মাশুল স্বতন্ত্র।

কলেরা কিওর— কলেরা, উদারময়, পেট ফাঁপা অগ্নিমান্দ্য ও সূতিকা প্রভৃতির মহৌষধ। ২৲ মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

নেত্র সুধা— চক্ষুউঠা, প্রভৃতি যাবতীয় চক্ষু রোগের অব্যর্থ মহৌষধ। মূল্য ১৲ টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :— শ্রীরাধাগোবিন্দ সাহা,

কাঁইয়াপট্টি, কোচবিহার।

কোচবিহার দর্পণের নিয়মাবলী।

১। কোচবিহার দর্পণের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা ও বার্ষিক সডাক তিন টাকা; মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। পত্রিকায় প্রকাশের জন্য লেখা কাগজের একপৃষ্ঠায় স্পষ্টরূপে লিখিয়া সম্পাদকের নিকট পাঠাইতে হইবে। উৎকৃষ্ট লেখার জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া হয়।

৩। অমনোনীত লেখা ফেরৎ লইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকেট সহ ঠিকানা লেখা খাম পাঠাইতে হয়; অমনোনীত কবিতা ফেরৎ দেওয়া হয় না। অমনোনয়নের কারণ দর্শাইতে সম্পাদক অক্ষম।

৪। মনোনীত লেখা কখন প্রকাশিত হইবে সে সম্বন্ধে সম্পাদক কোনরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন না।

৫। কোচবিহার দর্পণে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার পূর্ণ পৃষ্ঠা ১৫ টাকা; অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৮ টাকা এবং সিকি পৃষ্ঠা ৩ টাকা। কভারে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের হার দ্বিগুণ।

৬। টাকাকড়ি সম্পর্কিত চিঠিপত্র ম্যানেজারের নিকট লিখিতে হইবে।

ম্যানেজার কোচবিহার দর্পণ
ষ্টেটপ্রেস, কোচবিহার।

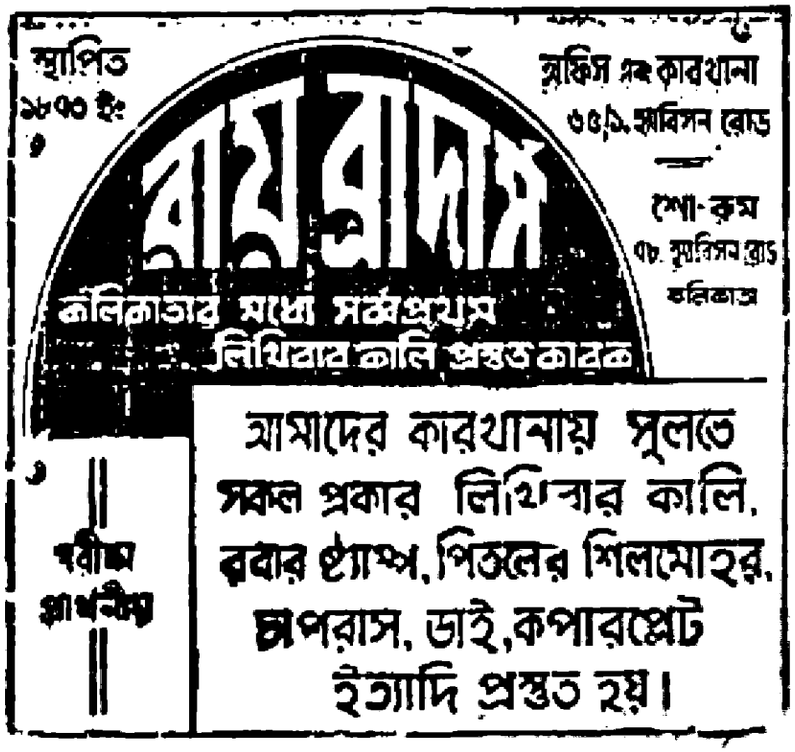

কোচবিহার রাজপ্রাসাদ

CENTRAL LIBRARY

কোচবিহার দর্পণ

অষ্টম বর্ষ | আশ্বিন ১৩৫২ সন, রাজশক ৪৩৬ | ৬ষ্ঠ সংখ্যা

রবীন্দ্রপ্রতিভার এক দিক

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি ভারতের সর্ব্বযুগের চিন্তানায়কগণের প্রতিনিধি। বৈদিক কবির আর্ষদৃষ্টি তাঁহার মানসনয়নে, উপনিষদের ঋষির ব্রহ্মোপলব্ধি তাঁহার সৃষ্টিতে এবং পৌরাণিক বীর ও তাপসের সত্যনিষ্ঠা ও তেজস্বিতা তাঁহার সাধনায়। বৌদ্ধ মহাস্থবিরদের মত গতানুগতিকতার বিরোধী স্বাধীন চিন্তার প্রচারক তিনি; মধ্যযুগের ধর্ম্মবিপ্লবের সামঞ্জস্য সম্পাদক মরমী সাধকদের বাণী তাঁহার সাহিত্যে মূর্চ্ছিত, এবং অর্বাচীনযুগে সংস্কৃতি সংঘর্ষের সন্ধিস্থলে যাঁহারা অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী ও সত্যপিপাসু তাঁহাদের সর্ব্বশক্তির মিলনভূমি তাঁহার সাধনা। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতীক রবীন্দ্রনাথ। আধ্যাত্মিক ভারতীয় সাধনার যে তপঃশক্তি যাজ্ঞবল্ক্য, জাবালি, বিদুর, মৌদ্গল্যায়ন, কালিদাস, নাগার্জ্জুন, রামানুজ, নানক, অদ্বৈত, চাঁদসদাগর, গোবিন্দ-মাণিক্য ও রামমোহনে পরিমূর্ত্ত হইয়াছে—সেই শক্তি যেন কেন্দ্রীভূত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথে। ভারতের বারের বিক্রমে, সাধকের সাধনায়, কবির বাণীতে কবি আপন মহত্তর সত্তার ধারাবাহিকতা অনুভব করিয়া বলিয়াছেন—

"এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্ত্তি ধরে
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করি পারাপার
কত বারংবার।"

কেবল কবিতার মধ্য দিয়া আমরা পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে পাই না—তাঁহার জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সাধনা, তাঁহার ব্রত, বাণী ও চিন্তার মধ্যে তাঁহাকে আমরা সমগ্রভাবে পাই। একাধারে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সাধনার সঙ্গে যাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—তিনিই এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কবির নিজের কথায়—

যেখানেই যে তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞযাগ
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।

মোহবন্ধ মুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়
তার মাঝে পেয়েছি আপন পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।

ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন সাধনার ধারার মহামিলন নিজের সত্তার মধ্যে অনুভব করিয়া কবি বলিয়াছেন —

লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জ্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে অস্ত্র নিয়ে মহাবাণী নিয়ে
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ আমার সমর্থ সগোত্র
তাদের নিত্য শুচিতায় আমি শুচি

তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক, অমৃতের অধিকারী।

যুগে যুগে ভারতীয় সংস্কৃতি যবদ্বীপে সংক্রামিত হইয়াছিল। যুগে যুগে ভারত তাহার সংস্কৃতির দূত যবদ্বীপে প্রেরণ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ কবিরূপে সেখানকার শেষ দূত। সাগরিকা নামক কবিতায় কবি আপনাকে ভারতের সর্ব্বযুগের সংস্কৃতির প্রতিনিধি বলিয়া কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন—

এবার মোর মকরচূড় মুকুট নাহি মাথে
নাহি বাণ নাহি আমার হাতে।
এবার আমি আনিনি ডাকি দখিন সমীরণে
সাগর কূলে তোমার ফুল বনে
এনেছি শুধু বীণা
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কিনা।

অর্থাৎ বার বার যুগে যুগে কতরূপে তোমার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি—এবার কবিরূপে আসিয়াছি। তুমি কি আমারে চিনিতে পার?

রবীন্দ্রনাথের প্রধান স্বাতন্ত্র্য তাঁহার নিজস্ব কবি-দৃষ্টিতে। যে রসদৃষ্টিতে তিনি বিধাতার সৃষ্টিকে দেখিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ। কোন সাধারণ লোকের দৃষ্টির সহিত তাহার মিল নাই—অন্যের পরে কা কথা, ভারতের কোন কবির দৃষ্টির সহিতও তাহার মিল নাই। একমাত্র মেঘদূতের কবির দৃষ্টির সঙ্গে তাহার আংশিক মিল আছে। এই দৃষ্টি যেন আর্ষদৃষ্টি—বেদ বা উপনিষদের ঋষিদের দৃষ্টি অনেকটা যেন এই শ্রেণীর; কবি যে দিব্যদৃষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে দিব্যদৃষ্টি কাহারও জীবনের অঙ্গীভূত নয় বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ জীবন ও মনের বিশিষ্ট অবস্থায় বিশ্ব-প্রকৃতির বিশিষ্ট পরিবেষ্টনীর মধ্যে এই দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য প্রাপ্ত হয়। মাঝে মাঝে এইরূপ দৃষ্টি আমরা লাভ করি। মাঝে মাঝে আমাদের গুহ্য তৃতীয় নয়নের পল্লব একটু একটু উন্মীলিত হয় বলিয়াই রবীন্দ্রনাথের কবিতা আমরা উপভোগ করি। এই দৃষ্টি আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত নয়—এই দৃষ্টি লইয়া আমরা জন্মগ্রহণ করি নাই বলিয়া আমরা উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু সৃষ্টি করিতে পারিনা।

রবীন্দ্রনাথে এই দিব্য দৃষ্টি লইয়া—বিকসিত তৃতীয় নয়ন লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই দৃষ্টি অমৃতময়ী দৃষ্টি—এই দৃষ্টিতে বিশ্বসৃষ্টিকে দেখিয়াছেন বলিয়া বিধাতার সৃষ্টি তাঁহার কাছে মধুময়ী। সৃষ্টির মাধুরী সম্ভোগেই এই দৃষ্টির কাজ ফুরায় নাই—তাহা হইলে কবি আদর্শ রসজ্ঞ হইতেন সন্দেহ নাই—কিন্তু আদর্শ রসস্রষ্টা হইতেন না। ঐ দিব্যদৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির বাসনা ও শক্তি নিহিত আছে—বিধাতার সৃষ্টিকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার প্রবৃত্তি জড়িত আছে। বিধাতার সৃষ্টি কবির চোখে সুন্দর—তাহাকে সুন্দরতর করিয়া দেখাইবার বাসনা ঐ দৃষ্টিরই অঙ্গ। বিধাতার

সৃষ্টি সুন্দর—কিন্তু আমাদের চোখে সর্বাঙ্গসুন্দর না—তাহাতে অঙ্গহানিও অনেক। কবি তাই বিধাতার সৃষ্টির অঙ্গহানি দূর করিয়া তাহাকে আমাদের জন্য সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িতে চাহিয়াছেন। কবির দিব্য-দৃষ্টির পরিণতি তাই দিব্যসৃষ্টি। ইহাই রবীন্দ্রনাথের রসসৃষ্টি। বিধাতার সৃষ্টির পরিপূরক কবির সৃষ্টি। কবি যে সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন—তাহার অর্ধেক বিধাতার—অর্ধেক কবির নিজস্ব। কবি তাঁহার দিব্য দৃষ্টি ও দিব্যসৃষ্টির দ্বারা বিধাতার সৃষ্টিকে একদিকে যেমন আমাদের উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন অন্যদিকে তেমনি বিধাতার সৃষ্টির অনেক অঙ্গকে ভাঙিয়া আপন মনের মাধুরী দিয়া নূতন করিয়া গড়িয়াছেন। কবিমাত্রই নূতন সৃষ্টি করেন—কিন্তু এমন করিয়া বিধাতার সৃষ্টিকে নব কলেবর দান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ভারতের আর কোন কবি করেন নাই। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকৃত রসজ্ঞের কাছে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতিটি অঙ্গ, মানব জীবনের প্রত্যেক কথা, বিশ্বরহস্যের প্রত্যেক তত্ত্বটি মেঘদূতকাব্যের উপভোক্তার চোখে নববর্ষার মেঘমালার ন্যায় অভিনব রূপ লাভ করিয়াছে।

কথাটাকে অন্যভাবে প্রকাশ না করিলে তৃপ্তি হইতেছে না। আগে রসময়ী দৃষ্টি, তারপর বিধাতার সৃষ্টির সংস্কার সাধন করিয়া সৃষ্টি—ইহা যেন কেহ মনে না করেন। ছন্দেভাষায় রূপ দানটা উপসৃষ্টি,—প্রকৃত সৃষ্টি দৃষ্টির নিজস্ব ক্রিয়ারই অঙ্গ। কবি যে দৃষ্টিতে বিশ্বজগৎকে দেখিয়াছেন সেই দৃষ্টিই বিশ্বজগৎকে নবকলেবরে তাঁহার নয়নে উপস্থাপিত করিয়াছে। এই নবকলেবর দৃষ্টিরই সৃষ্টি। আমি এই দৃষ্টিকে অমৃতময়ী বলিয়াছি—ইহাকে বিস্ময়ময়ীও বলা যাইতে পারে। বিস্ময়ই সকল দর্শন তত্ত্বের নিদান—বিস্ময়ই সৎকাব্যেরও মূল উৎস। অলঙ্কারশাস্ত্রে বিস্ময়কে অদ্ভুতরসের স্থায়ী ভাব বলা হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ কবিতাকে, প্রকৃতপক্ষে কোন রসপর্যায়ে ফেলিতে হইলে অদ্ভুতরসের কবিতাই বলিতে হয়। কবির বিস্ময়ময়ী দৃষ্টি এই সৃষ্টির যে অঙ্গেই পড়িয়াছে তাহাতেই বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছে। এই বিস্ময়সঞ্চারেই তাঁহার কবিতার জন্ম। জগৎ ও জীবনের এই বিস্ময়ঘনরূপই নূতন সৃষ্টি। ইহাকেই বলিয়াছি আমাদের দেখা বিধাতার জগৎকে ভাঙিয়া গড়া।

কবির সেই বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টিই ছন্দে ভাষায় বাণীরূপ লাভ করিয়া কবির বাঁশীতে ধরা পড়িয়া আমাদের হৃদয় বিস্ফারিত করিতেছে। কবি নিজে তাঁহার এই বিস্ময়ময়ী দৃষ্টি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করিনি, আমি চোখ মেলে যা দেখলুম, চোখ আমার তাতে ক্লান্ত হলো না,—বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। প্রতিদিন উষাকালে অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করার জন্য যে—যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।"

"আলোকিত ভুবনের মুখপানে চেয়ে নির্নিমেষ
বিস্ময়ের পাই নাই শেষ।
যে লক্ষ্মী আছেন নিত্য মাধুরীর পদ্ম উপবনে
পেয়েছি তাহার স্পর্শ সর্ব্ব অঙ্গ মনে
যে নিঃশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অঙ্গতে হাসিতে
তারে আমি ধরেছি বাঁশীতে॥"

যাঁহারা দেশের চিন্তাগুরু ও দার্শনিক—যাঁহারা সত্য প্রচারক তাঁহারা কবির কাব্যে দেন প্রেরণা ও উপাদান।

তাহারা যাহা তত্ত্বের আকারে সূত্রনিবদ্ধ করেন বা তথ্যের রূপে প্রচার করেন কবি সেগুলির মধ্যে করেন জীবন সঞ্চার—সেগুলি কবির কাব্যে রসরূপ লাভ করিয়া সাধারণের অধিগম্য ও উপভোগ্য হয়। অন্যান্য দেশে দেখা যায় বড় বড় চিন্তাগুরু ঋষিকল্প মহাপুরুষদের আবির্ভাবের অব্যবহিত পরেই কবিগণ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের তত্ত্বচিন্তাকে সাহিত্যে রূপ দান করিয়াছেন। আমাদের দেশে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পরে বৌদ্ধ-সাহিত্য ও জাতক-সাহিত্যের জন্ম হইয়াছে। এই সাহিত্যের মধ্য দিয়া বুদ্ধদেবের বাণী সরস হইয়া দেশে প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর যে সকল কবির আবির্ভাব হইয়াছিল—তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের বাণীকে সঙ্গীত ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া আমাদের অধিগম্য করিয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে উপনিষদের ঋষিদের বাণী কোন সংস্কৃত কবি বা প্রাদেশিক ভাষার কবির রচনায় রসরূপ ধারণ করে নাই। উপনিষদের ঋষিদের অমৃতবাণী এতকাল রবীন্দ্রনাথের প্রতীক্ষায় দেশের ভাবগুহায় ধ্যানমগ্ন ছিল বলিয়া মনে হয়। কেবল শ্রেষ্ঠ ঋষিদের বাণী নয়, কবিদের স্বপ্ন ও ঈপ্সাদর্শও পরবর্ত্তী কবিদের কাব্যে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় প্রাচীন ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের রসাদর্শ আমরা পরবর্ত্তী সংস্কৃত কবিদের এবং প্রাদেশিক কবিদের রচনার মধ্যে দেখিতে পাই না। কালিদাসের রসাদর্শও এই বর্ত্তমান যুগের মহাকবি রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করিতেছিল। রবীন্দ্রনাথ কেবল কালিদাসের রসাদর্শে যৌবনে আবিষ্ট হন নাই—রসবিচারচ্ছলে তাঁহার কাব্যের অভিনব সার্থকতা (Interpretation) দান করিয়া তাহাতে নব জীবনের সঞ্চার করিয়াছেন। কালিদাসের নিজস্ব রসাদর্শ দেশে বিলুপ্ত হওয়ায় তাঁহার কাব্যের রসোপযোগ সেই আদর্শে সম্পাদিত হইত না,—প্রচলিত আদর্শেই সম্পাদিত হইত। তাহার ফলে মহাকবির প্রতি অবিচারই হইত। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের নিজস্ব রসাদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কালিদাসের রচনার রসবিচার করিয়াছেন। ইহার দ্বারা ভারতীয় সাহিত্যজগতের তিনি যে কি উপকার করিয়াছেন তাহা রসজ্ঞ ব্যক্তিরাই জানেন। নিশ্চয়ই তিনি এজন্য অমর কবি কালিদাসের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছেন এবং নিশ্চয়ই তিনি সেই সঙ্গে ভবভূতিকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছেন—"ঠিকই বলিয়াছিলে বৎস, উৎপৎস্যতেঽস্তি কোঽপি সমান-ধর্ম্মা কালোঽয়ং নিরবধি বিপুলা চ পৃথ্বী।"

রবীন্দ্রনাথের যে রসদৃষ্টি বিশ্বপ্রকৃতিকে কাব্যে নব নব কলেবর দান করিয়াছে—সেই রসদৃষ্টিই প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সাহিত্য, আর্ষবাণী ও জীবনধারাকে অভিনব সার্থকতা (Interpretation) দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাই ভারতের সর্ব্বাঙীন সংস্কৃতিধারার অভিনব ব্যাখ্যাতা।

শ্যামদেশে ভারতীয় সভ্যতা

ডক্টর শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী এম্-এ, ডি-লিট্

এ কথা এখন অনেকেই জানেন যে প্রাচীনকালে ভারতীয় সভ্যতা নানা দূরদেশে প্রসার লাভ করেছিল। উত্তরে হিমালয়ের পরপারে, সমগ্র মধ্য এসিয়া, মঙ্গোলিয়া চীন, কোরিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসিগণ ভারতীয় সভ্যতার নানা উপাদান গ্রহণ করে নিজেদের সভ্যতার পরিপুষ্টি সাধন করেছিল। দক্ষিণে, সমুদ্রপথ বেয়ে ভারতীয় সভ্যতার ধারা ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ, বলীদ্বীপ প্রভৃতি দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছেছিল এবং স্থানীয় সভ্যতাগুলির পরিপুষ্টি ও উন্নতিতে সহায়তা করেছিল। ফলে ভারতের প্রত্যন্তভূমিভাগ হতে বহুদূরে এই সমস্ত দেশে ভারতীয় ঔপনিবেশিক রাজ্যসমূহ গঠিত হয়। ভারতীয় সভ্যতার এই দিগ্বিজয়ের ইতিহাস অতি বিচিত্র এবং বিরাট। এই প্রবন্ধে সেই সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র বিবৃত করব। প্রাচীনকালে শ্যামদেশে ভারতীয় সভ্যতা কি ভাবে এবং কি পরিমাণে প্রসার লাভ করেছিল তাই হবে এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

শ্যামদেশের পৃথক ইতিহাসের আরম্ভ মাত্র খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। তৎপূর্ব্বে এদেশ ছিল প্রাচীন কম্বুজ বা Cambodia রাজ্যের একটি অংশ মাত্র। কম্বুজ বা Cambodia বর্ত্তমানে ইন্দোচীনের অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র রাজ্য—মেকং নদীর উপত্যকা নিয়ে গঠিত। কিন্তু প্রাচীন কম্বুজ রাজ্য ব্রহ্মসীমান্ত হতে আনাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল—মেনাম ও মেকং এই উভয় নদীর জনবহুল ও উর্ব্বর উপত্যকা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ভারতীয় ঔপনিবেশিক রাজ্যগুলির মধ্যে কম্বুজ রাজ্য প্রায় এক সহস্র বৎসরের উপর শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

কম্বুজ রাজ্যের প্রথম সূত্রপাত হয় খৃষ্টীয় প্রথম শতকে কিংবা আরও কিছু পূর্ব্বে। এই সময়ে ভারতীয় বণিকগণ ভারতবর্ষ হতে সমুদ্রপথে পূর্ব্বাঞ্চলে যাতায়াত আরম্ভ করেন এবং মালয় উপদ্বীপের নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করেন। মালয় উপদ্বীপের অগ্রভাগে, বঙ্গোপসাগর ও শ্যাম-উপসাগরের মধ্যে যে ক্রা (Kra) নামক যোজক আছে এই যোজকের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে সেকালে তক্কোল নামক একটি বৃহৎ বন্দর স্থাপিত হয়। ভারতবর্ষের উপকূলে অবস্থিত নানা বন্দর হতে জাহাজগুলি মৌসুমী বায়ুর সাহায্যে সোজাসুজি তক্কোল বন্দরে পৌঁছুতে পারিত। তক্কোল নগর হতে ভারতীয় বণিকেরা স্থল পথে মেনাম ও মেকংএর উপত্যকা পর্য্যন্ত যাতায়াত করতেন। বর্ত্তমান যুগের শ্যামদেশের রেলপথ এই প্রাচীন স্থলপথ বরাবরই স্থাপিত হয়েছে।

এই প্রাচীন পথ বেয়েই ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ মেনাম ও মেকং নদীর উপত্যকায় খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের মধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই সমস্ত উপনিবেশ অল্পকালের মধ্যেই একটি ক্ষমতাশালী রাজ্যে পরিণত হয়। প্রাচীন চীনা ইতিহাসে এই রাজ্যের প্রথম পরিচয় পাই। সে ইতিহাসে বলা হয়েছে যে কৌণ্ডিন্য নামক এক ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ হতে গিয়ে এই প্রথম হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে এ রাজ্যের নাম ছিল "ফু-নান্"। "ফু-নান্"—"ফোন"

বা "প্রোম" নামের রূপান্তর। স্থানীয় ভাষায় এ নামের অর্থ হচ্ছে পার্বত্যদেশ। এ রাজ্যের প্রথম রাজধানী কোথায় ছিল তা অনুমান করবার উপায় নাই। খুব সম্ভব একদিন শ্যামদেশের অরণ্যে মেনাম নদীর উপত্যকার উত্তরাংশে কোন স্থানে এই প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ফু-নান্ রাজ্য-স্থাপনার কয়েক শতকের মধ্যেই আর এক দল ভারতীয় কম্বুজ রাজ্য স্থাপনা করেন। এ রাজ্য স্থাপিত হয় মে-কং নদীর উপত্যকায়, বর্তমান কাম্বোডিয়া অঞ্চলে। প্রথম যুগে কম্বুজের প্রতিষ্ঠাতাগণ ফু-নান্ রাজ্যের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে কম্বুজের রাজা চিত্রসেন মেকং-বর্ণিত ফু-নান্ রাজ্য জয় করে কম্বুজ রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করেন। অল্পকালের মধ্যেই ফু-নান্ নাম ও সে রাজ্যের স্বাধীনসত্তা বিলুপ্ত হয়। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতক হতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত কম্বুজের হিন্দু রাজারা ব্রহ্ম সীমান্ত হতে আনাম পর্যন্ত ভূমিভাগের উপর নিজেদের প্রভুত্ব বজায় রাখেন। এ যুগে প্রতিষ্ঠিত বহু হিন্দু ও বৌদ্ধমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ শ্যামদেশের নানা স্থানে পাওয়া গিয়েছে। তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে যুগে শ্যামদেশ ও কম্বুজ অভিন্ন ছিল। কম্বুজের হিন্দু সংস্কৃতই শ্যামদেশের অধিবাসীরা গ্রহণ করেছিল।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে থাই নামক এক দুর্ধর্ষ জাতি চীনদেশের সীমান্ত হতে বিতাড়িত হয়ে ব্রহ্মদেশ, আসাম ও শ্যামদেশে প্রবেশ করে। এই থাইদের আক্রমণেই প্রাচীন কম্বুজ রাজ্য ধ্বংস হয় এবং মেনাম নদীর উপত্যকায় স্বাধীন "থাই" রাজ্যের স্থাপনা হয়। থাইদের ছোট ছোট শাখা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতক হতেই এ অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং কম্বুজের অধীনে দু'টি খণ্ডরাজ্য স্থাপনা করে। এই দুই রাজ্যের নাম—"শ্যাম" ও "লো"। এই দুই নামই পরে সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত হয়ে শ্যাম ও লবপুরিতে পরিবর্তিত হয়। দুটি নাম মূলতঃ সংস্কৃত নয় এবং "শ্যাম" নাম সংস্কৃতে কৃষ্ণকায়-অধিবাসীদের নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল এরূপ মনে করবার কোন কারণ নাই। শ্যাম ও লো, এ দুটি নাম থাই জাতির দুটি বিশিষ্ট শাখার নাম বলেই অনুমান হয়। প্রাচীন অহোম বা আসাম নামটিও এই শ্যাম নামেরই অন্য রূপ। শ্যামরাজ্য স্থাপিত হয় মেনাম নদীর উপত্যকার উত্তর ভাগে এবং লবপুরি স্থাপিত হয় ঐ নদীর উপত্যকার দক্ষিণ ভাগে।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে যখন শ্যাম স্বাধীন রাজ্যে পর্যবসিত হল তখন তার নূতন নামকরণ হল—সুখোদয় বা সুখোদয়। রাম কাম্হেং নামক থাইদের এক রাজার চেষ্টাতেই এই রাজ্য স্বাধীন হয়। খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সুখোদয়ের আধিপত্য অটুট থাকে। খৃষ্টীয় ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণে লবপুরির রাজারা প্রাধান্য লাভ করেন এবং অল্পকালের মধ্যে সুখোদয় রাজা লবপুরির অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। লবপুরি রাজ্যের নূতন রাজধানী অযুধিয়া বা অযোধ্যা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত শ্যামদেশের রাজধানী ছিল। এর পর নূতন রাজধানী হয় ব্যাঙ্কক।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বর্তমান শ্যামরাজ্যের সৃষ্টি মাত্র খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে। তার পূর্বে এ প্রদেশ ছিল প্রাচীন হিন্দু ঔপনিবেশিক রাজ্য কম্বুজরাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে 'থাই' (Thai) জাতির আক্রমণে কম্বুজরাষ্ট্র বিধ্বস্ত হলে একদিকে স্বাধীন শ্যাম রাজ্য ও অন্যদিকে কাম্বোডিয়া রাজ্যের সৃষ্টি হয়।

ইন্দোচীন ও শ্যামরাজ্যের উত্তর ভাগের পার্বত্য অঞ্চলেও নানা স্বাধীন রাজ্যের সূত্রপাত হয়।

থাই জাতি নূতন স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করল বটে কিন্তু কোন নূতন সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। তার কারণ তাদের কোন উন্নত সভ্যতা ছিল না। দক্ষিণ চীনের পার্বত্য প্রদেশ আশ্রয় করে তারা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল বটে, কিন্তু নিজেরা কোন উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি করতে পারে নাই। সেই কারণে তারা শ্যামদেশের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিই গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সেই সংস্কৃতিকেই তারা ক্রমশঃ পরিপুষ্ট করে নিজস্ব করে নেয়। তাই আজও শ্যামদেশের লিপি ভারতীয় লিপির একটি বিশিষ্ট রূপ। পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রই হচ্ছে তাদের একমাত্র ধর্মশাস্ত্র। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রই তাদের Code of Law। শিল্প ও স্থাপত্যের ধারাও প্রাচীন পন্থাই অনুসরণ করে।

শ্যামদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন যুগের নানা নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। বিষ্ণুমন্দির ও শিবমন্দিরের সংখ্যাও কম নহে। দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে বিষ্ণু, শিব, গণেশ এবং লিঙ্গমূর্তিও পাওয়া যায়। হিন্দুমন্দিরগুলি কম্বুজ ও চম্পার হিন্দুমন্দিরগুলির অনুরূপভাবে নির্মিত। দেবমূর্তি ও মন্দিরগুলি হতে বুঝতে পারা যায় যে প্রাচীনকালে কম্বুজের আধিপত্যকালে শ্যামদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র, ব্যাকরণ, তন্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতি কম্বুজে অধীত হত। শ্যামদেশের হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই সমস্ত হিন্দু ধর্মশাস্ত্র ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচলন ছিল এ কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। প্রাচীনযুগের একটি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটি শেষ নিদর্শন এখনো শ্যামদেশে আছে। এঁদের "ফ্রম" বা ব্রহ্ম বলা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁরা বিশেষ পারদর্শী। রাজদরবারে বরাবরই তাদের কিছু প্রতিপত্তি আছে, কারণ রাজা বৌদ্ধ হলেও অভিষেকের সময় এই "ফ্রম" বা ব্রাহ্মণদের বিশেষ প্রয়োজন হয়। আরও অনেক ছোট খাটো অনুষ্ঠানেও তাদের ডাকা হয়। "ফ্রম"দের এই আধিপত্য হতে বুঝতে পারা যায় যে প্রাচীন যুগে এ দেশে ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রতিষ্ঠা ছিল।

শ্যামদেশ যখন কম্বুজের অন্তর্গত ছিল সেই যুগেই এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। কিন্তু সে বৌদ্ধধর্ম ছিল কম্বুজ ও যবদ্বীপে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্ম। মহাযানী বৌদ্ধ দেবদেবীর যে সব মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তা থেকেই এ কথা অনুমান করা যায়। কিন্তু হিন্দুধর্মের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল বলে এ বৌদ্ধধর্ম শ্যাম ও কম্বুজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে নি। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে শ্যাম রাজ্য স্বাধীন হবার পর এবং থাই জাতির রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মদেশ হতে হীনযান বৌদ্ধমত শ্যামদেশে প্রচারিত হল। সেই সঙ্গে পালি ভাষার অনুশীলন এবং পালি ত্রিপিটকের অধ্যয়ন আরম্ভ হয়। এবং খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতকে শ্যামদেশের রাজা সূর্যবংশ রামের আমন্ত্রণে সিংহল হতেও বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ শ্যামদেশে যান এবং বৌদ্ধধর্মের উন্নতিকল্পে নানা সহায়তা করেন।

পূর্বেই বলেছি যে শ্যামদেশের Code of Law বা ব্যবহারশাস্ত্র হিন্দু ধর্মশাস্ত্র হতে সংগৃহীত। মনুসংহিতার সঙ্গে শ্যামদেশের প্রচলিত ব্যবহারশাস্ত্রের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। অনুমান হয় যে মনুসংহিতার কোন প্রাচীন অনুবাদ অবলম্বন করেই শ্যামদেশের ব্যবহারশাস্ত্র রচিত হয়েছিল।

স্বর্গবাস

(গল্প)

শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

শ্যামবাজারের খালধারে কুণ্ডুবাবুদের প্রাসাদতুল্য বৃহৎ বাড়ী। একদিন বৈশাখের দুপুর বেলায় সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা ঘরে 'ফ্যান্'-এর নীচে বসিয়া বাবুদের মেজকর্ত্তা তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গো লইয়া বর্ত্তমান যুগের অবস্থা সম্বন্ধে নানারূপ গান-গল্প করিতেছিলেন। পাশের বাড়ীর সন্তোষবাবু বলিলেন—"দেওঘর থেকে সুবোধের ভাগনে একটা ছোটখাটো বাসার জন্যে লিখেছিলো। আজ এক মাস তন্ন-তন্ন কোরে খুঁজেও কোন কিনারা কোরে উঠতে পারলুম না। কি সাংঘাতিক ব্যাপার একবার বোঝ। বেলগেছের বাজারের কাছে একটা ধ্যাড়্-ধেড়ে ভাঙ্গা..... কি চাই আপনাদের?" মেজকর্ত্তা মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, খোলা দরজার সামনে, বাহিরের বারান্দায়, দুইটি যুবক দাঁড়াইয়া। সন্তোষবাবুর জিজ্ঞাসার উত্তরে একজন একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল—"আপনাদের বাড়ীর ওই কোণের ঘরের দেয়ালের গায় 'টু-লেট্' মারা রয়েছে; তাই দেখে আমরা আসচি। যদি

অসমাপ্ত কথার উপর মেজকর্ত্তা বলিয়া উঠিলেন—"জল-বিষ্টি-রোদে লেখাটা ত প্রায় উঠেই গেছে, তবুও ওটা পড়তে পেরে এসেচেন! বছর পাঁচ-ছয় আগে ঐ টীন-প্লেট্খানা লাগানো হোয়েছিল। এমন শক্ত কোরে ওখানা পেরেকমারা যে কিছুতেই ওখানা ওঠাতে পারা যায় নি। আমাদের গ্যারেজ-কুড়ি ভাড়া দেবার মত বাড়ী আগে ছিল বটে; কিন্তু বর্ত্তমানে একখানিও আর নেই, আছে শুধু ঐ ভাঙ্গা-চোরা অস্পষ্ট টিন্-প্লেট্খানা।"

হেমবাবু মৃদু হাসির সহিত কহিলেন—"গান থেমে গেছে, আছে তার রেশটুকু; মানুষ চলে গেছে, আছে শুধু স্মৃতিটুকু!"

মেজকর্ত্তা কহিলেন—ঠিকই তাই। প্লেট্খানাতে আলকাতরার একটা পোঁচ্ড়া টেনে দিতে হবে।" তারপর অদূরে দণ্ডায়মান ভৃত্যের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"সুরো, আজই একটা পোঁচ্ড়া টেনে দিস্ত। রোজ কতলোক যে ওইটে দেখে আসে! উঃ, কী জ্বালাতন রে বাবা!"

আগন্তুক যুবকদ্বয়ের একজন কহিল—"আমাদের একখানা শোবার আর ছোট্ট একখানা ..

সন্তোষবাবু কহিলেন—"আরে মশাই, আমখানা, সিকিখানা, এমনকি একখানা ইঁট্ পর্য্যন্ত পাবার উপায় নেই। এঁদের ঐ কুড়িখানা বাড়ীতে ৬০টা 'ফ্যামিলী' গুঁতো-গুঁতি কোরে আছে। কোন কোন বাড়ীর ছাদও কেউ কেউ ভাড়া নিয়েচে।"

ম্লানমুখে যুবক দুইটি চলিয়া গেল। ইহাদের একজনের নাম গুণময়, অপরজনের নাম—জ্ঞানময়। দুইজন সহোদর ভ্রাতা। যশোর জেলায় বাড়ী। কলিকাতায় চাকুরীর 'হরিরলুট' হওয়াতে দেশ থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দুই ভ্রাতা দুইটি চাকুরী দখল করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু চাকুরী দখল করিয়া ফেলিলেও, এপর্য্যন্ত সুবিধা মত বাসা দখল করিয়া উঠিতে পারে নাই। কালীঘাটে যাত্রী-তোলা একটা বাড়ীতে ছোট

একখানা ঘর দৈনিক ভাড়া হিসাবে লইয়া, তাহাতেই কোনরকমে দিন কাটাইতেছে। কিন্তু একরতি সেই ঘরখানার দৈনিক ভাড়া—তিন টাকা। বড় ভাই গুণময় ম্যাট্রিক পাশ; সে বেতন পায়—১০৫ টাকা; ছোট জ্ঞানময় ক্লাস ফাইভ্ পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল—তাহার বেতন ৭০ টাকা। এই ১৭৫ টাকার মধ্যে প্রতি মাসে ৯০ টাকা করিয়া ঘরভাড়া দিয়া বেতনের টাকারও 'হরিরলুট' হইয়া যাইতেছে। তাই উঠিয়া পড়িয়া দুই ভায়ে ঘরের সন্ধান করিয়া ঘুরিতেছে; কিন্তু কোথাও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। গুণময় বিবাহিত সুতরাং সঙ্গে তাহার স্ত্রীও আছে। জ্ঞানময়—অবিবাহিত।

সন্ধ্যার পর তিনজনে বসিয়া চা খাইতে খাইতে ঘরের সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছিল। মেনকা—অর্থাৎ বউটি বলিল—"অত টাকা মাইনে পেয়েও ত কোন সুখ নেই। যা আসচে, তা'র সবই বেরিয়ে যাচ্চে অথচ দেশে এর চেয়ে ভাল থেকে, ভাল খেয়ে দিন যাচ্ছিলো। আমি তাই তখনি বারণ কোরেছিলাম যে তাড়াতাড়ি কোনও.....

গুণময় কহিল—"পাড়াগাঁয় পড়ে থাকার চেয়ে, কোলকাতায় ত থাকা যাচ্চে, সেইটেই ত মহালাভ' —বলিয়া গুণময় সিগারেটের প্যাকেট হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া ধরাইল। জ্ঞানময়ও একটা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

ইহার কিছু পরেই একটী দালাল-গোছের লোক আসিয়া দরজার সামনে দাঁড়াইল। গুণময় কহিল—"কি খবর হে; কিছু সন্ধান করতে পারলে?"

লোকটি উৎসাহপূর্ণ স্বরে কহিল—"আমি, বাবু, না পারি কি? খুঁজে খুঁজে বের কোরে ফেলেছি। দুখানা ঘর; এই সানগরে। যারা আছে, তারা পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই কাশী চলে যাবে। ভাড়াও বেশী নয়; ২৮৲ টাকা। পঞ্চাশ টাকা বকসিস্ আমার বরাতে রয়েচে, কে মারে?"

এই লোকটাকে পঞ্চাশ টাকা বকশিসের লোভ দেখাইয়া দুইখানা ঘরের জন্য বলা হইয়াছিল। লোকটির নাম যুধিষ্ঠির। যুধিষ্ঠির কহিল—"তাহোলে কাল সকালে একবার চলুন, ঘরদু'খানা দেখে আসবেন, আর বাড়ীওলার সঙ্গে কথা পাকাপাকি করে আসবেন।

গুণময় বলিল—"তাহোলে ঠিক কাল আটটার সময় এসো, বাবো।"

এতদিনে গুণময় অকূলে কূল পাইল এবং পরম পরিতৃপ্তির সহিত আর একটা সিগারেট ধরাইয়া হাল্কা মনে হাল্কা ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

* * *

পরদিন সকালে গুণময় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে ঘর দেখিতে বাহির হইল। ভিতরে গিয়া দেখিবার সুবিধা হইল না; কারণ—ভদ্রগৃহস্থ যিনি এখন আছেন তাঁর মেয়ে-ছেলেরা সব রহিয়াছে। সুতরাং বাহির হইতেই যুধিষ্ঠির গুণময়কে একবার ঘুরাইয়া আনিল এবং বলিল—"এই চারটে জানালাওলা দুখানা পাশাপাশি ঘর; পূবদিকে রান্নাঘর আছে; তা'ছাড়া কল, পাইখানা, লাইট্—সবই সুবিধে। আপনার পক্ষে দিব্বি হবে। চলুন এইবার বাড়ীওলার কাছে যাওয়া যাক।"

বড় রাস্তা ধরিয়া কিছুদূর গিয়া একটা গলির মধ্যে টীনের বাড়ীতে বাড়ীওলা থাকেন। তিনি কহিলেন—"তিন মাসের ভাড়া য়্যাড্‌ভান্স্ দিতে হবে, নইলে বাড়ী ধরে রাখতে পারবো না। ভাড়াটে এখনো ওঠেনি, এরি মধ্যে রোজ পঞ্চাশজন কোরে লোক বাড়ীখানার

জন্যে আসচে। এই ত এখনিই দুটি বাবু এসেছিলো; আপনার আসার মিনিট পাঁচ সাত আগে।"

যুধিষ্ঠিরকে একটু আড়ালে লইয়া গিয়া গুণময় কহিল—"এক মাসের ভাড়া আমি য়্যাড্‌ভান্স দোবো এখন; এইটে বোলে কোয়ে রাজী করিয়ে দাও; তোমার বকশিস্ পঞ্চাশ তো পাবেই।"

যুধিষ্ঠির কহিল—"এ বাজারে ৩ মাস কেন, ৬ মাসের ভাড়াই অনেকে য়্যাড্‌ভান্স দিতে রাজী হবে। কিন্তু এ বাড়ী হুস্থালে আর মেলা দায় হবে। ভাড়া ত সেই দিতেই হবে, দিয়ে দিন বাবু; নইলে হয় ত আজই আর কেউ এসে বন্দোবস্ত করে ফেলবে।"

গুণময় ভাবিল, কথাটা ঠিকই; বলিল—"দেখ, তোমার বকশিসের টাকাটা না হয় আজই দিয়ে দোবো এখন, তুমি একটু বোলে বুঝিয়ে এক মাসের ভাড়া 'য়্যাড্‌ভান্স'.....

কথাটা শেষ হইতে না দিয়া যুধিষ্ঠির কহিল—"শুনুন"। তারপর মনে মনে যেন একটু মৎলব ভাবিয়া লইয়া কহিল—"বাড়ীতে আমার স্ত্রীর বড্ড অসুখ, আজ আমার খুবই টাকার দরকার। আমার বকশিসের টাকাটা আজ আমাকে দিয়ে দিন, আমি যেমন কোরে হোক বোলে বুঝিয়ে, ৩ মাসের জায়গায় যা'তে অন্ততঃ দু'মাসের য়্যাড্‌ভান্সেই কাজ হয় তার জন্য.....আমার সঙ্গে অনেক দিনের প্রণয় কি না ভাই..... ছেলেবেলায় নিতাই গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় একসঙ্গে পড়েচি .....ওরিপর ধরুন গিয়ে..... যা'ক, এ সুবিধে ছাড়া কিছুতেই হবে না; ঐ দু'মাসেরই 'য়্যাড্‌ভান্স' আজই দিয়ে দিন।"

তাহাই হইল, এবং হেঁচাড়া উপায়ও নাই। গুণময়ের ভাগ্য ভাল যে এত অল্প, এই বাজারে এরকম একটা বাসা তাহার মিলিয়া গেল। অতঃপর যুধিষ্ঠির মনের বলিয়া কহিয়া বাড়ীওলাকে দুই মাসের 'য়্যাড্‌ভান্সে' সম্মত করাইল। ভদ্রলোক কহিলেন—"তাহোলে আর দেরী করবেন না। যুধিষ্ঠিরকে দিয়ে এখনি দু'মাসের ভাড়া পাঠিয়ে দিন; ওর হাত দিয়েই আমি রসিদ পাঠিয়ে দো'বোখন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন ঘর আপনারই রইলো; ডবল টাকা দিলেও আর কেউ পাবে না। আজ হোল ১৪ই; ওরা ২০শে উঠে যাবে। ২১শে থেকে আপনি দখল করতে পারবেন।"

বাসায় ফিরিয়া গুণময় জ্ঞানময়কে সব কথা বলিল। জ্ঞানময় কহিল—"খুব পাওয়া গেছে! এ আর হাতছাড়া করতে আছে?"

যুধিষ্ঠির আনন্দ এবং গর্ব্বমিশ্রিত মৃদুহাস্যের সহিত বলিল—'বাবু, আমি যখন লেগেছি, তখন খুঁজে বার কোরবোই জানবেন। উঃ! কী ঘোরাটাই না ঘুরেচি! সকাল, বিকেল, দুপুর.....বাড়ীতে স্ত্রীর অসুখ, তার দিকে চেয়েও দেখিনি—; তাই ও অসুখটা তার বেড়ে গেল—। আজকে বড় ডাক্তার ওবেলা আসবে, অনেকগুলি টাকা আজ খরচ।"

গুণময় যুধিষ্ঠিরের হাতে দুমাসের 'য়্যাড্‌ভ্যান্স' ৫৬ টাকা ও তাহার বকশিস ৫০ টাকা একুনে ১০৬ টাকা দিয়া একটা মস্ত দায় থেকে যেন উদ্ধার পাইল। মেনকার উদ্দেশে কহিল—"ভাল কোরে এক কাপ চা করত, ভাল করে খাই একবার।"

যুধিষ্ঠির ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

২১শে তারিখ।

আজ গুণময়দের নতুন বাসায় যাইবার দিন। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে দেখা গেল, সকাল বেলায় ঘরের

একধারে গুণময় গালে হাত দিয়া আর অন্যধারে জ্ঞানময় হাতে গাল রাখিয়া, নীরবে যেন ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছে।

হিন্দুর দেশ হিন্দুস্থানে 'তিন' সংখ্যার প্রভাব বড়ই বেশী। ত্রিশূল, ত্রিফলা, ত্রিপত্র, ত্রিনেত্র, ত্রিভুবন প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। সুতানুটী, গোবিন্দপুর এবং কলিকাতা —এই তিন স্থানের একত্র মিলনে যে সহর সৃষ্ট হইয়াছে, যাহার মাহাত্ম্য ও রহস্য ত্রিলোকেরও অজ্ঞাত, গুণময় ও জ্ঞানময়ের চিরজীবনের ধ্যানেও সে স্থানের লীলা বুঝিবার সাধ্য হইবে না, যেহেতু তাহা সর্ব্বগুণের ও সর্ব্বজ্ঞানের অতীত। তত্ত্বকথা ছাড়িয়া দিয়া সোজা কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, শ্রীযুক্ত যুধিষ্ঠির সেদিন ভক্তিপূত অন্তরে একশত ছয় মুদ্রা হস্তগত করিয়া, আর এ-পথ মাড়ায় নাই। কোন্ মহাপ্রস্থানের পথে সে চলা-ফিরা করিতেছে তাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও এই 'যত্তরে' ভ্রাতৃত্বয় তাহার কোন সন্ধান করিতে পারে নাই। শুধু সন্ধান পাইয়াছে যে তাহার কোন স্ত্রী নাই; সুতরাং 'মাথা নেই তার মাথাব্যথা'র মতই তাহার স্ত্রীর অসুখ হইয়াছিল; আর সন্ধান পাইয়াছে যে সানগরের সেই ঘর দুখানাতে যিনি ছিলেন—তিনিই আছেন, কাশী যান নাই এবং তিনি ও বাড়ীর ভাড়াটিয়া নহেন, তিনিই বাড়ীর মালিক। আর যিনি ১৪ই তারিখের সকালবেলা সেই বাড়ীর মালিক ছিলেন এবং নিকটের কোন টীনের বাটীতে বাস করিতেন, নিতাই গুরুর পাঠশালায় যুধিষ্ঠিরের সেই মাণিকজোড় সহপাঠীটিরও কোন সন্ধান তাহারা করিতে পারে নাই। এইসব ব্যাপারের ফলেই আজ ২১শে তারিখের প্রভাতে গুণময় গালে হাত দিয়া ও জ্ঞানময় হাতে গাল দিয়া ধ্যানস্থ অবস্থায় বসিয়াছিল।

কিছু পরে সেকরা দুইগনের জন্য দুই কাপ চা আনিয়া কহিল—"এ বাজারে শত চেষ্টা করেও কেউ কোথাও ঘর পাচ্চে না, আর তোমরা পোচ্চোরের কথায় ভুলে গেলে! বেশ হয়েছে! এখন—লোকটার যদি কখনো দেখা পাও ত তাকে আর দুটো টাকা দিয়ে দিও।"

চায়ে একটা চুমুক দিয়া গুণময় জিজ্ঞাসা করিল—তার মানে?

"তার মানে; একশ ছ টাকাটা বড্ড বেখাপ্পা গোচের। ১০৮ সংখ্যাটাই হল আমাদের হিঁদুর ঘরে—শুভ সংখ্যা। ভবিষ্যতে কোনও দিন তাঁর দেখা—খুনি!—দর্শন পেলে, আর দুটো টাকা দিয়ে ওটা পূরণ কোরে দিও। দিয়ে, সকাল সন্ধ্যা দু'ভাই বোসে বোসে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশত অর্থাৎ ১০৮ নাম জপ কোরো; ইহকাল পরকাল সুখে কাটবে।"

জ্ঞানময়ের হাতে সেদিনেরই একখানা দৈনিক কাগজ ছিল। দাদা-গুণময়ের মুখের দিকে চাহিয়া ভাই-জ্ঞানময় কহিল—"তা হোলে এই বাড়ীটার খবর আজ নেওয়া যাক, কি বল?"

গুণময় কহিল—"আজ মানে? এখনই—এই দণ্ডেই ওখানে যেতে হবে। তা'ও হয় ত গিয়ে শুনবি যে ভাড়া হোয়ে গেছে।"

কাগজখানায় একটা ছোট বাড়ীভাড়ার বিজ্ঞাপন ছিল। বাড়ীটা টালীগঞ্জে। গুণময় কহিল—"মোটেই আর দেরী করা নয়, এখনি বেরিয়ে পড়। আমাদের মত হাজার-হাজার লোকের দৃষ্টি বিজ্ঞাপনটার ওপর পড়বে; আর পড়বা মাত্রই ছুটবে; বুঝলি না?"

জ্ঞানময় তখনি শার্টটা গায়ে চড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং টালীগঞ্জের সেই ঠিকানায় পৌঁছিয়া দেখিল,

হাজার-হাজার না হইলেও ৫০।৬০ জন লোক সেই বাড়ীর সামনে ভীড় জমাইয়া ফেলিয়াছে। ভীড়ের মধ্যে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, ওড়িয়া, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী—সকল জাতিই আছে; একধারে একজন চীনাকেও দেখিতে পাওয়া গেল।

ভীড়ের ঠিক মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান বাড়ীওয়ালাকে সহজেই চিনিতে পারা গেল। তাঁর আলু-থালু বেশ; দর-দর ধারে সর্ব্বাঙ্গে ঘাম করিতেছে; পরণের আটহাতি কাপড়খানা তাঁহার নাতিবৃহৎ ভুঁড়িপ্রদেশে আবদ্ধ থাকিতে ক্রমাগতই আপত্তি জানাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি সকলকে জোড়হাত করিয়া জানাইতেছেন—"মশাইরা, সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! আমার কোন এক শত্রু আমাকে ভোগাবার জন্যে, নিজের পকেট থেকে পয়সা খরচ কোরে এই বিজ্ঞাপন দিয়েচে। ভাড়া দেবার মত আমার বাড়ী নেই। আপনারা ..

ভীড়ের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিল—"তা হোলে কি আপনি বলতে চান, যে,...

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুধু বলা নয়, এই জোড়হাত কোরে আপনাদের বলচি, এ আমার কোনও শত্রুর কাজ! সেটা দু'-চার টাকা বিজ্ঞাপন-খরচা কোরে আজ সারাদিন আমাকে নাকানি-চোবানি খাওয়াবার ফন্দি!" তারপর যেন একটু দম পাইয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"এই সবে সকাল। কাগজখানা বেরুতে-না-বেরুতে এই আপনাদের একশো লোকের ভীড়; এখনো সারা দিন পড়ে রয়েছে। ঐ দেখুন, এইটুকু সময়ের মধ্যেই বৈঠকখানা ঘরের সার্সির কাঁচ তিনখানা ভেঙ্গে গেছে, ধাক্কার চোটে দরজার খিলটা ছুটে গেছে! এখনো সারাদিন বাকী। আপনারা দয়া কোরে আমার কথা বিশ্বাস করুন। ভাড়া দেবার মত আমার কোনও বাড়ী নেই। মহাশত্রু আমার ভাগনে নেড়ার এই কাজ; আমার অপরাধের মধ্যে, সাতশো টাকা চেয়েছিল, তিনি 'রেস' খেলবেন, আমি তা দিতে পারিনি। আপনারা দয়া করে.....

কিন্তু বেলা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃই লোকের ভীড় আরও বাড়িয়া চলিল। জ্ঞানময় একধারে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিল, তারপর উৎসাহহীন পদক্ষেপে বাসার দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

* * *

"মশাই গো! কি হয়?"

সকালবেলা গুণময় ও জ্ঞানময় ঘরের মধ্যে বসিয়াছিল। যাত্রী-তোলা এই বাড়ীর মালিক নটবর বিশ্বাস দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্ঞানময় কহিল—"কি খবর বিশ্বাস মশাই?"

নটবর একটু কাসিয়া গলাটা দোরস্ত করিয়া লইয়া কহিল—"খবর আর কিছুই নয়; ঘরখানার জন্য দিন দিন খদ্দেরের হুড়োহুড়ি পড়ে যাচ্চে। কি করি বলুন ত? এই দুর্দ্দিনে ত আর আপনাদের উঠে যেতে বলতে পারি না।

গুণময় কহিল—"তবে কি বলতে পারেন, সেইটে বলুন।"

"আপনাদের আর বেশী কি বলবো; আপনারা ভদ্রলোক। গেরস্তকে ভাড়া দেবার ত এ বাড়ী আমার নয় এ হোল যাত্রীতোলা বাড়ী। তা.....

জ্ঞানময় এতক্ষণ একদৃষ্টে বিশ্বাসের মুখের দিকে চাহিয়াছিল; কহিল—"তা', কি করতে হবে বলুন।"

"দেখুন, যাত্রীদের আমি আর জায়গা দিতে পারচি না।—এই ঘরখানার জন্যে এখন রোজ কমপক্ষে পাঁচটা কোরে টাকা অক্লেশে পাওয়া যায়। তা, আপনারা হলেন ভদ্র-

লোক;— আপনাদের ত চলে যেতে বলতে পারি না। তা—পাঁচ টাকা থাক্, আপনারা ভালো লোক, আমিই না-হয় একটু লোকসান খাই, রোজ আর একটা কোরেটাকা না দিলে ত .....

"অর্থাৎ রোজ চার টাকা! তার মানে, ১২০৲ এই এক রাত্রি একখানা ঘরের জন্যে!"—গুপময় চোখে কপালে তুলিয়া নটবরের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। রাগে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া পড়িল।

নটবর অত্যন্ত বিনয়ের সহিত কহিল—"কি করব বলুন, কোথাও একরাত্তি স্থান পাবার যো নেই। ঘরের অভাবে কত যাত্রী আমাকে ফিরিয়ে দিতে হয়। তা, দৈনিক চারটে কোরে টাকা আমি চাইচি, বিশেষ অন্যায় কিছু চাইনি।"

অত্যন্ত বিরক্তির ভাবে গুপময় কহিল—"না; খুবই ন্যায় কথা বলচেন। তবে, এই একখানা একরাত্তি ঘরের জন্যে রোজ ৪৲ টাকা ভাড়া আমরা দিতে পারব না। আমরা চারদিকেই ঘরের সন্ধান করচি; শীগ্‌গিরই আপনার ঘর ছেড়ে দেবো। কোথাও না পাই, ত যমের বাড়ী গিয়েও থাকবো।

নটবর অদৃশ্যে কি বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

মেনকা আজ আদিগঙ্গায় স্নান করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"দেখ, মা-গঙ্গার দয়ায়, তোমাদের একটা সুন্দর বাসার সন্ধান নিয়ে এলুম। জান ঠাকুরপো, এ বাসায় গিয়ে বাস করলে রোজ ৩৲ টাকার বদলে একটা কোরে টাকা দিলেই বোধ হয় চলবে; কিম্বা তার কমেও হতে পারে। তা ছাড়া—তোমরা আনন্দ পাবে ষোল আনা, আর পুণ্যলাভ হবে—আঠারো আনা।"

জ্ঞানময় কহিল—"কোথায় বৌদি?"

'নাইতে গিয়ে দেখে এলুম, প্রকাণ্ড একখানা ভাঙ্গা নৌকো গঙ্গার পাড়ের ওপর পড়ে রয়েছে। ঐটে ভাড়া নিয়ে, দিব্বি ওতে থাকা চলে। দিনরাত গঙ্গা হাওয়া তোরা খেতে পারবে; আর একেবারে মা-গঙ্গার বুকের ওপর বাস, পুণ্যি রাখবার আর জায়গা হবে না"

গুপময় কহিল—"যুধিষ্ঠিরকে পঞ্চাশ টাকা বকশিস্ কোরেছিলুম, তোমাকে দেখচি এরজন্যে হাজার টাকা বকশিস্ করার দরকার।"

প্রত্যুত্তরে মেনকা কিছু একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু কাহাকেও আসিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে সরিয়া পড়িল। যিনি আসিতেছিলেন, তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই কহিলেন—"এতদিন পরে জমিটা পরশু রেজেষ্ট্রি হোয়ে গেল।"

জ্ঞানময় কহিল—"যাক্ ক্ষিতীশবাবু, কোলকাতা সহরে তিনকাঠা জমি ত কিনে ফেল্লেন; বড় কম কথা নয়। এইবার বাড়ী একখানা তুলে ফেলুন আর কি!"

ক্ষিতীশবাবু ইহাদের দূর আত্মীয়; কহিলেন—"বাড়ী তোলা এখন অনেক দূরের কথা। বছর পাঁচেকের আগে তা আর ঘটে উঠবে না, তবে আসল জিনিস—জমিটা ত কেনা থাকলো।"

গুপময় জিজ্ঞাসা করিল—জমিটা কোথায় বলুন ত?"

"টালীগঞ্জ কাঁড়ীর পাশ দিয়ে উত্তর দিকে যে রাস্তাটা গিয়েছে ঐ রাস্তায় খান পাঁচ-সাত বাড়ীর পরেই। জমিটার ওপর একখানা দোতলা ভাঙ্গা 'বাস্' দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাওয়া যাবে।"

"বাস্? কার বাস্?"

"যার জমি, সেই লোক টারই বাস্। তবে তাতে কিছু আর পদার্থ নেই। কলকব্জা সব খুলে নিয়ে গেছে, শুধু

'বডি'টা খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জমির সঙ্গে ওখানা শুদ্ধু কিনে নিয়েছি—৭৫ টাকায়।"

"দোতালা বাস্? কল-কব্জা কিছুই নেই?"

"কিছু না—কিছু না। ঐ যে বল্লুম, খালি 'বডি' খানা দাঁড়িয়ে আছে; সীট্‌গুলো পর্য্যন্ত সব খুলে নিয়ে গেছে। ও বাস্ নিয়ে আর কোন কাজে লাগানো যাবে না। কিছু তক্তা-কাঠ খুলে বিক্রী করা যেতে পারবে, আর কতক উনুন ধরাবার কাজে লাগবে।"

"ওর জন্যে কত দিতে হোল আপনাকে?"

"পঁচাত্তর টাকা। তা, চেয়ার-চৌকি করলে, শ'খানেক টাকায় ওটা বিক্রী কোরে দেওয়া যেতে পারে। দেখি, যদি খদ্দের পাই .....

অতঃপর তিনজনে প্রায় ঘণ্টা-খানেক ধরিয়া নানারূপ আলাপ আলোচনা করিবার পর, গুণময় চা-টা গায়ে দিয়া ক্ষিতীশ বাবুর সহিত বাহির হইয়া গেল।

ইহারই দিন চার-পাঁচ পরে পথের লোকে দেখিল, ক্ষিতীশ বাবুর জমীর উপরে অবস্থিত ভাঙ্গা 'বাস্'খানা নূতন রংয়ে রঞ্জিত হইয়া জল জল করিতেছে। উপরতলার একপাশে পানিকটা স্থান দরমা দিয়া ঘিরিয়া রান্নার ব্যবস্থা হইয়াছে; বাকী অংশটা—হাওয়াখানা এবং শয়ন মন্দির। নীচের তলাটাকে—একযোগে বৈঠকখানা এবং শয়নঘরে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। বাসখানাকে ঘিরিয়া চারিদিকে দুই-দশটা 'পাম্' ও পাতাবাহারের টাবও শোভা পাইতেছে।

পথের লোক সহসা এই পরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইয়া যখন থমকিয়া দাঁড়াইয়া 'বাস্'খানার দিকে দেখিতেছিল, তখন হাওয়াখানায় শয্যার উপর কাত্ হইয়া শুইয়া গুণময় জ্ঞানময়কে বলিল—"একশোটা টাকা খরচ কোরে এবাড়ীতে একদম আরামে যে থাকতে পারবো, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। এখন ২ বছরের জন্যে বাড়ীভাড়ার হাত থেকে নিশ্চিন্দি!"

তোলা উনানে ডাল সাঁতলানোর ছ্যাঁক্—কল্ কল্ শব্দের মধ্যে মেনকা দরমার ও পাশ থেকে বলিয়া উঠিল—"এ আমাদের যেন স-শরীরে স্বর্গবাস ঘটলো!"

জ্ঞানময় খবরের কাগজখানা হইতে মাথা তুলিয়া কহিল—"কথাটা মিথ্যা নয় বৌদি।"

বাসখানার পূর্ব্বনাম ছিল—'স্বর্গ রথ'।

পরদিন সকলে দেখিল, স্বর্ণাক্ষরে তাহাতে লেখা রহিয়াছে—

'স্বর্গবাস'

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ

মা আসিয়াছেন। কেমনে জানিলে মা আসিয়াছেন? কৈ মা?—কেন, ঐ দেখ না কাশপুষ্পগুলির কত শুভ্র হাসি। সেফালি মায়ের চরণে লুটিয়া পড়িবার জন্য আনন্দে আত্মহারা, পদ্মগুলির ত কথাই নাই। প্রাবৃটের ঘনগর্জ্জনের গাম্ভীর্য্য ও বিরক্ততা, কৈ আর ত নাই।—দিগ্বলয়ের এখানে সেখানে দু এক খানা মাত্র শুভ্র মেঘ আগমনীর অগ্রদূত স্বপ্নাবেশে গগনের ঐ এক কোণে ভাসিতেছে। ধ্যানীর শুচকল চিত্তের ন্যায় নির্ম্মলখচিত বিশ্ব

আকাশের গাঢ় নীলিমা চন্দ্রালোকের সুষমায় ভরপুর। শিশিরসিক্ত তৃণ রাজি। সদ্যস্নাতা শস্য-শ্যামলা সমুদ্রমেখলা ধরিত্রী ভক্তির অঞ্জলিকে ভাবগম্ভীরা ও হাস্যময়ী মায়ের সাড়া পাইয়া পাখীগুলি মনের আনন্দে প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে স্রোতস্বিনীর সে কলমুখরতা আর নাই; বেগও কত মন্দ; সাধুলোকের চিত্তের ন্যায় জলও কত স্বচ্ছ; তবুও একটি ক্ষীণা,—মৃদু কলগান করিতে করিতে মায়ের আগমনীবার্ত্তা দেশে দেশে প্রচার করিয়া চলিয়াছে। মা যে আসিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত পবন কাননে কাননে কান্তারে কান্তারে কত কি সুগন্ধ পরাগ গায় মাখিয়াছে, মা আসিয়াছেন জানিয়া শিষ্ট শিশুটির মত ঐ কূলনাশিনীর বক্ষে মায়ের অঞ্চলে মুখ লুকাইতে গিয়া অঞ্চলখানিকে কুসুমপরাগলঞ্ছিত করিতেছে।

মা ত আসিয়াছেন, কৈ আমরা ত মায়ের আগমনের কোন সাড়াই বুঝিতে পারিতেছি না।—বুঝিব কেমন করিয়া? বাহিরের অনল অনিল, সলিল মৃত্তিকা তোমার আমার চক্ষে অচেতন। বৃক্ষলতা, পশু পক্ষী তোমার আমার দৃষ্টিতে অর্দ্ধচেতন, অজ্ঞানী। ওদেরও কিন্তু সংজ্ঞা আছে। চিন্ময়ী মা যে আমার জগন্ময়ী। মানুষের মন যেমন ঘন অহংকারের কালিমায় ঢাকা, বাহিরের প্রকৃতিতে তেমনটি নাই। উহারা সাড়া পায়, আমরা পাই না। সর্ব্বব্যাপিনী মা আমার, সকলের হৃদয় গুহার গভীরতম প্রদেশে স্বমহিমায় চিরপ্রকাশিতা আছেন। আমরা কর্ম্মের ফেরে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া জগৎ দেখিয়া ভুলিয়া আছি,—মাকে দেখি না। সূর্য্য মেঘে ঢাকা পড়িয়া, এবং পুকুরের জল পানার আবরণে যেমন অদৃশ্য হয়, দুষ্কৃতির কালিমায়, আলস্য অনিচ্ছার আবরণে, অবিশ্বাসে যুক্তিতর্কের কুজ্ঝটিকায়, নিজের প্রাণের প্রাণ যিনি ("প্রাণস্য প্রাণোযৎ" শ্রুতি)—যাহা হইতে জন্মিয়া বাঁচিয়াই আছি ("যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি"—শ্রুতি.)—তাঁহাকে আর দেখিতে পাই না—কত দূরে মনে করিতেছি। উচ্চ প্রাণী বলিয়া অভিমানী আমরা—আমরা ত তাঁর প্রকাশ অনুভব করিতে পারিতেছি না। আমার মত সকলেই কি মায়ের আগমনে মায়ের সাড়া পায় না?—তা হবে কেন? ঐ শোন দিকে দিকে মায়ের বোধনবাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে। 'গৌরী আমার আসবে ঘরে'। মেনকা ত গৌরীর জন্য কত আয়োজন করিতেছেন। নদনদী গিরিবনে শরৎশ্রীর অপূর্ব্ব শোভা। গৃহস্থ বুঝিয়াছে ঐ ত আমার আদরিণী মা এলো। অঙ্গন সুশোভিত বিচিত্র আলেপনে গৃহভিত্তি কত সুন্দর, মণ্ডপের দ্বারে দ্বারে ধ্বজপতাকার অপূর্ব্ব বিন্যাস, গৃহ গৃহ ফুলেফলে পত্রেমাল্যে পবিত্র নানা দ্রব্য-সম্ভারে পরিপূর্ণ। কত কত বিচিত্র বাল্যাপুলেপনপরিচ্ছদে দেহ পবিত্র করিয়া গৃহস্থ আজ মায়ের পূজার জন্য কত ব্যস্ত,—কত ব্যগ্র।

কে এ মা? মা কি সত্য সত্যই আসেন?—তা আবার জিজ্ঞাসা কর? এ মা—তোমার আমার, দেবদানবগন্ধর্ব্ব, যক্ষরাক্ষস, কীটপতঙ্গ, বৃক্ষলতা জল বাতাস, সকলের মা।—অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কারিণী—জগজ্জননী ভুবনেশ্বরী। দেখ দেখি চণ্ডীমণ্ডপ আলোকিত করিয়া মুকুটোজ্জ্বল জটাজুটধারিণী, ত্রিনয়না, দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা, অতসীপুষ্পবর্ণাভা ঐ যে মা দাঁড়াইয়া। ভক্তের প্রাণের ব্যাকুলতায় মা কি না আসিয়া থাকিতে পারেন? মা আমার পরব্রহ্ম-স্বরূপিণী। দেব্যুপনিষদে মাই বলিতেছেন, "অহং-ব্রহ্মস্বরূপিণী"। মা আমার নিরাকারা হইয়াও সাকারা,—অমূর্ত্তা হইয়াও, নিত্যা হইয়াও, জগন্মূর্ত্তি ("নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তি স্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।" শ্রীশ্রীচণ্ডী)। মা আবার

বিরাটে জগন্মূর্ত্তি—দ্যৌকিরীটিনী, নক্ষত্রমেখলা, চন্দ্রসূর্য্যাগ্নি-নয়না হইয়াও, দেবতাদের কার্য্য সাধন করিতে, দুষ্কৃতের দমন করিয়া তাঁহার একান্ত ভক্তজনগণকে রক্ষা করিতে,—সর্ব-শক্তিময়ী মা আমার—নিজ অলৌকিক মায়াশক্তি অবলম্বন করিয়া দেহীর মত হইয়া আবির্ভূতা হয়েন। ("দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং আবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে নিত্যাপি সাপ্যভিধীয়তে।"—শ্রীশ্রীচণ্ডী।) ভক্ত চায় তাঁর নিজের মত করিয়া তাঁকে পাইতে, নিজের মত করিয়া সব দিয়া সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সেবা করিতে। তাই মা ভক্তের জন্য ভক্তের মনের মত হইয়া আসেন। গোড়ায় এরই তাঁকে মাই বল আর বাবাই বল, তিনি আসেন। ("ভক্ত চিত্তানুসারেণ জায়তে ভগবান্ অজঃ।") আসিয়া ভক্তের প্রাণভরা সেবা গ্রহণ করিয়া ভক্তকে কৃতার্থ করেন। রাজারাণীর প্রাণের ডাকে বিশ্বজন-মোহিনী বিশ্বরাণী গৌরী মা আমার গিরিরাজমহিষী মেনকার গর্ভ সম্ভূতা। অহঙ্কারদৃপ্ত ইন্দ্রাদিদেবগণের সম্মুখে মা আসিলেন,—"উমা হৈমবতী" আকাশে আবির্ভূতা হইয়া দেবগণের বিজয়গর্ব্ব চূর্ণ করিলেন। অন্তর্ণক্ষির কন্যা,—ব্রাহ্মী; মা তাহার আত্মার আত্ম-স্বরূপে স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। ঋষিকন্যা বুঝিলেন স্বরূপে তিনি মাই। (দেবীসূক্ত)। যখনই জীব বিপন্ন হইয়া, অনন্যশরণ হইয়া মায়ের শরণ লয় তখনই মা আসেন। মায়ের সন্তানের প্রতি এত করুণা—এত অনুগ্রহ। বড় বিপন্ন রাজ্যভ্রষ্ট রাজা সুরথ। বড়ই লাঞ্ছিত স্বজনপরিত্যক্ত বৈশ্য সমাধি। মাতৃতত্ত্বজ্ঞ মহামুনি মেধস বলিলেন, তোমরা মায়ের শরণ লও। ভোগের জন্য তাঁকে ডাকিলে যাহা চাও তাহাই পাইবে। আর চিরতরে দুঃখের হাত হইতে মুক্তি চাও ত মা তাহাই দিবেন। ("সৈষাপ্রাধিতা নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা" শ্রীশ্রীচণ্ডী)। মধুকৈটভভীত্যাতুর ব্রহ্মার ডাকে মা মহাকালী মূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়া ব্রহ্মাকে রক্ষা করিলেন। মহিষাসুরলাঞ্ছিত স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাগণের দুঃখে করুণাময়ী মা প্রত্যেক দেবদেহ হইতে আবির্ভূতা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী মহিষমর্দ্দিনী। মা দেবতাদিগকে অসুরের হাত হইতে রক্ষা করিলেন। শুম্ভ নিশুম্ভের অত্যাচারে প্রপীড়িত দেবগণের স্তবে কৌশিকী রূপে মনোমোহিনী মূর্ত্তিতে অসুরকুল ধ্বংস করিলেন। মা যে ভক্ত সন্তানের জন্য নিজেই রণোন্মাদিনী হইয়া ভক্তকে রক্ষা করেন। ("সমদং কৃণোম্যহং" শ্রীশ্রীদেবীসূক্ত)। আর উন্মার্গগামী, জগতের অকল্যাণকারী, মায়ের অসুর সন্তানগণকে—শস্ত্রাঘাতে তাহাদের অসুর দেহ ধ্বংস করিয়া— পবিত্র করিয়া লয়েন। মা যে পরম কল্যাণকারিণী কল্যাণময়ী সর্ব্বমঙ্গলা। আজ সেদিনও মা আমার 'তনয়ারূপেতে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া।' মা আমার দক্ষিণেশ্বরের ব্রাহ্মণসন্তানের সঙ্গে কত না কথা কহিয়াছেন। আরও কত শত সহস্র ভাগ্যবান্ কত শত সহস্ররূপে মাকে পাইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন। কয়জনের কথা বা জানা যায়, কয়জনে বা প্রকাশ করে! নানা জাতিতে নানারূপে না স্বীয় লীলা প্রকাশ করেন।—মা সত্যসত্যই আসেন। সমকালে স্বরূপে নিরাকারা, স্বীয় মায়াশক্তিতে জগন্মূর্ত্তি মা—অবতীর্ণ হইয়া দুর্গা, কালী নানারূপে জগৎ রক্ষা করেন। আবার প্রতি জীবহৃদয়ে মাই আত্মস্বরূপা। শ্রুতি, পুরাণ, ইতিহাস ভক্তগণ সকলেই বলিতেছেন—সাক্ষ্য দিতেছেন—মা আসেন, সত্যসত্যই আসেন।—আসিয়া জীবের দুঃখ দূর করেন।—আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য, এমন মা থাকিতে আমাদের দুঃখ দৈন্য যায় না। আমরা মাকে ডাকি না, মায়ের পূজা ঠিক ঠিক করি না। তাই মায়ের কৃপায় বঞ্চিত আমাদের দুঃখের অবধি নাই।

ঐ বোধনের বাদ্য বাজিয়া উঠিয়াছে, এস না সকলে প্রাণমন ঐক্য করিয়া, গোবৎস যেমন গাভীকে ডাকে, শিশু যেমন জননীর জন্য কাঁদিয়া আকুল হয়, তেমনটি করিয়া প্রাণ মন বাক্য সব এক করিয়া—মাকে ডাকিয়া মাকে জাগাও দেখি। বল 'বড় দুঃখে বড় জ্বালায় ভুগিতেছি, অন্ন নাই বস্ত্র নাই, স্বাস্থ্য নাই, নাই বলিতে কিছুই যে নাই। মা এস; এস মা দুঃখ দূর কর। সন্তানের দুঃখ মা ছাড়া কে দূর করিবে? বড়ই অসহায় আমরা। যার কেহ নাই তুমি আছ তার। চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি মা জাগ। অন্তর্য্যামিণি, প্রকাশিতা হও। তিথি নক্ষত্র যোগে কালস্বরূপিনী মা মহাসপ্তমী মহাঅষ্টমী মহানবমীরূপে সমাগতা। কল্যাণময়ীর করুণা লাভ করিতে চাওত এই শুভমুহূর্ত্তে মায়ের শরণ লও। চিৎসাগরে মিশিতে চাওত এই শুভলগ্নে কালস্রোতের টানে আপনাকে মিশাইয়া দাও। পৃথিবীব্যাপী ধ্বংস-লীলা, পৃথিবীব্যাপী হাহাকার। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কত শত দুঃখ আজ জীবের। এস, আমরা সর্ব্বশক্তিময়ী মাকে ডাকি। মায়ের কৃপায়—জগতে শান্তি আসিবেই! যাঁর ইচ্ছায় লোকক্ষয়কারী ধ্বংসলীলা, তাঁরই ইচ্ছায় শান্তি আসিবে।

ডাকিতে ত ইচ্ছা করে, ডাকিতে ত পারি না। আমার বাক্য মনপ্রাণ ত কলিকল্মষকলুষিত। নিজের কাছে ত আর কিছু গোপন নাই। প্রাণে মনে ব্যাকুল হইয়া ডাকার মত যোগ্যতাও ত আমার নাই। বড় দীন আমি। কেমন করিয়া মাকে ডাকিব? কেমন করিয়া মাকে পূজা করি তাহাত জানিনা; কি দিয়া পূজা করি? আমার যে কিছুই সম্বল নাই। —তাতে তোমার চিন্তা কি? মা যে অকিঞ্চন ধন রে। যারা ভাবে, 'আমরা পূজা করি, বা পূজা করিতে পারি,' তাদের বৃথা দম্ভ। দেহ মন বুদ্ধি—'আমিত্ব' পর্য্যন্ত সবই মায়ের দেওয়া। সন্তানের নিজস্ব বলিতে কি আছে বলত? যেটুকু শক্তি তিনি দিয়াছেন সেই টুকু দিয়াই এস মাকে ডাকি। মা যে আমার বিশ্বরাণী। মায়ের অফুরন্ত ভাণ্ডারে কিসের অভাব? রাজকোষের নানারত্নের আভরণে দাসদাসীগণ রাজরাণীকে নানা সাজে সজ্জিত করে, রাজভাণ্ডারের চর্ব্বচোষ্যলেহ্যপেয় খাদ্যদ্রব্যে রাজদম্পতির তৃপ্তি বিধান করে, রাজপ্রাসাদের অপূর্ব্ব শয্যারচনায় নানা উপচারে রাজরাণীর মনোরঞ্জন করে। এই প্রকারে সেবাদ্বারা রাজদম্পতির প্রসন্নতা লাভ করিয়া রাজকৃপায় তাহাদের সর্ব্বার্থসিদ্ধি লাভ হয়। জগন্মাতা বিশ্বেশ্বরীর সন্তান আমরা; এস, আমরাও মায়ের দ্রব্যে মায়ের পূজা করিয়া কৃতার্থ হই।

মাকে পূজা করিতে বল, আমিত মাকে দেখি নাই পূজা করিব কেমন করিয়া? —আরে, মাকে পাবার জন্যইত পূজা। যাঁহারা মাকে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের দেওয়া মায়ের রূপের অপূর্ব্ব বর্ণনা, অপূর্ব্ব লীলার অমৃতময়ী কথা—শাস্ত্রমুখে, মহাজনমুখে জানিয়া লও। অচিন্ত্যমূর্ত্তি, অচিন্ত্যশক্তি মা, অব্যক্ত হইয়াও ভক্তের আকুল আহ্বানে শুদ্ধসত্ত্বের চিন্ময়ীমূর্ত্তিতে ভক্তজন-মনমোহন করিয়া প্রকটিত হয়েন। কায়মনোবাক্য পবিত্র করিয়া সর্ব্বজনহৃদ্‌বিহারিণীকে আপনার হৃদয়-কন্দরে ধ্যাননেত্রে নিরীক্ষণ কর। মানসকল্পনায় মন যাহা দিতে চায়, মন যতদূর দিতে পারে ততই তত উপচারে মনে মনে মায়ের অর্চ্চনা কর। বাহিরে মায়ের মৃন্ময়ীমূর্ত্তিতে ভাবের তীব্রতায় ধ্যানের গাম্ভীর্য্যে মায়ের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া মায়ের দেওয়া পত্রেপুষ্পে, ফলেজলে, নানা উপচারে মায়ে পূজা কর। রাজা সুরথ, বৈশ্যসমাধি,—মহামুনি মেধসের অনুগ্রহে মায়ের তত্ত্ব অবধারণ করিয়া,

মায়ের মৃন্ময়ীমূর্ত্তি রচনা করতঃ—কখন নিরাহারে, কখন মিতাহারী হইয়া, সর্ব্বদা তন্মনস্ক থাকিয়া,— মনেপ্রাণে মায়ের ভাবে বিভোর হইয়া—পত্রপুষ্প, ফলজল, ধূপ দীপ নানা উপচারে—তিন বৎসর ব্যাপিয়া অনন্যমনে মায়ের অর্চ্চনা করিতে করিতে মায়ের প্রসন্নতা লাভ করিয়াছিল। সুরথ ও সমাধির ভাগ্যে মায়ের দেখা মিলিয়াছিল। তুমিও তেমনি ভাবে কায়মনোবাক্য পবিত্র করিয়া এই শুভ মুহূর্ত্তে মাকে ডাক দেখি। মায়ের প্রসন্নতা মিলিবেই।

মায়ের কথা ভাবিতে ভাবিতে ভক্তের হৃদয় ভরিয়া গিয়াছে, হৃদপদ্মে জগদম্বার যোড়শমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভক্ত দেখিতেছেন,—জ্যোতির্চ্ছটায় চিত্তাকাশের দশদিক্ আলোকিত করিয়া হাস্যময়ী জটাজুটধারিণী ত্রিনয়না সিংহবাহিনী অসুরমর্দ্দিনী করুণার্দ্রনয়নে ভক্তের প্রতি চাহিয়া আছেন। আনন্দ বিহ্বল সাধক শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধ তন্মাত্রার মাকে সাজাইয়া তৃপ্ত করিয়া 'মনঃ'পুষ্প মায়ের শ্রীচরণে অর্পণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মা, জন্ম জন্ম কত দুঃখে জলিয়াছি। বড় সাধ, তোর স্বরূপে স্থিতিলাভ করিয়া মায়ের কোলে চির বিশ্রাম লাভ করি। এই আমার "অহং"কার তোমার সঙ্গে চিরব্যবধান করিয়া রাখিয়াছে। অন্তর্য্যামিনী মা আমার, এই 'অহং'টিকে তুমি গ্রহণ কর। আমি তোমার হইয়া ধন্য হইয়া যাই।" —মায়ের অপূর্ব্বস্পর্শে ভক্তের অন্তঃকরণ আপ্যায়িত হইয়াছে। পুলকে রোমরাজি কণ্টকিত, ভক্তের চক্ষে অশ্রুধারা। ভক্তের দৃষ্টি বহির্ম্মুখে প্রবাহিত হইতেই দেখে চণ্ডীমণ্ডপ আলো করিয়া মা সম্মুখে। "মা আসিয়াছ, 'কি দিয়া পূজিব তোমায় কি আছে আমার'? ছেলে খেলার মত আমি তোমার বিশ্বভাণ্ডারের তোমার দেওয়ার ফলমূল পত্রপুষ্প যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু, তোমার দেওয়া শক্তিতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি; মা, করুণাময়ি, তোমার ভক্তসন্তানের প্রতি কৃপা করিয়া তাহা তুমি গ্রহণ কর। এতেই আমাদের দুর্ভাগ্য দুর্দ্দশা, একটু বিশুদ্ধ ঘৃত, শর্করা, মধু যে তোমাকে দিব তাহারও উপায় নাই। মহামূল্য রত্নরাজি কোথায় পাইব। সামান্য বসন ভূষণ আজ সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না তুমি ত সবই জান, সবই দেখ। মা প্রসন্ন হও। মা তুমি মহামহিমময়ী; অবোধ ছেলের পূজাত ধূলাখেলা। হে মায়ের কৃতী সন্তানগণ, তোমরা আমার সহায় হও। তোমরা যুগে যুগে মাকে দেখিয়াছ, মাকে ডাকিয়াছ; আজিও দেখ, আজিও ডাক। হে ব্রহ্মা বিষ্ণুরুদ্র, দেবদানবগন্ধর্ব্ব, যক্ষরাক্ষসকিন্নর, মহর্ষিদেববিসিদ্ধগণ, সূর্য্যচন্দ্রমাসঋতুসংবৎসর, নদীপর্ব্বতসাগর, যে যেখানে আছ তোমরা আসিয়া আমার মাকে স্নান করাও, মাকে সাজাও, মায়ের আরতি কর, মায়ের অর্চ্চনা কর। ক্ষুদ্র আমি, তোমাদের অর্চ্চনা দেখিয়া দেখিয়া কৃতার্থ হই। আর তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার যৎকিঞ্চিৎ উপচারে মায়ের অর্চ্চনা করিয়া দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক করি। 'মা, আমি অকিঞ্চন, তোমার দেওয়া মনপ্রাণ দিয়া, তোমার দেওয়া উপচারে, তোমারই প্রতিমা অবলম্বনে তোমার এই পূজা মা, তুমি গ্রহণ কর। আমি ত আর কিছু পারি না। আমার অপরাধ ক্ষমা কর।' চতুরানন ব্রহ্মা, ভাগ্যবান্ ঋষিগণ, শরণাগত দেবগণ তোমার কত কত স্তব করিয়াছেন। মূর্খ আমি। আমি তোমার মাহাত্ম্য কি শুনাইব তোমাকে। আমি তোমারই দেওয়া বাক্যে তোমারই বড় প্রিয় সপ্তশতী মহামন্ত্রে (শ্রীশ্রীচণ্ডী) তোমার লীলা তোমার কাছে পাঠ করিতেছি। তুমি শ্রবণ কর, তুমি প্রসন্ন হও। 'দেবি, প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ। প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।" মা, আমাকে

তোমার করিয়া লও। তোমার শ্রীচরণে প্রপন্ন হইবার প্রবৃত্তি, প্রপন্ন হইবার শক্তি দেও মা। মা মহাবিদ্যে, তোমার মোহিনী মায়ার মুগ্ধ আমরা, তোমার মহাদেবী ভাব বিস্মৃত হইয়া, তোমার আসুরীমূর্ত্তির সেবা করিয়া বড়ই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। তুমি ত সকল দুঃখ দূর কর মা। "দুর্গোত্তারিণী দুর্গে ত্বং"। "মাতঃ প্রসীদ"। হিংসা-দ্বেষে জর্জ্জরিত পৃথিবীর কামোপভোগপরায়ণ নরনারী-কুলীহের বহ্নিস্তূপে পতঙ্গের ন্যায় ধ্বংসমুখে ছুটিয়াছে। অস্ত্রদর্পের প্রপীড়নে লোক সকল "ত্রাহি" "ত্রাহি" আর্ত্তনাদ করিতেছে। এই দুর্দ্দিনে, সর্ব্বকল্যাণকারিণী সর্ব্বমঙ্গলা তুমি, তুমি ছাড়া কে আমাদিগকে রক্ষা করিবে? মা ত্রাণ কর, বিশ্বকে রক্ষা কর। 'ত্রাহি দুর্গে বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বম্।' যে তোমার শরণ লয় সেই দীন সন্তানকে, সেই আর্ত্তজীবকে, তুমি ত্রাণ কর; ইহাই তোমার স্বভাব। আমাদের আর্ত্তি, সকলের আর্ত্তি হরণ কর মা। অক্ষম আমরা কি আর করিতে পারি মা? আমাদের বুদ্ধি শুদ্ধদিকে পরিচালিত কর। তোমার শ্রীচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছি। মা তুমি প্রসন্ন হও।

"শরণাগত দীনার্ত্ত পরিত্রাণ পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

উপনদী

(উপন্যাস)

শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য

(১)

নদী তাহাকে বলা যায় না। উপনদী বা শাখানদী—শীর্ণজলধারায় তাহার উদ্দাম চঞ্চলতা জাগে না। গতির মাঝে তাহার কোন তরঙ্গোচ্ছ্বাস নাই। একই ধারায় শীর্ণ নদীটি বহিয়া চলিয়াছে কিন্তু ইহারই বুকে নাকি একদিন জোয়ার ভাঁটার গতিপ্রবাহ ছিল। পূর্ণিমার জোয়ারে প্লাবনের ঢেউ জাগিত। বন্যাপ্রবাহে অনেকবার নাকি গ্রাম ভাসাইয়াছে—ভাঙ্গনের ক্ষুধায় অনেক ঘরবাড়ি গ্রাস করিয়াছে।

সে কথা এখন উপকথা! বর্ত্তমানে সে নদী মজিয়া আসিয়াছে।

সুলেখার জীবন কথাও তাহাই। নারী—অথচ নারীর আদর্শ সংস্কার তাহার নাই। হৃদয়াবেগের যে চঞ্চলগতি উদ্দাম থাকিলে আজ তাহাকে ঘর সংসারের মাঝে আদর্শ ঘরণীরূপে মানাইত, ছেলেপুলের মাঝে সংসারধর্ম সাজাইয়া স্বামীকে অনুশাসনে বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারিত—সোনাদানায় বাড়ি-গাড়িতে বহু নারীর ঈর্ষার কারণ হইতে পারিত—স্বেচ্ছায় সে সুখ-সৌভাগ্যকে সে বর্জন করিয়া যৌবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া আজ সে এই উপনদীরই সামিল হইয়াছে। তাহার রুদ্ধ জীবনস্রোতে এখন আর জোয়ারের প্লাবন জাগে না। তবুও সন্ধ্যার

ধূসরতার এই মজিয়া-আসা নদীর তটরেখায় বসিয়া দিগন্তের সূর্য্যাস্তের পানে তাকাইয়া মনটা তাহার বিষণ্ণ হইয়াই ওঠে।

তবুও এই একটিক্ষণই তাহার দৈনন্দিন জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত। গোধূলির রক্তরাগে এইখানে আসিয়া দিনান্তে একবার সে আত্ম-উপলব্ধির বিশেষ একটা আমেজকে উপভোগ করে। মন তাহার করুণায় ভরিয়া উঠে; উঠুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই; তবুও তাহার মাঝে যেন একটা প্রচ্ছন্ন দুঃখ বিলাস আছে। তাহার ব্যর্থ জীবনের বিশেষ একটি করুণ সুর-মূর্চ্ছনা বিষণ্ণ চিত্তকে তাহার মধুর তৃপ্তির আমেজে ভরাইয়া তোলে।

সুলেখার এই সেন্টিমেন্ট্যালিটিকে লইয়া আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক এবং জড়বাদী সাহিত্যের যুগে এমন করিয়া রঙ ফলাইবার প্রয়োজন কি? হয়ত সে সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিবে। সুলেখার সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে হইলে এগুলি বাদ দিলে চলিবে না। অতীতের পটভূমির উপর না আঁকিলে তাহার বর্ত্তমান রূপও পরিস্ফুট হইবে না।

সুলেখা শিক্ষিতা—হাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী তাহার আছে—ইচ্ছা করিলে এই বয়সেও তাহাকে স্মার্ট সাজাইয়া আলোকোজ্জ্বল দু'একটি নাগরিক ড্রইংরুমে বসাইয়া দু'একখানি উদাসী রবীন্দ্রসংগীত গাওয়ানো চলে—তাহার এ্যানিমিক্ দেহযষ্টি ঘিরিয়া এখনও হয়তো যন্ত্রের ঝঙ্কারধ্বনি গুঞ্জরিয়া উঠিতে পারে। পঁয়ত্রিশ বছরের ঘুণধরা মন এবং অবসাদক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত অজীর্ণ দেহের মাঝেও হয়ত সে এখনও নূতন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিতে পারে—পুরাতন পৃথিবীকে অবজ্ঞা করিয়া নতুন সভ্যতার সংজ্ঞা দিতে পারে—"Chastity means passion—chastity means neurasthenia. And passion and neurasthenia means instability. And instabilitty means the end of civilization. You can't have a civilization without plenty of pleasant vices"

বুদ্ধিপ্রধান সমাজে সুলেখার এইরূপ হওয়াই উচিত ছিল—হাঁ আমিও মনে করি সুলেখা এইরূপ হইলে আমার অন্ততঃ কিছু সুবিধা হইত। সুলেখার জীবনকাহিনী আঁকিতে অনেকটা স্বস্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিতাম—কিংবা সুলেখা যদি কোন সিনেমা অভিনেত্রী হইত—পঁয়ত্রিশ বছরের বিগতযৌবনা নারী সুলেখাকে লইয়াও তাহা হইলে রঙিন কোন কাহিনীর অবতারণা করিতে পারিতাম—কিন্তু আমার নিতান্তই দুর্ভাগ্য সুলেখা ইহাদের কোনটিই হইল না।

অথচ সুলেখা এতদিন নাগরিক জীবনই যাপন করিয়াছে; বহু ঈর্ষিত দৃষ্টির মাঝে চলাফেরা করিতে করিতে বহু দীর্ঘশ্বাসের বোঝা কুড়াইয়া নারীগর্ব অনুভব করিয়াছে। চেহারায় যত না হোক্ বেশভূষায় ছিল তাহার অতি মাত্রায় স্মার্টনেস। চারবছর কলেজী জীবনে বহু তরুণ সহপাঠীকে সে শুধু তাহার শাড়ীর রঙে ঘায়েল করিয়াছে। ইহার পর আবার সংগীতকলায়ও ছিল তাহার পারদর্শিতা। ইনাইয়া বিনাইয়া রবীন্দ্রসংগীত গাহিতে এবং পূরবী ও মুলতানে সেতারের সুরঝংকারে পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি করিতেও এমন কিছু অক্ষমতা তাহার ছিল না। সে বয়সটা সুলেখার কাছে ছিল যেন একটা হালকা হাওয়ার ঝলক—আকাশের গায়ে সঞ্চরণশীল একটুকরো রঙিন মেঘ। প্রেম! হাঁ প্রেমেও পড়িয়াছে সে কত নতুন ঢঙে—প্রেমকরা, মন দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার সুলেখার সমাজে ছিল একটা অত্যন্ত সাধারণ রীতি—কিংবা তাহাকে বলা যায় একটি বিশেষ ভঙ্গী বা ষ্টাইল্। অসংখ্য

প্রেমপত্র সে লিখিয়াছে এবং পাইয়াছে; শেষকালে এমনতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল যাহাকে এককথায় বলা চলে অত্যন্ত "হ্যাক্‌নিড্"।

কিন্তু সে গেল পূর্বেকার সুলেখা। সেদিন জীবনে তাহার ছিল বন্যার প্লাবন—জীবননদীতে তখন তাহার জোয়ার ভাটার গতি ছিল—আজ কিন্তু সে নদী মজিয়া আসিয়াছে।

সুলেখাকে লইয়া আজ আর সে কথা বলা যায় না। ম্যাটিহরি দেখিয়া যে সুলেখা সন্দীপকে বলিয়াছিল একদিন—One day you will know me something more than a woman. হারিৎ চ্যাটার্জির বিবাহের প্রস্তাবকে যে সুলেখা ঘৃণা প্রকাশ করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল—Marrige! How silly!

হারিৎ বলিয়াছিল, কিন্তু সু, বিয়েই ত হচ্ছে প্রেমের বিকাশ!

সুলেখা ভ্রূকুঞ্চনের মাঝে সে কথা উড়াইয়া দিয়াছিল, what rot!

হারিৎ একটু উচ্ছ্বাসপ্রবণ এবং সেকেলে কবি। অক্ষর গুণিয়া কবিতা লিখিয়া ছন্দ বৈচিত্র্যে প্রাচীন-পন্থীদের মাঝে তখন সে বেশ নাম কিনিয়াছে এবং বাপের লোহার ব্যবসায়ের অংশীদাররূপে ধনীমহলে কিছুটা সুনামও অর্জ্জন করিয়াছে—কিন্তু তাই বলিয়া বিবাহ? ওইরূপ একটা ইডিয়টিক্ চেহারা যাহার তাহাকে কিনা সুলেখা করিবে বিবাহ? তাহার চেয়ে বরঞ্চ আত্মহত্যা সহজ।

হারিতের 'উইলিস্ নাইট'টার প্রতি বরঞ্চ সুলেখার লোভ আছে—আর্মান 'এ্যালসেসন এলাভনকে'ও সে সহ্য করিতে পারে—কিন্তু ওই রিপালসিভ্ কবি হারিৎ—অসহ্য!

সে কথা থাক্, সে হইতেছে লরেটোর পড়া নতুন-যুগের তরুণী তন্বী সুলেখা। সে সুলেখার সহিত আজিকার সুলেখার কোন মিল নাই।

আমি বর্ত্তমান গ্রাম্যস্কুলের হেডমিষ্ট্রেস্ সুলেখার কথা বলিতেছি। বয়স যাহার পনের হইতে আজ পঁয়ত্রিশে পৌঁছাইয়াছে—দেহনদীতে জোয়ারের প্লাবন যাহার রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে—চোখের কোণে নামিয়াছে যাহার ক্লান্তির গাঢ় অবলেপ—দেহমনে অবসাদের বোঝা—আমি সেই সুলেখার কথা বলিতেছি।

সুলেখা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে—নগরীর পিচঢালা রাজপথ ছাড়িয়া গ্রামের রাঙামাটির পথে শান্তপদক্ষেপে বিচরণ করে—দিন পাঁচ ছয় ঘণ্টা ধরিয়া ইংরাজী গ্রামার এবং ইতিহাস, ভূগোল পড়াইয়া দিনের অন্ন সংগ্রহ করে। অতীত তাহার জীবনের এক বিস্মৃতির অংশ। শান্ত সন্ধ্যায় কর্ম্মান্তে প্রতিদিন সে শুধু একবার এই মজানদীর তীরে আসিয়া বসে। বর্ত্তমান জীবনের শুধু এই একটি মুহূর্ত—এই মুহূর্তটুকুর মাঝে সে নিজের সত্তাকে অনুভব করিবার চেষ্টা করে শুধু।

গ্রামটিকে সুলেখার মন্দ লাগে নাই। পল্লীগ্রাম বলিতে যে কুৎসিত আবহাওয়ার কথা মনে হয়—এ গ্রামটি সেরূপ নয়। অন্ততঃ আজ কয়েকটি বছর ধরিয়া বহু জায়গায় ঘুরিয়া ফিরিয়া সুলেখার ওই জায়গাটিকে অপেক্ষাকৃত ভালোই লাগিয়াছে।

বহুস্থানে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবার কালে বহু অভিজ্ঞতা সুলেখা অর্জন করিয়াছে। কোথাও সেক্রেটারীর সহিত হাসিয়া কথা না কহিলে শিক্ষয়িত্রীর অনেক গলদের অনেক ত্রুটির কথা বিশ্লেষণ করা হয়—কোথাও প্রেসিডেন্টের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না গেলে

চাকরি রাখা দায় হয়—কোথাও বা অধিকবয়স পর্যন্ত অবিবাহিত জীবনের প্রতি হীন কটূক্তি প্রকাশ করা হয়—এমনি বহুতর জীবন-সংগ্রামের সহিত সুলেখা ঠোকর খাইয়াছে—কিন্তু ছ'মাসের কর্মজীবনে এখানে তেমন কিছু দুর্ঘটনা ঘটে নাই।

তবে এখানে ঘনিষ্ঠভাবে কাহারও সহিত সুলেখার পরিচয় নাই—পরিচিত হইতেও সে চাহে না আর। কিন্তু সেদিন কেমন করিয়া না জানি সুলেখার পঁয়ত্রিশ বছর জীবনের গতিরও আবার মোড় ঘুরিল। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়াই আজিকার সুলেখার জীবনের নূতন আখ্যায়িকা সুরু হইল।

(২)

সেদিন সন্ধ্যায় সুলেখা নদীর ধার হইতে বেড়াইয়া বাড়ি ফিরিতেছিল, পথে একজন আসিয়া অত্যন্ত আকস্মিকভাবে তাহার সহিত যাচিয়া আলাপ করিল।

প্রথমে সুলেখা খানিকটা বিস্মিত হইয়াছিল এবং শুধু ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াই তাহাকে এড়াইতে চাহিয়াছিল—কিন্তু লোকটির যে কী স্বভাব চট্ করিয়া এত সপ্রতিভতা প্রকাশ করিয়া বসিল যে সুলেখার পক্ষেও তাহাকে এড়াইয়া চলা দুষ্কর হইয়া উঠিল।

—নমস্কার—আমাকে চিনতে পারেন লেখা দি? লোকটি সুলেখার পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল।

সুলেখা অবশ্যই প্রতিনমস্কার জানাইল। বিস্মিত হইল সুলেখা।

—লেখাদি? স্মরণের গ্রন্থি ইদানিং তাহার এতই শিথিল হইয়া আসিয়াছে যে বহু চেষ্টা করিয়াও চিনিতে সে কিছুতেই পারিল না। অপরিচিত কহিল—আমি সঞ্জয়ের বন্ধু—সহপাঠী—অশোক মিত্তির—মনে পড়েছে আপনার?

সুলেখা ক্ষীণ হাসিয়া বিস্মৃতির কথা স্মরণ করিল। সঞ্জয় তাহার ছোট ভাই—ডাক্তারী পড়িত। সঞ্জয় আজ ছয় বছর গত হইল মারা গেছে। হ্যাঁ—মনে পড়িতেছে বটে, ছেলেটি বার কয়েক তাহাদের বেলতলার বাড়িতে আসিয়াছে। সেই ফুটফুটে ছেলেটি—অশোক মিত্তির—হ্যাঁ বেশ মনে পড়িতেছে তাহার। বয়সের গাম্ভীর্যে যদিও আজ তাহার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটিয়াছে—তবু মুখখানির কমনীয়তা আজও যেন সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা রাখে।

সুলেখা কহিল—হ্যাঁ মনে পড়ছে বটে—অনেকদিনের কথা—আর চেনবার উপায় নেই। কিন্তু আপনি এখানে? আপনি তো সুইন্‌হো ষ্ট্রীটে থাকতেন না?

অশোক মিষ্টি হাসিয়া স্বীকৃতি জানাইল।

—কিন্তু আপনি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করছেন কেন? আমি আপনার ছোট ভাইয়ের বন্ধু—আমাকে অশোক বললেই খুসি হবো।

সুলেখা আপত্তি প্রকাশ করিল না।

—তুমি এখানে? এটা কী তোমার দেশ নাকী?

অশোক কহিল—না—এখানে নতুন চাকরি নিয়েছি। ইউনিয়নবোর্ডের ডাক্তার—এখানে বদলি হয়ে এসেছি। কাল আপনার প্রিয় ছাত্রীর মুখে আপনার নাম শুনলুম—আর পরিচয় পেলুম। আমার কিন্তু চিনতে একটুও কষ্ট হয় নি।

—আমার প্রিয় ছাত্রী?

—হ্যাঁ—আমার পেসেন্ট মুন্না।

—ওঃ—সুলেখা আর একবার হাসিল—সত্যি বড় চমৎকার মেয়ে—স্কুলের ভেতর ওর জোড়া আর কেউ নেই।

—ও বিশু আপনার ভারী ভক্ত।

—বটে!

—আমি কিন্তু আপনার বাড়ির কাছেই থাকি—ওই দত্তদের বার বাড়িটা হচ্ছে আমার কোয়ার্টার।

—এখানে আর কে আছেন?

—কে আবার থাকবে? একেবারে একা। বদিন এমন বোরিং লাগ্‌ছিল।

—বিয়ে থা করো নি বুঝি?

সুলেখার এ প্রশ্নে অশোক যেন একটু লজ্জা অনুভব করিল—পরক্ষণেই বেশ শান্তস্বরে কহিল—না—ও বন্ধন আমার ভালো লাগে না—তার চেয়ে এই বেশ আছি। কিন্তু আপনি এমন নির্বাসনদণ্ড নিলেন কেন? একা এই অজ পাড়াগাঁয়ে কেমন করে কাটাচ্ছেন?

সুলেখা এ প্রসঙ্গে একটু অস্বস্তিবোধ করিল। এ কথার কোন উত্তর না দিয়া কহিল—চলো, যাওয়া যাক্; কাজ নেই তো এখন?

না—কেন বলুন তো?

আমার বাড়ী একটু চা খেয়ে যাবে।

অশোক বিশেষ আপ্যায়িত হইল। বলিল—বেশ—চলুন যাই।

তারপর দু'জনে চুপচাপ। সুলেখার মধ্যে কোন চাঞ্চল্য নাই। দীর্ঘদিন এই একক নিরবচ্ছিন্নতার মাঝে আকস্মিক অশোকের এই আবির্ভাব, ইহাতে তাহার কিছুমাত্র বৈষম্যের কিম্বা বৈচিত্র্য বোধের ভাব নাই প্রতিদিন যেমন একলা বেড়াইয়া বাড়ি ফেরে আজও যেন ঠিক তাহাই। অশোকের অস্তিত্বকেই সে অনুভব করিতে পারিতেছে না।

আর অশোক—এই নির্বান্ধব পুরীর মাঝে দু'দিনেই যেন হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। তাহার সামাজিক জীবন অত্যন্ত অস্বস্তিবোধ করিতেছিল—হঠাৎ পুরাতন পরিচয়ের ক্ষীণ সূত্রটি ধরিয়া লেখাদির সহিত নূতন করিয়া আত্মীয়তা পাতাইতে এখন যেন তাহার আর উৎসাহের সীমা নাই।

সুলেখা নীরব—গম্ভীর পদক্ষেপে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে।

অশোক মনে মনে কেবল নূতন কথার মালা গাঁথিতেছে আর কোন্ কথা কেমন করিয়া বলিলে শোভনতর হইবে—কোন্ কথার মাঝে আজিকার সম্পর্কের ভিত্তি ভবিষ্যতের দৃঢ়তা এবং আত্মীয়তার সৃষ্টি করিবে তাহার পরিকল্পনা করিতেছে।

হাঁ—অশোকের মনে পড়িতেছে—বেশ স্পষ্টভাবে মনে পড়িতেছে লেখাদির সাহিত্য-প্রীতি অতিমাত্রায় ছিল—অতি আধুনিক সাহিত্যের প্রতি লেখাদির অনুরাগ খুবই বেশী। সঞ্জয় তাহার প্রথম পরিচয় দিয়াছিল তাহার দিদির নিকট—সাহিত্যিক এবং কবি বলিয়া।

লেখাদি তাহার লেখা পড়িতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। অশোক আবিষ্কার করিয়াছে—সাহিত্য-প্রসঙ্গে লেখাদি'কে আবার সে আপন জন করিয়া লইবে। খুসির আমেজে অশোকের মন ভরিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

পদার্থের রূপান্তর

শ্রীতারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এম্-এস্-সি

প্রাচীনকালে যাঁহারা কিমিয়া বিদ্যা আলোচনা করিতেন তাঁহাদের চেষ্টা ছিল কি উপায়ে লৌহকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করা যায়। এমন একটা কিছুর সন্ধানে তাঁহারা ছিলেন যাহার স্পর্শে নিকৃষ্ট ধাতু স্বর্ণে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু এই "পরশ-পাথর" তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগারে এই "পরশ-পাথর" জন্মলাভ করিয়াছে। ইহার নাম সাইক্লোট্রন। ইহার দ্বারা লৌহকে স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব। এখানে একথা বলা আবশ্যক যে লৌহ হইতে স্বর্ণ উৎপাদন করাই এই যন্ত্রের সার্থকতা নহে।

জড় বস্তুর উপাদান সম্বন্ধে ভারতীয় দার্শনিকগণ সর্ব্বপ্রথম চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে মাটি, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটি জড়ের উপাদান এবং কার্য্যকারণের বশে ইহাদের মিলনে বিচিত্র বিশ্ব সৃজিত হইয়াছে। এই চারিটি উপাদানের পরমাণুসমূহ নিত্য এবং অবিভাজ্য।

গ্রীক দার্শনিকগণের মতেও জড় পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণাসমূহ দ্বারা গঠিত। সেই জন্য এই কণার নাম Atom (যাহা ভাগ করা যায় না) বা পরমাণু। পরমাণুর মিলনের ফলেই জড়জগতের উদ্ভব হইয়াছে। অবশ্য গ্রীকদার্শনিকদের এই তত্ত্বের পিছনে কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ছিল না। ইহা তাঁহাদের অনুমান মাত্র।

এ বিষয় সর্ব্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হইতেছে জন ডালটনের পরমাণুবাদ। ডালটনের মতে পরমাণু অবিভাজ্য এবং দুই বা ততোধিক পরমাণুর মিলনের ফলে অণু (Molecule) গঠিত হয়। যদিও পরমাণু খালি চোখে এমন কি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেও দেখা যায় না (কারণ আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষা পরমাণুর আকার ক্ষুদ্রতর) তবুও পরমাণুর অস্তিত্ব একটা অবিসংবাদী সত্য। ইহার ভর (Mass) স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং বিভিন্ন মৌলিক পদার্থে পরমাণুর অবস্থান কিরূপ তাহাও জানা গিয়াছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে স্যার উইলিয়ম ক্রুকস্, অধ্যাপক জে, জে, টমসন প্রভৃতি বিজ্ঞানীর পরীক্ষার ফলে জানা গেল যে পরমাণুও অবিভাজ্য নহে এবং পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন নামে এক অতি সূক্ষ্ম কণিকা বর্ত্তমান। সুতরাং পরমাণুই যে জড়ের সূক্ষ্মতম উপাদান, ডালটনের এই মত উঠিয়া গেল। এ সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। ইংলণ্ডের কোন একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তাঁহার ছাত্রদের সমক্ষে পরমাণু বিষয় এক বক্তৃতা দিতেছিলেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল এই যে পরমাণু অবিভাজ্য। একজন ছাত্র হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "মহাশয়! জানেন কি যে পরমাণু ভাঙ্গা হইয়াছে; ইহা আর অবিভাজ্য নহে?" অধ্যাপক উত্তর দিলেন, "অসম্ভব! তাহা হইতে পারে না। Atom এই গ্রীকশব্দের অর্থ যাহা অবিভাজ্য এবং পরমাণুকে atom বলা হয়। সুতরাং পরমাণুকে কি প্রকারে ভাঙ্গা যাইতে পারে?" ছাত্রটি উত্তর দিল, "মহাশয়! গ্রীকভাষা জানিবার উহাই বিপদ।"

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রি বেকোরেল য়ুরেনিয়ম নামক খনিজ পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান। তিনি দেখিতে পান যে য়ুরেনিয়মকে অন্ধকার ঘরে ফটোপ্লেটের নিকটে রাখিলে ফটোপ্লেটে আলোক রশ্মির ন্যায় রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে। ইহার পর কুরী দম্পতি পিচ্‌ব্লেণ্ড নামক এক প্রকার খনিজ প্রস্তর পরীক্ষা করিয়া য়ুরেনিয়মের অনুরূপ একটি পদার্থ পান। ৮ টন পিচ্‌ব্লেণ্ড হইতে পাঁচ বৎসর পরিশ্রমের ফলে তাঁহারা এক গ্রাম পরিমাণ ঐ পদার্থ পাইলেন। তাঁহারা ইহার নাম দিলেন রেডিয়ম। ইহার তেজস্ক্রিয়তা (radio activity) য়ুরেনিয়ম হইতে বহুগুণে বেশী। অধ্যাপক রাদারফোর্ড রেডিয়ম দ্বারা পরীক্ষা করিয়া রেডিয়ম হইতে নির্গত তিন প্রকার রশ্মির সন্ধান পাইলেন। ইহাদিগকে আলফা, বিটা ও গামা রশ্মি বলা হয়। আলফা রশ্মিকে রশ্মি না বলিয়া কণা বলা উচিৎ। প্রত্যেক আলফা কণিকায় ৪টি প্রোটন ও ২টি ইলেকট্রণ আছে। প্রোটনের বিদ্যুৎ ধনাত্মক (positive) এবং ইলেকট্রণের বিদ্যুৎ ঋণাত্মক (negative) কিন্তু বিদ্যুতের পরিমাণ সমান। প্রোটনের ভর ইলেকট্রণের ভর অপেক্ষা প্রায় দুই হাজার গুণ বেশী। এক একটি প্রোটনের ভর এক ধরা হয় এবং ইলেকট্রণ ভরশূন্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। সুতরাং একটি আলফাকণিকার ভর ৪, কারণ ইহাতে ৪টি প্রোটন আছে এবং ইহার বিদ্যুৎ ধনাত্মক (৪টি প্রোটনের ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ ৪ এবং দুইটি ইলেকট্রণের ঋণাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ ২ ; সুতরাং আলফাকণিকার বিদ্যুতের পরিমাণ ২ এবং বিদ্যুৎ মোটের উপর ধনাত্মক)। প্রত্যেকটি বিটা কণিকা এক একটি ইলেকট্রণ। এই ইলেকট্রণ প্রতিসেকেণ্ডে লক্ষ মাইল বেগে রেডিয়ম হইতে নির্গত হইতেছে। গামারশ্মি রঞ্জনরশ্মির মতই একপ্রকার তরঙ্গ কিন্তু ইহা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন। ১২ ইঞ্চি পুরু লৌহ-পাতকে এই রশ্মি অনায়াসে ভেদ করিয়া যায় এবং ইহার গতি আলোর গতির সমান। রেডিয়মের পরমাণু এইরূপে আপনা হইতেই নিজকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে এবং প্রতি সেকেণ্ডে সংখ্যাতীত প্রোটন ও ইলেকট্রণ তীব্র বেগে নির্গত হইয়া আসিতেছে। ঐ সঙ্গে গামা রশ্মিও বাহির হয়। এইরূপে তেজ বিকীরণ করিয়া রেডিয়ম সীসকে পরিণত হয়। রেডিয়ম, য়ুরেনিয়ম বা যে কোন তেজস্ক্রিয় (Radio-active) পদার্থের পরমাণু এরূপভাবে গঠিত যাহার ফলে এই সমস্ত পরমাণু আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া যায়। এবং আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানীর হাতে এমন কোন ক্ষমতা আসে নাই যাহা দ্বারা ইহাদের তেজস্ক্রিয়তা বাড়ান বা কমান যায়।

প্রায় ১৩ বৎসর পূর্ব্বে আর একটি কণিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বোথে এবং গাইগার নামক দুইজন পদার্থবিদ্ তেজস্ক্রিয় পোলোনিয়ম হইতে নির্গত কণিকা দ্বারা বেরিলিয়ম ধাতুকে আঘাত করিয়া দেখিলেন যে বেরিলিয়ম পরমাণু হইতে এমন একপ্রকার কণিকা বাহিরে আসিতেছে যাহার ভর প্রোটনের সমান কিন্তু এই কণিকা তড়িৎবিহীন। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে প্রোটন ও ইলেকট্রণের ন্যায় ইহা মৌলিক কণিকা নহে। একটি প্রোটন এবং একটি ইলেকট্রণের অত্যন্ত সন্নিহিত অবস্থানের ফলে একটি নিউট্রণের জন্ম হয়। সেই কারণে ইহা তড়িৎশূন্য এবং ইহার ভর প্রোটনের সমান।

পৃথিবীতে মোট ৯২টি মৌলিক পদার্থ বর্ত্তমান এবং প্রত্যেক পদার্থই কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। এই

পরমাণুসমূহের গঠনবৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া জানা যায় যে তিন প্রকার কণিকা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পরমাণু গঠিত। এই তিন কণিকা হইতেছে—প্রোটন, নিউট্রণ ও ইলেকট্রণ। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে একটি প্রোটন এবং প্রোটন হইতে কিছু দূরে একটি মাত্র ইলেকট্রণ নির্দ্দিষ্ট কক্ষে তীব্রবেগে প্রোটনকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সুতরাং হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন এক এবং ইহা তড়িৎশূন্য। কোনরূপে পরমাণু হইতে ইলেকট্রণ সরাইয়া নিলে ইহার বিদ্যুৎ ধনাত্মক হয়—অপর পক্ষে যদি বাহির হইতে একটি ইলেকট্রণ পরমাণুতে প্রবেশ করে তবে ইহার বিদ্যুৎ হইবে ঋণাত্মক। হাইড্রোজেনের পরবর্ত্তী গুরুতর পদার্থ হিলিয়ম। ইহার কেন্দ্রক (Neucleus) দুইটি প্রোটন ও দুইটি নিউট্রণ দ্বারা গঠিত এবং বিভিন্ন কক্ষে দুইটি ইলেকট্রণ কেন্দ্রককে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং হিলিয়ম পরমাণুর ভর ৪ এবং বিদ্যুৎপরিমাণ শূন্য। এইরূপে বিভিন্ন পরমাণু বিভিন্ন সংখ্যক প্রোটন, নিউট্রণ ও ইলেকট্রণ লইয়া গঠিত। পরমাণুর মূল উপাদান এই তিন প্রকার কণিকা। প্রত্যেকটি পরমাণুতে যত সংখ্যায় প্রোটন ঠিক তত সংখ্যায় ইলেকট্রণ থাকে। পরমাণুর অধিকাংশ স্থানই ফাঁকা। অতি সামান্যমাত্র স্থান প্রোটন, নিউট্রণ ও ইলেকট্রণ অধিকার করিয়া আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে একজন সাধারণ মানুষের শরীরের সমস্ত প্রোটন, নিউট্রণ ও ইলেকট্রণ যদি এমনভাবে ঠাসিয়া একত্র করা যায় যাহাতে ইহাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র ফাঁক না থাকে তবে ইহারা একত্রীভূত হইয়া এত ক্ষুদ্র হইবে যে অত্যন্ত শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হইবে না।

পরমাণুর ভর প্রোটন ও নিউট্রণের সংখ্যার উপর নির্ভর করে—বহিস্থ ইলেকট্রণ শুধু পরমাণুর বিভিন্ন গুণ বা ধর্ম্ম স্থির করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পারদ ও স্বর্ণের তুলনা করিয়া দেখা যায় যে পারদের পরমাণুতে কেন্দ্রকের বাহিরে অর্থাৎ বহিস্থ ইলেকট্রণের সংখ্যা ৮০টি এবং স্বর্ণে ৭৯টি। এখন যদি কোনরূপে পারদ হইতে একটি প্রোটন ও একটি ইলেকট্রণ সরাইয়া লওয়া হয় তবে পারদ স্বর্ণে রূপান্তরিত হইতে পারে। ইলেকট্রণকে সহজেই উত্তাপ বা বিদ্যুৎ-ক্ষেত্রের সাহায্যে সরান যায় কিন্তু মুস্কিল হইতেছে কেন্দ্রস্থ প্রোটন সরান। ইহাকে স্থানচ্যুত করাই ছিল বিজ্ঞানীর সমস্যা। সম্প্রতি ইহার সমাধান অনেক সহজ হইয়া পড়িয়াছে।

সাধারণতঃ আমরা যে সমুদয় মৌলিক পদার্থ দেখিতে পাই তাহার কেন্দ্রকের প্রোটন আপনা হইতে কখনও স্থানচ্যুত হয় না। কিন্তু য়ুরেনিয়ম, রেডিয়ম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় ধাতুর কেন্দ্রকের প্রোটন, নিউট্রণ আপনা হইতে তীব্রবেগে বাহির হইয়া আসিতেছে এবং ফলে ধাতুর রূপান্তর ঘটিতেছে। কেন্দ্রকের প্রোটনের সংখ্যা ৮৪টির বেশী হইলেই প্রোটন আপনা হইতে কেন্দ্রক ত্যাগ করে। প্রায় সমস্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থে ৮৪ অপেক্ষা অধিক সংখ্যক প্রোটন আছে। কেন্দ্রে প্রোটন সংখ্যা যত বেশী হয় ততই প্রোটনগুলি পরস্পরের বিকর্ষণের ফলে কেন্দ্রকচ্যুত হইতে চাহে, স্থায়ী ভাবে থাকিতে পারে না। সেই জন্য ৯২টির বেশী প্রোটন লইয়া কেন্দ্রক গঠিত হইলে বিকর্ষণ এত প্রবল হয় যে এরূপ কেন্দ্রক স্বল্প সময়ের জন্যও টিকিতে পারে না। এই কারণে কেন্দ্রকে ৯২টির বেশী প্রোটন আছে এরূপ কোন পরমাণু জানা নাই। ৮৪ হইতে ৯২টি প্রোটন থাকিলে সেরূপ পরমাণুর কেন্দ্রকে ভাঙ্গন লাগিয়াই থাকে। কেন্দ্রকে অবস্থিত প্রোটন ও ইলেকট্রণ (পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রকে প্রোটন ও নিউট্রণ থাকে

কিন্তু প্রোটন ও ইলেকট্রণের একত্র সন্নিবেশের ফলে নিউট্রণ উৎপন্ন, সুতরাং কেন্দ্রকে ইলেকট্রণ আছে একথা বলা চলে) প্রচণ্ড শক্তিবলে একত্রিত থাকে। যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন ইহারা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় লক্ষ মাইল গতিতে ছুটিয়া বাহির হয়। সেই জন্যই এই ধাবমান প্রোটন কোন পরমাণুর উপর গিয়া পড়িলে পরমাণু কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া দিতে পারে। এই গতিশক্তিই রেডিয়ম বা অন্য কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তার কারণ। প্রোটন এবং ইলেকট্রণ নির্গত হইবার ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ রূপান্তরিত হয় এবং নির্গত প্রোটন এবং ইলেকট্রণ কোন পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে সেই পরমাণুরও এইরূপে ভঙ্গ এবং ধর্ম্ম বদলাইয়া যায় অর্থাৎ ইহা অন্য পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হয়। এইরূপে এক পদার্থকে অন্য পদার্থে পরিণত করা যাইতে পারে।

কেন্দ্রকে প্রোটন আছে বলিয়া ইহার বিদ্যুৎ ধনাত্মক। একটি অমিত বেগশালী প্রোটন যখন কোন পরমাণুর কেন্দ্রকের দিকে ছুটিয়া নিকটে যায় তখন উভয়ের মধ্যে বিকর্ষণ ঘটিবে, কাজেই প্রোটনের কেন্দ্রক পর্য্যন্ত পৌঁছিবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। রেডিয়ম হইতে নির্গত আলফাকণিকা দ্বারা রাদারফোর্ড এলুমিনিয়ম, নাইট্রোজেন প্রভৃতি পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়াছেন বটে, কিন্তু রেডিয়ম বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় না এবং ইহা অত্যন্ত মূল্যবান। আবার রেডিয়ম হইতে যদি ১০০ কোটি কণিকা নির্গত হয় তবে হয়ত একটি কণিকা পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করে যদি নির্গত প্রোটনের বেগ বৃদ্ধি করা যায় তবেই অধিক সংখ্যক প্রোটন কেন্দ্রকে আঘাত করিবে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বোথে এবং গাইগার নামক দুইজন বৈজ্ঞানিক নিউট্রণ আবিষ্কার করেন। এই নিউট্রণকে বেগযুক্ত করিতে পারিলে কেন্দ্রক ভাঙ্গা সহজ, কারণ ইহা তড়িৎশূন্য। কাজেই বিকর্ষণ ঘটিবে না। কিন্তু নিউট্রণ পাইতে হইলে আগে কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা বেরিলিয়ম ধাতুর পরমাণুকে ভাঙ্গিতে হইবে (বেরিলিয়ম ধাতু হইতে নিউট্রণ অপেক্ষাকৃত সহজে পাওয়া যায়)। সুতরাং নিউট্রণ পাওয়া গেলেও সমস্যার সমাধান হইল না।

কয়েক বৎসর হইল ব্যোমরশ্মি (cosmic rays) নামে একপ্রকার রশ্মি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা রঞ্জনরশ্মির মতই, তবে লক্ষ লক্ষ গুণ শক্তিশালী। এমন কোন বস্তু নাই যাহা ভেদ করিয়া এই রশ্মি চলিয়া যাইতে না পারে। সম্ভবতঃ সূর্য্য এবং উত্তপ্ত নক্ষত্রে এই রশ্মির জন্ম। সেখান হইতে ইহা পৃথিবীতে আসিতেছে। বৈজ্ঞানিক মিলিকান অনুমান করিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ নিউট্রণ দ্বারা এই রশ্মি গঠিত। বৈজ্ঞানিক জীন্‌সের মত ইহা কোন একপ্রকার তরঙ্গ। এক ব্যক্তি মিলিকানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কোন্ মতবাদটি খাঁটি তাহা জানিতে চাহেন। মিলিকান একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উত্তর দিলেন, "তিনি (অর্থাৎ জীন্‌স্) একরকম বলেন, আমি আর একরকম বলি। আসলে আমরা কেহই কিছু জানিনা।"

উপরের আলোচনা হইতে বোঝা গেল যে যদি কোন উপায়ে প্রোটনের বেগ বৃদ্ধি করা যায় তবে পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙ্গা সহজ হইবে। অধ্যাপক ই, ও, লরেন্স তাঁহার উদ্ভাবিত সাইক্লোট্রণ যন্ত্রে এমন প্রবলগতিসম্পন্ন প্রোটন উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছেন যাহা দ্বারা শুধু পদার্থবিজ্ঞানই নহে, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানেও যুগান্তর আসিয়াছে।

. এই আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি নোবেল . পুরস্কার লাভ করেন।

চারপাঁচটি লৌহ খণ্ড পরস্পর সাজাইয়া একটি বিদ্যুৎচুম্বক প্রস্তুত করা হয়। লৌহখণ্ডগুলিকে বাঁকাইয়া ইংরাজি C অক্ষরের মত আকৃতি দেওয়া হয় যাহাতে দুই প্রান্তের মধ্যে প্রায় ১০ ইঞ্চি পরিমাণ ফাঁক থাকে। এই লৌহখণ্ড কয়টির ওজন ৬০।৭০ টন। চুম্বকের দুই প্রান্তে বাক্সের ঘেরাটোপে তামার তারের কুণ্ডলী রাখা হয়। এই তারের ওজন ৯ টন। সাধারণতঃ তেলের মধ্যে এই তার বসান থাকে। এই তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিলে লৌহখণ্ডটি চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। চুম্বকের দুই প্রান্ত বা মেরুর মধ্যস্থানের ফাঁকা জায়গায় একটি ফাঁপা বাক্স আছে। এই বাক্সের মধ্যে ইংরাজী D অক্ষরের ন্যায় দুইটি অর্দ্ধবৃত্তাকার ফাঁপা বাক্স বসান আছে। বাক্স দুইটি এরূপে বসান যে ইহাদের সরল পার্শ্ব পরস্পরের সম্মুখীন থাকে এবং উভয়ের মধ্যে সামান্য ফাঁক থাকে। যে বাক্সের মধ্যে এই D বাক্স দুইটি আছে তাহা হইতে বাতপাম্পের সাহায্যে সমস্ত বাতাস বাহির করিয়া ফেলা হয়।

একটি ইলেকট্রনকে যদি দুই প্লেটের মধ্যবর্ত্তী তড়িৎক্ষেত্রের মধ্যে রাখা হয় তবে ইহা ঋণাত্মক প্লেট হইতে ধনাত্মক প্লেটের দিকে ছুটিবে। ক্ষেত্রটি ৪ ভোল্ট বিভবযুক্ত হইলে ইলেকট্রণের গতিবেগকে বলা হয় ৪ ইলেকট্রণ ভোল্ট। সেইরূপ ১০০ ভোল্ট বিভবযুক্ত ক্ষেত্রে ১০০ ইলেকট্রণ ভোল্ট বেগযুক্ত ইলেকট্রণ পাওয়া যায়। পরমাণুর কেন্দ্রক ভাঙ্গিবার জন্য প্রায় কোটি ইলেকট্রণভোল্ট বেগসম্পন্ন কণিকা প্রয়োজন। সোজাসুজি উপায়ে এত বেশী ভোল্টের বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় না। লরেন্স তাঁহার সাইক্লোট্রণ যন্ত্রে ধাপে ধাপে একটি প্রোটন বা ইলেকট্রনকে কোটি বেগ ভোল্ট দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

D বাক্স দুটিকে দশসহস্র ভোল্ট বিভবের পার্থক্যে রাখা হয়। মনে করা যাক যে একটি প্রোটন কণিকাকে দুই D বাক্সের মাঝের ফাঁকা জায়গায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আছে বলিয়া প্রোটনটি ধনাত্মক D বাক্স হইতে ঋণাত্মক D বাক্সের দিকে দশসহস্র ভোল্ট বেগে ছুটিবে। বাক্স দুইটি আবার শক্তিশালী চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রহিয়াছে। প্রোটনটি একটি D বাক্সের অভ্যন্তরে যাওয়া মাত্র বাক্সের একপ্রান্ত হইতে বৃত্তাকারে ঘুরিয়া অন্য প্রান্ত দিয়া বাহিরে আসিবে এবং পুনরায় দুই বাক্সের মাঝের ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হইবে (তড়িৎগ্রস্ত কণিকা চুম্বকের আকর্ষণে বৃত্তাকারে ঘুরে এবং D বাক্স দুটির ভিতর ফাঁপা বলিয়া সেখানে তড়িৎ-ক্ষেত্রের কোন প্রভাব নাই)। যে মুহূর্ত্তে কণিকাটি ফাঁকা জায়গায় আসে সেই মুহূর্ত্তেই বাক্স দুটির তড়িৎবিভব উল্টাইয়া দেওয়া হয়। ফলে আগে যে D বাক্সটি ঋণাত্মক ছিল তাহা এখন ধনাত্মক এবং ধনাত্মকটি হইল ঋণাত্মক। ফলে প্রোটন কণিকাটি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে আবার D বাক্সে প্রবেশ করে এবং চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে বৃহত্তর বৃত্তে ঘুরিয়া আসিয়া পুনরায় ফাঁকা জায়গায় উপস্থিত হয়। পুনরায় তড়িৎবিভব উল্টাইয়া দেওয়া হয় এবং কণিকাটি আরও অধিক বেগে D বাক্সে প্রবেশ করে। এইরূপে প্রতি ধাপে ধাপে কণিকাটিকে বেগসম্পন্ন করা হয়। হিসাবে মোটামুটি দেখা গিয়াছে যে কণিকাটির বেগ একবার ঘুরিয়া আসিলে ২ গুণ, দুইবারে ৪ গুণ, তিন বারে ৬ গুণ হয় এবং যে বৃত্তে ইহা ঘুরে তাহার ব্যাসও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অবশেষে বাক্সের শেষপ্রান্তে একটি জানালার (window) মধ্যদিয়া

প্রায় কোটি ইলেকট্রনভোল্ট বেগে বাহিরে আসে। এখন ঐ আধারের নিকট যদি কোন পদার্থ রাখা যায় তবে এই প্রচণ্ডগতিসম্পন্ন প্রোটন ঐ পদার্থের পরমাণুর কেন্দ্রকে আঘাত করিয়া ইহার রূপান্তর ঘটাইতে পারে এবং ইহাকে তেজস্ক্রিয় করিতে পারে। সাইক্লোট্রণ সাহায্যে যেমন তড়িৎগ্রস্ত কণিকার বেগ বৃদ্ধি করা যায় তেমনি অগণিত কণিকাও পাওয়া যায়।

আমেরিকার ওয়াশিংটনে অবস্থিত কার্ণেগি ইনষ্টিট্যুশনে যে সাইক্লোট্রণ নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সাইক্লোট্রণ। এই সাইক্লোট্রণের ওজন ২২৫ টনের বেশী, উচ্চতা ১২ ফিট, দৈর্ঘ্য ৩০ ফিট এবং প্রস্থ ২০ ফিট। ৪টি লৌহখণ্ডে ইহার চুম্বক নির্ম্মিত এবং সম্পূর্ণ চুম্বকটির ওজন ১২০ টনের কাছাকাছি। D বাক্সের ব্যাস প্রায় ৬০ ইঞ্চি এবং ইহাতে ১৩৪ অশ্বশক্তির বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করা হয়। মাটির দশফুট নীচে একটি ঘরে এই যন্ত্র বসান হইয়াছে যাহাতে ইহা হইতে নিক্ষিপ্ত কণিকা লোকের গায়ে না পড়ে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে ইঁদুরের গায়ে এই কণিকা সমূহ আঘাত করিলে ইঁদুর মরিয়া যায়। যাঁহারা এখানে কাজ করেন তাঁহারা এক বিশেষ প্রকার পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত হইয়া এই ঘরে প্রবেশ করেন। অত্যন্ত শক্তিশালী বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করা হয় বলিয়া দরজার সঙ্গে এরূপভাবে সুইচ্ সংলগ্ন থাকে যে সাইক্লোট্রণে কাজ চলিবার সময় যদি কেহ বাহির হইতে দরজা খোলেন তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়। যন্ত্রটির নির্ম্মাণকার্য্যে ৪ বৎসর সময় লাগিয়াছে এবং যে ঘরে ইহা স্থাপন করা হইয়াছে সেই ঘর নির্ম্মাণের খরচা, সাইক্লোট্রণের মূল্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যাপারে মোট ব্যয় হইয়াছে পনের লক্ষ টাকা। কলিকাতায় বিজ্ঞানকলেজে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার তত্ত্বাবধানে এরূপ একটি যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।

সাইক্লোট্রণ সাহায্যে সাধারণ অনেক পদার্থকে তেজস্ক্রিয় করা হইয়াছে। অবশ্য এই তেজস্ক্রিয়তা অতি সামান্য সময় ধরিয়া থাকে; অঙ্গার, সোডিয়ম, আয়োডিন, ফস্ফরাস্, লৌহ, গন্ধক, ক্যালসিয়ম প্রভৃতির পরমাণুকে সাইক্লোট্রণ হইতে নির্গত কণিকাদ্বারা আঘাত করিয়া তেজস্ক্রিয় করা যায় এবং ফলে এই সমস্ত পদার্থ হইতে গামা রশ্মি ও ইলেকট্রণ নির্গত হয়। এইরূপে তেজস্ক্রিয় করিয়া এই পদার্থসমূহ আমাদের নানা কাজে লাগান যাইতে পারে।

সোডিয়ম ধাতুকে প্রোটন কণিকাদ্বারা আঘাত করিলে সোডিয়ম তেজস্ক্রিয় হয় এবং ইহাকে রেডিও-সোডিয়ম বলা হয়। ইহা যেন "কৃত্রিম রেডিয়ম"। কিন্তু রেডিয়ম দুই হাজার বৎসর ধরিয়া তেজ বিকীরণ করে, আর রেডিও-সোডিয়মের তেজস্ক্রিয়তা পনের ঘণ্টায় অর্দ্ধেক পরিমাণ হ্রাস পায়। তাহা হইলেও ইহার ব্যবহারিক সার্থকতা আছে। কোন ব্যক্তিকে যদি তেজস্ক্রিয় রেডিয়ম ঘটিত কোন খাদ্য খাওয়ান যায় তবে তাহার দেহের যে কোন অংশে কণামাত্র রেডিও-সোডিয়ম থাকিলেও যন্ত্রদ্বারা সেই অংশে তাহার অবস্থান ধরা যাইবে। এই উপায়ে দেহাভ্যন্তরে খাদ্যের ক্রিয়া কিরূপে ঘটিতেছে তাহা জানা যায়। তেজস্ক্রিয় সোডিয়মফস্ফেট্ আহার করাইয়া পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে প্রাণীদের এমন কি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রাণীদেরও মস্তিষ্কের অণুকোষ সমূহ ক্রমাগত নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। তেজস্ক্রিয় ক্যালসিয়ম শরীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে আমাদের শরীরের অস্থি নিয়তই ক্ষয় এবং পূরণ হইতেছে। তেজস্ক্রিয় লবণ আহার করিলে সেই লবণ দশমিনিটের

মধ্যে শরীরের সমস্ত অণুকোষগুলিতে ছড়াইয়া পড়ে। এক কথায় দেহের অভ্যন্তরের কার্য্যপ্রণালী যেন চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

রেডিয়মদ্বারা ক্যানসার রোগ আরোগ্য হয়। ইহার কারণ জীবাণুদুষ্ট তন্তু বা অণুকোষসমূহ রেডিয়ম-নিঃসৃত কণিকার আঘাতে দোষমুক্ত হয়। এই চিকিৎসার দুইটি প্রধান অসুবিধা। প্রথমতঃ এই প্রণালীতে চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ দেহের বহিরাংশে ক্যানসার হইলে তাহার উপর রেডিয়ম প্রয়োগ করা চলে। দেহের অভ্যন্তরে ক্যানসার হইলে যদি খানিকটা রেডিয়ম দেহের মধ্যে রাখা হয় তবে ক্যানসার রোগ সারিয়া যাইতে পারে কিন্তু রেডিয়ম বেশী সময় ধরিয়া শরীরের মধ্যে থাকিলে নিঃসৃত কণিকাসমূহ দেহের সুস্থাংসপেশী ক্ষত-বিক্ষত করিয়া রোগীর মৃত্যু ঘটাইতে পারে। এইরূপ রোগীকে যদি খানিকটা রেডিও-সোডিয়ম সেবন করান যায় তবে রেডিও-সোডিয়ম তেজ বিকীরণ করিয়া (অর্থাৎ ইলেকট্রণ ও গামারশ্মি নির্গত করিয়া) ক্যানসার আরোগ্য করিবে এবং কয়েক ঘণ্টা পর আপনা হইতে ম্যাগনেসিয়মে পরিণত হইবে। ম্যাগনেসিয়ম শরীরের কোন ক্ষতি করে না এবং রেডিও-সোডিয়মও যে কয় ঘণ্টা ধরিয়া তেজ বিকীর্ণ করে তাহাতে দেহের সুস্থ অংশের কোন ক্ষতি হয় না। রেডিও-সোডিয়মদ্বারা চিকিৎসার খরচও কম। একমাত্র অসুবিধা এই যে ইহার তেজস্ক্রিয়তা কয়েক ঘণ্টা মাত্র থাকে। সুতরাং রেডিও-সোডিয়ম প্রস্তুত হইবার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর উপর প্রয়োগ করিতে হইবে।

সাইক্লোট্রণ দ্বারা পদার্থের রূপান্তর ঘটাইতে পারা যায় এবং ইহার সাহায্যে লৌহকে স্বর্ণে পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু ইহাতে খরচ এত বেশী পড়িবে এবং উৎপাদনের হার এতই কম হইবে যে এই উপায়ে কেহ স্বর্ণ উৎপন্ন করিতে চাহিবে না।

শক্তি জড়ের রূপান্তর মাত্র। সাধারণতঃ যে উপায়ে আমরা জড় হইতে শক্তি পাই তাহাতে জড়ের অতি সামান্যমাত্র অংশই শক্তিতে পরিবর্ত্তিত হয়। যদি একটু করলার সমস্তটাই শক্তিতে পরিণত করা যায় তাহা হইলে তদ্দ্বারা একটী বড় জাহাজ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে পারে। বিজ্ঞানী এখনও এমন কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই যাহার দ্বারা জড়ের সমস্তটাই শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। পরমাণুকেন্দ্রকে প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি রহিয়াছে। কেন্দ্রক ভাঙ্গিয়া গেলে এই শক্তি বাহির হইয়া আসে। তাপ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি যেরূপ কাজে লাগান যায় কেন্দ্রকের শক্তিকে এখনও সেইরূপ ইচ্ছামত ব্যবহারোপযোগী করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। সাইক্লোট্রণের মধ্যে সেই সম্ভাবনা নিহিত আছে এবং হয়ত ভবিষ্যতে জড়কে সম্পূর্ণরূপে শক্তিতে পরিবর্ত্তিত করা যাইবে।

পরিচয়

(গল্প)

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

চিত্রকর ভাস্করের বয়সের চেয়ে তার খ্যাতি তাকে অনেকখানি জীবনের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। তার জীবনের পথ রাজপথের মতোই বিস্তৃত ও জনবহুল। ভাস্করের বয়সের যারা তাদের অনেকেই এখনো সে পথের সন্ধান জানে না।

সে শিল্পী। সৃষ্টির আনন্দে সে প্রভাত হ'তে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সমাহিত হ'য়ে থাকে। সেই তার জীবনের আনন্দ, সঞ্চয় ও অপচয়। জীবনের অপচয় সে করতে পারে কিন্তু খ্যাতি বা ঐশ্বর্য্যের জন্য শিল্পের ব্যভিচার সে করেনি কোনদিন। সে জাতশিল্পী, সে সাধক। অন্ধকারের অতলে ব'সেও তার সাধনার নিয়মনিষ্ঠার ব্যত্যয় ঘটেনি কোনদিন।

তার ছিপ্‌ছিপে লম্বা গড়নের চেহারা, বয়স কুড়ি হ'তে বাইশের মধ্যে, নবযৌবনের দীপ্তি ধারালো ইস্পাতের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে তার সাড়া দেহে। মুখচোখের দৃঢ়তা বয়সের চেয়ে তার গাম্ভীর্য্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। তার ইঙ্গিতে আভাসে, কটাক্ষে হাসিতে প্রতিভা স্ফুরিত হ'য়ে ওঠে।

কাজ, কাজ, কাজ! সারাদিন সে নিজেকে কাজের মাঝে ডুবিয়ে রাখতে চায়। কাজের মাঝে ডুবে যেন সে বিশ্বসংসারকে ভুলতে চায়। নিজের সৃষ্টির গভীরে সে নিজেকে ও নিজের আসন্ন যৌবনকে ডুবিয়ে দিতে চায়।

ভাস্করের বিগত জীবনের ইতিহাস অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ঘোলাটে। বিস্মৃতির ধ্বংসস্তূপে তা চাপা পড়ে আছে। স্মৃতির আবর্জ্জনা সরিয়ে সে লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করবার সময় তার প্রচুর নয়। পূর্ণ পরিস্ফুট শিল্পীর মন নিয়ে সদাই সে নিজের ধেয়ানে মগ্ন হ'য়ে থাকে। কী যে সে ভাবে, সে নিজেই জানে না। বাইরের কাজ ছাড়া সে সর্বক্ষণই নিজেকে ষ্টুডিওর মাঝে আবদ্ধ ক'রে রাখে। আত্মীয় স্বজন নেই, বন্ধু বান্ধব নেই, সংসারে আপন জন বলতে তার কেউ নেই। প্রয়োজন ভিন্ন সে কথা বলে কম। মডেল বা সহকারীরা তার গাম্ভীর্য্যকে সম্মান করে। তরুণী মডেলরা মুগ্ধবিস্ময়ে তার প্রিয়দর্শন মুখের পানে অপলকে চেয়ে থাকে। রহস্যালাপ করতে সাহসে কুলোয় না।

জ্ঞান হ'য়ে পর্য্যন্ত ভাস্কর এমনি নিঃসঙ্গ, এমনি একা! নিঃসঙ্গতার সমুদ্রে গা ভাসিয়ে সে শিল্পীর চোখ দিয়ে সূর্য্যোদয় দেখেছে—আকাশের বুকে নবারুণের বিকাশ দেখেছে। জীবনে সঞ্চয় ক'রেছে অফুরন্ত আলো, জীবনের সকল প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করবার মতো অজস্র শক্তি। জীবনের প্রথম হ'তেই সে অভাবনীয় পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে নিজের শক্তিতে স্বচ্ছন্দে বড় হ'য়ে উঠেছে। যার প্রভাবে, যার অনুকম্পায় সে মানুষ হ'য়ে উঠেছে তিনি সংসারী হ'য়েও সন্ন্যাসী, তিনি অসাধারণ প্রকৃতির মানুষ। তিনি দেশসেবক, দরিদ্রের বন্ধু, তিনি রামকৃষ্ণ চৈতন্যের মতো সাধক তিনি গান্ধীভক্ত, তিনি দুঃসাহসী বিপ্লবী! তাঁরই আ অনুপ্রাণিত হ'য়ে ভাস্কর নিজের জীবনকে গড়ে তুলে

তাই এই নিঃসঙ্গতার মাঝে তার উদ্দাম যৌবন অনিয়ম উত্তেজনায় উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে ওঠেনি। শিল্প ছাড়া তাকে আর সংসারের কোন আকর্ষণই পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। কোন আসক্তিই তাকে জীবনের উন্মাদ আস্বাদে বিভ্রান্ত ক'রে তুলতে পারেনি ব'লেই আজ সে জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পেরেছে।

তার এই একাকিত্বে ব্যর্থতার বেদনা ছিল কিনা তার অন্তর্যামীই জানেন, তবে তার অবসর সময়টুকুতে তার জীবনের আঙিনায় কারুর মৃদু পদধ্বনি উঠতো কিনা কিংবা কারুর গোপন অভিসারের সন্তর্পিত চরণপাতে নূপুরধ্বনি হতো কিনা আমাদের জানা নেই। কারুর বিরহব্যথায় তার কর্মশ্রান্ত মনকে দীর্ঘশ্বাসে ভারী করে তুলতো কিনা তার ইতিহাস জানা নেই। গভীর রাত্রিতে বিছানা আশ্রয় করে সে গাঢ় ঘুমে অসাড় হ'য়ে পড়তো।

এই ছিল ভাস্করের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা!

সেদিন বিকেলের দিকে মডেলকে সামনে বসিয়ে ভাস্কর যখন কাজের মাঝে গভীর ভাবে মগ্ন, দরজার মাথায় ইলেকট্রিক বেলটা ঘড়্ ঘড়্ ক'রে বেজে উঠতেই ভাস্কর চমকে উঠে দাঁড়াল। গভীর বিরক্তিতে মুখখানা ভ'রে গেল। আবার বেল্ বাজলো। মডেলকে ইঙ্গিতে বসতে বলে, ভাস্কর বাইরে গেল।

দরজা খুলতেই ভাস্করের বিস্ময়ের অবধি রইল না। সামনে দাঁড়িয়ে এক সুবেশা সম্ভ্রান্ত-মহিলা!

বিহ্বল-বিস্ময়ে ভাস্কর বলে উঠলো, মিস্ দাশ? আপনি?

মিস্ দাশ স্মিত হাসিতে মুখ ভরে বললেন, হ্যাঁ, নমস্কার! খুব আশ্চর্য হ'চ্ছেন না? আপনাকে দেখতে এলুম। কী হ'য়েছে আপনার?

—কিছু না। আমি তো কোন্ ক'রে আপনাকে জানিয়ে ছিলুম আজ আর যেতে পারবো না—

তেম্নি হাসিতে মুখ ভরে মিস্ দাশ বল্লেন, তাইতো দেখতে এলাম, কী হলো আপনার? অসুখ-বিসুখ করলো নাকি?

হঠাৎ ভাস্করের ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে মিস্ দাশ বললেন, কিন্তু এইখানে এম্নি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আমায় বিদেয় দেবেন নাকি? চলুন তো ভেতরে যাই—

অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে মাথা নীচু ক'রে ভাস্কর দরজাটা খুলে দিয়ে বললে, মাপ করবেন। আসুন, ভেতরে আসুন—

মিস্ দাশ সশব্দে হেসে উঠলো।

ভিতরে এসে ভাস্কর বললে, অসুখবিসুখ কিছু না, আপনি মিছে কষ্ট করলেন মিস্ দাশ! একখানা আর্জেন্ট ছবির কাজ পেয়েচি এক রাজবাড়ী হ'তে। পৌরাণিক ছবি, তাই বাধ্য হ'য়ে আপনার কাছে ক'দিনের ছুটি নিতে হলো—

দেওয়ালে-ঝোলানো ছবিগুলোর পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাইতে চাইতে মিস্ দাশ বললেন, কী ছবি? পৌরাণিক?

মিস্ দাশের অন্যমনস্ক মুখের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ভাস্কর বললে, হাঁ। কৃষ্ণলীলার ছবি—

তাই নাকি? কতটা হলো?

প্রশ্নভরা দৃষ্টি তুলে মিস্ দাশ ভাস্করের মুখের পানে তাকালেন।

ভাস্কর হাসলে। এই তো আজ সবে মডেল সেলেক্ট ক'রে আরম্ভ ক'রেচি।

—মডেল? কই?

ভাস্কর ডাকলে, প্রতিমা!

ভিতরে পর্দার আড়াল ঠেলে, জড়োসড়ো হ'য়ে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো একটি তরুণী। মিস্ দাশ নির্নিমেষে তার মুখের পানে তাকালেন, ব্যথাভরা দৃষ্টি দিয়ে। মেয়েটির মুখখানি সত্যই ছাঁচে-গড়া প্রতিমার মুখের মতই নিখুঁত। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ও ব্যথার বেদনায় সে মুখের জ্যোতি গেছে নিভে, ঝরা ফুলের মতই সে মুখ করুণ, নিষ্প্রভ ও বর্ণমলিন! অলক্ষ্যে একটা দীর্ঘশ্বাসে মিস্ দাশের বুকখানা দুলে উঠ্‌লো।

ভাস্কর ড্রয়ার হ'তে একখানা দশটাকার নোট বের ক'রে মেয়েটির হাতে দিয়ে বললে, আজ তুমি যাও। কাল সকালে কিন্তু ঠিক্ দশটার সময় আসা চাই। রিক্সা নিয়ে চলে আস্‌বে।

মেয়েটি নিঃশব্দে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। মেয়েটি চ'লে গেলে মিস্ দাশ জিগ্‌গেস করলেন, এদের কোথা হ'তে আনেন?

ভাস্কর ম্লান হাসিতে মুখ ভ'রে বললে, এদেরও মিডিলম্যান (Middleman) আছে, তারাই জোগাড় ক'রে আনে।

মিস্ দাশ কপালে চোখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কী আবার ওর টাকা হ'তে বখরা নেয় নাকি?

—সার্‌টেন্‌লি (Certainly), দশটাকার আড়াইটাকা তো নেবেই। নতুন হ'লে বেশীও আদায় করে।

কী সর্ব্বনাশ! আহা!—মিস্ দাশ আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

ভাস্কর হাসলে, আপনারা বড়লোক মিস্ দাশ, আপনারা ঠিক্ বুঝ্‌বেন না ওদের ব্যথা। ব্যথার পাহাড় বুকে ব'য়ে সকাল হ'তে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত পাথরের মতো নিশ্চল হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে আমার সুমুখে, আর আমি ওর অনাবরিত দেহ হ'তে রূপ নিংড়ে নিয়ে ক্যান্‌ভাসের গা রাঙিয়ে দেব। অনাহারের জ্বালা, আমি কিছু কিছু জানি মিস্ দাশ—আপনারা বুঝ্‌বেন না। ও নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

মাথা নীচু ক'রে অনেকক্ষণ মিস্ দাশ নিঃশব্দে ব'সে রইলেন। ভাস্কর লক্ষ্য করলে তার চোখদুটি জলে ভারী হয়ে উঠেছে।

ভাস্কর কথার মোড় ফিরিয়ে বললে, এ ক'টা দিন দয়া ক'রে আমায় ছুটি দিতেই হবে। কাজটা শেষ হ'য়ে গেলেই আবার নিয়মমত আপনার কাজে আমি মন দোব।

মিস্ দাশের ঠোঁটের ওপর আলগোছে একটু হাসি ভেসে উঠ্‌লো। বললেন, তা আমি জানি। বেশ তো এ কাজ শেষ হ'লেই যাবেন। আমার ছবি শেষ হ'তে আর ক'দিন লাগ্‌বে?

ভাস্কর অপলকে তার মুখের পানে চেয়ে বললে, বেশী দিন নয়।

ভাস্কর হঠাৎ মাথা নীচু ক'রে ঢোঁক গিলে বললে, তবে যতো দেরী হয় আমার পক্ষে ততই ভালো—

—কেন?

বিস্ময়ের আতিশয্যে ভাস্করের মুখের পানে বিহ্বল দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে মিস্ দাশ প্রশ্ন করলেন, কেন, দেরী হ'লে আপনার লাভ কিসে? আপনি তো ছুটিয়ে নিয়েছেন।

ভাস্কর পরিপূর্ণ সপ্রশ্ন দৃষ্টি দিয়ে তার মুখের পানে চেয়ে বললে, আমার লাভ, আমি আপনাকে দেখ্‌তে পাবো, কাছে পাবো।

সহসা মিস্ দাশের অন্তরের অন্তরতম দেশে কে যেন সবেগে প্রচণ্ড আঘাত করলে। মুহূর্ত্তে চোখ বুজে নিজের প্রথম বেগটা সামলে নিয়ে স্থিরের প্রদীপ্ত মুখের পানে

চাইলেন। অপরূপ সে মুখের জ্যোতি। অবারিত আকাশের মতো নীলিম, মেঘশূন্য। তার কণ্ঠস্বর সকাতর কান্নার আবেগে তার বুকের মাঝে আছড়ে পড়ল। মিস্ দাশ সাগ্রহে ভাস্করকে সস্নেহে বুকের মাঝে টেনে নিতে চাইলেন। একটা প্রচণ্ড আলোড়নে তার বুকখানা সমুদ্রতরঙ্গের মতো উদ্বেল হয়ে উঠ্‌লো। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে তার মুখের পানে চেয়ে থেকে মিস্ দাশ প্রশ্ন করলেন, আমার আপনার ভালো লাগে মিষ্টার রায়?

ভাস্কর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে ধরা-গলায় বললে, ভালো লাগে? এতো রূপ আমি জীবনে দেখিনি, অথচ অনন্তকাল ধ'রে এই রূপই আমি কল্পনা করেচি, ধ্যান করেচি। আমি শিল্পী, আমি রূপের উপাসক, রূপের সাম্‌নে আমি অঞ্জলি পেতে দাঁড়াই।

মিস্ দাশ সশব্দে উঠ্‌লেন, নিজেকে সাম্‌লাবার চেষ্টায়। ভাস্কর চাইল তার পূর্ণ পরিস্ফুট দৃপ্ত রূপরাশির পানে বিকশিত শতদলের মতো পরিপূর্ণ তার মাধুরী!

আর্টিষ্ট কিনা!

মিস্ দাশ দাঁতে ঠোঁট্ চেপে হাসলেন।

ভাস্কর বাধা দিয়ে উত্তেজিতস্বরে বললে, না না। এ আর্টিষ্টের অন্ধ আবেগ নয়। রক্তের লালিমা নয়। এ নয় স্নেহভুখারীর বুভুক্ষা। এ তার অন্তরের কাতর কান্না। এ আপনি বুঝ্‌বেন না। বুঝ্‌বেন না পিপাসাতুর আত্মার এই চিরন্তন হাহাকার!

ভাস্করের গলা চিরে উঠে রুদ্ধ হ'য়ে গেল। আয়ত চোখ দুটি সজল হয়ে এলো।

মিস্ দাশ হঠাৎ অস্থির হ'য়ে উঠে দাঁড়ালেন। আগ্রহ-কম্পিত কণ্ঠে ডাক্‌লেন, রায়!

তার কণ্ঠের ঝংকারে ভাস্কর কেঁপে উঠ্‌লো। সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল।

মিস্ দাশ বললেন, চলো তোমার ষ্টুডিও দেখি, তোমার চৌরাশিক ছবি—

ষ্টুডিয়োর মাঝে মিস্ দাশ হঠাৎ বজ্রাহতের মতো একখানা লাইফ্ সাইজ্ ছবির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে পাথর হ'য়ে গেল। একটী আধাবয়সী মাঝারী সম্ভ্রান্তের পুরুষের প্রতিকৃতি। রোগা দেহ, প্রশান্ত মুখ, কপাল চওড়া, সাম্‌নের চুলগুলো পাতলা হ'য়ে এসেচে। গায়ে ঢিলে হাতা সাদা পাঞ্জাবীর ওপর জহর কোট। চোখে মুখে অনামনস্ক গাম্ভীর্য্য। পায়ের নীচে একটা দো-আঁস্‌লা সাদা কুকুর। মিস্ দাশ অপলক স্থির দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে আছে ছবির মুখের পানে, আর ভাস্কর চেয়ে আছে নির্নিমেষে মিস্ দাশের পাংশু মুখের পানে। মিস্ দাশের ঈষৎ-ভিন্ন পাতলা ঠোঁট্ দুখানি কাঁপচে হাওয়ার ভরে, কী যেন বল্‌তে চায়, বল্‌তে পারচে না।

ভাস্কর হঠাৎ ব'লে বস্‌লো, চেনেন্ নাকি? তা' হ'লে বল্‌তেন ওখানা ছবি নয়, জীবন্ত—

উত্তেজিত স্বরে মিস্ দাশ প্রশ্ন করলেন, কে? কে ইনি? তুমি এঁকে চেনো?

ভাস্কর একখানা টুলের ওপর ব'সে প'ড়ে বললে, চিনি? চিনি শুধু চোখ দিয়ে নয়, আমার দেহের প্রতি বিন্দুটি রক্ত দিয়ে, সমস্ত চেতনা দিয়ে!

কে? কে তোমার উনি রায়? ভীরু কম্পিতকণ্ঠে মিস্ দাশ প্রশ্ন করলেন।

ভাস্করের প্রোজ্জ্বল চোখদুটি কৌতুকে স্নেহে ছল্‌ছল্ ক'রে উঠ্‌ল। সে নিতান্ত বালকের মতো ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে, উনি আমার সব। আমার প্রতিপালক, আমার গুরু। উনিই আমায় জীবনের আলো দেখিয়েচেন, আঁধারের অতল হ'তে তুলে এনে। আমার ওপর ওঁর করুণার অন্ত নেই।

ভাস্কর থামল'। মিস্ দাশ চিৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, তার পর?

বিমূঢ় বিস্ময়ে প্রতিহত হ'য়ে ভাস্কর বললে, না, আর কোন সম্বন্ধ আমাদের নেই—

মিস্ দাশ অধীর উত্তেজনায় হঠাৎ নত হ'য়ে ভাস্করের একখানা হাত চেপে ধ'রে কাতরোক্তি ক'রে ব'লে উঠলেন, কোন সম্বন্ধ নেই? আমার কাছে লুকিয়ো না ভাস্কর, সত্যি বলো, কোন সম্বন্ধ নেই?

ভাস্কর কেঁপে উঠলো। কেঁপে উঠলো মিস্ দাশের তপ্ত স্পর্শে! অজানা পুলকের রোমাঞ্চ জাগলো তার দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। রক্তের মাঝে বিদ্যুৎ প্রবাহ খেলে গেল।

মিস্ দাশ তার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে উদ্দাম ঝড়ের বেগে আর্তস্বরে ডাকলেন,—ভাস্কর! ভাস্কর!

.....বাইরে হ'তে কে ভারী গলায় ডাক দিল, ভেতরে আস্‌বো ভাস্কর?

সচকিত ভাস্কর উঠে দাঁড়াল, মিস্ দাশের শক্ত মুঠোর নীচে হ'তে তার হাতখানা আল্‌গা হ'য়ে খসে পড়ল। ভাস্কর ব'লে উঠলো, ওই যে উনি এসেচেন। ভাস্কর এগিয়ে যাচ্ছিল, বাধা দিলেন মিস্ দাশ।

কে এসেচেন? কে এসেচেন, রায়?

বাইরে হ'তে যিনি ডাক দিলেন, তিনি তখন ঘরের মাঝে এসে স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন। ভাস্করের আঁকা প্রতিকৃতি যেন রূপ পরিগ্রহ ক'রে দেওয়াল হ'তে নেমে এসে মেঝের ওপর দাঁড়িয়েছে।

কারুর মুখে কোন কথা নেই। বিস্ময়ের ভারে ঘরখানা থম্ থম্ করছে। আগন্তুকের বিস্ফারিত বিস্মিত দৃষ্টির নীচে দুজনেই মাথা নীচু ক'রে দাঁড়িয়েছে। অশরীরীর ছায়া দেখে যেন তারা মূক হ'য়ে গেছে।

আগন্তুক ধীরে ধীরে তাদের কাছে স'রে এসে দাঁড়াল। অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় মিস্ দাশ ভাস্করের একখানা হাত চেপে ধরে তার দেহের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ান।

আগন্তুক সহসা সশব্দে হেসে উঠে বললে, আশ্চর্য্য! তোমায় এখানে কে নিয়ে এলো মমতা? কোন্ অদৃশ্য মহাশক্তি? আমি যে সারাপথ আজ তোমার কথাই ভাবতে ভাবতে আসচি। কিন্তু এখানে এসে যে তোমায় দেখা পাবো, এ যে আমি কল্পনা করতেও পারিনি।

ভাস্কর মাথা তুলে আগন্তুকের মুখের পানে তাকাল।

আগন্তুক বললেন, তোমার কথা ভাবছিলুম কেন জানো মমতা, আজ তোমার ছেলেকে তার পরিচয় জানিয়ে যাবো বলে। আমি আজ আবার যাচ্ছি কিনা, ডিফেন্স্ অব ইণ্ডিয়া আক্‌ট (Defence of India Act)। যদি আর না ফিরি, তাই ঠিক্ ক'রেছিলুম, ওর পরিচয় ওকে জানিয়ে যাবো। কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। তোমার ভাস্করকে আজ তোমার হাতেই দিয়ে চললুম।

আগন্তুক ডাকলেন, ভাস্কর!

ভাস্কর কাছে এলো। আগন্তুক তাকে বুকের মাঝে টেনে নিয়ে বললেন, ভাস্কর, মমতা তোমার মা। সতেরো বছর আগে একদিন ওর কোল হ'তে তোমায় ছিনিয়ে নিয়েছিলুম, আজ ফিরে দিলুম।

সবিস্ময়ে ভাস্কর প্রশ্ন করলে, মিস্ দাশ?

আগন্তুক সশব্দে হাসলেন, হাঁ মিস্ দাশ। বিধির বিধানে তিনি মিসেস্ অমর রায়, কিন্তু আইনের বিধানে

নয়। জানোইতো চিরদিন বিধির বিধানকেই মেনে এসেচি আর আইনকে অমান্য ক'রেচি—

ভাস্কর সহসা মমতাকে দুহাতে শিশুর মত জড়িয়ে ধরে চিৎকার ক'রে উঠলো, মা, মা আমার—

—আর এই বিপ্লবী অমর রায়ই তোমার পিতা। আমি চল্লুম, বাকিটুকু তোমার মার কাছে শুনো। বাইরে পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে

ভাস্করের আলিঙ্গনের নীচে মমতা তখন মূর্চ্ছা গেছে।

স্বভাবোক্তি

অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত এম্-এ

অলঙ্কারাচার্য্য দণ্ডী সমুদয় অলঙ্কারকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, স্বভাবোক্তি ও বক্রোক্তি। যাহা স্বাভাবিকতায় পরিস্ফুট, তাহা স্বভাবোক্তি; যাহা বক্রতা অর্থাৎ বৈদগ্ধ্যময় ভঙ্গীদ্বারা পরিস্ফুট, তাহা বক্রোক্তি। অলঙ্কার শব্দ শুনিয়া চিন্তিত হইবার কারণ নাই, কেন না প্রাচীনদের মতে বাক্-সৌন্দর্য্যই অলঙ্কার। আমরা সহজ করিয়া বলিতে পারি আচার্য্য দণ্ডীর মতে কাব্য দুই প্রকার,—স্বভাবোক্তিকাব্য ও বক্রোক্তিকাব্য।

প্রত্যেক নিসর্গবস্তু ও মানবীয় বস্তুর একটি নিজস্ব মহিমা আছে, সেই নিজত্বে তাহারা সৃষ্টির মধ্যে অতুলনীয়। কবিচিত্তের অনুরঞ্জনদ্বারা বস্তু রঞ্জিত হইয়া যেন বিকৃত হয়, বর্ণনার অলঙ্কার, শ্রী ও ভঙ্গী-সৌষ্ঠব যেন তাহার স্বরূপকে আবৃত করে। অলঙ্কারের সুনির্ম্মল জলধারা কোন কিছুর স্পর্শে আসিলেই, এমন কি উর্দ্ধগগনের সুনীল ছায়াপাতেও যেন অম্লান সৌন্দর্য্যলোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। মোহমুক্ত কবির প্রসন্নচিত্তে সাধারণভাবে অধিবাসিত হইয়া কখন কখন এই বস্তু বিধাতার সৃষ্টির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য লইয়া ফুটিয়া উঠে। যে ভাষায় বিহঙ্গ গান গায়, নদী নির্ঝর ছুটিয়া চলে, প্রভাতের আলোক পুষ্পবালার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া শুভ্রশ্রীতে তাকে বিকসিত করে, সেই ভাষায় কখন কখন কবি-কণ্ঠে স্বভাবের সৌন্দর্য্যস্তোত্র রচিত হয়। ইহাই সত্যকার স্বভাবোক্তি। রসধর্ম্মে প্রবল হইলে রচনা হইয়া যায় রসোক্তি, তাহা চিত্তকে করে ভাবসিক্ত। বর্ণনার সজ্জাবাহুল্যে ভূষিত হইলে রচনা হয় বক্রোক্তি। এই উভয় সীমা পরিহার করিয়া বস্তুর অবলম্বনে কবিচিত্তকে উদ্বুদ্ধ না করিয়া কবিচিত্তের অবলম্বনে বস্তু স্ব-মহিমায় দ্যোতমান হইলে রচনা হইবে স্বভাবোক্তি। যে রম্যতা ইহার প্রাণ, সে রম্যতা সর্ব্বদা রসের নয়, বক্র-বর্ণনারও নয়; সে রম্যতা বস্তুর প্রাণধর্ম্মের অভিনব স্পন্দন, তাহারই সজীব চিন্ময় স্পর্শ। মন তাতে মুগ্ধ হয়, আবিষ্ট হয়, বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে একবার অন্তরে একবার বাহিরে দৃষ্টিপাত করে।

এই বর্ণনা চিত্রকে দীপ্ত করা অপেক্ষা বিগলিত করে বেশী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এই রচনা সম্বন্ধে বলা যায়,—

আমার এ গান ছেড়েছে তা'র
সকল অলঙ্কার;
তোমার কাছে রাখেনি আর
সাজের অহঙ্কার।
অলঙ্কার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে,
তোমার কথা ঢাকে যে তার
মুখর ঝঙ্কার।

—গীতাঞ্জলি

ভাবের, সাজের এবং অহঙ্কার ও অলঙ্কারের মুখর ঝঙ্কার স্বভাবোক্তির স্বভাবরূপ প্রাণটিকে একেবারে বিনষ্ট না করিলেও তাহাকে আচ্ছন্ন করে এবং সহৃদয়ের হৃদয়ের সহিত তাহার পূর্ণ মিলন ঘটিতে দেয় না।

অলঙ্কারাচার্য্য দণ্ডী স্বভাবোক্তিকে আদি বা প্রথম অলঙ্কার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং পরে অন্যান্য অলঙ্কারের কথা বলিয়াছেন। দণ্ডী বলিয়াছেন,—

নানাবস্থাং পদার্থানাং রূপং সাক্ষাদ্ বিবৃণ্বতী।
স্বভাবোক্তিশ্চ জাতিশ্চেত্যাদ্যা সালঙ্কৃতির্যথা॥

—কাব্যাদর্শঃ, ২।৮

—পদার্থসমূহের নানা অবস্থার স্বরূপ যাহাতে সাক্ষাৎভাবে বিবৃত হয়, তাহাই স্বভাবোক্তি বা জাতি, তাহাই আদ্য অলঙ্কার। মূলের 'রূপ' শব্দের অর্থ টীকাকারেরা করিয়াছেন,—

'স্বরূপ-বিশেষম্ অসাধারণ-ধর্ম্মম্'—স্বরূপ বিশেষ, যাহা বস্তুর অসাধারণ বা বিশিষ্ট ধর্ম্ম। এই অর্থই অভিপ্রেত সন্দেহ নাই।

জাতি শব্দের ব্যাখ্যায় কথিত হয়,—

নানাবস্থাসু জায়ন্তে যানিরূপাণি বস্তুনঃ।
স্বেভ্যঃ স্বেভ্যো নিসর্গেভ্য স্তানি 'জাতি' প্রচক্ষতে॥

—নিজ নিজ নিসর্গ হইতে বস্তুর নানা অবস্থায় যে সকল রূপ জাত হয়, তাহাদিগকেই জাতি বলে। দণ্ডী স্বভাবোক্তিকে আদ্য অলঙ্কার বলিয়া স্বভাবোক্তি-কাব্য যে মনুষ্য সমাজের আদি কাব্য, তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বক্রোক্তি মানুষের শিক্ষার আভিজাত্য প্রকাশ করে; তাহা যে পরবর্ত্তী সভ্যতার সৃষ্টি, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বভাবোক্তি মানুষের প্রীতি-সিক্ত চিত্তে আপন প্রসন্নতায় ফুটিয়া উঠে; তাহা কেবল আদ্যকালের নয়, তাহা নিত্যকালের; তাহার সহিত অচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে সহজ মানুষটির। জেম্‌স্ হেনরি লী হাণ্ট কাব্য কি বুঝাইতে যাইয়া এক জায়গায় বলিয়াছেন—

"Nay the simplest truth is often so beautiful and impressive of itself, that one of the greatest proofs of his genius consists in his leaving it to stand alone, illustrated by nothing but the light of its own tears or smiles, its own wonder, might or playfulness."

—What is Poetry?

—"শুধু তাই নয়, সহজতম সত্যটি অনেক সময়ে এত সুন্দর এবং নিজেই এত হৃদয়গ্রাহী যে, কবির প্রতিভার একটি সব চাইতে বড় প্রমাণ হইতেছে ইহাকে কেবল নিজ স্বভাবে থাকিতে দেওয়ায়; ইহা নিজ অশ্রু বা হাসির প্রভা, নিজ বিস্ময়-শক্তি এবং লীলাময়ত্বে নিজেই প্রকাশ পাইবে, আর কিছুতে নহে।"

স্বভাবোক্তি কাব্য সম্বন্ধে ইহার পর আর কিছু বলিবার নাই।

স্বভাবোক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। নিসর্গ-কবিতা ও প্রাণি-কবিতা। নিসর্গ শব্দে সংস্কৃতে সর্গ বা সমগ্র সৃষ্টি বুঝাইলেও বাঙ্গলায় বৃক্ষ-লতা, নদী-পর্ব্বত, মেঘ-রৌদ্র প্রভৃতি প্রত্যক্ষ প্রাণ-স্পন্দ-হীন মূক বা দৃশ্যমান প্রকৃতি অর্থাৎ Nature অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই নিসর্গ বা Nature আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের এক প্রধান অবলম্বন। প্রাচীন নাট্য বা কাব্যেও তাহার অনাদর ছিল না। অভিজ্ঞান-শকুন্তল বা বিক্রমোর্ব্বশী অথবা উত্তরচরিত নাটকে নিসর্গের অপূর্ব্ব বিশিষ্টতার কথা কাব্য-রসিক মাত্রেই অবগত আছেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—"অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকে অনসূয়া প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্মন্ত যেমন, তপোবন প্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র।"

(প্রাচীন সাহিত্য, শকুন্তলা)।

আধুনিক গীতিকাব্যের যুগে নিসর্গ-সুন্দরী কবির আরাধ্যা দেবীতে পরিণত হইয়াছেন। কবি ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থ নিজেকে 'A worshipper of Nature' প্রকৃতির পূজারী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বাস্তবিকই প্রকৃতি এখন কবির চক্ষে এক স্বতন্ত্র সত্তায় দীপ্যমান, কবির সহচরীরূপে কখন তাহাকে বশ করে, কখন তাহার বশীভূত হয়। প্রাণি-জগতের কাব্যে সহজেই ভাব ও রসের সঞ্চার হয়; কিন্তু কখন কখন বর্ণনার স্বভাব-সৌন্দর্য্যই সমধিক পরিস্ফুট হয়, রস ও ভাব থাকিলেও তাহা স্বভাবোক্তি বলিয়াই সর্ব্বাগ্রে চিত্তকে চমৎকৃত করে।

শারদীয়

শামসুদ্দীন

আলোর দিগন্ত রেখা চলে ছুটে আরো দূর পথে,
দৃষ্টি নয় ক্ষীণ তন্দ্র, দীপ্ত আরো জাগার মায়ায়;

ছুরন্ত কালের স্রোত তরঙ্গিত দিনের পাখায়
এলোমেলো তীরে তীরে চলিয়াছে অক্লান্ত রথে।
আকাশে উলসি' ওঠে তারকায় কামনা মনের,
বিমুগ্ধ ধরণী আঁখি দেখিছে তা' আকুল বিস্ময়ে;
বাসনার বৃন্তগুলি মেলি' দল শস্প-কিশলয়ে
ঊষর মরুতে খুঁজে পরিণাম অফুট পথের।

স্বচ্ছন্দ মনের তটে নিরিবিলি জলের ধারায়
সে সাধ বাঁধিছে বাসা রোমাঞ্চিত জীবন বেলাতে;
সহস্র মধ্যাহ্ন সূর্য হাজারো সে রাতের তিমির
পারিবে না ভেঙে দিতে সেই সুর ক্ষণিক ছায়ায়;
উজ্জ্বল প্রদীপ্ত রবে রক্তরাঙ্গা স্মৃতির ছায়াতে
সংগ্রামের ইতিহাসে স্বাতন্ত্র্যের সংকীর্ণ প্রাচীর।

শ্যামসুক

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বৈষ্ণব শ্যামসুক,
দিবানিশি তার দেহ মন প্রাণ—
হরি সেবা উন্মুখ।
আপনারে ভাবে সবাকার নীচু,
হরিকথা ছাড়া শোনে না ক কিছু,
হরি তার ধ্যান, হরি তার জ্ঞান,
হরি তার সুখ দুখ।

(২)

গ্রাম থেকে দূরে রয়,
করে কাঞ্চন কামিনীকে সে যে
সর্পের চেয়ে ভয়।
বলে 'পিচ্ছিল কঠিন এ পথ,
প্রতি পদে পদে বিঘ্ন বিপদ,'
রুক্ষ নীরস জীবন তাহার
তবু কি অমৃতময়!

(৩

হরি শোনে তার ডাক,
প্রতি কথা তার হয় যে সফল
সত্যসিদ্ধ বাক্।
বুকে তার মহাভাবের জগৎ,
বাহিরেতে থাকে শুধু জড়বৎ
রাগের পথের প্রেমিক পথিক
সংসারে বীতরাগ।

(৪)

একদা পর্য্যটনে
চলেছেন সাধু, থমকি দাঁড়ান
বালকের ক্রন্দনে।
হারায়ে ফেলেছে পয়সাটী তার—
কাঁদিয়া আকুল খুঁজিয়া বেড়ায়,
হাতে দেন তার খুঁজে পেয়ে সাধু
অনেক অন্বেষণে।

(৫)

একি এ অকস্মাৎ!
সাধুর গাত্র শিহরি উঠিল,
অবশ হইল হাত।
অর্থের বিষ তীব্র কি এত?
পশে দেহে মনে গরলের মত,
দেবের দেউলে এ যেন হঠাৎ
হল রে বজ্রপাত।

(৬)

স্বপ্নে সাধুর মনে
পয়সার ছাপ, শিশুর বদন
জাগে যে ক্ষণে ক্ষণে।
জাগে আশ্রমবিরোধী কি ভাব
সাংসারিকের ক্ষতি আর লাভ
অসহ বেদনা—কাঁদিয়াও তাহা
যায়না যে জাগরণে।

(৭)

লক্ষ্য করে নি কেহ
পরদিন হতে জ্যোতিঃহারা হলো
সাধুর পুণ্য দেহ।
আশীর্ব্বাদের ফলেনাক ফল,
সাধু ম্লান মুখ—চোখ ভরা জল,
মমতা দেখালে—এই অপরাধে
পতন হওয়া কি শ্রেয়?

(৮)

কহিছে দৈববাণী
কেন হুঁসিয়ার হলে নাক সাধু
পিচ্ছিল পথ জানি?
সেনাদল যারা রণে ছুটে যায়
কোনো দিকে তারা ফিরে কি তাকায়?
সাগরে কি ঘটে দেখিয়া দেখেনা
মুকুতার সন্ধানী।

(৯)

হে কঠোর সন্ন্যাসী,
রাগের এ পথে সদাই বাদল
পিচ্ছিল বারমাসই।
ধরা মায়া আছে আগুলিয়া পথ,
মিশিলে পতন—দেখিলে বিপদ,
ব্যাকুল হৃদয়ে ছুটে যেতে হবে
যেখানে ডাকিছে বাঁশী।

ওরে যাযাবর মন

শ্রীঅপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এই নিখিলের পথে প্রান্তরে ওরে যাযাবর মন!
নিশিদিন ধরে দরবেশ সম চলেছ বাজায়ে বাঁশী;
তোমারে তো জয় করেনি এখনো ঘুম-কিশোরীর হাসি,
বিজন প্রাণের মুক্তি স্বপন তবুও চিরন্তন!
মরণের ছায়া মরীচিকা হয়ে তোমারে দিয়েছে দেখা,
রমণীর মায়া রহস্যজালে জড়ালো তোমারে লাজে;
অসীমকালের কত মোহানায় দেখেছ তোমার কাছে
বিরহবিধুর ধরিতার মতো ধরার ছন্দ-রেখা!

কামনার পরী ভালোবাসা নিয়ে গেয়ে গেছে আশাবরী,
ভাব-বিহ্বল শুনেছ ক্ষণিক মীড়টানা তার গীতি,
মেয়েলি হাতের হাতছানি পেয়ে স্বপনেরবন প্রীতি
মরুর কানন রচিয়াছে বৃথা আকাশ কুসুম ঝরি'!
কত রজনীর তারকার বাণী আসিয়াছে অভিসারে,
তোমারে ভোলাতে করেছে অশ্রু—বিরহে ছিন্নহার তারা
যুগে যুগে তব চলার সাথনা চির আশাহারা,—
সীমার ওপারে কখন তুমি কি খুঁজিবে মুক্তিটারে!

অজানার সাথে গানের ভেলাতে আজো নাহি দিলে পাড়ি
ভুলের কুসুম কুড়ায়ে কুড়ায়ে চির পথিকের প্রায়।
তোমার অতীত, ভুবনে নাহিক স্মরণের চেতনা,
পরিচয়হীন বিরহ গানে তোমারে চেনেনা কেহ।

রাজপরিবারের সংবাদ

শ্রীশ্রীমহারাজা ভূপবাহাদুর সমরকার্য্যে ভারতের বাহিরেই অবস্থান করিতেছেন। রয়টারের সংবাদে প্রকাশ যে, সিঙ্গাপুরে জাপানীদের আত্মসমর্পণের দলিল সম্পাদনের সময়ে তিনি লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের সহিত তথায় উপস্থিত ছিলেন। বর্ত্তমান যুদ্ধে শত্রুপক্ষের আত্মসমর্পণের সময় আর কোথাও কোন ভারতীয় নৃপতি উপস্থিত ছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই।

মাতৃশ্রী শ্রীশ্রীমহারাণী সাহেবা বর্ত্তমানে দার্জ্জিলিংএ আছেন।

স্থানীয় সংবাদ

প্রধান মন্ত্রীর পীড়া—

কুচবিহার রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় সর্দ্দার ডি, কে, সেন এম-এ, বি-সি-এল, এল্-এল্-বি, ব্যার-এট্-ল মহোদয় কিছুদিন যাবত অ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ রোগে ভুগিতেছিলেন। গত জুন মাসে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায় এবং তখনই অস্ত্রোপচারের কথা হয়। কিন্তু ডাক্তারগণের পরামর্শে তখন অস্ত্রোপচার স্থগিত রাখা হয়। সম্প্রতি গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার এক নার্সিহোমে তাঁহার দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়। আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতেছেন। কুচবিহার হইতে তাঁহার সাময়িক অনুপস্থিতি কালে রাজ্যের রাজস্বমন্ত্রী রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত করালীচরণ গাঙ্গুলী মহোদয় নিজ কার্য্য ছাড়াও প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেছেন।

স্থানীয় কলেজের নূতন অর্থনীতির অধ্যাপক—

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ এম্-এ স্থানীয় ভিক্টোরিয়া কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। অধ্যাপক গুহ ইতিপূর্ব্বে বগুড়া কলেজে কার্য্য করিতেন।

সদর হাসপাতালের বেসরকারী পরিদর্শক

কুচবিহার দরবার নিম্নলিখিত মহিলা ও ভদ্রলোকদিগকে এক বৎসরের জন্য স্থানীয় সদর হাসপাতালের বেসরকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করিয়াছেন—(১) রায় সাহেব সুরেন্দ্রনাথ বসু মজুমদার, (২) শ্রী চৌধুরী আবদলহাই সাহেব, (৩) শ্রীযুক্ত চুনীলাল মুখোপাধ্যায়, এবং (৪) শ্রীযুক্তা ইন্দিরা রায়।

মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের মৃত্যুবার্ষিকী—

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর স্বর্গগত মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের বার্ষিকী শ্রাদ্ধদিবস গিয়াছে। ঐ দিবস সকাল সাড়ে নয় ঘটিকার সময় কেশব আশ্রমে মৃত মহারাজার সমাধিমন্দিরের সন্নিকটে এক বিশেষ উপাসনা হয়। কলিকাতা হইতে আগত ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বোষ মহাশয় উপাসনা পরিচালনা করেন। রাজ্যের রাজস্বসচিব এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ কেশব আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মৃত মহারাজার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

বৈকালে সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় মহারাজার মর্ম্মর-মূর্ত্তির সন্নিকটে হাইকোর্টগৃহের বারান্দায় এক স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। মাননীয় রাজস্বসচিব মহোদয়ের প্রস্তাবে আচার্য্য বোষ মহাশয় এই স্মৃতিসভার সভাপতিত্ব করেন। সভায় সঙ্গীত, প্রার্থনা ও বক্তৃতাদি হয়। মাননীয় শিক্ষাসচিব শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় সিংহ সরকার, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবাপ্রসাদ সেন এবং শ্রীযুক্ত জানকী বল্লভ বিশ্বাস মহাশয় সভায় বক্তৃতা করেন।

স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উভয় অনুষ্ঠানই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল।

দেশবিদেশের কথা

আন্দামানে নির্ব্বাসন ব্যবস্থা রহিত—

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ বহুদিন যাবত ভারত সরকার কর্ত্তৃক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীদিগের কারাবাসস্থল রূপে ব্যবহৃত হইতেছিল। জাপানের হস্ত হইতে এই দ্বীপপুঞ্জ পুনরুদ্ধারের পর ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন যে তাঁহারা আর ভারতীয় বন্দীগণকে আন্দামানে পাঠাইবেন না। আন্দামানে বন্দী প্রেরণের জন্য ভারতে যে রাজনৈতিক অসন্তোষের সৃষ্টি হইত ভারত সরকারের বর্ত্তমান সিদ্ধান্তের ফলে তাহা দূরীভূত হইবে।

বৃদ্ধা মহিলার জ্ঞানস্পৃহা—

এই বৎসর পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এক বৃদ্ধা বাঙ্গালী মহিলা বাংলায় এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া জ্ঞানস্পৃহার এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। মহিলার নাম শ্রীযুক্তা মৃণালিনী ঘোষ; তাঁহার এগারোটি নাতিনাতনী বর্ত্তমান। তাঁহার স্বামী পরলোকগত মিষ্টার এল্, কে, ঘোষ বিহার ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ বৎসর পরে ১৯৪১ সালে শ্রীযুক্তা ঘোষ আই-এ পরীক্ষা দেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বি-এ পরীক্ষা দেন; এবং সেই বৎসরই তাঁহার বড় নাতনী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়।

কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের নূতন অধ্যক্ষ—

আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে শ্রীযুক্ত মুকুল দে অবসর গ্রহণ করায় সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অতুল বসু মহাশয় কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলের নূতন অধ্যক্ষ

নিযুক্ত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসু কৃতী শিল্পী; প্রথম জীবনে বাংলার বাঘ (Bengal Tiger) নামে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একখানি ছবি আঁকিয়া তিনি বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি লণ্ডনের Royal Academy of Artsএ শিক্ষালাভ করেন এবং ইউরোপের বিভিন্ন শিল্পাগার পরিদর্শন করেন। নয়া দিল্লীতে রাষ্ট্রপ্রতিনিধির প্রাসাদে তাঁহার অঙ্কিত কয়েকখানি ছবি আছে।

অধ্যাপক জ্ঞান মুখার্জ্জির নূতন পদ—

ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদিগের অন্যতম। ভারত সরকার ইংলণ্ড ও আমেরিকায় যে বিজ্ঞান মিশন প্রেরণ করিয়াছিলেন ডক্টর মুখোপাধ্যায় তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি খবর পাওয়া গিয়াছে যে ভারত সরকার তাঁহাকে Imperial Agricultural Research Council এর ডিরেক্টর নিযুক্ত করিয়াছেন। ডক্টর মুখোপাধ্যায়ের এই নূতন পদলাভে আমরা আনন্দিত এবং তাঁহাকে আমাদের সর্ব্বান্তঃ অভিনন্দন জানাইতেছি।

আমেরিকার ভারতস্থিত অতিরিক্ত যুদ্ধ সম্ভার বিক্রয়—

আমেরিকার যে সকল অতিরিক্ত যুদ্ধসম্ভার ভারতে পড়িয়া আছে সেইগুলি শীঘ্র ভারতবর্ষেই বিক্রয় করিয়া ফেলা হইবে। এই সকল যুদ্ধসম্ভারের মধ্যে এরোপ্লেন, মোটরগাড়ী প্রভৃতি ব্যতীত গৃহনির্ম্মাণের সাজসরঞ্জাম, খাদ্যদ্রব্য এবং বস্ত্রাদিও আছে। শেষোক্ত দ্রব্যগুলির বিক্রয়ে ভারতবাসীর অনেক সুবিধা হইবে।

আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সম্প্রতি পুণা সহরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা হইয়া গেল। এই সভায় স্থির হইয়াছে যে ভারতের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাসমূহের নির্ব্বাচনে কংগ্রেস প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবে। এই জন্য সর্দ্দার প্যাটেল, ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতিকে লইয়া একটি পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিতকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বান—

ডক্টর জোয়াড ইংলণ্ডের একজন বিখ্যাত দর্শনের অধ্যাপক; তাঁহার খ্যাতি পৃথিবীর নানা দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ১৯৪৬ সালে "ষ্টিফানোস্ নির্ম্মলেন্দু" বক্তৃতামালা দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন। ডক্টর জোয়াড এই আহ্বান গ্রহণ করিলে বিশ্ববিদ্যালয় উপকৃত হইবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা—

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হইয়াছে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে জাপান মিত্রপক্ষের নিকট চূড়ান্ত আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এখন মিত্রপক্ষের সম্মুখে জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠার সমস্যা মুখ্য হইয়া দেখা দিবে। পৃথিবীতে যাহাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় জগৎবাসী তাহাই কামনা করে। শক্তিশালী সম্মিলিত জাতিসমূহকে এই জন্য সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে। সঙ্কীর্ণ স্বার্থ ও ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জগতের কল্যাণচিন্তায় তাহাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। সবল যাহাতে দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিতে না পারে, বৃহৎ যাহাতে ক্ষুদ্রকে গ্রাস করিবার লোভে মত্ত হইয়া না উঠে সেই দিকে সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রপ্রতিষ্ঠার আদর্শ লইয়া এই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল; সেই আদর্শ যাহাতে কার্য্যকরী হয় সম্মিলিত জাতিসমূহকে তদ্বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। ইতিমধ্যেই বন্ধুভাবাপন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। রুশিয়া বল্কান রাষ্ট্রসমূহের সহিত একক চুক্তি সম্পাদন করিতেছে বলিয়া ইংলণ্ড ও আমেরিকা অভিযোগ করিতেছে; পক্ষান্তরে রুশিয়ার অভিযোগ এই যে ইংলণ্ড ও আমেরিকা পশ্চিম ইউরোপে রুশিয়ার বিরুদ্ধে দল পাকাইবার চেষ্টা করিতেছে! সম্মিলিত জাতি-সমূহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের ভাব জগতে স্থায়ী শান্তিপ্রতিষ্ঠার অনুকূল নহে। জগতের রাষ্ট্রনায়কগণের অন্তরে শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হউক, আমরা ইহাই কামনা করি। অন্যথায় এত রক্তপাত, মৃত্যুবরণ, ধ্বংসলীলা সকলই ব্যর্থ হইয়া যাইবে!

আণবিক বোমা—

বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নানাবিধ নূতন আবিষ্কার হইয়াছে; ছয় বৎসরে বিজ্ঞানের অগ্রগতি শত বৎসর আগাইয়া গিয়াছে—কোন কোন বিজ্ঞানীর ইহাই অভিমত। বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার নবতম অবদান আণবিক বোমা; ইহার ধ্বংসকারী শক্তি জাপানের হিরোসিমো ও নাগাসাকি বন্দরে অনুভূত হইয়া গিয়াছে। এতদিন মানুষ তড়িৎ, তাপ, এবং রাসায়নিক শক্তির সহিতই পরিচিত ছিল; এই সকল শক্তির সাহায্যে সে অসাধ্য সাধন করিয়াছে। পরমাণুর মধ্যে এক মহাশক্তি লুক্কায়িত আছে, মানুষ তাহাও জানিত; কিন্তু এই শক্তি নিষ্কাশন করিয়া কিভাবে কাজে লাগান যাইতে পারে তাহার সন্ধান এতদিন মানুষ পায় নাই। আজ সেই সন্ধান পাইয়া মানুষ শক্তিমদে মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমেরিকা কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত দুইটি আণবিক শক্তিসম্পন্ন বোমার আঘাতে জাপানের দুইটি প্রকাণ্ড বন্দর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারাইয়াছে। বিজ্ঞানসাধনার এই ভয়াল মূর্ত্তি দেখিয়া বিশ্বমানব সভয়ে প্রশ্ন করিতেছে, ইহার পরিণাম কি? মানুষের অন্তর হইতে যদি হিংসা, দ্বেষ, লোভ, অহঙ্কার দূরীভূত না হয় তাহা হইলে বিজ্ঞানের এই অপপ্রয়োগে গোটা পৃথিবীটাই একদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত হইয়া এই আণবিক শক্তি কিভাবে বিশ্বকল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে বিজ্ঞানীদের এবং রাষ্ট্রনেতাদের সেইদিকে

হইতে হইবে। "Peace hath victories no less renowned than war." শেষ হইয়াছে, এখন বিজ্ঞান শক্তির প্রয়োগ দ্বারা শান্তির কল্যাণক্ষেত্রে মানব নব নব জয়লাভ করুক ইহাই কামনা করি।

দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার শিক্ষার ক্ষতি

ভারতীয় সংখ্যাতত্ত্ব পরিষদ (Indian Statistical Institute) কর্তৃক অনুষ্ঠিত একটি সাম্প্রতিক জরিপের ফলে গত দুর্ভিক্ষে বাংলা দেশে শিক্ষার কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে তাহার একটা আভাস পাওয়া যায়। গত ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ এবং ১৯৪৪ সালের মহামারী দ্বারা বিধ্বস্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৩১০টি গ্রামের শিক্ষার অবস্থা জরিপ করা হয়। ইহাতে দেখা যায় যে ঐ সকল গ্রামের বিদ্যালয়সমূহে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে ২৮০০৩ জন ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিত; ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহাদের সংখ্যা কমিয়া ১৮৫২৬ হয়; ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা আরও কমিয়া ১৭৮৯৯এ দাঁড়ায়। এই জরিপলব্ধ সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া সংখ্যাতত্ত্ব পরিষদ সারা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার কি ক্ষতি হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে বাংলার গ্রাম্যবিদ্যালয়সমূহে ২১ লক্ষ ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করিত; ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা বাড়িয়া প্রায় ৩২ লক্ষ হয়; কিন্তু ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে এই সংখ্যা কমিয়া ২৬৯০ লক্ষের একটু উপরে দাঁড়ায়। এই সংখ্যা অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে ১৯৩৯ হইতে ১৯৪৩ পর্য্যন্ত যে হারে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়িতেছিল সেই হারে বাড়িতে থাকিলে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে বাংলার গ্রাম্য বিদ্যালয়সমূহে (জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধরিয়া) ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ হইত। অর্থাৎ, দুর্ভিক্ষ এবং মহামারীর ফলে ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ এই দুই বৎসরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ১৪ লক্ষ কমিয়া গিয়াছে। জরিপে ফলে আরও দেখা গিয়াছে যে গ্রাম্যবিদ্যালয় সমূহে শুধু ছাত্রসংখ্যাই কমে নাই; শিক্ষার মানদণ্ডেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে।

দুর্ভিক্ষ ও মহামারী যে আমাদিগকে কত রকমে মারিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহার শেষ নাই। শিক্ষার যে ক্ষতি হইল তাহা অপূরণীয়; বাংলার ভবিষ্যদ্বংশধরগণকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে।

ভারতীয় শিল্পপতি মিশনের ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন—

ভারতের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে এদেশে নানাবিধ শিল্পের প্রতিষ্ঠা একান্ত আবশ্যক। যুদ্ধোত্তর কালে ভারতে শিল্পপ্রতিষ্ঠায় বিদেশ হইতে কিরূপ সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিবার নিমিত্ত কয়েকজন ভারতীয় শিল্পপতি কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও আমেরিকা ভ্রমণে গিয়াছিলেন। এই দলে জে, আর টাটা; ডি ডি বিরলা; এন, আর সরকার প্রভৃতি ছিলেন। ইহারা সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া একটি রিপোর্ট প্রচার করিয়াছেন। এই রিপোর্টে তাঁহারা বলিয়াছেন যে নিকট ভবিষ্যতে ইংলণ্ড বা আমেরিকা হইতে কারখানা স্থাপনোপযোগী কলকব্জা বা যন্ত্রপাতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। আমেরিকা হইতে এইরূপ যন্ত্রপাতি পাইতে বহুদিন লাগিবে; ইংলণ্ড কমপক্ষে দুই বৎসরের পূর্ব্বে কোন সরবরাহ পাইবার সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শিল্পপতিগণের মতে বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষ করিয়া যন্ত্রপাতি কিনিবার চেষ্টা করা সমীচীন হইবে না; তাহা করিতে গেলে একদিকে পুরাতন যন্ত্রপাতি বিক্রি হইবে এবং অন্যদিকে উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করা [illegible]

হইবে। বছর দুই গেলে ঐ সকল দেশে উন্নততর যন্ত্রপাতি নির্ম্মিত হইবে এবং তাহাদের মূল্যও কমিবে। পুরাতন যন্ত্রপাতি কিনিয়া উৎপাদনে নামিলে প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্পের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং শিল্প-পতিগণের উপদেশমত বর্ত্তমানে বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক না দিয়া আপাততঃ ভারতে ছোটখাট শিল্প প্রসারের জন্য চেষ্টা করাই সঙ্গত হইবে। তবে ইতিমধ্যে বিদেশী মালে বাজার ছাইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে কিন্তু সরকারী সাহায্য পাইলে ইহাতে পরিণামে শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাঘাত হইবে না।

খেলাধূলা

কুচবিহার কাপ ফাইন্যাল—

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার কলিকাতায় কুচবিহার কাপের ফাইন্যাল খেলা হইয়া গিয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল দল মহমেডান স্পোর্টিং দলকে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়া কাপ বিজয়ী হইয়াছে। ইষ্টবেঙ্গল দলের পক্ষে মহাবীর একাই তিনটি গোল করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

আমাদের মনে হয় কুচবিহার হইতে একটি দল এই খেলায় প্রতিযোগিতা করিলে ভাল হয়। আমরা এ বিষয়ে মহারাজার ক্রীড়া-সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

ইলিয়ট শীল্ড ফাইন্যাল—

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর এই শীল্ডের ফাইন্যাল খেলা হইয়া গিয়াছে। লিটলটনের দল কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ দলকে এই বিন ৩—১ গোলে পরাজিত করিয়া এই বৎসর শীল্ডবিজয়ীর সম্মান অর্জ্জন করে। পূর্ব্বে উভয় দল ১—১ গোল করায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়।

এই খেলাটি কেবল ছাত্রদলের ভিতরই সীমাবদ্ধ। কুচবিহার ছাত্রদলও একবার এই শীল্ডবিজয়ীর সম্মানঅর্জ্জন করিয়াছিল। কিন্তু আজকাল আর কুচবিহার হইতে ছাত্রদল এই শীল্ডে প্রতিযোগিতা করিতে যায় না। আবার এই শীল্ড খেলায় যোগদান করা যায় কিনা ছাত্রগণ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

স্থানীয় খেলাধূলা—

মণীন্দ্রমেমোরিয়াল শীল্ড খেলার উদ্যোগ আয়োজন লক্ষ্য করিয়াছিলাম কিন্তু তাহা বোধ হইতেছে খেলা আর হইবে না। ফুটবল মরশুমও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।

পূজাবকাশের পর বিদ্যালয়ের ও অফিসাদি খুলিলে ক্রীকেট খেলার ধুম পড়িয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে কুচবিহার ক্রীকেট ক্রীড়ামোদী ও খেলোয়াড়গণকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে গতবার কুচবিহারদলের ক্রীকেট খেলা দলের পূর্ব্ব সুনাম অনুযায়ী হয় নাই। এবারে খেলায় যাহাতে সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকে প্রথম হইতে খেলোয়াড়গণ যেন সে বিষয়ে অবহিত হন।

আমরা জানিয়া সুখী হইলাম যে ক্যাপ্টেন এস, বা এ-ডি-সি মহাশয় রাজবাড়ীর খেলাধূলার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার এ সহরের ক্রীড়া-সম্পাদক শ্রীযুক্ত দিজেন সেনের যোগ্য নেতৃত্বে কুচবিহার দল খেলাধূলা বিষয়ে ক্রমেই অধিকতর গৌরব অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে।